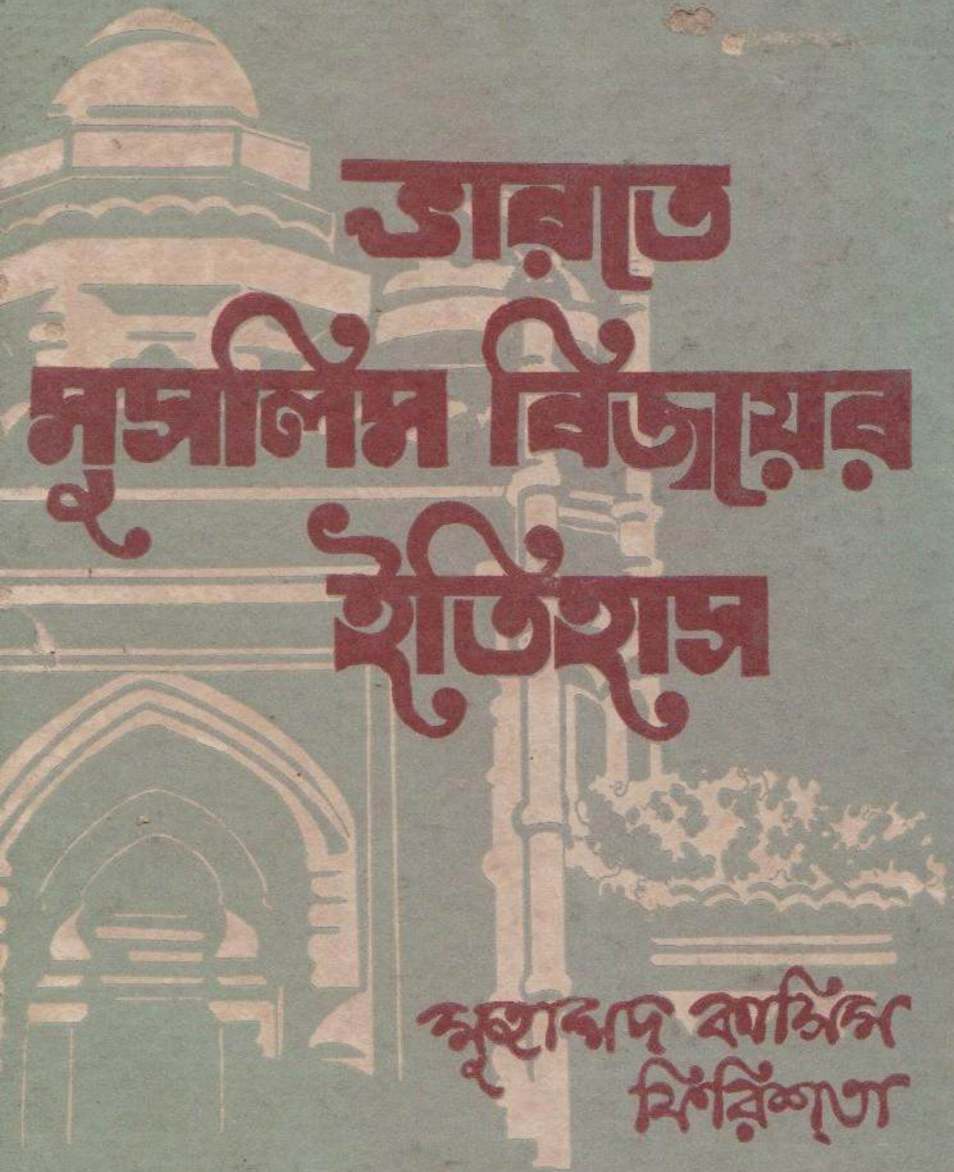

ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস

মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশতা

মুহাম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা বিরচিত

ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস

অনুবাদ :

মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ

এম. এস. সি, এম. বি. বি. এস.

প্রথম প্রকাশ
কার্তিক, ১৩৮৪
[নভেম্বর, ১৯৭৭]

বাএ/৮৯১
পাণ্ডুলিপি : অনুবাদ বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

প্রকাশনায়
ফজলে রাব্বি
পরিচালক
প্রকাশন-মুদ্রণ-বিক্রয় বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা—১

মুদ্রণে
মানিক লাল শর্মা
মনোরম মুদ্রায়ণ
২৪ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা—১

প্রচ্ছদ : সিতারা ইব্রাহিম

মূল্য : পঁয়ত্রিশ টাকা মাত্র।

BHARATE MUSLIM BIJOYER ITIHASH : Bengali Translation of Ferista's History of Muslim Conquest of India. Translated by

সূচীপত্র

উপক্রমণিকা ১—৮

প্রথম অধ্যায়ঃ লাহোরের গজনভী সুলতানদের ইতিহাস

আমীর নাসির-উদ-দীন সুবুক্তগীন	...	৯—২২
আমীর ইসমাইল	...	২৩—২৫
সুলতান মাহমুদ গজনভী	...	২৬—৭৫
সুলতান মুহাম্মদ গজনভী	...	৭৬—৭৮
সুলতান মাসুদ (১) গজনভী	...	৭৯—৯২
সুলতান মওদুদ গজনভী...	...	৯৩—১০১
সুলতান মাসুদ (২) বিন-মাসুদ গজনভী	...	১০২
সুলতাল আবুল হাসান আলী গজনভী	...	১০৩—১০৪
সুলতান আবুল রশিদ গজনভী	...	১০৫—১০৭
সুলতান ফারুকজাদ গজনভী	...	১০৮—১০৯
সুলতান ইব্রাহিম-বিন-মসউদ গজনভী	...	১১০—১১৩
সুলতান মসউদ (৩) বিন ইব্রাহিম গজনভী	...	১১৪
সুলতান আরসালান গজনভী	...	১১৫—১১৬
সুলতান বৈরাম-বিন-মসউদ (৩) গজনভী	...	১১৭—১২১
সুলতান খসরু-বিন-বৈরাম গজনভী	...	১২২—১২৩
সুলতান খসরু মালিক-বিন-খসরু গজনভী	...	১২৪—১২৫

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ দিল্লীর সুলতানদের ইতিহাস

মুহাম্মদ ঘুরী	...	১২৬—১৪৭
কুতুব-উদ-দীন আইবেক	...	১৪৮—১৫৭
তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ	...	১৫৮—১৬০
আরাম	...	১৬১—১৬২
শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাস	...	১৬৩—১৬৭
রুকুন-উদ-দীন ফিরোজ	...	১৬৮—১৬৯

সুলতানা রাজিয়া বেগম	...	১৭০—১৭৪
মুইজ-উদ-দীন বৈরাম	...	১৭৫—১৭৮
আলা-উদ-দীন-মসউদ	...	১৭৯—১৮১
নাসির-উদ-দীন মাহমুদ	...	১৮২—১৯৩
গিয়াস-উদ-দীন বুলবন	...	১৯৪—২১৪
কায়কোবাদ	...	২১৫—২২৩
আলা-উদ-দীন ফিরোজ খিলজী	...	২২৪—২৫১
আলা-উদ-দীন খিলজী	...	২৫২—৩০১
ওমর খিলজী	...	৩০২—৩০৪
মোবারক খিলজী	...	৩০৫—৩১৭
গিয়াস-উদ-দীন তোগলক	...	৩১৮—৩২৪
মুহাম্মদ তোগলক	...	৩২৫—৩৫৩
ফিরোজ তোগলক	...	৩৫৪—৩৭০
গিয়াস-উদ-দীন তোগলক (২)	...	৩৭১—৩৭২
আবুবকর তোগলক	...	৩৭৩
নাসির-উদ-দীন মহাম্মদ তোগলক	...	৩৭৪—৩৭৯
মাহমুদ তোগলক	...	৩৮০—৩৮৪
তৈমুর (বা তৈমুর লং) কর্তৃক ভারত আক্রমণ	...	৩৮৫—৪০০

দিল্লীর সুলতানদের চতুর্থ বংশঃ সৈয়দ বংশ

সৈয়দ খিজির খান	...	৪০১—৪০৬
সৈয়দ মুবারিক	...	৪০৭—৪২১
সৈয়দ মুহাম্মদ	...	৪২২—৪২৮
সৈয়দ আলা-উদ-দীন	...	৪২৯—৪৩২

দিল্লীর সুলতানদের পঞ্চম বংশ এবং লোদী বংশীয় আফগানদের প্রথম রাজবংশ

বাহুলুল লোদী আফগান	...	৪৩৩—৪৪৮
সিকান্দর লোদী আফগান	...	৪৪৯—৪৬৯
ইব্রাহিম লোদী আফগান	...	৪৭০—৪৭৭

ভারতে মুসলিম বিজয়ের ইতিহাস

গ্রন্থকার পরিচিতি

যে ইতিহাসে গ্রন্থকার অংশ বিশেষের বিবরণ স্বচক্ষে দেখিয়া বা নিজে ঘটনাবলীর সঙ্গে জড়িত থাকিয়া ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, সেইসব ইতিহাস পাঠে আমরা স্বচ্ছন্দে লেখকের জীবন সম্বন্ধে অনেক তথ্য অবগত হইতে পারি। অন্ততঃপক্ষে এইটুকু জানা যায় তিনি কে ছিলেন, কোন্ যুগে জীবিত ছিলেন এবং তাহার শেষ পরিণতি কি হইয়াছিল। ফিরিশতা সম্বন্ধে জানিবার এইরূপ সুবিধা থাকিলে তাহা অত্যন্ত সুখের বিষয় হইত। কিন্তু লেখক অতিরিক্ত বিনয়ী হওয়ার জন্য আমাদের সে পথ রুদ্ধ। সেই জন্য তাঁহার ইতিহাস পাঠে আমাদের তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানিবার ইচ্ছা হয় তাহার অর্ধেকও জানিতে পারি না। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই মহান ঐতিহাসিকের শেষ পরিণতি সম্বন্ধে কোন খবর নাই বা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার বিবরণ সুস্পষ্ট করিবার জন্য তিনি মাঝে মাঝে নিজের কথা উল্লেখ করিয়াছেন এবং উহা হইতে তাঁহার সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে তাহা এইরূপ: মুহম্মদ কাসিম ফিরিশতা (পারিবারিক পদবী)। কাশপিয়ান সাগরের তীরে আস্ত্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা গোলাম আলী হিন্দুশাহ একজন বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। গোলাম আলী জন্মভূমি ত্যাগ করিয়া ভাগ্যান্বেষণে ভারতে আগমন করেন এবং অনেক স্থান ঘুরিয়া শেষ পর্যন্ত দাক্ষিণাত্যে আহমদ নগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তখন আহমদ নগরের সুলতান ছিলেন মুর্তুজা নিজাম শাহ্। ফিরিশতা তাঁহার জন্মের সঠিক তারিখ সম্বন্ধে আমাদিগকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রাখিয়াছেন। বার বৎসর বয়সে তিনি পিতার সঙ্গে আহমদ নগরে পৌছেন এবং বালক শাহ্জাদা মীরন হুসেন নিজাম শাহের সহপাঠী ছিলেন। মীরন ১৫৮৭ খ্রীস্টাব্দে ষোল বৎসর বয়সে পিতাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। যেহেতু আমাদের গ্রন্থকার শাহজাদা অপেক্ষা বয়সে সামান্য বড় ছিলেন, এই বিবরণ হইতে আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, ফিরিশতা ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বা তাহার কাছাকাছি সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ফিরিশতার পিতা গোলাম আলী হিন্দু শাহের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া সুলতান তাঁহাকে শাহজাদা

মীরন হুসেন শাহের ফারসী ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত করেন। খুব সম্ভব আহমদনগর পৌঁছিবার অল্পকাল পরেই ফিরিশতার পিতা গোলাম আলী ইন্তেকাল করেন এবং ফিরিশতা অল্প বয়সেই এতিম হইয়া পড়েন। কিন্তু পিতার সুখ্যাতির বদৌলতে তিনি সুলতানের নিকট পরিচিত হইয়াছিলেন এবং সুলতানের অনুগ্রহ ও আশ্রয়-লাভের সৌভাগ্য তাঁহার ঘটিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার শাহী প্রভুর সিংহাসনচ্যুতির সময় ফিরিশতাকে আমরা দেহরক্ষী বাহিনীর সর্দাররূপে দেখিতে পাই। শাহজাদা মীরন শাহ তাহাকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। নতুবা সাবেক সুলতানের অন্য পার্শ্বচরদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, ফিরিশতার ভাগ্যেও তাহাই ঘটিত। এক বৎসর যাইতে না যাইতেই মীরন হোসেনও সিংহাসনচ্যুত ও নিহত হন। ফিরিশতার বয়স তখন সতর বৎসর এবং মনে হয়, তাঁহার মালিকের মৃত্যুর পর যে বিপ্লব সংঘটিত হয় তিনি তাহাতে কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন নাই। তিনি শীয়া মতাবলম্বী হওয়ার জন্য দরবারের শক্তিশালী দলের বন্ধুত্বলাভে অসমর্থ হইয়াছিলেন এবং এজন্যই আসন্ন হাঙ্গামা হইতে তিনি নিজেকে দূরে রাখিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। ইহার অনতিকাল পরে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি আহমদনগর ত্যাগ করিয়া বিজাপুরের রাজধানীতে গমন করিতেছেন।

তাঁহার নিজস্ব বিবরণ হইতেই আমরা জানিতে পাই যে, ১৫৮৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি বিজাপুরের রাজধানীতে পৌঁছেন এবং প্রধান উজির ও সুলতানের প্রতিভূ দিলওয়ার খান কর্তৃক সদয়ভাবে গৃহীত হন। উজির তাহাকে সুলতান দ্বিতীয় আদিল শাহের নিকট পরিচয় করিয়া দেন। মুর্তজা নিজাম শাহের অধীনে তিনি যে কাজ করিতেন, তাহাতে অনুমান করা যায় যে, ইব্রাহিম আদিল শাহের অধীনেও তিনি সামরিক কর্মচারী হিসাবেই কর্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজাপুরে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরেই তিনি নিজের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাতে এই ধারণাই জোরদার হয়। দিলওয়ার খান এই সময় বিজাপুর সুলতানকে আহমদ নগরের ন্যায্য দাবীদার বুরহান নিজাম শাহের স্বপক্ষে তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎকারী জালাল খানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উদ্বুদ্ধ করেন। এই জালাল খান একাধারে রাজদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন এবং অন্যদিকে নিজেকে এক ধর্মশাখার নেতা হিসাবে এবং অলৌকিক শক্তির অধিকারী বলিয়া জাহির করিতেন। বিজাপুর-রাজ প্রতিভূ-জালাল খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য

অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু তরুণ সুলতান ইব্রাহীম চাহিয়াছিলেন যে, বুরহান নিজাম শাহ যুদ্ধে নামিবার পূর্বে তিনি যুদ্ধে নামিবেন না। জালাল খান অবশ্য পূর্বেই আহমদ নগরের সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া পুবেন্দার পথে বিজাপুরের দিকে অগ্রসর হন। তখন সুলতানের আদেশ অমান্য করিয়াই দিলওয়ার খান ভীমানদীর তীরে জালাল খানের বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া বসেন। যুদ্ধকালে কয়েকজন বিশিষ্ট বিজাপুরী সেনানায়ক দিলওয়ার খানকে ত্যাগ করিয়া দারা সেনায় ফিরিয়া আসেন। সিনা ও ভীমা নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত এই স্থানে সুলতান শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। দিলওয়ার খান যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং বিজাপুর বাহিনী রাত্রির অন্ধকারে শাহদুর্গে পালাইয়া যান। ফিরিশতা এই প্রসঙ্গে নম্রসুরে বলিয়াছেন, "যুদ্ধে আহত হওয়ার দরুন পলায়ন করিতে পারি নাই এবং সেজন্য জালাল খানের হস্তে বন্দী হই। কিন্তু পরে কোন প্রকারে পালাইয়া যাই"। উত্তর দিক হইতে আগত বুরহান নিজাম শাহের সৈন্যবাহিনীর মোকাবিলার জন্য জালাল খান সেই দিকে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হন। এই সময় ফিরিশতা বিজাপুর বাহিনীর সঙ্গে পুনর্মিলিত হইবার সুযোগ লাভ করেন। জালাল খান যখন পশ্চাদাপসরণ করিতেছিলেন তখন বিজাপুর বাহিনী রহুনকেরা ঘাট পর্যন্ত ১৬০ মাইল পথ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। এই সময় সুলতান ও মন্ত্রী দিলওয়ার খানের মধ্যে দ্বিতীয়বার মতানৈক্য ঘটে। দারাসুনের যুদ্ধে পরাজয়ের পর হইতেই তাহাদের মধ্যে মনোমালিন্য বিরাজ করিতেছিল। এই দ্বিতীয়বার মতাবিরোধের পর দিলওয়ার খানের প্রভাবজাল ছিন্ন করিবার জন্য সুলতান কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু রাজপ্রাসাদের ভৃত্য ও দেহরক্ষী সৈন্যদের সঙ্গে মন্ত্রীর যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল তাহাতে সুলতানের পক্ষে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা সহজসাধ্য ছিল না। শেষ পর্যন্ত সুলতান অবশ্য আইন-উল-মুলক্ জিলানীকে স্বপক্ষে পাইলেন। জিলানীর সৈন্যদল দিলওয়ার খানের সেনাদল হইতে এক মাইল দূরে শিবির স্থাপন করিয়াছিল। সুলতান গোপনে অশ্বারোহণ করিয়া আইন-উল মুলকের শিবিরে গমন করিবার জন্য যখন তাঁবু হইতে নির্গত হইতেছিলেন তখন তাঁহার পোষ্যভ্রাতা ইলিয়াস খান তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসেন এবং তিনি কোথায় যাইতেছেন জিজ্ঞাসা করেন। সুলতান উত্তরে বলেন, "কোন প্রশ্ন করিও না, যদি আমার সঙ্গে আসিতে চাও তো আসিতে পার"। ইলিয়াস খান অমনি একশত অশ্বারোহী

সৈন্যসহ তাহার অনুগমন করেন। প্রায় তিন সহস্র সৈন্যসহ আরও কতিপয় সেনানায়ক তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। ফিরিশতা বলেন, ইহাদের মধ্যে তিনিও ছিলেন। দিলওয়ার খান ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইবার কোন আশা না দেখিয়া আহমদ নগর অভিমুখে পলায়ন করেন। ইহার পরবর্তী কয়েক বৎসর ফিরিশতা কোথায় কিভাবে ছিলেন, এ-সম্বন্ধে তিনি কিছুই বলেন নাই। মনে হয়, এই সময়ের পরেই তিনি ইতিহাস সঙ্কলনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন, এই কার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাহার মালিক ইব্রাহিম আদিল শাহ্ যে-কোন ব্যয়ে তাঁহার জন্য প্রচুর উপকরণ সংগ্রহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস তিনি যে ৩৪টি নামকরা গ্রন্থ এবং আরও কুড়িটি গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে অল্প কয়েকটি মাত্র এখন পাওয়া যায়। আনুমানিক ১৫৯৬ খ্রীস্টাব্দে ২৬ বৎসর বয়সে ফিরিশতা বিজাপুর সুলতানদের ইতিহাস সমাপ্ত করেন এবং তাঁহার পরিকল্পিত ইতিহাসের অবশিষ্টাংশ তিনি পরবর্তী কয়েক বৎসরের মধ্যে সমাপ্ত করেন। চৌত্রিশ বৎসর বয়সের সময় তিনি শাহ্জাদী সুলতানা বেগমকে বিজাপুর যাইতে আহমদ নগর লইয়া যাইবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে মুঙ্গিপত্তনে শাহজাদা দানিয়েল মির্জার সঙ্গে শাহজাদী সুলতানার বিবাহ মজলিসে ফিরিশতা উপস্থিত ছিলেন। শাহজাদী যখন খান্দেশে তাঁহার স্বামীর সুবার রাজধানী বুরহানপুর গমন করেন তখন ফিরিশতা সমস্ত পথ শাহজাদীর পাল্কীর পাশাপাশি গমন করিয়াছিলেন।

বিজাপুরে প্রত্যাগমন করিবার পর তাঁহাকে বিশেষ কার্যোপলক্ষে সম্রাট আকবরের উত্তরাধিকারী মোগলে আজম জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরণ করা হয়। কথিত আছে, পুত্র দানিয়েলের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া আকবর দুঃখে প্রাণত্যাগ করেন। বিজাপুরী শাহজাদীর সঙ্গে শাদীর অল্পকাল পরেই শাহজাদা দানিয়েলের প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছিল। ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীর যখন কাশ্মীর গমন করিতেছিলেন তখন পথে লাহোরের নিকট ফিরিশতা তাঁহার নাগাল পাইয়াছিলেন। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে ফিরিশতা জাহাঙ্গীরের দরবারে প্রেরিত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমাদের লেখক নীরব। দুই শাহী পরিবারের মধ্যে যে সম্প্রীতির সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল, তাহাতে আমরা স্বচ্ছন্দে অনুমান করিতে

পারি যে, জাহাঙ্গীরকে পিতৃবিয়োগে সমবেদনা জ্ঞাপন এবং প্রাচ্যের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যের তখ্‌তে আরোহণের জন্য মোবারকবাদ জ্ঞাপনের জন্যই দরবারের অন্যতম বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবে বিজাপুর সুলতান ফিরিশতাকে দিল্লী গমনের জন্য মনোনীত করিয়াছিলেন।

ফিরিশতা তাঁহার ঐতিহাসিক গ্রন্থকে কোন কোন স্থানে 'নওরুস নামা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে মনে হয় ইব্রাহিম আদিল শাহ নওরুস নামে অভিহিত তাঁহার নূতন রাজধানীতে অবস্থানকালে ফিরিশ্‌তা সেখানে তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দে এই নূতন শহরের নির্মাণকার্য আরম্ভ হইয়াছিল। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে সুরাটে পর্তুগীজ ও ইংরেজ কুঠির অস্তিত্বের কথা ফিরিশ্‌তা উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই সময় তাঁহার গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বয়স ছিল একচল্লিশ বৎসর। পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে আমরা মনে করিতে পারি যে, ইহার অল্পকাল পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন। বত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর কোন এক কুসংস্কারমূলক ধারণার বশবর্তী হইয়া ইব্রাহীম আদিল শাহ রাজধানী হইতে তাঁহার দরবার অন্যত্র সরাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং বিজাপুরের তিন মাইল দূরে অবস্থিত তোরা গ্রামে নূতন শহর নির্মাণ করাইয়া উহার নাম দেন নওরুস (অভিনব)। এই সময় যে নূতন মুদ্রা বাহির করা হয় তাহাতেও তিনি তাঁহার এই প্রিয় আখ্যা সংযোজিত করিয়াছেন। শীঘ্রই দরবারে এই নামটি এমন আদরণীয় হইয়া পড়ে যে, যে-কোন অভিনব বস্তুর এই নামকরণ হইতে থাকে। এই কারণেই ফিরিশতার গ্রন্থেরও সম্ভবতঃ নওরুস নামকরণ হয়। কয়েক বৎসর পরেই ইব্রাহিম আদিল শাহ নওরুস ত্যাগ করিয়া বিজাপুরে ফিরিয়া আসেন এবং সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করিয়াছিলেন। এইখানেই ১৬২৬ খ্রীঃ ফিরিশতা সম্বন্ধে শেষ সংবাদ প্রাপ্তির ১৫ বৎসর পরে বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহীম আদিল শাহ ইন্তেকাল করেন। এই সময় বিজাপুর রাজধানীতে সুরম্য ইমারত নির্মাণের ঝোঁক সর্বাপেক্ষা অধিক পরিলক্ষিত হইয়াছিল। পাঁচ হাজার লোক এক সঙ্গে নামাজ পড়িতে পারে এইরূপ এক অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ নির্মাণ করাইয়া দিলেন--সুলতানের চাচা প্রথম আলী আদিল শাহ। তাঁহারই অনুকরণে এই সময় সেইসব অতুলনীয় অট্টালিকারাজি নির্মিত হইয়াছিল, যাহা আজিও বিজাপুর রাজদরবারের শানশওকতের স্মৃতি-সৌধস্বরূপ বিদ্যমান রহিয়াছে। রাজ-অভিভাবক কামিল খানের প্রাসাদ, চাঁদ

বিবির মসজিদ ও চৌবাচ্চা, ফিরিশতার পৃষ্ঠপোষক দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিল শাহের সুন্দর ও সুরুচিব্যঞ্জক সমাধিসৌধ এবং তাঁহার পুত্রের সমাধির উপর নির্মিত অপূর্ব সৌধ এবং কয়েক মাইল ব্যাপী সমতল ভূমির উপর নির্মিত আরও অসংখ্য ইমারত আজিও সেই সময়ের সমৃদ্ধি ও শানশওকতের সাক্ষীস্বরূপ অবিকৃত ও অমলিন রহিয়াছে। শাহজাদা মুহাম্মদের সমাধিসৌধের গম্বুজের পরিধি সেন্ট পলসের গীর্জার পরিধিকে অতিক্রম করিয়াছে। রোমের সেন্ট পিটারের গম্বুজ অপেক্ষা ইহা আয়তনে কিছু ক্ষুদ্র। গ্রন্থ সমাপ্ত করিবার পরও ফিরিশতা যদি জীবিত থাকিতেন তাহা হইলে দরবারে তিনি যে খ্যাতি ও মর্যাদার আসন লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাতে তাঁহার সম্বন্ধে নিশ্চয়ই আমরা অনেক কিছু শুনিতে পাইতাম—হয় উজির হিসাবে না হয় গ্রন্থকার হিসাবে। আমরা আরও ধরিয়া লইতে পারি যে, বাঁচিয়া থাকিলে তিনি নিশ্চয়ই গোলকুণ্ডার সুলতানের ইতিহাস অধ্যয়ন করিতেন—যাহা এখনও পাওয়া যায় এবং যাহা তিনি জীবিত-কালে সংগ্রহ করিতে পারেন নাই বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বাদাখশানের খসরু শাহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার যে অভিলাষ তিনি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহাও অপূর্ণ রহিয়াছে। শাহী দরবার বিজাপুরে পুনরাগমনের পর যদি তিনি ইন্তেকাল করিতেন তবে তাঁহার মত একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য তাঁহার সমাধির উপর কোন সৌধ নির্মাণ করা কিছুই বিচিত্র ছিল না। সুতরাং খুব সম্ভব শাহীদরবার নওরুসে অবস্থানকালেই আমাদের গ্রন্থকারের প্রাণ বিয়োগ ঘটিয়াছিল। দরবার স্থানান্তরের পর সেখানকার অট্টা-লিকাগুলি দ্রুত ধ্বংস হইয়া যায়। ফলে একটা অসম্পূর্ণ প্রাচীরের অংশবিশেষ এবং সামান্য কয়েকটি প্রাসাদের কিছু ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত সেখানে লক্ষ্য করিবার মত আর কিছুই নাই।

এই পরিশ্রমী ঐতিহাসিকের স্মৃতিসৌধ বলিতে তাঁহার রচিত গ্রন্থাবলী ছাড়া আর কিছুই নাই। তাঁহারই অনুবাদ পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে রহিল।

গ্রন্থকারের ভূমিকা

আমার নাম মুহম্মদ কাসিম হিন্দু শাহ এবং আমার পারিবারিক পদবী ফিরিশতা। আমি এই সাম্রাজ্যের এক অতি নগণ্য প্রজা। বিদ্বান ব্যক্তিদের নিকট আমি এইটুকু নিবেদন করিতে চাই যে, হিন্দুস্তানে 'ইসলামের বিজয়াভিযানের ইতিহাস' সংকলন করিবার বাসনা তরুণ বয়সেই আমার অন্তরে উদিত হইয়াছিল এবং হিন্দুস্তানে যে-সব পীর-আউলিয়া গুজরাইয়া গিয়াছেন তাঁহাদের বিবরণ প্রদান করিবার আকাঙ্ক্ষাও তরুণ বয়সেই আমার মনে স্থান পাইয়াছিল। কিন্তু আমার তৎকালীন বাসস্থান আহমদ নগরে প্রয়োজনীয় উপকরণাদি সংগৃহীত হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় আমার মনের বাসনা মনেই থাকিয়া যায়। ৯৯৮ হিজরীতে (১৫৮৯ খ্রীঃ) আমি আহমদ নগর ত্যাগ করিয়া বিজাপুর চলিয়া আসি। বিজাপুরের সুলতানের সঙ্গে সৌভাগ্যক্রমে আমার পরিচয় হয়। তিনি ইতিহাসের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন এবং ইতিহাস পাঠে অনেক সময় ব্যয় করিতেন। আমার অন্তরে যে বাসনা সদাজাগ্রত ছিল, তাহা কার্যকরী করিবার জন্য তিনি আমাকে জোর তাগিদ দিতে লাগিলেন এবং এই ব্যাপারে আমাকে অনেক অনুগ্রহ প্রদান করিলেন।

আমার উদ্দেশ্য সাধনের উপযোগী ঐতিহাসিক গ্রন্থাদি সুলতানের আদেশে সংগৃহীত হইতে লাগিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ সংগৃহীত হইল। আমি সেসব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করিলাম। কিন্তু এইসব ঐতিহাসিক গ্রন্থের মধ্যে এমন একটিও মিলিল না যাহাতে প্রয়োজনীয় সমস্ত খবর পাওয়া যাইতে পারে। নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখশীর ইতিহাসে যদিও এই সময়ের বৃহত্তর অংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ ছিল—তবুও কতকগুলি স্থানে ইহাতে এমন ফাঁক রহিয়াছে যে আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতেই উহার অনেকাংশ পূরণ করিতে পারি। এইসব করিয়া ভারতে মুসলিম প্রভুত্বের ইতিহাস লিখিবার বাসনাই শেষ পর্যন্ত আমার মনে প্রবল হইয়া উঠিল। সেই উদ্দেশ্যে আমি ঐতিহাসিক উপকরণাদি সাজাইতে আরম্ভ করিলাম এবং পরিশেষে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া 'তারিখ-ই-ফিরিশতা' নাম দিয়া উহা মহামান্য

সুলতানকে উপহার দিলাম। এইরূপে আমার অনেক দিনের বাসনা ও পরিশ্রমের ফল তাঁহার নামে বিনীতভাবে উৎসর্গ করিয়া নিজেকে কৃতকার্য মনে করিলাম।

আরও যে-সব লেখক এই বিষয়ে হাত দিয়াছেন এবং মাথার উপর আচ্ছাদন টানিয়া যাঁহারা কবর-নিদ্রায় বিভোর রহিয়াছেন তাঁহাদের সম্বন্ধে কোনরূপ মন্তব্য করা আমি শোভনীয় বিবেচনা করি না। এইজন্য মুখের উপর নীরবতার অঙ্গুলী চাপিয়া ধরিয়া তাঁহাদের ত্রুটিবিচ্যুতি সম্বন্ধে নির্বাক রহিলাম। আমি পাঠকদের উপরই আমার গ্রন্থের বিচার ভার ছাড়িয়া দিলাম। সদাশয় পাঠকগণ যদি আমার এবং তাঁহাদের ইতিহাসের মধ্যে এইটুকু পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারেন, যেমন আছে রসূলুল্লার সঙ্গে আলীর এবং মক্কার সঙ্গে বায়তুল মোকাদ্দসের—তাহা হইলেই আমি আমার পরিশ্রম সার্থক মনে করিব। ইহাই আমার সর্বোচ্চ আকাঙ্ক্ষা।

অধিকন্তু আমি আশা করি, আমার এই সত্যভিত্তিক সরল ও অলঙ্কারহীন বিবরণ (যাহা সর্বোতভাবে বর্ণনা-চাতুর্য ও রচনা-মাধুর্য বর্জিত) মহামান্য সুলতানের গ্রহণযোগ্য হইবে এবং এই পুস্তিকাগুলির বিষয়বস্তু পৃথিবীর দূর ও নিকট সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

এই ইতিহাস সংকলনে যে গ্রন্থগুলির মূল পাণ্ডুলিপি অধ্যয়ন করা হইয়াছে, তাহা হইল ঃ

১। তর্জমা ইয়েমুনী, ২। জৈনুল আখবর, ৩। তাজ-উল-মা'ছির, ৪। মুল্হিকাত দোখ আইন উদ-দী বিজাপুরী, ৫। তবকাত-ই-নাসিরি, ৬। তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী, ৭। ফৎহা-এ ফিরোজ শাহ্, ৮। বাবর নামা, ৯। হুমায়ুন নামা, ১০। তারিখ-ই-মুবারক শাহী, ১১। তারিখ-ই-মুবারক শাহী (দ্বিতীয় গ্রন্থ মোবারক শাহ্ বিচিত্র), ১২। বাহমন নামা (শেখ আজুরী রচিত বীর গাঁথা), ১৩। তারিখ-বেনা-এ-গেতী, ১৪। সিরাজ-উৎ-তারিখ-ই-বাহমনী (মোল্লা মুহাম্মদ লারী রচিত), ১৫। তেহ্ফত-উস-সালাতীন বাহমনী (মোল্লা দাউদ বিদ্রী রচিত), ১৬। সহস্র বৎসরের ইতিহাস, কৃত মোল্লা আহমদ নিনিভী, ১৭। রজাত-উস-সাফা, ১৮। হাবিব-উস-সিয়ার, ১৯। হাজী মুহাম্মদ কান্দাহারী রচিত ইতিহাস, ২০। তাবকাত-ই-মাহমুদ শাহ্ গুজরাটি (নাসির শাহ্ রচিত), ২১। গুজরাটের

মাহমুদ শাহের রাজত্বের স্মৃতি কথা, ২২। গুজরাটের বাহাদুর শাহের ইতিহাস, ২৩। গুজরাটের মুজাফর শাহের ইতিহাস, ২৪। গুজরাটের মুজাফর শাহের অন্য আর এক ইতিহাস, ২৫। মান্দুর মহান মাহমুদের ইতিহাস, ২৬। মান্দুর ছোট মাহমুদের ইতিহাস, ২৭। নিজাম-উদ-দীন আহমদ বখ্‌শী রচিত ইতিহাস, ২৮। বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৯। সিন্ধের ইতিহাস, ৩০। কাশ্মীরের ইতিহাস, ৩১। ফোয়াইদ-উল-ফোয়াদ, ৩২। খায়রুল মুজালিস, ৩৩। তারিখ-ই-কুতুব শাহ্‌, ৩৪। সাহিরুল আরিফিন (কবি শেখ জামাল রচিত), ৩৫। নুস্‌কাএ কুতবী।

১। সাকী নামা[১]। ২। তারিখ-ই-আহমদ উল্লা মুসতোফী। ৩। তারিখ-ই-মরিহাজ-উস-সিরাজ জুর্জনী। ৪। জমা-উল-হিকায়েত। ৫। মা-আসির-উল-মুল্‌ক। ৬। ফাত-উল-বুলাদ। ৭। আবু-নসর-নাসকাতীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ৮। আবুল ফজলের ভ্রমণ বৃত্তান্ত। ৯। ফাতু-উস-সালাতিন। ১০। তারিখ-ই-খুরী (ফখর-উদ-দীন মোবারাক শাহ লোদী রচিত)। ১১। তারিখ-ই-শেখ ফরিদ-উদ-দীন। ১২। জৈনুল মাসির, আত্বারা (এই দুইটি গ্রন্থেই সোমনাদের বিবরণ পাওয়া যায়)। ১৩। সাদীর গুলিস্তান। ১৪। তারিখ-ই-গজেদা। ১৫। মাখ্‌জুন-উল-আসরার (শেখ নিজাম কর্তৃক রচিত এই গ্রন্থটি সুলতান বৈরাম-বিন-মাসুদ গজনভীর নামে উৎসর্গ করা হইয়াছিল)। ১৬। কালিলা ও দীম্‌না। ইহার অন্য নাম আনোয়ার সোহেলী)। ১৭। কাজী আহমদ গাফারী রচিত তারিখ-ই-জাহানারা। ১৮। হজ নামা। ১৯। খুলাছাত-উল-ইন্‌সা। ২০। রওজাতুল ইনসা।

এই ইতিহাসটি উপক্রমানীকা, ১২টি অধ্যায় ও উপসংহারে বিভক্ত। ভূমিকায় ভারতে ইসলাম ধর্মের অগ্রগতির কথা বর্ণিত আছে।

অধ্যায়গুলিতে রহিয়াছে: ১। গজনী ও লাহোরের সুলতানগণ। ২। দিল্লীর সুলতানগণ। ৩। দাক্ষিণাত্যের সুলতানগণ। ৪। গুজরাটের সুলতানগণ। ৫। মালবের সুলতানগণ। ৬। খান্দেশের সুলতানগণ। ৭। বাঙ্গালা ও বিহারের সুলতানগণ। ৮। মুলতানের সুলতানগণ। ৯। সিন্ধের শাসকবর্গ। ১০। কাশ্মীরের সুলতানগণ। ১১। মালাবারের বিবরণ। ১২। ভারতের পীর-দরবেশদের বিবরণ।

উপসংহারে ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও আবহাওয়ার কিছু বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছিল।

---

১ লেখক ভূমিকায় যে সব গ্রন্থের নামোল্লেখ করিয়াছেন, সেগুলি ছাড়াও এই গ্রন্থগুলি হইতে স্থানে স্থানে অংশ বিশেষ উধৃত করিয়াছেন।

হিন্দুদের সম্বন্ধে

মহাভারতকে হিন্দুরা একটি মহামূল্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করেন। আকবর বাদশাহের আদেশে শেখ মোবারকের পুত্র শেখ আবুল ফজল মূল সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে পারস্য ভাষায় ইহার কাব্যানুবাদ করেন। ইহাতে লক্ষাধিক শ্লোক আছে। অত্র ইতিহাসের লেখক মুহম্মদ কাসিম ফিরিশতা সেই অনুবাদের সংক্ষিপ্ত সার অবলম্বনে তাঁর এই ইতিহাসের মুখবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের দার্শনিক ও ঋষিরা তাহাদের স্বপ্ন-ধারণানুযায়ী বিশ্বসৃষ্টি সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন। এক মহাভারতেই ত্রিশটি বিভিন্ন বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, যাহাদের একটিও যথেষ্ট সন্তোষজনক নয় যে, আমরা অন্যগুলি বাদ দিয়া সেইটি গ্রহণ করিতে পারি। হিন্দুরা মহাকালকে চারিযুগে বিভক্ত করিয়াছেন: প্রথম সত্যযুগ; দ্বিতীয় ত্রেতাযুগ; তৃতীয় দাপরযুগ; চতুর্থ কলিযুগ। তাহারা বলেন, এই চারিযুগ পালাক্রমে আসে এবং চিরকাল আসিতে থাকিবে। বর্তমান যুগ কলিযুগ। ইহা শেষ হইলে পুনরায় সত্যযুগ আরম্ভ হইবে, সুতরাং তাহাদের মতে জগত চিরস্থায়ী, ইহার আদিও নাই অন্তও নাই। অবশ্য কতিপয় ব্রাহ্মণ আবার দৃঢ়তার সঙ্গেই বলিয়া থাকেন যে, এই পৃথিবী একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে এবং শেষ বিচারের দিন আসিবে।

বলা হয়, সত্যযুগ ১৭,২৮,০০০ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। এই সময় ধর্ম ও সত্যের প্রাধান্য ছিল এবং মানুষ একলক্ষ বৎসর জীবিত থাকিত।

ত্রেতাযুগ ছিল ১২,৯৬,০০০ বৎসর ব্যাপী। সৃষ্টির ¾ লোক এই যুগে ঈশ্বরাদেশ পালন করিয়া চলিত এবং মানুষের পরমায়ু ছিল ১০ হাজার বৎসর।

দ্বাপর যুগের মেয়াদ ছিল ৮,৬৪,০০০ বৎসর। এই সময় মানবজাতির অর্ধাংশ ছিল দুরাচার এবং মানুষ মাত্র ১ হাজার বৎসর জীবিত থাকিত।

কলি যুগের মেয়াদ ৪,৩২,০০০ বৎসর। এই যুগে অধিকাংশ মানুষ পাপাচারী হইয়াছে; শুধু এক চতুর্থাংশ লোক ঈশ্বরের আদেশ অনুসরণ করে। এখন মানুষের আয়ু খর্ব করিয়া ১ শত বৎসরে নামানো হইয়াছে। হিন্দুদের গণনানুযায়ী বর্তমান বৎসরে (১০১৫ হিজরী) কলি যুগের ৪,৬৮৪ বৎসর অতিবাহিত

হইয়াছে। আদিতে ঈশ্বর চারিটি মূল উপাদান সৃষ্টি করেন, ইহা ছাড়াও হিন্দুরা ইথারকে পঞ্চম উপাদান মনে করে। ইহার পরে ঈশ্বর মানুষ সৃষ্টি করেন এবং নাম দেন ব্রহ্মা। এই ব্রহ্মাকে ঈশ্বর আর সকল জীব সৃষ্টি করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। হিন্দুরা ইথারকে একটি মূল উপাদান মনে করেন এবং তাহাদের মতে ইহা কোন বস্তু নয়; তাহারা মনে করে। বায়ু শুধু পৃথিবীর চারিদিকে পরিভ্রমণ করে এবং ঈশ্বর হইতে উদ্ভূত গ্রহাদিই পৃথিবীতে মানবরূপে আবির্ভূত হয়। নশ্বর পার্থিব জীবন অতিবাহিত করিবার পরে, পৃথিবীতে তাহাদের কৃত সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ মানুষ স্বর্গবাসী হয় এবং তখন পবিত্রতায় তাহারা প্রায় ঈশ্বরের সমপর্যায়ভুক্ত হয় ও ঐশ্বরিক মহিমার অংশীদার হইয়া পড়ে। তাহাদের কতক-গুলি গ্রন্থে দেখা যায়, তাহারা আকাশকেই স্বর্গীয় সত্তা বলিয়া ধারণা করে।

ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা বলে ব্রহ্মা চারি শ্রেণীর মানব জাতি সৃষ্টি করেন। প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রীয়, তৃতীয়ঃ বৈশ্য, চতুর্থ শূদ্র। প্রথম শ্রেণীর উপর ঈশ্বরো-পাসনা ও মানুষকে সদুপদেশ প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। মানব জাতির উপর রাজত্ব করিবার জন্য নিযুক্ত করা হয় ক্ষত্রীয়দিগকে। ভূমি কর্ষণ ও সর্বপ্রকার হস্তশিল্পের জন্য সৃষ্টি করা হয় তৃতীয় শ্রেণীকে। এই তিন শ্রেণীর লোককে সেবা করিবার জন্য চিরদাস করিয়া সৃষ্টি করা হয় চতুর্থ শ্রেণীকে। অতঃপর মানুষকে পথ নির্দেশ করিবার জন্য, ব্রহ্মা এক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া উহার নাম দিলেন বেদ। ধর্মতত্ত্বপূর্ণ এই গ্রন্থে এক লক্ষ শ্লোক আছে; প্রত্যেক শ্লোকে চারিটি চরণ আছে এবং চরণগুলিতে ২১ হইতে ২৬টি অক্ষর আছে। ব্রহ্মা সত্যযুগের ১শত বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। প্রত্যেক বৎসরে ছিল ৩৬০ দিন এবং প্রত্যেক দিন ছিল বর্তমান যুগের ৪ হাজার বৎসরের সমান এবং প্রত্যেক রাত্রিও ছিল তদনুরূপ দীর্ঘ। ব্রাহ্মণেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ব্রহ্মা অদ্বিতীয়; তিনি এক হাজার একবার পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছেন এবং বর্তমান ব্রহ্মার জীবনের পঞ্চাশ বৎসর ও অর্ধদিন গত হইয়াছে এবং অবশিষ্ট অর্ধদিন চলিতেছে। কথিত আছে, দ্বাপর যুগের শেষ ভাগে ক্ষত্রীয় বংশীয় রাজা ভরত, হস্তীনাপুর নগরে[১] সিংহাসনে উপবেশন করেন। তাহার বংশের ৭ জন রাজা একাদিক্রমে রাজত্ব করেন। তাহাদের অষ্টম পুরুষের

১ দিল্লীর ৪৫ মাইল উত্তরপূর্বে হস্তীনাপুর নামে একটি শহর এখনও বিদ্যমান আছে।

নাম কুরু এবং তাহার নামানুসারেই থানেশ্বর প্রান্তরের নাম হইয়াছে কুরুক্ষেত্র এবং তাহার বংশধররা কৌরব নামে পরিচিত।

এই বংশের ছয় পুরুষ একাদিক্রমে রাজত্ব করিবার পর বিচিত্র বীর্য তেজরাজ রাজা হন। তাহার দুই পুত্রের একজনের নাম ধৃতরাষ্ট্র বা বিজেতা এবং অন্য জনের নাম পাণ্ডু (ফ্যাকাশে)। ধৃতরাষ্ট্র জন্মান্ধ ছিলেন। এইজন্য জ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও তাহাকে বাদ দিয়া কনিষ্ঠ পাণ্ডুকে সিংহাসন দান করা হয়। পাণ্ডু হইতেই পাণ্ডব বংশের উৎপত্তি। পাণ্ডু পাঁচ পুত্র রাখিয়া যান। ইহাদের মধ্যে যুধিষ্ঠির (নির্ভীক) নামান্তরে ধর্মরাজ, ভীম ও অর্জুন কুন্তী মায়ের গর্ভে জন্মলাভ করেন; আর নকুল ও সহদেব জন্মগ্রহণ করেন মাদ্রীর গর্ভে। ধৃতরাষ্ট্রের ১০১ জন সন্তান ছিল। ইহাদের মধ্যে ১০০জন গান্ধার রাজকন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন— যাহাদের সর্বজ্যেষ্ঠের নাম ছিল দুর্যোধন। অন্য পুত্র যুযুৎসু এক শূদ্র কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ধৃতরাষ্ট্রের বংশধররা কৌরব এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা পাণ্ডুর বংশধররা পাণ্ডব নামে পরিচিত। পাণ্ডুর মৃত্যুর পরে অন্ধত্ব সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্রকে রাজা ঘোষণা করা হয় এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন প্রতিভূ নিযুক্ত হন। খুল্লতাত ভ্রাতাদের (পঞ্চ পাণ্ডব) প্রতি ঈর্ষা পরবশ হইয়া দুর্যোধন তাহাদিগকে হত্যা করিতে বদ্ধপরিকর হন। ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডবদের দিক হইতে ধৃতরাষ্ট্রও শংকাহীন ছিলেন না। গৃহ-বিবাদ নিবারণের জন্য তিনি পাণ্ডবদিগকে নগরের বাইরে বাস গৃহ নির্মাণ করিতে আদেশ করেন। গৃহটি যাহাতে সহজে ভস্মীভূত হয় তজ্জন্য দুর্যোধন স্থপতিকে উৎকোচ প্রদান করিয়া গৃহের উপকরণের সঙ্গে প্রচুর দাহ্য পদার্থ মিশ্রিত করাইয়া দেন। কিন্তু পাণ্ডবেরা তাহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া নিজেরাই গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া মাতার সঙ্গে হস্তীনাপুর ত্যাগ করিয়া নিরুদ্দিষ্ট হন। ভীল নাম্নী[২] এক স্ত্রীলোককে ঘুষ প্রদান করিয়া অগ্নিসংযোগের জন্য নিযুক্ত করা হইয়াছিল; সেই স্ত্রীলোক তাঁহার পাঁচ পুত্রসহ এই গৃহদাহে ভস্মীভূত হয়। কিন্তু কৌরবরা পরের দিন ভীল ও তাহার পুত্রদের ভস্মীভূত দেহকে পাণ্ডবদের দেহ বলিয়া ভ্রম করেন। এই ঘটনার পর হস্তীনাপুর হইতে বহির্গত হইয়া পাণ্ডবেরা ভারতবর্ষের বহু

২ কিচাত বংশীয় লোকেরা ভীল নামে পরিচিত ছিল। মহাভারতে আছে, ভীল বংশের এক স্ত্রীলোক তাহার সন্তানদের সঙ্গে দৈবক্রমে সেই গৃহে রাত্রি যাপন করিতে যাইয়া ভস্মীভূত হইয়াছিল।

স্থান ভ্রমণ করেন এবং এই সময়ে তাহারা কয়েকটি যুদ্ধও করেন—মহাভারতের অনেকাংশ জুড়িয়া রহিয়াছে এইসব যুদ্ধের কাহিনী। অবশেষে তাহারা কুম্পিলা নগরে (গঙ্গার উপকূলে) আসিয়া উপনীত হন। সেখানে পাঁচ ভাই একসঙ্গে কুম্পিলা রাজকন্যা দ্রোপদীর পাণি গ্রহণ করেন এবং স্থির হয় দ্রোপদী প্রত্যেক ভাইয়ের নিকট ৭২ দিন অবস্থান করিবেন। এই ব্যবস্থার ফলে প্রত্যেক ভাই বৎসরের ⅕ অংশ কাল দ্রোপদীর সংগে সুখ উপভোগ করিতে পারিতেন। কোন কোন হিন্দু এই ঘটনাকে অলীক মনে করেন। সে যাহাই হউক, দুর্যোধন যখন শুনিলেন যে, পাণ্ডবরা জীবিত আছেন তখন তিনি ইহার সত্যতা নির্ণয় করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাহাদের দাবী প্রত্যাখান করিতে না পারিয়া তিনি তাহাদিগকে হস্তীনাপুরে আমন্ত্রণ করেন এবং পিতৃভূমি ইন্দ্রপ্রস্থসহ[৩] হস্তীনাপুর রাজ্যের অর্ধাংশ পাণ্ডবদিগকে সমর্পণ করেন। পাণ্ডবেরা দিন দিন শক্তিশালী হইতে থাকে। কৌরবরা বাহ্যিকভাবে বন্ধুত্বের ভাণ করিত, কিন্তু অন্তরে তাহাদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাব পোষণ করিত। অবশেষে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির দেবতাদের সম্মানার্থ এক যজ্ঞ সভার আয়োজন করেন। এই যজ্ঞের বিধানানুসারে পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে যজ্ঞ সভায় উপস্থিত হইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে আহ্বান করা হয়। তদনুযায়ী যুধিষ্ঠির তাহার ভ্রাতাগণকে পৃথিবীর চতুর্দিকে প্রেরণ করেন; তাহারা খাট্টা, রুম, হাবৃশ, আজম, আরব, ও তুর্কীস্থানের[৪] রাজাদিগকে বশীভূত করিয়া যজ্ঞোৎসবে আনয়ন করেন। দুর্যোধন এতদিন যাবৎ তাহার খুল্লতাত ভ্রাতাদের উদীয়মান শক্তি ঈর্ষানেত্রে অবলোকন করিয়া আসিতেছিলেন, এখন তিনি তাহার ঈর্ষানল আর চাপিয়া রাখিতে

---

৩ সরস্বতী নদীতীরে ইন্দ্রপ্রস্থ নামে একটি নগর এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে এবং আমার বিশ্বাস ছিল এই নগরের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। কিন্তু আমার বন্ধু টডের মতে দিল্লীর পুরাতন নামই ইন্দ্রপ্রস্থ। হিন্দু-ইতিহাস সম্বন্ধে টডের গভীর গবেষণা ও ভারতবর্ষের উক্ত অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের কথা বিবেচনা করিলে তাঁহার মত উড়াইয়া দেওয়া যায় না। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে তুর বংশীয় রাজারা ঐ শহরের দিল্লী নামকরণ করিয়াছেন—তুর বা পাণ্ডবদের সাক্ষাৎ বংশধর। সুতরাং এই দিল্লীই প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ তাহাতে সন্দেহ নাই।

৪ মহাভারতে কোথাও এইসব নামের উল্লেখ নাই। নিশ্চয়ই মুসলমানগণ কর্তৃক এই নামগুলি মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

পারিলেন না। তিনি পাণ্ডবদের শক্তি নস্যাৎ করিবার উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। শক্তি দ্বারা তাহাদিগকে অপসারণ করা অসম্ভব বিবেচনায় তিনি কৌশলে উহা সমাধা করিতে সংকল্প করিলেন। সেকালে একটা সাধারণ আমোদের ব্যাপার ছিল পাশা খেলা এবং দুর্যোধন জানিতেন পঞ্চ পাণ্ডব পাশা খেলায় অত্যন্ত আসক্ত। তিনি স্থির করিলেন যে, প্রবঞ্চকের সাহায্যে পাশা খেলায় তিনি তাহাদিগকে তাহাদের রাজ্যাংশ হারাইতে বাধ্য করিবেন। পাণ্ডবরা ফাঁদে পড়িয়া প্রথমতঃ রাজ্য ছাড়া বাকী সর্বস্ব হারাইলেন।

দুর্যোধন তখন আর একটা চাল চালিতে চাহিলেন, শর্ত হইল যদি দুর্যোধন হারেন, তাহা হইলে তিনি এ পর্যন্ত যাহা কিছু লাভ করিয়াছেন সব পাণ্ডবদিগকে ফিরাইয়া দিবেন, কিন্তু পাণ্ডবরা যদি হারেন তবে তাহাদিগকে রাজ্য ছাড়িয়া ১২ বৎসর কাল বনবাসে জীবনযাপন করিতে হইবে এবং বনবাস জীবন যাপনের পর ১ বৎসর অজ্ঞাত-বাসে কাটাইতে হইবে ; এই সময় ধরা পড়িলে তাহাদিগকে আরও ১২ বৎসর বনবাসে থাকিতে হইবে। পাণ্ডবরা হারিয়া যান এবং নানা তীর্থ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে দাক্ষিণাত্যের ওয়াই[৫] রাজ্যে বসতি স্থাপন করেন। দুর্যোধন সমস্ত সাম্রাজ্য খুঁজিয়াও তাহাদিগকে বাহির করিতে পারেন নাই। বৎসর শেষে পাণ্ডবরা বাসুদেব—তনয় কৃষ্ণকে তাহাদের রাজ্যের দাবী উত্থাপন করিবার জন্য দূতরূপে রাজধানীতে প্রেরণ করেন। দুর্যোধন রাজ্য ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করেন। তখন পাণ্ডবরা ভারতের যে সমস্ত রাজা[৬] তাহাদিগকে সমর্থন করিয়াছিলেন তাহাদের সঙ্গে থানেশ্বর প্রান্তরে কলি যুগের প্রথম ভাগে কুরু-বাহিনীকে আক্রমণ করেন। যুদ্ধে দুর্যোধন নিহত হন এবং কৌরবদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে। কৌরব বাহিনীতে ছিল একাদশ অক্ষৌহিনী এবং পাণ্ডবদের বাহি-নীতে ছিল সাত অক্ষৌহিনী। প্রত্যেক অক্ষৌহিনীতে ২,১৮,০৭০ হস্তী, ২,১৮,০৭০ রথ, ৬,৫০,৬১০ অশ্ব ও ১,০৯,৩৫০ পদাতিক সৈন্য ছিল। এই কাহিনীর সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক পরিণতি এই যে, উভয় পক্ষে মাত্র ১২ জন লোক এই যুদ্ধের পরে জীবিত

---

৫ সাতারা দুর্গ হইতে ২০ মাইল উত্তরে পাণ্ডুগর নামে এক দুর্গ আছে। নির্বাসিত পাণ্ডব ভ্রাতাদের নামেই সম্ভবতঃ ইহার এই নামকরণ হইয়াছে। এই দুর্গের অনতি দূরে কৃষ্ণানদীর তীরে ওয়াই নগর অবস্থিত।

৬ ইহাদের মধ্যে ওয়াই রাজ্যের রাজা বিরাটরাজও পাণ্ডবদের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তিনিও প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

ছিল। কৌরব পক্ষে ছিল ৪ জন। প্রথম কৃপাচার্য নামক এক ব্রাহ্মণ যিনি কৌরবদের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন, বিদ্যা ও শৌর্য উভয়ের জন্য তিনি সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি অশ্বত্থামা ছিলেন দ্রোনাচার্যের পুত্র। দ্রোনাচার্য যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন কৃতবর্মা এবং চতুর্থ ব্যক্তি ছিলেন ধৃতরাষ্ট্রের গুপ্তচর সঞ্জয়। যুদ্ধকালে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের সারথী ছিলেন। পাণ্ডবদের পক্ষে বাঁচিয়া ছিলেন ৮ জন যথা—পঞ্চ পাণ্ডব, ষষ্ঠ সত্তিক যদু, সপ্তম যযুচা (দুর্যোধনের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা), অষ্টম কৃষ্ণ—যাহাকে ওয়াই হইতে দুর্যোধনের নিকট দৌত কার্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। এই শেষোক্ত ব্যক্তির ইতিহাস মহাভারত হইতে যে প্রকারে অনূদিত হইয়াছে তাহাই আমরা এখানে বর্ণনা করিব।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি মথুরা নগরী পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য। দেবতাদের মধ্যে কৃষ্ণের আসন কোথায় সে সম্পর্কে হিন্দুরা সবাই একমত নন। কেহ কেহ তাহাকে প্রেরিত পুরুষ এবং কেহ কেহ তাহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া মনে করেন। থানেশ্বরের যুদ্ধের পূর্বে রাজা কংস গণকদের নিকট জানিতে পারিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণ তাঁহাকে বধ করিবে। তিনি কৃষ্ণকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য সর্বস্থান অনুসন্ধান করেন। কিন্তু কৃষ্ণ গোপনে ১১ বৎসর কাল নন্দ নামক এক গোয়ালার গৃহে বাস করেন এবং অবশেষে রাজা কংসকে বধ করিবার সুযোগ লাভ করেন। অতঃপর কংসের পিতা উগ্রসেনকে সিংহাসনে বসাইয়া কৃষ্ণ রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করেন। পরিশেষে তিনি প্রজাপুঞ্জকে নির্দেশ দেন যে, তাহাকে দেবতারূপে সম্মান করিতে হইবে। অনেক লোক তাঁহার অনুগামী হয়। কথিত আছে, তিনি জীবনের ৩২ বৎসরকাল মথুরা নগরে আমোদ-প্রমোদে মত্ত ছিলেন। তাহার সম্বন্ধে যে-সব গল্প প্রচলিত আছে সেগুলি যেমন বিস্ময়কর তেমন আজগুবি।

"প্রতিবেশী রাজন্যবর্গ তাহার ক্ষমতায় ঈর্ষান্বিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর হন। ইহাদের মধ্যে বিহারের রাজা জরাসন্ধ পাটনা হইতে বিরাট বাহিনীসহ অগ্রসর হন। পশ্চিম দিক হইতে ম্লেচ্ছ[৭] রাজা

৭ ম্লেচ্ছ শব্দের অর্থ অসভ্য বর্বর। হিন্দুরা তাহাদের বর্ণাশ্রম ধর্মের বহির্ভূত সকলকে ম্লেচ্ছ নামে অভিহিত করিত। যেমন রোমানরা বাহিরের লোকদিগকে বলিত বার্বার।

কাল যবনও[৮] আগমন করেন। তিনি হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন না, তবুও কৃষ্ণকে দমন করিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন। এই রাজাকে আরব জাতীয় বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণ এই সম্মিলিত শক্তিকে বাধাদান করিতে অসমর্থ হইয়া সমুদ্রগোকূলে দ্বারকায় (বর্তমান আহমদাবাদ হইতে ১০০ ক্রোশ দূরে) পালাইয়া আসেন। সেখানে তিনি ৭৮ দিন যাবৎ অবরুদ্ধ হইয়া থাকেন, কিছুতেই শত্রুসৈন্য ভেদ করিয়া বহির্গত হইতে পারেন না এবং শেষে ১২৫ বৎসর বয়সে সেখানেই দেহত্যাগ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি এখনও আত্মগোপন করিয়া জীবিত আছেন।"

এইবার আমাদের ইতিহাসে ফিরিয়া আসা যাউক। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও দুর্যোধনের মৃত্যুর পরে পাণ্ডবরা ৩৬ বৎসর রাজত্ব করেন, ইহার পর তাঁহারা সিংহাসন ত্যাগ করেন। এইখানেই এই বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

রাজা কুরু হইতে পাণ্ডুর মৃত্যু পর্যন্ত	৭৬	বৎসর
দর্যোধনের রাজত্বকাল	১৩	,,
যুধিষ্ঠির বা ধর্মরাজের রাজত্বকাল	৩৬	,,
মোট	১২৫	,,

পাণ্ডবদের সিংহাসন ত্যাগের কয়েক বৎসর পর অর্জুন—পাণ্ডবের এক প্রপৌত্র সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অন্যান্য সাহিত্য সাধনা ও পৃষ্ঠ-পোষকতা ছাড়াও তাহার বংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিবার অভিলাষ করেন। ব্যাস নামক এক ব্যক্তি এই কার্য গ্রহণ করেন এবং মহাভারত রচনা করেন। মহাভারতের অর্থ নাকি মহাযুদ্ধ, কিন্তু ভারত শব্দের অর্থ যে যুদ্ধ তাহা আমি কোথাও পাই নাই এবং সেইজন্য আমি মনে করি অক্ষরটি যুক্ত করা হইয়াছে এবং মহাভারতের অর্থ ভরত বংশের ইতিহাস। ভরত, কুরু ও পাণ্ডব বংশের প্রতিষ্ঠাতা, ব্যাস চারি বেদের টীকাও লিখিয়াছেন। বেদগুলির নাম ঋকবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও শামবেদ। পূর্ববর্তী তিনটি গ্রন্থ—দর্শন

---

৮ হিন্দুরা সমস্ত পাশ্চাত্য দেশীয় লোককে যবন বলে, যেমন পারশিকরা তাহাদিগকে ইউনানী বলে। আলেকজাণ্ডার ও তাঁহার সৈন্যদিগকে হিন্দুরা যবন বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। পারসিকরা বলিত ইউনান—এই শব্দ আইওনিয়াসের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।

ও ধর্মতত্ত্বের উপর এবং শেষোক্তটি (যেটা এখনও আছে) ইতিহাস এবং মহাভারত নামে পরিচিত। মহাভারতের একলক্ষ শ্লোকের মধ্যে ২৪ হাজার শ্লোকেই পাণ্ডবদের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত আছে। চীনবাসী ও তাতারবাসীদের মতো হিন্দুরাও নূহের প্লাবনে বিশ্বাস করে না।[১] হিন্দুদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়া থাকে যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রীয় জাতি স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। রাজপুতরা একটা আধুনিক জাতি, শুধু কলি যুগের প্রথম ভাগ হইতেই তাহাদের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। অন্যান্য অনেক জাতির সম্বন্ধেই এইরূপ কথা প্রচলিত আছে। রাজা বিক্রমজিতের মৃত্যুর পরে রাজপুত জাতি শক্তিশালী হইয়া ওঠে। বিক্রমজিত হইতেই বর্তমান হিন্দু-সাল আরম্ভ। ইহা প্রায় ১৬০০ বৎসরের কিছু বেশী। রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নিম্নরূপ বিবরণ আছে।

তৎকালে রাজারা বিবাহিত স্ত্রীতে সীমাবদ্ধ না থাকিয়া প্রায়শঃই পরিচারিকাদের গর্ভে সন্তানের জন্ম দিতেন। এইসব সন্তানাদি সিংহাসনের বৈধ উত্তরাধিকারী ছিল না, তবুও তাহারা নিজদিগকে রাজপুত বা রাজার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিত। রাজা সূর্যের—যাহার ইতিহাস আমরা এইখানে বর্ণনা করিব—পুত্ররাই প্রথম রাজপুত নামে অভিহিত হয়। পৃথিবীর অন্যান্য অংশের ন্যায় ভারতবর্ষের অধিবাসীরাও নূহের বংশধর হইতে সম্ভূত। প্লাবনের পরে নূহের তিন পুত্র—শেম, হেম এবং জাফেট নিজেদের এবং সন্তান সন্ততিদের জীবন ধারণের জন্য ভূমি কর্ষণ আরম্ভ করেন।

প্রথম যে রাজা সম্বন্ধে কিছু খবর পাওয়া যায় তিনি কৃষ্ণ, কিন্তু তিনি মথুরার কৃষ্ণ নন। বিহারের লোকেরা একমত হইয়া তাঁহাকে রাজা নির্বাচিত করে। ভারতে প্রথম যে নগর নির্মিত হয় তাহা অযোধ্যা। বাহমন নামে বাংলার এক অধিবাসী কৃষ্ণের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। রাজার শরীর এমন বিশাল ছিল যে, তাহাকে বহন করিতে পারে এমন কোন অশ্ব যোগাড় করা সম্ভব

১ হিন্দুদের 'বিশ্ব সৃষ্টি তত্ত্ব' সম্বন্ধে ফিরিশতা ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করিতেন। হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থাদিতে স্পষ্টভাবে মহাপ্লাবনের উল্লেখ আছে—যাহার বর্ণনার সঙ্গে ইহুদীদের গ্রন্থে উল্লেখিত প্লাবনের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। 'পৃথিবীর অধিপতি' প্লাবনে পৃথিবীর ধ্বংসের বিষয় সাবধানতার বাণী প্রাপ্ত হন এবং তাঁকে "আর্নব" নামক একখানি জাহাজ জোগাড় করিতে বলা হয়—যাহাতে তিনি সাতজন ধর্ম প্রাণ ব্যক্তি ও প্রত্যেক প্রাণবন্ত জিনিসের বীজসহ ঐ জাহাজে উঠিয়া পড়েন।

হয় না। এইজন্য তিনি একটি হস্তীকে পোষ মানাইতে বলেন এবং সেই হস্তীতেই তিনি আরোহণ করিতেন। কথিত আছে, লাঙ্গল ও কাস্তে বাহমনই প্রথম আবিষ্কার করেন এবং কথিত আছে তিনিই নাকি প্রথম বর্ণমালারও উদ্ভাবন করেন। চারিশত বৎসর পরে কৃষ্ণ মারা যান। তিনি পারস্যের তাহ্‌মরাস্পের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ৩৭ জন সন্তান রাখিয়া যান, উহাদের সর্বজ্যেষ্ঠ ছিলেন মহারাজা—যিনি তাঁহার পরে সিংহাসনে উপবেশন করেন। মহারাজা সাহিত্য ও শিল্পে উৎসাহ দান করিতেন। তাঁহার রাজত্বকালে দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং অধিবাসীরা সকলেই বিত্তশালী ছিল। মহারাজা ভারতবর্ষের অধিবাসীদিগকে কতকগুলি গোষ্ঠীতে বিভক্ত করেন। বিদ্যাচর্চা ও রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন ব্রাহ্মণদের উপর। অন্য এক গোষ্ঠীর উপর কৃষিকার্য এবং তৃতীয় গোষ্ঠীর উপর শিল্পকলার ভার অর্পণ করেন। এই সময় হইতে এই সমস্ত পেশা বংশানুক্রমিক হইয়া পিতা হইতে পুত্রে হস্তান্তরিত হইয়া আসিতেছে। গোষ্ঠীপতির নাম অনুসারে তিনি এই সম্প্রদায়গুলির নামকরণ করেন—রাটোর, চৌহান, পাওয়ার এবং বৈশ ইত্যাদি। 'মহারাজা' সর্বদাই পারস্যের রাজার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আদান-প্রদানের সম্পর্ক বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র ডঙ্গুব সেন রাজ-পরিষদ ত্যাগ করিয়া পারস্যরাজ ফরিদুনের শরণাপন্ন হন। মহারাজকে রাজ্যের কিয়দংশ ভ্রাতুষ্পুত্রকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করাইবার জন্য ফরিদুন তাঁহার পুত্র কুরশপ্‌সের অধীনে একদল সৈন্য পাঞ্জাব আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন। যুদ্ধ দশ বৎসরকাল স্থায়ী হইয়াছিল। পরিশেষে 'মহারাজা' রাজ্যের একাংশ ভ্রাতুষ্পুত্র ডঙ্গুর সেনকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হন। তাঁহার রাজত্বের শেষাংশে সেবালা[১০] ও কর্ণাটিকের জমিদারেরা তাঁহার প্রতিনিধি শিব রায়কে আক্রমণ করিয়া দাক্ষিণাত্য হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। শিব রায়কে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত এবং বিদ্রোহীদিগকে শাস্তিদান করিবার জন্য মহারাজা তাঁহার পুত্রের অধীনে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। রাজপুত্র যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত হন। শিব রায় পুনরায় মহারাজার দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মহারাজা তাঁহার পুত্রের মৃত্যু অপেক্ষাও তাঁহার সেনাবাহিনীর পরাজয়ে অধিক দুঃখিত হইয়াছিলেন। কারণ অচিন, মালাক্কা, পেগু ও মালাবার উপকূলের রাজারা ইতিপূর্বে কখনও বিদ্রোহ করিতে সাহসী

১০ সিংহল।

হয় নাই। এই সময় উত্তর পশ্চিম সীমান্তেও এক বিদেশী হাম্‌লা হয় এবং তাহার ফলে সাম্রাজ্য বিপন্ন হইয়া পড়ে এবং তাহার দক্ষিণ হস্ত মালবের মালচাঁদকে পাঞ্জাব রক্ষার জন্য প্রেরণ করেন বলিয়া তখনকার মত দাক্ষিণাত্যে সংগ্রাম পরিচালনা প্রস্তুতি সম্ভবপর ছিল না। মালচাঁদ পারস্য বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে চিরতরে পাঞ্জাব ছাড়িয়া দেন, উপরন্ত অনেক হস্তী এবং অন্যান্য আরও অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, পঞ্জাব পূর্ব হইতেই ফরিদুনের অধিকারেই ছিল এবং কুরশাপ্‌সের বংশধরেরা বিখ্যাত রুস্তমাবধি কাবুল, তিব্বত, সিন্ধু ও নেমরুজের সঙ্গে পাঞ্জাবও দখলে রাখিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া মালচাঁদ (যাহার নাম অনুসারে মালবের নামকরণ হইয়াছে) দাক্ষিণাত্যের জমিদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাঁহার সৈন্যের আগমনে উহারা পালাইয়া যায় এবং তিনি শিব রায়কে শাসনকর্তার আসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। কথিত আছে, এই সময় তিনি বিখ্যাত গোয়ালিয়র দুর্গ নির্মাণ করেন। মালচাঁদই হিন্দুস্তানে প্রথম সঙ্গীতশাস্ত্রের প্রবর্তন করেন। তেলিঙ্গানা অভিযান কালে তিনি সেই দেশ হইতে সঙ্গীত আমদানী করেন। অনেকদিন পরে মালচাঁদ গোয়ালিয়রে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং তেলিঙ্গী সঙ্গীতজ্ঞদের বংশধরেরা সেখান হইতে উত্তর ভারতের সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে।[১১] সাতশত বৎসর রাজত্বের পর 'মহারাজার' জ্যেষ্ঠ পুত্র কেশব রায়কে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়া পরলোক গমন করেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া কেশব রায়, রাজ্যজয়ের জন্য ভ্রাতাদের পরিচালনাধীনে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজে কাল্‌পীর পথে গণ্ডোয়ানা প্রবেশ করেন এবং তথা হইতে সেবালা দ্বীপ (সিংহল) পর্যন্ত অগ্রসর হন। তিনি যেসব রাজাদের রাজ্য অতিক্রম করিয়া গিয়াছিলেন, তাহাদের সকলের উপর কর ধার্য করিয়াছিলেন। প্রত্যাবর্তনকালে সেইসব রাজারাই তাঁহাকে

---

১১ ইহা একটা কৌতুকজনক ব্যাপার যে, দক্ষিণ ভারতে যেখানে ভদ্র মহিলাদিগকে বাঈ বলা হয়, সেক্ষেত্রে হিন্দুস্তানে পেশাদার গায়িকাগণ বাঈ নামে পরিচিত। দাক্ষিণাত্যের ভাষায় পেশাদার নর্তকীকে কুলাস্ত বলা হয়। এই শব্দই হিন্দুস্তানে পরিবর্তিত হইয়া 'কুলাস্তিন' হইয়াছে এবং নর্তকী অর্থেই ইহা ব্যবহার হয়। এই গ্রন্থে হিন্দুস্তান বলিতে নর্মদা ও মহানন্দা নদীর উত্তরে অবস্থিত দেশগুলিকে বুঝাইয়াছে।

আক্রমণ করেন এবং তাহাদের মোকাবিলা করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি শান্তির প্রস্তাব করেন এবং এইরূপে তাঁহাকে নির্বিঘ্নে রাজধানীতে ফিরিবার অনুমতি দান করা হয়। দেশে ফিরিয়াই তিনি পারস্য রাজার নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া এক দূত প্রেরণ করেন। তাহাকে সাহায্য করিবার জন্য মনুচেহের, নরিমানের পুত্র শামকে এক বাহিনীসহ প্রেরণ করেন এবং কেশব রায় পাঞ্জাবের জলন্দর নামক স্থানে সসৈন্যে তাহার সহিত মিলিত হইয়া দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করেন। দক্ষিণাত্যের রাজারা পারস্য সৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া কেশব রায়ের প্রভুত্ব স্বীকার করেন। ইরান প্রত্যাবর্তনকালে কেশব রায় পাঞ্জাব পর্যন্ত পারসিকদের সঙ্গে গমন করেন। তারপর সেখান হইতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসেন। অযোধ্যায় তিনি দুইশত কুড়ি বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাহার পুত্র মুনারী রায় তাঁহার উত্তরাধিকারী নিযুক্ত হন। এই রাজার রাজত্বকালের প্রধান কীর্তি মুনারী নগর। তিনি তাঁহার সমস্ত রাজত্বকাল সাহিত্যে উৎসাহদান ও প্রজার সুখশান্তি বিধানে অতিবাহিত করেন। কিন্তু পারস্যের প্রতি অকৃতজ্ঞতার অপরাধে তিনি দোষী ছিলেন—যে সাম্রাজ্যের নিকট তাঁহার পিতার ঋণ ছিল অপরিসীম। ইরানে মনুচেহেরের মৃত্যুর পর তুরানের রাজা আফ্রাশীয়াব তুর্ক ঐ রাজ্য আক্রমণ করেন এবং মুনারী রায়ও পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া শামের পুত্র যালের সেনাপতিদের নিকট হইতে পাঞ্জাব কাড়িয়া লন এবং জলন্দরে তাঁহার রাজ্য স্থাপন করে। সেই সঙ্গে মুনারী রায় আফ্রাশীয়াবের নিকট দূত প্রেরণ করিয়া তাঁহার বশ্যতা মানিয়া লন। ইহার পর হইতে কায়কোবাদের রাজত্বকাল পর্যন্ত পাঞ্জাব ভারতের রাজাদের অধিকারেই ছিল। কায়কোবাদ যালের পুত্র রুস্তমকে পাঞ্জাব পুনরাধিকার করিতে পাঠাইলে, মুনারী রায় পরাস্ত হন এবং তিনি যে শুধু পাঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃতই হন তাহাই নয়, অধিকন্তু ঝারখণ্ড ও গণ্ডোয়ারার পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় অন্বেষণ করিতে যাইয়া তিনি সেখানে মারা যান! তিনি ৫৩৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এইরূপে ভারতবর্ষ জয় করিয়া রুস্তম স্থির করিলেন যে, পারস্যের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তিস্বরূপ মুনারী রায়ের কোন পুত্রকেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিতে দিবেন না। সেইজন্য তিনি সূর্য নামক এক হিন্দু দলপতিকে সিংহাসনে বসাইয়া পারস্যে ফিরিয়া যান। সূর্য সমগ্র হিন্দুস্তানের উপর আধিপত্য স্থাপন করেন এবং বঙ্গোপসাগর হইতে দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত সমস্ত

ভূ-ভাগে তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকৃত হয়। কথিত আছে, তাঁহার সময়েই এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে মূর্তি স্থাপনে সম্মত করান এবং সেই সময় হইতেই হিন্দুরা মূর্তি পূজক। ইহার পূর্বে তাহারা পারসিকদের মতই সূর্য ও নক্ষত্রাদির উপাসনা করিত।[১২] সূর্যের রাজত্বকালে অবশ্য মূর্তি পূজা প্রবর্তিত হয় নাই। তিনি কায়কোবাদের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহাকে কর দান করিতেন। তিনি ২৫০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর মারা যান। তাঁহার ভগ্নীর কন্যাকে তিনি রুস্তমের সঙ্গে বিবাহ দেন।

সূর্য ৩৫ জন সন্তান রাখিয়া যান। তাঁহাদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভয়রাজ পিতার উত্তরাধিকারী হন এবং তিনি ভয়রাজ নগর নির্মাণ করেন। ভয়রাজ নগর সাধারণ্যে ভায়রাক নামে পরিচিত। সঙ্গীতের প্রতি তাঁহার বিশেষ অনুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে সরকারী কার্যের মধ্যে বেনারস শহরের নির্মাণ কার্যের সমাপ্তি অন্যতম। তাঁহার পিতা ইহার ভিত্তি স্থাপন করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, ভয়রাজই তাঁহার ভ্রাতাদিগকে রাজপুত উপাধি প্রদান করেন এবং তিনি কতকগুলি সম্প্রদায়কে বিশেষ নাম প্রদান করেন। তিনি এমন অপরিণামদর্শী ছিলেন যে, মহারাজা কর্তৃক প্রবর্তিত নিয়মতন্ত্র পরিত্যাগ করেন, এবং তাহার ফলেই তিনি সেবালিক পর্বতবাসী কেদার নামক এক ব্রাহ্মণের শত্রুতার শিকারে পরিণত হন। কেদার তাঁহাকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া রাজ্য অধিকার করেন। ভয়রাজ ৩৬ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কেদার রাজা বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন এবং জগৎ সম্বন্ধে তাঁহার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। ভয়রাজের সময় ভারতবর্ষের যে নৈতিক অবনতি ঘটিয়াছিল তিনি সেই অধঃপতন হইতে দেশকে রক্ষা করেন। তিনি কায়কাউস ও কায়খসরুর সমসাময়িক ছিলেন এবং তাহাদিগকে বাৎসরিক কর প্রদান করিতেন। তিনি কালিঞ্জর দুর্গের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করিয়া উহার নির্মাণ কার্য সমাধান করেন। তাঁহার রাজত্বের শেষ ভাগে তিনি কুচ জাতির নেতা সঙ্কল কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সঙ্কল বিপুল সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাং (বাংলা) ও বিহার পদানত করিয়া কেদারকে

১২ এই বাক্যটি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য এবং ইহা জানিতে পারিলে খুবই চমক-প্রদ হইত—ফিরিশ্‌তা কোথা হইতে এই খবর পাইলেন। তিনি যে ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যদি নির্ভরযোগ্য হয় তাহা হইলে, রামায়ন মহাভারত ও ভগবত কখন জাতীয় বীরগাঁথার রূপ হারাইয়া পবিত্র গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত হইয়াছে, সেই সময় নির্ধারণ করিবার সূত্র পাইতে পারি।

আক্রমণ করেন এবং কয়েকটি যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহার রাজ্য গ্রাস করেন। কেদার ১৯ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সঙ্কল বাংলার লক্ষণাবতী নগরের ভিত্তি স্থাপন করেন। পরে ইহা গুর বা গৌর নামে পরিচিত হয় এবং প্রায় দুই হাজার বৎসর যাবৎ ইহা এই প্রদেশের রাজধানী ছিল। কিন্তু মোগল রাজত্বকালে ইহা ধ্বংস-প্রাপ্ত হইলে টাণ্ডা (পাণ্ডুয়া) রাজধানী হয়।

সঙ্কল-রাজের সৈন্যবাহিনীতে ৪,০০০ হস্তী ১,০০,০০০ অশ্বারোহী ৪,০০,০০০ পদাতিক সৈন্য ছিল। তিনি আফ্রাশীয়ারকে কর প্রদান বন্ধ করেন। তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য আফ্রাশীয়াব পিরান্ুইশার অধীনে ৫০,০০০ তুর্কী অশ্বা-রোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। সঙ্কল-রাজ বাংলা সীমান্তে কুচ পর্বতের সন্নিকটে তাহাকে বাধাদান করেন। দুই দিন ও দুই রাত্রি অবিরাম যুদ্ধ চলিয়াছিল। এই সময় তুর্কীরা ১৩,০০০ এবং হিন্দুরা ৫০,০০০ সৈন্য হারাইয়াছিল। তৃতীয় দিবসে তুর্কীরা গা বাঁচাইয়া পিছু হটিয়া যাইতে থাকে এবং শেষে এক পাহাড়ে আসিয়া উপস্থিত হয়। এইখানে তাহারা ঘাটি স্থাপন করেন এবং পিরানুইসা আফ্রাশীয়ারকে তাহাদের অবস্থা লিখিয়া জানান।

আফ্রাশীয়ার এই সময় খাট্টা ও খুতুমের মধ্যবর্তী কুনুকদিজ শহরে অবস্থান করিতেছিলেন; ইহা খানবালিগ হইতে এক মাসের পথ। পিরানুইসের পত্র পাইয়া তিনি এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাহার সাহায্যে আগমন করেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন যে, ভারতবর্ষের অসংখ্য রাজা তাহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলি-য়াছেন। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন এবং তাঁহার সেনাপতিকে সংকটজনক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার করিলেন। ইহার পর তিনি সঙ্কলকে লক্ষণাবতী পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যান। সেখান হইতে ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইয়া তিনি তিরহুতের পাহাড়ে প্রবেশ করেন। তথা হইতে তিনি ক্ষমা ভিক্ষা ও দর্শন লাভের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া আফ্রাশীয়ারের নিকট দুত মারফত প্রস্তাব পাঠান। কিন্তু তাহাকে গলায় তলোয়ার ঝুলাইয়া ও স্কন্ধে কাফনের বস্ত্র জড়াইয়া, সেই মহান সম্রাটের সম্মুখে হাজির হইতে হইয়াছিল। আফ্রাশীয়ার সঙ্কলকে তুরান লইয়া যান এবং সঙ্কল রাজার পুত্রকে রাজ্যের শাসন-ভার অর্পণ করেন। সঙ্কল বহু দিন যাবৎ আফ্রাশীয়ারের সঙ্গে ছিলেন, কিন্তু পরে এক যুদ্ধে রুস্তমের হস্তে নিহত হন। তিনি ৬০ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইরানে প্রত্যাবর্তন করিয়া আফ্রাশীয়ার ভারতের শাসনভার সঙ্কলের পুত্র রহুতের হস্তে অর্পণ করেন। গারহি হইতে মালব পর্যন্ত তাহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। ইহার রাজস্ব তিনি সমান তিন অংশে বিভক্ত করিয়া এক অংশ দান করিতেন, অন্য অংশের কিছু তাহার পিতাকে ও কিছু করস্বরূপ আফ্রাশীয়ারকে পাঠাইতেন। অবশিষ্ট যাহা থাকিত তাহার দ্বারাই শাসনকার্যের ব্যয় নির্বাহ করিতেন। রাজস্বের এই সামান্য অংশ তাহার রক্ষণব্যবস্থার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না বলিয়া মালবের রাজা তাঁহার হস্ত হইতে গোয়ালিয়র কাড়িয়া লইলেন। রহুত-রাজ রোটাস দুর্গ নির্মাণ করিয়া উহাকে মন্দিরাদি দ্বারা সুশোভিত করেন। তিনি গোয়ালিয়র পুনরুদ্ধারের জন্য যুদ্ধ করিয়া অকৃতকার্য হন এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চাদাপসরণ করিতে বাধ্য হন। তিনি অধিকাংশ সময় কনৌজেই রাজধানী রাখিয়াছিলেন এবং সেখানে ৮০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর প্রাণত্যাগ করেন।

রাজা রহুত কোন প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র সন্তান রাখিয়া যান নাই, সেই জন্য তাঁহার মৃত্যুর পরে রাজ্যে বিপ্লব ঘটিয়াছিল। ইহাতে মহারাজা নামক মারোয়ার প্রদেশের কাচওয়াহা জাতির এক ব্যক্তি সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নিহারওয়ালা[১৩] আক্রমণ করিয়া সেই অঞ্চলের জমিদারদিগকে দমন করিয়া কতকগুলি সামুদ্রিক বন্দরের গোড়াপত্তন ও নানা আকারের অনেক জাহাজ নির্মাণ করান। এই দ্বিতীয় মহারাজা গুশ্‌তাসপের সমসাময়িক ছিলেন এবং ৪০ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এই সময় তিনি পারস্যরাজকে বাৎসরিক কর প্রদান করিতেন। মহারাজার মৃত্যুর পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র কেদার রাজা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। মৃত্যুকালে মহারাজা এক অন্তিম আদেশলিপি দ্বারা ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিয়া যান। তাঁহার রাজত্বকালে রুস্তম নিহত হন এবং তিনি রুস্তমের বংশধরদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে পাঞ্জাব কাড়িয়া লন। বেহারা শহরে[১৪] কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি সেখানে জাম্মু দুর্গ নির্মাণ করান এবং সেখানে তাঁহার অন্যতম আত্মীয় দুর্লবান বংশীয় দুর্গাকে রাখিয়া যান। তদবধি এই বংশের লোকেরা এই অঞ্চলে বসবাস করিয়া আসিতেছে। দুর্গা,

---

১৩ গুজরাটের পত্তন।

১৪ গারায় অবস্থিত এই শহরের কথা প্রাচীন ইতিহাসে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথম মুসলমান আক্রমণকালে ইহা গোগা চৌহানদের অধিকারে ছিল।

পাঞ্জাবের প্রাচীন জমিদার গোক্কর ও চৌবিয়া এবং কাবুল ও কান্দাহারের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে যে-সব লোক বাস করিত, তাহাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিয়া কেদার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। কেদার রাজা পাঞ্জাব হইতে পালাইয়া যান। এই জাতিগুলি পূর্বে পৃথক ছিল, এইবার তাহারা এক শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করিল এবং আমি মনে করি, আমরা যাহাদিগকে আফগান বলিয়া থাকি উহারাই সেই আফগান।[১৫] কেদার রাজা ৪৩ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

কেদার রাজার মৃত্যুর পর, তাঁহার মন্ত্রী জয়চাঁদ সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি সেনাবাহিনীরও অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরেই দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়, তাহাতে হাজার হাজার প্রজা মারা যায়। উহাদের দুঃখ লাঘব করিবার জন্য তিনি কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই, বরং ঐ সময়ে বিয়ানা শহরে আমোদ-প্রমোদ করিয়া সময় কাটাইয়াছেন। ৬০ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তিনি মারা যান। তিনি বাহমুন ও দরাবের সমসাময়িক ছিলেন। জয়চাঁদ এক শিশু পুত্র রাখিয়া যান। তাহার বিধবা পত্নী ঐ শিশু সন্তানকে সিংহাসনে বসাইয়া তাহার নামে রাজ্যশাসন করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শিশুরাজার পিতৃব্য দেহ্‌লু সভাসদদের সাহায্যে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এই রাজা সাহস ও ন্যায়পরায়ণতার জন্য সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং প্রজাদের কল্যাণের জন্য সমস্ত সময় ব্যয় করিতেন। তিনিই দিল্লী শহর নির্মাণ করেন। তিনি মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছেন—সেই সময় কুমাইওনের রাজা ফুর বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করিয়া তাহাকে আক্রমণ ও বন্দী করেন। তারপর তাহাকে রোটাস দুর্গে আটক রাখিয়া তাঁহার সাম্রাজ্য আত্মসাৎ করেন। রাজা ফুর[১৬] বঙ্গ দেশের মধ্য দিয়া গমন করিয়া সমুদ্র পর্যন্ত সমস্ত দেশ জয় করেন। তিনি এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করিয়া পারস্য রাজাকে কর প্রদান বন্ধ করিয়া দেন। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য ঐতিহাসিকরা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, পুরু আলেকজাণ্ডারের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্য স্বসৈন্যে ভারতের সীমান্তে অগ্রসর হইয়া গিয়াছিলেন। ৭৩ বৎসর রাজত্ব করিবার পর রাজা ফুর বা পুরু সেই সংগ্রামে

---

১৫ ফিরিশতা কিসের উপর ভিত্তি করিয়া এই মত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা মুশকিল।

১৬ পুরু।

নিহত হন। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের বাদারা শক্তিশালী হইয়া স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের অনেকের মধ্যে ছিলেন, কুলবর্গার প্রতিষ্ঠাতা কুল চাঁদ; মার্চের প্রতিষ্ঠাতা মার চাঁদ, বিজয় নগরের প্রতিষ্ঠাতা বিজয় চাঁদ। ইহাদের বাহিরেও আরও অনেক ছিল যাহাদের নাম উল্লেখ করিতে গেলে এই পুস্তকের কলেবর অনেক স্ফীত হইবে।

কথিত আছে, মহাবীর আলেকজাণ্ডার ভারতে প্রবেশ করিলে রাজা বিদর, (তিনি বিদর শহরের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঐ জাতীয় নেতা ছিলেন, তাহার বংশধররা দাক্ষিণাত্যে এখনও সাহসিকতার জন্য প্রসিদ্ধ) গ্রীক সম্রাটের পরাক্রমের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার দাক্ষিণাত্য আক্রমণ নিবারণ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি অনেক হাতী ও নানা প্রকার মূল্যবান দ্রব্যসহ নিজ পুত্রকে দূতরূপে আলেক-জাণ্ডারের নিকট প্রেরণ করেন। পুরুর মৃত্যুর পর সুনচার চাঁদ[১৭] ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। কিন্তু তিনি পারস্যের রাজা গুদর্যকে বাৎসরিক কর প্রদান করিতেন। পুরুর ভ্রাতুষ্পুত্র জুনা তাঁহার রাজ্য আত্মসাৎ করেন। জুনাকে উদার স্বভাবের নরপতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন করেন এবং গঙ্গা ও যমুনার তীরে অনেক নগর নির্মাণ করান। তিনি আর্দশিয়ার বাবিগানের সমসাময়িক ছিলেন—যিনি ভারতবর্ষও আক্রমণ করিয়া-ছিলেন। জুনা বহু হস্তী ও স্বর্ণ উপঢৌকন লইয়া তাহার সহিত সীমান্তে যাইয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাকে আক্রমণ প্রত্যাহার করিতে সম্মত করান। কনৌজে ফিরিয়া ৯০ বৎসর রাজত্বের পর জুনা পরলোক গমন করেন।

তাঁহার ২২ জন পুত্রের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কল্যাণ চাঁদ উত্তরাধিকারী হন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও স্বেচ্ছাচারী রাজা ছিলেন। বিনা কারণে প্রজাদিগকে হত্যা করিতেন এবং তজ্জন্য বিন্দুমাত্র অনুশোচনা বোধ করিতেন না। তাঁহার রাজ্যের হতভাগ্য প্রজারা তাঁহার অত্যাচারের হাত হইতে পরিত্রাণের জন্য কনৌজ শহর জনশূন্য করিয়া পলায়ন করে। তাঁহার পরে যাহারা কনৌজে রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে রামদেব ব্যতীত আর কেহই উল্লেখযোগ্য নন এবং তাঁহার ইতিহাস শীঘ্রই বর্ণিত হইবে। আমি হিন্দুস্তানের রাজন্যবর্গের ইতিবৃত্ত

১৭ তিনি চন্দ্রগুপ্ত নামেও পরিচিত। গ্রীকরা সম্ভবতঃ তাহাকে মণ্ড্রকোট্রাস বলিত।

কনৌজ রাজবংশে সীমাবদ্ধ রাখিতে চাই না। সেইজন্ত আমি মালব ও মালবের বিখ্যাত বিক্রমজিৎ পাওয়ারের ইতিহাস বর্ণনায় অগ্রসর হইতেছি।

সে যুগের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ও ধার্মিক রাজা বিক্রমজিতের ইতিহাস পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে পৌরাণিক কাহিনীর মত প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে এবং এখনও তাহার দেশবাসীর মনে জাগ্রত আছে।

কথিত আছে, প্রথম জীবন তিনি সাধু-সন্ন্যাসীদের মধ্যে দরিদ্রের বেশে ও কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া কাটাইয়াছিলেন। ৫০ বৎসর বয়সে তিনি এক সেনাবাহিনীর অধিনায়ক হন এবং কয়েক বৎসরের মধ্যে সমস্ত নিহারওয়ালা[১৮] ও মালব অধিকার করিয়া ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে শাসন করিতে থাকেন। হিন্দুরা বিশ্বাস করেন যে, তিনি সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন—ভবিষ্যতে কি ঘটিবে তাহা বলিতে পারিতেন। তিনি কোন প্রকার জাঁকজমক প্রদর্শন করিতেন না। প্রজাদের মতই সরল জীবন যাপন করিতেন। সোনার পরিবর্তে মাটির বাসনাদি ব্যবহার করিতেন এবং পালঙ্কের পরিবর্তে মাছরে নিদ্রা যাইতেন। তিনি উজ্জয়িনী নগরে মহাকালীর প্রতিমা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাহার রাজত্বকালে উজ্জয়িনী জনবহুল নগরে পরিণত হইয়াছিল। ধর দুর্গও তিনি নির্মাণ করিয়াছিলেন। বিক্রমজিতের মৃত্যুর তারিখ হইতে হিন্দুরা তাহাদের অন্যতম সাল গণনা করে, যাহা এখন ১৬৩৩ সনে পড়িয়াছে এবং যাহা হিজরী ১০১৫ সালের সমান। তিনি আর্দশিয়ার ববিগণের সমসাময়িক ছিলেন এবং কেহ কেহ বলেন, তিনি শাহপুরেরও সমসাময়িক ছিলেন। তাহার রাজত্বের শেষভাগে দাক্ষিণাত্যের রাজা শালীবহন তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কয়েকটি যুদ্ধ হয়, শেষ যুদ্ধে বিক্রমজিত রাজ্য ও প্রাণ উভয়ই হারান। তাঁহার মৃত্যুর পরে বহুদিন যাবৎ মালবে অরাজকতা বিরাজ করে। অবশেষে রাজা ভোজ সিংহাসন দাবী করিয়া শাসন ক্ষমতা অধিকার করেন। রাজা ভোজও পাওয়ার বংশীয় ছিলেন এবং তিনি তাঁহার পূর্বগামী বিক্রমজিতের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। তিনি অনেক নগর প্রতিষ্ঠা করেন, যাহার মধ্যে ছিল কার্গন, বিজয়গর ও হাণ্ডিয়া। তিনি বৎসরে দুইবার বিরাট ভোজের আয়োজন করিতেন যাহা চল্লিশ দিন স্থায়ী হইত। এই সময় হিন্দুস্থানের সমস্ত বিখ্যাত নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকা সমবেত হইত।

---

১৮ নিহারওয়ালা অর্থে এইখানে সমগ্র গুজরাট বুঝাইয়াছে মনে হয়।

তিনি তাহাদিগকে খাদ্য ও সুরা সরবরাহ করিতেন। এবং ভোজ শেষে প্রত্যেক অতিথিকে নূতন বস্ত্র ও ১০ মিস্কাল (স্বর্ণ-মুদ্রা) প্রদান করিতেন। ৪০ বৎসর রাজত্বের পর তিনি মারা যান। এই সময় ব্যাসদেব নামক এক ব্যক্তি কনৌজ প্রদেশ অধিকার করিয়া সেখানে নিজকে রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার রাজত্বকালে পারস্যরাজা বাহরামগুড় ছদ্মবেশে কনৌজের রাজসভায় আসিয়াছিলেন। তিনি যে সময় রাজধানীতে ছিলেন সেই সময় একটা বন্য হস্তী রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলে অনেক অনিষ্ট সাধন করিয়াছিল এবং ঐ হস্তীকে আক্রমণ করিতে যাইয়া বহু লোক প্রাণ হারাইয়াছিল। অন্য লোকদের সঙ্গে ব্যাসদেব নিজেও অনেকবার সেই হাতী মারিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু সফলকাম হন নাই। বাহরামগড়ের আগমনের পরেই সেই হস্তীটি নগরের তোরণ পর্যন্ত পৌছিয়া এক ভীষণ আতঙ্কের সৃষ্টি করে। পারস্য-রাজ একাকী সেই স্থানে ছুটিয়া যাইয়া হাতীর পায়ে একটা মাত্র তীর মারিয়া উহাকে ভূতলশায়ী করেন। এক বিদেশী হাতীটা মারিয়াছে শুনিয়া ব্যাসদেব তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি রাজসভায় প্রবেশ করিবার কালে বাৎসরিক কর প্রদানান্তে পারস্য হইতে সদ্য প্রত্যাগত ভারতীয় দূত তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিলেন এবং ব্যাসদেবের নিকট উহা প্রকাশ করিলেন। ব্যাসদেব তৎক্ষণাৎ সিংহাসন হইতে অবতরণ করিয়া বিদেশীকে সেখানে উপবেশন করাইলেন। তিনি পারস্যরাজকে কন্যা দান করিয়া যথাযোগ্য রক্ষীদলসহ তাঁহাকে পারস্য পাঠাইয়া দেন। ৭০ বৎসর রাজত্বের পর ব্যাসদেব প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে কাল্পী দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। তিনি ৩২ জন পুত্র রাখিয়া যান, উহারা দুই বৎসর যাবৎ উত্তরাধিকারত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত ছিল। অবশেষে বিগত ব্যাসদেবের সেনাপতি রামদেব রাটোর সিংহাসনে আরোহণ করেন। নিজের রাজ্যের বিদ্রোহী কর্মচারী ও রাজাদিগকে দমন করিবার পর তিনি মারবার প্রদেশে গমন করেন। সেখান হইতে কাচওয়াহা সম্প্রদায়ের লোকদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া রাটোর বংশের লোকদিগকে সেখানে বসবাস করিতে দেন। তদবধি রাটোররা সেই প্রদেশে রহিয়াছে এবং কাচওয়াহা বংশের লোকেরা রোটাসের নিকটবর্তী অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে। তিন বৎসর অনুপস্থিতির পর কনৌজে ফিরিয়া আসিয়া রামদেব বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া উহার রাজধানী অধিকার করেন এবং প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেন।

এই ঘটনার চারি বৎসর পরে তিনি মালব অধিকার করিয়া সেই রাজ্যে অনেক নগর প্রতিষ্ঠা করেন। ইহাদের মধ্যে অন্যতম নারোয়ার সেখানে একদল রাটোর সৈন্য রাখিয়া তিনি চলিয়া আসেন। অতঃপর তিনি বিজয় নগরের রাজা শিব রাজের কন্যার পাণিপ্রার্থী হইয়া তাহার নিকট দুত প্রেরণ করেন। শিব রাজা রামদেবের শক্তিকে ভয় করিয়া অনেক মূল্যবান উপঢৌকনসহ কন্যাকে দুতের সঙ্গে প্রেরণ করেন। রামদেব দুই বৎসর নিরিবিলি কাটাইলেন, অতঃপর তিনি সেবালিকের রাজাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিকট হইতে বাৎসরিক রাজস্ব আদায় করেন। সেই যুদ্ধে কুমায়ুনের রাজা তাঁহার বিপক্ষে ছিলেন (কুমায়ুনের রাজা এক অতি প্রাচীন রাজ-বংশের উত্তরাধিকারী সূত্রে রাজ্য ও রাজমুকুট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই রাজ বংশ ২,০০০ বৎসরেরও অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিল) এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হইয়াছিল, যাহা সমস্ত দিন স্থায়ী হইয়াছিল। উভয় পক্ষে বহু সৈন্য নিহত হইয়াছিল। শেষ পর্যন্ত কুমায়ুন-রাজ পরাভূত হন, তাহার সমস্ত হস্তী ও ধনরত্ন শত্রু হস্তে পতিত হয় এবং তিনি পাহাড়ে পালাইয়া যান। রামদেব অতঃপর তাহার শত্রুকে কন্যাদান করিতে বাধ্য করেন এবং উহার পর তাঁহার রাজ্য তাঁহাকে প্রত্যার্পণ করেন। ইহার পর নগরকোট গমন করিয়া তিনি উহা লুণ্ঠন করেন এবং অবশেষে শিবকোট পিণ্ডি[১৯] নামক স্থানে আসিয়া পৌঁছেন এবং সেখানে থামিয়া তথাকার রাজাকে সম্মুখে হাজির হইতে আদেশ করিলেন (নগর কোটের পার্শ্ববর্তী পর্বত শীর্ষে অবস্থিত দুর্গা প্রতিমার প্রতি সম্মানার্থ তিনি সেখানে থামিয়াছিলেন)। রাজা কিছুতেই সম্মত হইলেন না, পরে যে মন্দিরে প্রতিমা ছিল, সেই মন্দিরে রামদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে সম্মত হন। এই রূপে দুই রাজা মন্দিরে সাক্ষাত করেন। স্থানীয় রাজা রামদেবের পুত্রের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন। রামদেব তথা হইতে জাম্মু দুর্গে গমন করেন। জাম্মুর রাজা তাঁহাকে জঙ্গলে বাধা প্রদান করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হন। রাম-দেব জাম্মু দুর্গ পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং জাম্মু দুর্গ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। রাজা অবশেষে করদরাজা হইতে স্বীকৃত হইয়া রামদেবের অন্য

১৯ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে এই নাম লেখা আছে এবং আমি যেসব মানচিত্র দেখিয়াছি তাহাদের কোনটাতেই ইহা পাই নাই।

এক পুত্রের সঙ্গে নিজের কন্যার শাদী দেন। রামদেব বিহুত নদীর নিকটে পৌঁছিয়াছিলেন। এই নদী কাশ্মীরের পর্বত হইতে আরম্ভ হইয়া পাঞ্জাবের মধ্যে দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। অতঃপর তিনি বাংলার মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইয়া সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত গমন করেন—যেখানে সেবালিক[২০] পর্বতমালা শেষ হইয়াছে।

রামদেব পাঁচ মাস ভ্রমণ কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন, এই সময়ে তিনি পাঁচ শতেরও অধিক রাজাকে বশীভূত করেন এবং তাহার পর তিনি রাজধানীতে প্রত্যাগমন করিয়া সৈন্যদিগকে পুরস্কৃত করেন এবং সেই উপলক্ষে এক ভোজসভার আয়োজন করেন। রামদেব ৫৪ বৎসরের উপর রাজত্ব করিয়া পরলোকগমন করেন। তিনি সামানী বংশীয় ফিরোজের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার পুত্র কায়কোবাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। উভয় সম্রাটকেই ভারতীয়রা কর প্রদান করিয়াছেন। রামদেবের মৃত্যুর পর তাহার অগণিত পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব লইয়া টানাটানির ফলে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়। রামদেবের সেনাপতি শিশুদিয়া বংশীয় প্রতাপ চন্দ্র এই নব বিবাদের সুযোগে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজকুমারদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কুমারদিগকে বন্দী করিয়া হত্যা করেন এবং নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নিজেকে তাঁহার পূর্বগামী রাজার মত শক্তিশালী করিবার পর পারস্য রাজাকে কর দান করিতে অস্বীকার করেন। নওশেরওয়ার দূত শূন্য হস্তে ফিরিয়া যায়। এই কারণে পারস্য বাহিনী মুলতান ও পাঞ্জাব আক্রমণ করে। দেশকে ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রতাপচন্দ্র পারস্য সেনাপতি ও পারস্যের রাজা উভয়ের নিকট শান্তির প্রস্তাব পেশ করেন। ইহার পর হইতে তিনি পূর্বের মতই পারস্য রাজাকে করদান করিতে আরম্ভ করেন। প্রতাপ চন্দ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রত্যেক সেনাপতি একটি করিয়া প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়। ওদিকে তাঁহার পুত্ররা কনৌজ হইতে পালাইয়া চিতোর ও মান্দযুরের নিকট কুম্বালমির পাহাড়ে একটি ক্ষুদ্র অঞ্চল অধিকার করিয়া লয়। তাহাদের বংশধররা আজ পর্যন্ত সেখানে রাজত্ব করিতেছেন। তাহারা রানা বা ক্ষুদ্ররাজা নামে অভিহিত।[২১]

২০ এখানে সেবালক হিমালয়ের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২১ শিশুদিয়া বংশের নেতাকে রানা বলা হয়। তাহারা এখনও চিতোর ও উদয়পুরে রাজত্ব করিতেছেন এবং তাহাদের বংশধররাই ডঙ্গুরপুর ও প্রতাপ

(তিরিশ)

প্রতাপ চন্দ্রের মৃত্যুর পর আর যে-সব সেনাপতি ও রাজা শক্তিশালী হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে বিশ-সম্প্রদায়ভুক্ত আনন্দ দেব রাজপুত ছিলেন অন্যতম। মালবে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া, তিনি দাক্ষিণাত্যের নিহারওয়ালা ও মারহাট্টা রাজ্য জয় করেন। তিনি বেরাবের রামগীর ও মাহুর দুর্গ এবং মালবের মান্দু দুর্গ নির্মাণ করেন। তিনি খসরু পারভেজের সময়ে জীবিত ছিলেন এবং ১৬ বৎসর রাজত্বের পর মারা যান।

এই সময় মালদেব নামক এক হিন্দু দোয়াবে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লী ও কনৌজ আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন। তিনি কনৌজে বাস করেন এবং তাঁহার সময়ে কনৌজের এমন শ্রীবৃদ্ধি হয় যে, ইহার সমকক্ষ আর কোন শহর তখন কোথাও ছিল না বলিলেই চলে। এই বিবৃতি হইতে কনৌজের লোকসংখ্যা সম্বন্ধে একটা ধারণা হইতে পারে—যেমন কনৌজে পান বিক্রয়ের জন্য ৩০,০০০ দোকান ছিল, সাধারণ নর্তক-নর্তকী ও গায়ক-গায়িকাদের ৬০,০০০ হাজার পরিবার ছিল। ৪০ বৎসর রাজত্বের পর মালদেব পরলোকগমন করেন। তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবার মতো উপযুক্ত কোন সন্তান তিনি রাখিয়া যান নাই। ফলে রাজ্যের সর্বত্র অরাজকতা ও গৃহযুদ্ধ চলিতে থাকে। সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া মুসলমান আক্রমণ পর্যন্ত কোন এক রাজা সমস্ত ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য করে নাই। কারণ সুলতান মাহমুদ যখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তখন ভারত নিম্নলিখিত ক্ষুদ্র রাজ্যগুলিতে বিভক্ত ছিল :

কনৌজ—কুরুর রাজ ; মিরাট—হরদত রাজ ; মহাভান[২২]—গুল চন্দ্র রায় ; লাহোর—জয়পাল (হরপালের পুত্র)।

এইরূপ মালব, গুজরাট, আজমীর, গোয়ালিয়র প্রভৃতি প্রত্যেকটি রাজ্যে স্বতন্ত্র রাজা ছিল।

গড়ে রাজা হইয়াছেন। রানা অর্থ 'ক্ষুদ্র রাজা'—ফিরিশতার এই কথাটি ভুল। বড় বড় হিন্দু রাজারা এই উপাধি ধারণ করিয়াছেন এবং রানা সর্বদা অসামান্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

২২ মথুরার ১০ মাইল নিম্নে যমুনার বাম তীরে এই নামের একটি গ্রাম আছে। সম্ভবতঃ সেই স্থানের কথাই এখানে বলা হইয়াছে।

উপক্রমণিকা

[আরবদের পারস্যাভিমুখে যাত্রা এবং কিরমান, সিস্তান, কোহিস্তান ও নিশাপুরের মধ্য দিয়া অগ্রগতি। খোরাসান, মার্ভ, বাখীজ ও জুজিস্থানে বসতি স্থাপন। কারুন নামক এক পারসিক দলপতি খোরাসান পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ। আবদুল্লাহ্-বিন-জাজিম পরাস্ত। আবদুল্লাহ্-বিন-যিয়াদের ট্রান্স-অকসিয়ানা প্রবেশ। পরে তাঁহাকে ফিরাইয়া আনা এবং তাঁহার স্থানে তাঁহার ভ্রাতা সালিম-বিন যিয়াদের নিযুক্তি। মুহাল্লিব-বিন-আবূ সাফ্রার সালিমের সঙ্গে গমন। মুসলমানদের বিরুদ্ধে কাবুলে বিদ্রোহ এবং মুসলমানরা কাবুল হইতে বিতাড়িত। সালিম কর্তৃক কাবুল পুনরাধিকৃত এবং আবদুল্লাহ্ নামক এক ব্যক্তি কাবুলের শাসনকর্তা নিযুক্ত। আবদুল্লাহ্‌র পদাবনতি এবং সোলেমান পর্বতে বসবাসকারী আফগানদের মধ্যে গমন। লোদী ও শূর নামক তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম—যাহাদের বংশধররা ইতিহাসে লোদী ও শূর নামে খ্যাত। আফগানরা লাহোরের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত। আফগানদের সঙ্গে গোক্করদের সহযোগিতা। আফগানদের আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য লাহোরের রাজা কর্তৃক গোক্কর-দিগকে কিছু অঞ্চল দান।]

যে মুসলমান বীর ভারতের সমতল ভূমিতে প্রথম ইসলামের ঝাণ্ডা উড়াইয়া-ছিলেন তাহার নাম মুহাল্লিব-বিন-আবুসাফ্রা।[১]

হিজরীর ২৮ সনে (৬৪৮ খ্রীঃ) হজরত ওসমানের (রাঃ) খিলাফত লাভের অব্যবহিত পরেই তিনি বসরার শাসনকর্তা আবদুল্লাহ্-বিন-আমীরকে ফার প্রদেশ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। হযরত ওমরের মৃত্যুর সময়

১ মোহাল্লিবরা এই নেতার বংশোদ্ভূত জাতিবিশেষ। এই জাতি সিরিয়ায় উমাইয়া খলিফাদের সময় লারিস্তান এবং অরমুজ শাসন করিত। পরে তাহারা দ্বিতীয় এজিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে পরাজিত হয় এবং শাসন ক্ষমতা হারায়।

বিন শাহানা নামক আরবী কবি মোহাল্লিবদের সাহস ও দানশীলতার বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। এবং ইসপাহানের আবুল ফারাহ্ ও আবুল ফিদা তাহাদের গ্রন্থে মোহাম্মদ মোহাল্লিবির কথা উল্লেখ করিয়াছেন।

ঐ প্রদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। আবদুল্লাহ্ সাফল্যের সঙ্গে বিদ্রোহ দমন করিয়া বসোরায় প্রত্যাবর্তন করেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে খলিফা হজরত ওসমান (রাঃ) ওয়ালিদ-বিন ওতবাকে চরিত্রহীনতার অপরাধে কুফার শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারণ করিয়া সাইদ বিন-আবুল আসকে তাহার স্থানে নিযুক্ত করেন। ইহার অনতিকাল পরেই সাইদ পারস্যের মধ্য দিয়া তাব্রিস্তান পর্যন্ত এক সমরাভিযান পরিচালনা করেন। হযরত আলীর দুই পুত্র—হাসান ও হুসায়ন এই অভিযানে শরিক হইয়াছিলেন এবং তাহাদের বীরত্বে কাশ্পিয়ান সাগর তীরস্থ জুরজান প্রদেশ (যাহার রাজধানী আস্ত্রাবাদ) অধিকৃত হয়। ঐ প্রদেশের অধিবাসীদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। উহাদের নিকট হইতে দুই লক্ষ দিনার আদায় করা হইয়াছিল।

পর বৎসর আবদুল্লা-বিন-আমীরকে সসৈন্যে কিরমান ও তথা হইতে খোরাসান প্রেরণ করা হয়। হানিফ-বিন-কায়েসের পরিচালনাধীনে তাঁহার অগ্রগামী বাহিনী সিস্তান, কোহিস্তান ও নিশাপুর জয় করে। নিশাপুরে তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন তুসের শাহজাদা। মুসলমান বাহিনী সেখান হইতে অগ্রসর হইয়া সুরুখ্স্, হিরাট, বাখীজ, ঘুর, জুর্জিস্থান, মার্ভ, তালিখান ও বল্খ অধিকার করে।

এই সাফল্য অর্জনের পর আবদুল্লাহ্ সেনাদল ত্যাগ করিয়া মক্কা গমন করেন। মক্কা যাত্রার প্রাক্কালে তিনি বিজিত প্রদেশগুলি তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দিয়া যান। হাশিমের পুত্র কায়েসকে খোরাসান, কায়েসের পুত্র হানিফকে মার্ভ, তালিখান ও নিশাপুর এবং আবদুল্লার পুত্র খালিদকে বাখীজ, ঘুর ও জর্জিস্তান প্রদান করেন।

৩২ হিজরীতে বাগদাদ হইতে আবদুর রহমান-বিন-রাবিয়াকে ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্য পারস্যে প্রেরণ করা হইয়াছিল। বিপুল সংখ্যক পারস্যবাসী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া তিনি নিহত হন এবং তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই জর্জিস্তান ও জিলানে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই বৎসরই ভূতপূর্ব পারস্য-রাজের অন্যতম সভাসদ কারুন মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। তিনি দেখিলেন যে

আবদুল্লাহ্ মুসলমান ফৌজকে ভাঙ্গিয়া কয়েকটি প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়া গিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন ইহাদিগকে পরাজিত করা কঠিন হইবে না। তিনি তাবাস, হিরাট, বাঘীজ, ঘুর ও কোহিস্তানের অধিবাসীদের মধ্য হইতে চল্লিশ হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কারুন নিশাপুরে হানিফের অন্যতম সেনাপতি আবদুল্লাহ্-বিন-জাজিমের হস্তে পরাজিত হইলেন। আবদুল্লার সঙ্গে ছিল মাত্র চারি হাজার সৈন্য। এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য আবদুল্লাহ খোরাসানের শাসনকর্তার পদ লাভ করিলেন।

চুয়াল্লিশ হিজরীতে খলিফা মোয়াবিয়া-বিন-আবুসুফিয়ান উমিয়ার পুত্র জিয়াদকে বসরা, সিস্তান ও খোরাসানের শাসনকর্তা মনোনীত করেন। সেই বৎসরই আবদুর রহমান-বিন-সিমার নামক এক সেনাপতি মার্ভ হইতে অগ্রসর হইয়া কাবুল পৌছেন এবং সেখানে বার হাজারেরও অধিক সংখ্যক অধিবাসীকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন। এই সময়েই মুহাল্লিব-বিন-আবুসাফ্রা একদল সৈন্য লইয়া কাবুল হইতে ভারতাভিমুখে রওয়ানা হন এবং মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া পশ্চাদপসরণ করেন। শুধু লুণ্ঠন কার্য চালাইয়া তিনি মুল সামরিক ঘাটি খোরাসানে সাফল্যের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন করেন। অনেক হিন্দুস্থানী বন্দীকে তিনি সঙ্গে আনিয়াছিলেন যাহাদের সকলকে জোরপূর্বক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়।

৫৩ হিজরীতে (৬৭২ খ্রীঃ) বসরা শহরে প্লেগ দেখা দেয় এবং তাহাতে উমিয়ার পুত্র যিয়াদের মৃত্যু ঘটে। যিয়াদের মৃত্যুর সংবাদ পৌছিবার পূর্বেই খলিফা মোযাবিয়া যিয়াদের পুত্র আবদুল্লাকে কুফার শাসনকর্তা মনোনীত করিয়াছিলেন। আবদুল্লাহ্ এক সেনাবাহিনী লইয়া পারস্য ভেদ করিয়া মা-উরাউন্নাহার যাইয়া পৌছেন এবং উহা আংশিকভাবে অধিকার করেন। এই সময় তাঁহার পিতার মৃত্যুতে বসরার শাসনকর্তার পদ শূন্য হওয়ায় তাঁহাকে বিজয়াভিযান বন্ধ করিয়া চলিয়া আসিতে হয়। বসোরায় ফিরিবার সময় তিনি তাঁহার আত্মীয় সালিম-বিন-জুরাকে খোরাসানের শাসনভার অর্পণ করিয়া চলিয়া আসেন।

ইহার পরে (হিজরী ৫২ ; ৬৭৮ খ্রী:) খলিফা মোয়াবিয়া সালিমকে অপসারণ করিয়া তাহার স্থলে সাদ-বিন-ওছমান-বিন-ইফানকে খোরাসানের

শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ৫৫ হিজরীতে (৬৮১ খ্রীঃ) সাদকে ডাকিয়া পাঠান হয় এবং তাঁহার স্থানে জিয়াদের পুত্র আবদুর রহমানকে খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এই আবদুর রহমানই ইতিপূর্বে কাবুলে সমরাভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী খলিফা মোয়াবিয়ার পুত্র ইয়াযিদ ৬২ হিজরীতে (৬৮৩ খ্রীঃ) তাহাকে সরাইয়া সালিম-বিন-যিয়াদকে খোরাসানের শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন। সালিমের সঙ্গে তাঁহার নূতন কর্মস্থলে যাঁহারা গিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে আবু সাফ্রার পুত্র মুহাল্লিবও ছিলেন। খোরাসান পৌঁছিবার অনতিকাল পরেই সালিম তাহার ভ্রাতা ইয়াযিদ-বিন-যিয়াদকে সিস্তানে পাঠান। ইহার কিছুদিন পরেই ইয়াযিদ-বিন-যিয়াদ শুনিতে পান যে কাবুলের অধিপতি মুসলমানদের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়াছে এবং তিনি সিস্তানের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা যিয়াদের পুত্র আবু ওবায়দাকে আক্রমণ করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইয়াযিদ-বিন-যিয়াদ একদল সৈন্য লইয়া কাবুল পুনরুদ্ধার করিতে গমন করেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধে কাবুলীদের হস্তে পরাজিত হন। এই দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সালিম যুদ্ধের পথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষতিপূরণদানে আবু ওবায়দাকে মুক্ত করিবার পন্থা অবলম্বন করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার দরবারের অন্যতম পদস্থ ব্যক্তি তিল্লা-বিন-আবদুল্লাহ্‌কে কাবুলে প্রেরণ করেন। পাঁচ লক্ষ দিরহাম কাবুল সরকারকে প্রদান করিয়া তিনি আবু ওবায়দাকে মুক্ত করেন এবং এই কার্য সমাধা করিয়া তাহার পুরস্কারস্বরূপ তিল্লা-বিন-আবদুল্লাহ্ সিস্তানের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হন। সিস্তানে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি কাবুল পুনরাধিকার করেন। খালিদ-বিন-আবদুল্লাহ্‌কে (কেহ কেহ বলেন খালিদ-বিন-ওলিদ, আবার কেহ কেহ বলেন খালিদ-বিন-আবুজেহেল) কাবুলের শাসনকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। পরে খালিদকে সরাইয়া তাঁহার স্থানে অন্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা হয়। তখন খালিদ খুব মুশ্‌কিলে পড়েন। পারস্যের মধ্যে দিয়া আরবদেশে ফিরিতে তাঁহার সাহসে কুলাইল না; কারণ, পারস্যে তাঁহার অনেক শত্রু ছিল। অপরপক্ষে তাঁহার পরবর্তী শাসনকর্তার অধীনে কাবুলে অবস্থান করাও তিনি নিরাপদ মনে করিতে পারেন নাই। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি পরিবার-পরিজন ও কিছু সংখ্যক আরব অনুচরসহ মুলতান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী সোলেমান

পর্বতাঞ্চলে চলিয়া যান এবং সেখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করিবার সিদ্ধান্ত করেন। এক আফগান দলপতির সঙ্গে তিনি তাঁহার কন্যার শাদী দেন। এই কন্যার গর্ভে সেই আফগান সর্দারের ঊরসে অনেক সন্তান জন্মগ্রহণ করে। উহাদের মধ্যে দুইজনের নাম ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে। একজনের নাম ছিল লোদী এবং অন্যজনের নাম ছিল শূর। ইহাদের বংশধররাই ইতিহাসে যথাক্রমে লোদী ও শূর নামে পরিচিত।

আমি দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ প্রদেশের অন্তর্গত বুরহানপুর শহরে 'মুত্‌লাওল আনোয়ার' [২] নামক এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ গ্রন্থটি ছিল এক খ্যাতনামা ঐতিহাসিকের লেখা। উহাতে আমি পড়িয়াছি যে, আফগানরা কপ্‌ট্‌স মিশরের ফেরাউনদের জাতি হইতে উদ্ভূত। মুসা যখন বিধর্মী ফেরাউনের উপর বিজয়লাভ করেন এবং ফেরাউন সদলবলে লোহিত সাগরে ডুবিয়া মরে তখন অনেক মিশরবাসী ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা দুর্দান্ত ও একগুঁয়ে প্রকৃতির ছিল তাহারা সত্য ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে। ইহারাই দেশ ত্যাগ করিয়া ভারতে আসিয়া সোলেমানী পর্বতাঞ্চলে বসতি স্থাপন করিয়াছিল এবং আফগান [৩] নামে পরিচিত হইয়াছিল। আবরাহা যখন মক্কা আক্রমণ করিতে গিয়াছিলেন তখন দূর ও নিকটবর্তী দেশগুলি হইতে অনেক কাফের সম্প্রদায়ের লোক তাহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। সেই সময় একদল আফগানও নাকি আবরাহার সেনাবাহিনীতে যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সকলেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

আবদুল্লাহ্‌র সেখানে বসতি স্থাপনের পূর্বেই আফগানরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা নবাগত মুসলমানদের সাদরে গ্রহণ করে। এই অঞ্চলে

---

২ ফিরিশ্‌তা যেসব ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে তাঁহার ইতিহাসের মালমসল্লা সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাদের তালিকায় এই গ্রন্থের স্থান নাই। তালিকা বহির্ভূত এইরূপ আরও অনেক গ্রন্থের উল্লেখ ফেরিশ্‌তার ইতিহাসে পাওয়া যায়। 'মুত্‌লাওল আনোয়ার' নামে কোন গ্রন্থ আমি খুঁজিয়া পাই নাই। ঐ মূল গ্রন্থে নিশ্চয়ই এই বিষয় বিষদভাবে বর্ণিত আছে এবং সেখান হইতেই ইহুদীদের মিশর ত্যাগের পর নানা দিকে ছড়াইয়া পড়িবার ধারণা গ্রহণ করা হইয়াছে।

৩ এখানে নিশ্চয়ই সেইসব বিধর্মী মিশরীয়দের কথা বলা হইয়াছে যাহারা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে নাই।

বসতি স্থাপনের পর মুসলমানদের দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়। তাহাদের মেষ ও পশুপাল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কৃষিকার্যের অভূতপূর্ব উন্নতি সাধিত হয়। কয়েক বৎসর পর মুহাম্মদ কাশিম কর্তৃক সিন্ধু ও মুলতান আক্রমণের পর তাহার অনুচরদের মধ্যে যাহারা সেখানে রহিয়া গিয়াছিল, আফগানরাই তাহাদিগকে আশ্রয়দান করিয়াছিল। ৬৬ হিজরীতে (৬৮২ খ্রীঃ) আফগানরা পর্বত হইতে নির্গত হইয়া কার্মান, শিবুরান ও পেশোয়ারের বসতিপূর্ণ এলাকায় হানা দিয়া লুটপাট ও ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইতে আরম্ভ করে। ইহাদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য লাহোরের রাজা তাহাদের বিরুদ্ধে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু আফগানদের হাতে তাহাদের শোচনীয় পরাজয় ঘটে। লাহোর-রাজের[৪] আত্মীয় আজমীর-রাজ লুণ্ঠনকারীদের বিতাড়িত করিবার জন্য দ্বিতীয়বার চেষ্টা করিবার জন্য তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করেন এবং লাহোরের রাজার সাহায্যার্থে আজমীর-রাজ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের পরিচালনাধেনে ২,০০০ অশ্বারোহী ও ৫,০০০ পদাতিক সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন।

আফগানরাও খালিজ ঘুর ও কাবুল হইতে চার হাজারের মত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হয়। পরবর্তী পাঁচ মাসে এই দুই বাহিনীর মধ্যে ৭০টি সংঘর্ষ হয়। শেষে প্রচণ্ড শীতের জন্য ভারতীয় বাহিনী লাহোরে ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হয়। পথে তাহাদিগকে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে হইয়াছিল। পর বৎসর ভারতীয়রা বসন্তকালে পুনরায় পূর্ব সেনাপতির পরিচালনাধীনে আফগানদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। পেশোয়ার ও মধ্যবর্তী সমতল ভূমিতে উভয়-বাহিনী শক্তি পরীক্ষার জন্য পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এবারও কয়েকটি সংঘর্ষ হইল। কিন্তু কোন পক্ষ চূড়ান্ত জয়লাভ দাবী করিতে পারিল না। শেষে বর্ষাকাল আসন্ন দেখিয়া ভারতীয়রা আফগানদের উপর সাময়িকভাবে যেটুকু সুবিধা অর্জন করিয়াছিল, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া এবং উহাকেই কাজে লাগাইয়া নিলাব নদী পারোপযোগী থাকিতেই দ্রুতগতিতে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদাপসরণ করিয়া আসে। বর্ষার অসুবিধার কথা বিবেচনা করিয়া মুসমানরাও তাহাদের অঞ্চলের অভ্যন্তরে সরিয়া যায়। এই সময় গোক্ষরদের[৫]

৪ এই গ্রন্থের সর্বত্র রায় ও রাজা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

৫ গোক্ষর সম্প্রদায়ের কথা এল্‌ফিনস্টোন উল্লেখ করিয়াছেন এবং কাবুল হইতে ফিরিবার পথে তিনি পাঞ্জাবে তাহাদিগকে দেখিয়া আসিয়াছেন।

সঙ্গে লাহোরের রাজার বিরোধ বাধে। তখন গোক্করা আফগানের সঙ্গে পরস্পরকে সাহায্য করিবার চুক্তিতে মিত্রতা স্থাপন করে। ফলে ভীত হইয়া লাহোর-রাজ গোক্করদের দাবীর নিকট নতি স্বীকার করেন। তাহা না হইলে লাহোরের রাজাই গোক্করদিগকে তাহার শর্ত মানিয়া লইতে বাধ্য করিতেন।

গোক্করদের সঙ্গে লাহোর-রাজের যে সন্ধি হয় তাহাতে গোক্করদিগকে কয়েকটি এলাকা চিরতরে হস্তান্তর করিতে হয় এবং আফগানরা লামঘান অঞ্চলে যে সমস্ত খিলজী সম্প্রদায়ের লোককে বসবাস করিতে দিয়াছিল, লাহোর-রাজ তাহাদিগকেও কতকগুলি অঞ্চল ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইয়াছিল। গোক্করদের সঙ্গে লাহোর-রাজের অবশ্য গোপনে আর একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, অতঃপর গোক্করা মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে ভারত সীমান্ত রক্ষা করিবে। ইহা সত্ত্বেও আফগানরা তাহাদের আক্রমণ ও লুণ্ঠন কার্য অব্যাহত রাখে এবং পেশোয়ার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সেখানে পাহাড়ের মধ্যে একটি দুর্গ নির্মাণ করিয়া উহাকে খাইবার নামে অভিহিত করে। এই সঙ্গে তাহারা রোহ্ প্রদেশও অধিকার করিয়া লয়। এই প্রদেশ উত্তর দিকে সোয়াদ ও বিজোর হইতে দক্ষিণে সিন্ধু এলাকার ভাক্কারের নিকটবর্তী শিউই পর্যন্ত এবং পূর্বে হাছান আবদাল হইতে পশ্চিমে কাবুল ও কান্দাহার পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

সামানী সুলতানের রাজত্বকালে আফগান অঞ্চল মুলতান ও লাহোর রাজ্যের মধ্যে প্রতিবন্ধক অঞ্চলরূপে অবস্থান করিত। এই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে, সামানীরা সর্বদাই সিন্ধু ও থাট্টা পর্যন্ত তাহাদের লুণ্ঠন-অভিযান সীমাবদ্ধ রাখিয়াছে। আলপ্তগীন গজনীর শাসনভার প্রাপ্ত হইবার পর তাঁহার সেনাপতি সুবুক্তগীন আফগানদের প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করিয়া পুনঃ পুনঃ মুলতান ও লামঘান প্রদেশ আক্রমণ করিয়া অধিবাসীদিগকে গোলাম রূপে বন্দী করিয়া আনে। লাহোরের রাজা জয়পাল বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদের পক্ষে উত্তরাঞ্চলের প্রচণ্ড শীত সহ্য করিয়া আক্রমণকারীদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা সম্ভবপর নয়। সেইজন্য তিনি ভাটিয়ার[৬] রাজার মধ্যস্থতায় আফগান সর্দার শেখ হামিদকে পক্ষে আনিলেন। শেখ হামিদকে মুলতান ও লামঘানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং শেখ হামিদ মুলতান ও লামঘানের দুর্গে আফগান সৈন্যদল রাখিলেন।

৬ তিনি ছিলেন জয়পালের অন্যতম অধীনস্থ করদরাজা। তাহার রাজধানীর নাম ছিল ভাটানিয়ার। ইহাকেই এরোস্থিত বলিয়াছেন বুলনিয়ার।

এই সময় হইতেই আফগানদের মধ্যে সামরিক দলপতির সৃষ্টি হয়। আলপ্তগীনের মৃত্যুর পর সুবুক্তগীন তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তখন শেখ বুঝিলেন যে সুবুক্তগীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ আসন্ন এবং তিনি আরও বুঝিলেন সেই আক্রমণে তাঁহার এলাকাই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। এই কথা চিন্তা করিয়া শেখ হামিদ সুবুক্তগীনের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন।

সুবুক্তগীন সর্বপ্রযত্নে শেখ হামিদের এলাকা এড়াইয়া চলিবার নীতি মানিয়া চলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মাহমুদ এই নীতি অমান্য করিয়া আফগানদের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ শুরু করিয়া দেন এবং যাহারা তাহার প্রভুত্ব মানিয়া চলিতে অস্বীকার করে তাহাদের সকলকে নির্মূল করেন। এই প্রকারে তিনি শেষ পর্যন্ত আফগান সম্প্রদায়ের সকলকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

প্রথম অধ্যায়

লাহোরের গজনভী সুলতানদের ইতিহাস

আমীর নাসির-উদ-দীন সুবুক্তগীন

[নাসির-উদ-দীন সুবুক্তগীন সামানী বংশ শাসিত বোখারা রাজ্যের অধীনে গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন। পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে সুবুক্তগীন যুদ্ধ করেন। শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। জয়পাল মুসলমান দুতকে কারারুদ্ধ করেন। পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লামঘানের যুদ্ধে হিন্দুরা পরাস্ত হয় এবং তাহাদিগকে সিন্ধু পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যাওয়া হয়। বোখারার সামানী অধিপতি আবুল মনসুর মারা যান। তাঁহার পুত্র নুহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অন্যতম সেনাধ্যক্ষ ফাইক বিদ্রোহ করে। তাঁহাকে বাধাদানের জন্য সুবুক্তগীন বোখারার সুলতানের সঙ্গে মিলিত হন। ফাইক খোরাসানের শাসনকর্তা বু-আলি হাসান বিন-সানজার এবং জর্জানের ফখর-উদ্-দৌলা দেলিমীকে মিত্ররূপে প্রাপ্ত হন। ফাইক ও তাঁহার মিত্ররা বোখারার রাজা ও সুবুক্তগীনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন, কিন্তু ফাইক পরাজিত হন। সুবুক্তগীনের পুত্র মাহমুদকে নিশাপুরে রাখা হয়। ফাইক ও তাঁহার মিত্ররা মাহমুদকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহার পিতার আগমনে পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা পান। ফাইক সিস্তানের অন্তর্গত কিলাতে পলাইয়া যান। সুবুক্তগীনের মৃত্যু। তাঁহার চরিত্র।]

সুবুক্তগীন বোখারার সামানী সুলতানের অধীনে গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। প্রথমে সন্ধি দ্বারা যুদ্ধের অবসান হয়। জয়পাল মুসলমান দুতদের আটক রাখায় পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হয়। লামঘানের যুদ্ধে হিন্দুদের পরাজয় ঘটে এবং মুসলমানরা সিন্ধু নদীর তীর পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। বোখারার সুলতান আবুল মনসুর সামানীর মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নুহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফায়েক নামক এক সেনাপতি বিদ্রোহ ঘোষণা করায় তাহাকে দমন করিবার জন্য সুবুক্তগীন বোখারার সুলতানের পক্ষাবলম্বন করেন। খোরাসানের শাসনকর্তা বুয়ালী হাসান-বিন-সানজার ও জর্জানের শাসনকর্তা যাবার-উদ-দৌলা দেলিমী

ফায়েককে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হন। ফাইক ও তাহার মিত্ররা বোখারার সুলতান ও সুবুক্তগীনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। কিন্তু যুদ্ধে তাহাদের পরাজয় ঘটে। সুবুক্তগীনের পুত্র মাহমুদকে নিশাপুরে রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল। ফায়েক ও তাহার মিত্ররা মাহমুদকে তথায় আক্রমণ করে। কিন্তু সময়মত সুবুক্তীগনের উপস্থিতিতে মাহমুদ পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা পান। ফায়েক সিস্তানের অন্তর্গত কিলাত নামক স্থানে পলাইয়া যান। সুবুক্তগীন কখনও সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন নাই এবং পাঞ্জাবের কোন এলাকার উপরও স্বীয় অধিকার বিস্তার করেন নাই। অথচ সকল ঐতিহাসিকই লাহোরের সুলতানদের মধ্যে সুবুক্তগীনকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। ঐতিহাসিকদের মতে আমীর সুবুক্তগীন জাতিতে তুর্কী ছিলেন এবং পরে তিনি নাসির-উদ-দীন উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। আলপ্তগীন তাঁহার অন্যান্য ক্রীতদাসদের সঙ্গে সুবুক্তগীনেরও বিদ্যা ও অস্ত্রশিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সামানী বংশের[১] রাজত্বকালে আলপ্তগীন খোরাসানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। গজনীর শাসনকর্তা-রূপে তিনি এমন সুখ্যাতি অর্জন করেন যে সুলতান আবদুল মালিক সামানীর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী নির্বাচন ব্যাপারে ওমরাহগণ তাঁহার মতামত গ্রহণের প্রয়োজনীয়নতা বোধ করিয়া তাহার নিকট লোক প্রেরণ করিয়াছিলেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক শাহজাদা আবুল মনসুরের সিংহাসনারোহণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে আলপ্তগীন দ্বিধাবোধ করেন নাই। তিনি সুপারিশ করিয়াছিলেন যে, শাহজাদার বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহার চাচা শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। কিন্তু তাঁহার সুপারিশ পৌঁছিবার পূর্বেই দরবারের একদল প্রধান ব্যক্তি মনসুরকে তখ্‌তে উপবেশন করান। ইহাতে আলপ্তগীন নূতন সুলতানের বিরাগভাজন হওয়ার আশঙ্কা পোষণ করিতে থাকেন। ফলে শিশু সুলতান যখন পরে আলপ্তগীনকে রাজধানীতে তলব করেন, তখন প্রাণনাশের আশঙ্কায় তিনি নানা অজুহাত দর্শাইয়া সুলতান সমীপে হাজির হইতে বিরত থাকেন। ৩৫১ হিজরীতে (৯৬২ খ্রীঃ) তিনি প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং গজনী অধিকার করিয়া সেখানে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

---

১ এই বংশ ট্রান্স্ অকসিয়ানায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিত। তাঁহাদের রাজধানী ছিল বোখারায়। খারিজম, মা-উরাউন্নাহার, জুর্জান, খোরাসান, সিসস্তান ও গজনী তাঁহাদের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

রাজ্যের একাংশ এইরূপে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সংবাদ পাইয়া সুলতান মনসুর ইব্রাহীম সানজারের পুত্র আবুল হাসান মুহাম্মদ তুর্কীর উপর খোরাসানের শাসনভার ন্যস্ত করেন এবং আলপ্তগীনকে দমন করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে দুইবার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কিন্তু দুইবারই তাহাদের পরাজয় ঘটে।

আহমদ উল্লাহ্ মুস্তাফীর ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, আলপ্তগীন ১৫ বৎসর কাল স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিয়া গজনী শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার সেনাপতি সুবুক্তগীন পুনঃ পুনঃ ভারতীয়দের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া প্রতিবারই তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ৩৬৫ হিজরীতে (৯৭৫ খ্রীঃ) আলপ্ত-গীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আবু ইসাহাক সুবুক্তগীনের সঙ্গে বোখারায় গমন করেন। বোখারাধিপতি মনসুর আবু ইসহাককে গজনীর শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করিয়া সুবুক্তগীনকে তাঁহার সহ-শাসনকর্তা হিসাবে কার্য করিবার আদেশ দেন। অধিকন্তু সুলতান আরও স্থির করিয়া দেন যে, ভবিষ্যতে আবু ইসাহাকের পরে সুবুক্তগীন হইবেন গজনীর শাসনকর্তা। এই ঘটনার অল্পকাল পরেই আবু ইসাহাক ইন্তেকাল করেন। তখন গজনীর প্রধান ব্যক্তিরা এক বাক্যে সুবুক্তগীনকে গজনীর সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন (৩৬৭ হিঃ, ৯৭৭ খ্রীঃ)। এই সময়েই তিনি আলপ্তগীনের কন্যার পানি গ্রহণ করেন। তিনি শাসনকার্যে ন্যায় নীতি অনুসরণ করিয়া অতিশীঘ্র সর্বশ্রেণীর জনগণের হৃদয় জয় করিতে সমর্থ হন।

মিনহাজ-উস-সিরাজ জুর্জানী সুবুক্তগীনের প্রথম জীবন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা হইলঃ বালকাবস্থায় নসর হাজী নামক এক সওদাগর তাঁহাকে ক্রয় করিয়া তুর্কীস্তান হইতে বোখারায় লইয়া যান এবং তথায় আলপ্তগীনের নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করেন। আলপ্তগীন তাঁহার মধ্যে ভবিষ্যতে মহান ব্যক্তি হইবার লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিয়া তাঁহাকে ক্রমশঃ অধিকতর আস্থা ও দায়িত্বশীল পদে উন্নীত করিতে থাকেন। তিনি যখন নিজেকে গজনীতে স্বাধীন সুলতান রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন তখন তিনি সুবুক্তগীনকে আমীরুল ওমরাহের মর্যাদা প্রদান করেন এবং তাঁহাকে উকিল-ই-মুতলক বা প্রতিনিধি উপাধি প্রদান করেন। সুবুক্তগীনকে অনেকেই ইয়াযদিগারদের (শেষ পারস্য সম্রাট) বংশধর বলিয়াছেন। খলিফা হজরত ওসমানের সময় মুসলমানদের ভয়ে পলায়ন কালে মার্ভ শহরের নিকটে তিনি নিহত হন। তাঁহার পরিবার পরিজন

তুর্কীস্থানেই রাখিয়া যান এবং তুর্কীদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া তাহাদের মধ্যে স্থায়িভাবে বসবাস করেন। ইহাদের বংশধররা কালক্রমে তুর্কী জাতিতেই পরিণত হয়।

সুবুক্তগীনের বংশপঞ্জী হইল: পারস্য রাজ ইয়ায্‌দিগারদের পুত্র ফিরোজ, ফিরোজের পুত্র কাজিল-আরসালান, তাহার পুত্র কাজিল হাকাম, তস্য পুত্র জুকান এবং জুকানের পুত্র সুবুক্তগীন।[২] রাজদণ্ড ধারণ করিবার অব্যবহিত পরেই সুবুক্তগীন গজনী সীমান্তে তোগান নামক এক স্বাধীন সর্দারের হস্তে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে পার্শ্ববর্তী রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হওয়ার পর তোগানকে গজনী রাজ্যের সীমান্তে একটি এলাকায় প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছিল। শর্ত ছিল তিনি গজনী সুলতানের অধীনে ঐ এলাকা শাসন করিবেন। কিন্তু তোগান গজনীর আনুগত্য যথাযথ মানিয়া চলে নাই। সুবুক্তগীন তাঁহার রাজ্য পরিদর্শন করিতে বাহির হইয়া তোগানের এলাকায় যাইয়া উপস্থিত হন। সেখানে অবস্থানকালে তিনি তোগানকে পাশা খেলায় আমন্ত্রণ করেন। খেলার সময় নির্জনে পাইয়া সুবুক্তগীন তাঁহাকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্য তিরস্কার করেন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া তোগান তলোয়ারে হাত দেন। তখন আত্মরক্ষার জন্য সুবুক্তগীনও তাঁহার তলোয়ার নিষ্কাশিত করেন এবং দুই জনের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ লাগিয়া যায়। সুবুক্তগীন হাতে আঘাত পান। সুবুক্তগীন ও তোগানের দেহরক্ষীরাও ঘটনাস্থলে প্রবেশ করিয়া পরস্পরকে আক্রমণ করে এবং এক তুমুল লড়াই আরম্ভ হয়। তোগান পরাস্ত হইয়া হইয়া পলায়ন করেন এবং শেষে বুস্টের[৩] দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুবুক্তগীন পরে এই দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। কিন্তু তোগান ধরা পড়ে না। সে কোন প্রকারে পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করে।

---

২ এই বংশপঞ্জী অনুযায়ী ইয়ায্‌দিগারদের মৃত্যু হইতে সুবুক্তগীন পর্যন্ত মাত্র পাঁচ পুরুষ দেখা যায়। পাঁচ পুরুষ অতিবাহিত হইতে কখনই ৩২০ বৎসর সময় লাগিতে পারে না।

৩ বুস্ট বর্তমানে জাবুলীস্তানের রাজধানী। বুস্ট্র একটি সুরক্ষিত শহর। এই শহরের চতুপার্শ্বস্থ স্থানগুলি উর্বর ও সুন্দর। ভারত ও পারস্যের সীমান্তে অবস্থিত এই শহরের মাধ্যমে উভয় দেশে প্রচুর ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত।

এইখানেই সুবুক্তগীন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী আবুল ফাত্তার সাক্ষাৎ লাভ করেন। তিনি দুর্গের প্রাক্তন মালিকের কর্মসচিব ছিলেন। বিশ্বাসঘাতক তোগানকে আশ্রয় দানের অপরাধে সুবুক্তগীন দুর্গের সেই মালিককে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছিলেন। অতঃপর সুবুক্তগীন আবুল ফাত্তাকে স্বীয় কর্মসচিব মনোনীত করেন। মাহমুদের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাহমুদের অভিযোগের পর তিনি বিরক্ত হইয়া তুর্কীস্তানে চলিয়া যান।

বুস্টের দুর্গ অধিকার করিবার পর সুবুক্তগীন কান্দাহার গমন করিয়া সেই প্রদেশও দখল করেন। কান্দাহারের প্রাক্তন শাসককে বন্দী করা হয় এবং পরে তাঁহাকে মুক্তি দান করিয়া গজনীর অন্যতম কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। সুবুক্তগীন তাঁহার রাজত্বের প্রথম বৎসরের শেষের দিকে ভারতের পৌত্তলিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি কতকগুলি দুর্গ অধিকার করিয়া সেইসব স্থানে মসজিদ নির্মাণ করেন এবং বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া গজনী প্রত্যাবর্তন করেন।

ব্রাহ্মণ বংশীয় হরপালের পুত্র জয়পাল এই সময় দৈর্ঘ্যে সারহিন্দ হইতে লামঘান এবং প্রস্থে কাশ্মীর হইতে মুলতান পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিবার সুবিধার জন্য রাজা জয়পাল বিতুণ্ডা দুর্গে বাস করিতেছিলেন। মুসলমানদের ঘন ঘন ভারতাক্রমণ করিবার প্রবণতা লক্ষ্য করিয়া জয়পাল বুঝিলেন যে ইহাদের শক্তি খর্ব না করিলে দেশে শান্তিতে বসবাস করা যইবে না। তিনি স্থির করিলেন যে, আক্রমণকারীদিগকে তাহাদের দেশে যাইয়াই আক্রমণ করিবেন। এতদুদ্দেশে জয়পাল এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করিলেন এবং অনেক রণহস্তীও সংগ্রহ করিলেন। জয়পালের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া সুবুক্তগীন এক বিরাট সৈন্যবাহিনী ভারতাভিমুখে রওয়ানা করিয়া দিলেন। লামঘান সীমান্তে দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল এবং সামান্য সংঘর্ষও হইল। এই সময় সুবুক্তগীনের বালক পুত্র মাহমুদ অসাধারণ সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। দুই বাহিনী অনেক দিন যাবৎ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া রহিল। কেনো বড় রকমের সংঘর্ষ বাধিল না। এই সময় মাহমুদ শুনিতে পাইলেন যে, জয়পালের শিবিরে একটা প্রস্রবণ আছে যাহাতে কোন প্রকারে কিছু গোময় নিক্ষেপ করিতে পারিলে

প্রলয়কাণ্ড শুরু হইবে। মুহূর্তকাল মধ্যে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হইয়া তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হইবে, মাহমুদ গোপনে সেই প্রস্রবণে গোময় নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা করিলেন। আর অমনি তার প্রতিক্রিয়া শুরু হইল। আকাশ যেন নিম্নে নামিয়া আসিয়া বজ্র বিদ্যুৎ ঝড় ও শিলাবৃষ্টি সহকারে পৃথিবীকে আক্রমণ করিল। চক্ষের নিমেষে দিবস রাত্রিতে পরিণত হইল বহুদূর পর্যন্ত ধ্বংস ও আতঙ্ক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। এই প্রলয়কাণ্ডে অধিকাংশ পশু এবং উভয় পক্ষে কয়েক সহস্র সৈন্য বিনষ্ট হইল। কিন্তু হিন্দুস্তানীদের অপেক্ষা গজনীর সৈনিকরা অধিকতর দুর্ধর্ষ ও কষ্টসহিষ্ণু ছিল বলিয়া তাহাদের লোক ক্ষয় হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক কম হইয়াছিল। প্রভাতে জয়পাল তাঁহার ক্ষতির পরিমাণ দেখিয়া আঁৎকিয়া উঠিলেন। তিনি আরও দেখিলেন যে, তাঁহার সৈনিকদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও মনোবল বলিতে কিছুই নাই। তাঁহার ভয় হইল পাছে সুবুক্তগীন তাহার দুরবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া বসিবে। এই জন্য তিনি কালবিলম্ব না করিয়া সুবুক্তগীনের নিকট শান্তির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন। এই প্রস্তাবে তিনি গজনী সুলতানকে বাৎসরিক কিছু পরিমাণ কর এবং তখনকার মত অনেক হস্তী ও স্বর্ণ উপহার দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।

সুবুক্তগীন এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে যাইতেছিলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মাহমুদের পীড়াপীড়িতে তিনি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিতে বাধ্য হইলেন। জয়পাল সুবুক্তগীনকে ইহা পুনর্বিবেচনা করিতে অনুরোধ জানাইলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতীয়, তথা রাজপুত সৈনিকদের বীরত্বের কথা বলিয়া প্রচ্ছন্নভাবে ভীতিও প্রদর্শন করিলেন। তিনি সুলতানকে জানাইলেন, "নিরুপায় হইলে হিন্দুরা স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে স্বহস্তে বধ করিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ ক'রে এবং তার পরে কেশ পাশ খুলিয়া মৃত্যুকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মাদনায় শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবে।"

জয়পালের উক্তির যথার্থতা উপলব্ধি করিয়া সুবুক্তগীন তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। জয়পাল সুবুক্তগীনকে বহু নগদ অর্থ ও ৫০টি হস্তী প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। শিবিরে সমস্ত অর্থের সংস্থান না হওয়ায় জয়পাল আবেদন জানাইলেন যে," সুবুক্তগীনের কয়েকজন লোক তাঁহার সঙ্গে লাহোর গমন করিয়া

তথায় অবশিষ্ট অর্থ গ্রহণ করিবে। সুবুক্তগীন ইহাতে সম্মত হইলেন। জয়পালের সঙ্গে সুবুক্তগীনের যে লোকগুলি গেল তাহাদের নিরাপত্তার জামিন-স্বরূপ জয়পালকেও তাহার কতিপয় লোককে সুবুক্তগীনের নিকট রাখিয়া যাইতে হইল। লাহোর পৌঁছিয়া জয়পাল তাঁহার মত বদলাইলেন। তিনি দেখিলেন যে সুবুক্তগীন ততক্ষণে গজনী যাইয়া পৌঁছিয়াছেন, সুতরাং তাহার দিক হইতে তখনকার মত আর কোন আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার ব্রাহ্মণ উপদেষ্টাগণও তাঁহাকে অঙ্গীকৃত অর্থ প্রদান করিতে নিষেধ করিলেন। অর্থ গ্রহণ করিতে যে-সব গজনীর লোক আসিয়াছিল জয়পাল তাহাদিগকে আটক করিলেন।

তৎকালে রাজাদের মধ্যে প্রথা ছিল যে কোন গুরুতর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দিলে রাজা সমসংখ্যক ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ প্রধানদের এক পরামর্শ-সভা আহ্বান করিতেন। এই সভায় ব্রাহ্মণরা রাজার দক্ষিণ পার্শ্বে এবং ক্ষত্রিয়রা রাজার বাম পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিতেন। সুবুক্তগীনকে প্রতিশ্রুত অর্থ ও উপহার প্রদানের প্রশ্নে রাজা জয়পাল অনুরূপ সভা আহ্বান করিয়াছিলেন। জয়পাল সুবুক্তগীনকে অর্থ প্রদান না করিবার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন ক্ষত্রিয়রা তাঁহাকে উহার মারাত্মক পরিণতির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছিলেন। তাহারা বলিয়াছিলেন, "সৈনিকেরা কখনও শত্রুর অস্ত্রের বিভীষিকার কথা বিস্মৃত হয় নাই। প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিলে সুবুক্তগীন কখনই সে অপমান নীরবে সহ্য করিবে না। তিনি নিশ্চয়ই ইহার ভয়াবহ প্রতিশোধ গ্রহণ করিবেন।" তাহারা রাজাকে সন্ধির শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন—যাহাতে প্রজারা যুদ্ধের বিভীষিকা হইতে মুক্ত হইয়া সুখে শান্তিতে বাস করিতে পারে। কিন্তু রাজা তাহাদের কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

সুবুক্তগীন যখন শুনিলেন যে রাজা জয়পাল প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান তো করেনই নাই, উপরন্তু তাঁহার কর্মচারীদিগকে আটক করিয়াছেন, তখন তিনি ফেনিল বন্যা স্রোতের ন্যায় স্বসৈন্যে ভারতাভিমুখে ধাবিত হইলেন। জয়পালও তাঁহার সেনাদল সজ্ঘবদ্ধ করিয়া শত্রুর মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হইলেন। এই সময় প্রতিবেশী রাজারা বিশেষভাবে আজমীর, কালিঞ্জর ও কনৌজের রাজারা সৈন্য ও অর্থ দ্বারা জয়পালকে সাহায্য করিয়াছিলেন। এই মিত্রপক্ষীয় সৈন্যরা পাঞ্জাবে জয়পালের সেনাবাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইবার পর এক লক্ষ অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠিত হয়।

লামঘান সীমান্তে দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়। সুবুক্তগীন এই সময় শত্রু বাহিনী দর্শন করিবার জন্য পাহাড়ে আরোহণ করিয়াছিলেন। বিশাল হিন্দু বাহিনী তাঁহার নিকট সমুদ্রের মত অসীম এবং পিপীলিকা ও পঙ্গপালের মত গণনাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হইল। কিন্তু সুবুক্তগীনের মনোবল একটুও ক্ষুণ্ণ হইল না। বিশাল শত্রু-সেনাদল তাঁহার নিকট মেষ পালের মতই মনে হইল এবং শার্দুলের ন্যায় উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িবার জন্য তিনি উন্মত্ত হইলেন। তিনি সৈন্যদলকে একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করিতে উদ্বুদ্ধ করিলেন। তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বেশী ছিল না। এই স্বল্প সংখ্যক সৈন্যকে প্রতি পাঁচশত সৈন্যের এক একটি দলে বিভক্ত করিলেন। তিনি এই দলগুলিকে শত্রু ব্যূহের একই স্থানে পুনঃ পুনঃ পালাক্রমে আঘাত হানিবার নির্দেশ দান করিলেন যাহাতে শত্রু সৈন্যকে ক্ষণে ক্ষণে নূতন ফৌজের মোকাবিলা করিতে হয়।

গজনী বাহিনীর অশ্ব অপেক্ষা হিন্দুদের অশ্বগুলি ছিল অনেক দুর্বল ও নিকৃষ্ট শ্রেণীর। ফলে গজনীর অশ্বারোহী বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণে ও পূর্বোল্লিখিত রণকৌশলের বিভীষিকায় বিভ্রান্ত হইয়া হিন্দু বাহিনী পিছু হটিতে লাগিল। শত্রুদলে বিশৃঙ্খলার লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিয়া সুবুক্তগীন সর্বাত্মক আক্রমণের নির্দেশ দিলেন। হিন্দুরা সমরক্ষেত্রের সর্বস্থানেই পরাজিত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। মুসলমানেরা নিলাব নদীর তীর পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের অসংখ্য সৈনিককে হত্যা করে। এই যুদ্ধজয়ে সুবুক্তগীন অপরিমিত সম্পদ ও অভূতপূর্ব যশের অধিকারী হইয়াছিলেন। শত্রু শিবিরে পরিত্যক্ত বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য তাঁহার হাতে পড়িয়াছিল। তদুপরি নিলাব নদীর পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত অঞ্চল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয় এবং লামঘান ও পেশোয়ার হইতে তিনি প্রচুর কর প্রাপ্ত হন।

আফগান ও খিলজী সম্প্রদায়ের যে-সব লোক পর্বতাঞ্চলে বাস করিত, সুবুক্তগীনের বশ্যতা স্বীকারের শপথ গ্রহণের পর তাহাদের অনেককেই গজনীর সেনাবাহিনীতে গ্রহণ করা হইল। অতঃপর সুবুক্তগীন বিজয়গর্বে গজনী প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময় বোখারাধিপতি আবুল মনসুরের মৃত্যুর পর তাহার পুত্র নুহ সামানী বংশের ষষ্ঠ সুলতানরূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ফাইক নামক এক

বিদ্রোহী সর্দারকে দমন করিবার জন্য বোখারার সুলতান সুবুক্তগীনের সাহায্য প্রার্থনা করিয়া আবুল নসর ফারসীকে গজনী প্রেরণ করেন। সামানী পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হইয়া সুবুক্তগীন অবিলম্বে সসৈন্যে মা-উরা-উন্নাহার অভিমুখে ধাবিত হন। তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য নূহ-সুরুখ্‌স্‌ প্রদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসেন। সুবুক্তগীন দূত মারফত নূহকে অনুরোধ জানাইয়াছিলেন যে বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতার জন্য সাক্ষাৎকালে তিনি অশ্বাবতরণ করিতে অসমর্থ হইলে যেন কোন অপরাধ গ্রহণ করা না হয়। কিন্তু সাক্ষাৎকালে তরুণ সুলতানের মুখে সামানী রাজবংশের দীপ্তি প্রতিভাত হইতে দেখিয়া সুবুক্তগীন তাঁহার রাজভক্তির আবেগ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। তিনি অশ্ব হইতে লাফাইয়া নামিয়া শাহজাদার রেকাব চুম্বন করিবার জন্য ছুটিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া তরুণ সুলতান অশ্ব হইতে দ্রুত অবতরণ করিয়া রেকাব চুম্বন করিবার পূর্বেই সুবুক্তগীনকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিলেন।

সামরিক অভিযানের প্রতিকূলে তখন শীত ঋতু অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছিল। এজন্য স্থির হইল শীতকালে সুবুক্তগীন গজনী প্রত্যাবর্তন করিবেন। যথাবিধি সম্মানসূচক খেলাৎ প্রদান করিবার পর আমীর নূহ বোখারায় ফিরিয়া গেলেন। বুয়ালী-হাসান-বিন সানজার খোরাসানের কিয়দংশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং বোখারার সুলতানের বিরুদ্ধে ফাইককে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। আমীর নূহ ও সুবুক্তগীনের মধ্যে মিত্রতা স্থাপনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিদ্রোহীকে সাহায্য করার সম্ভাব্য পরিণতির কথা ভাবিয়া চিন্তিত হইলেন। ভাগ্য অপ্রসন্ন হইলে কোথায় আশ্রয় পাইবেন সেই বিষয় তিনি তাঁহার পরিষদবর্গের সঙ্গে আলোচনা করিলেন এবং স্থির হইল যে, তাঁহাকে জুর্জানের[৪] অধিপতি ফখর-উদ-দৌলা দেলিমীর সঙ্গে মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হইতে হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি জাফর জুলকারনাইন নামক এক ব্যক্তিকে খোরাসান ও তুর্কীস্তানের বহুমূল্য ও আজব উপহার দ্রব্যসহ জুর্জানে পাঠাইলেন। এই প্রকারে দুই শাসকের মধ্যে এক মিত্রতা চুক্তি সম্পাদিত হইল।

৪ জুর্জান—খোরাসানের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ।

সুবুক্তগীন ইতিমধ্যে তাঁহার সেনাদল রওয়ানা করিয়া দিয়া বল্‌খে[৫] আসিয়া পৌঁছিলেন। আমীর নুহ বোখারার সেনাবাহিনী লইয়া সেখানে আসিয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। এই সংযোগ স্থাপনের সংবাদ পাইয়া ফাইক ও বুয়ালী হাসান ফখর-উদ-দৌলার সেনাপতি দারার সঙ্গে মিলিত হইয়া হিরাট হইতে বাধাদানের জন্য রওয়ানা হইলেন। এক বিশাল প্রান্তরে শিবির স্থাপন করিয়া সুবুক্তগীন শত্রুর আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুবাহিনী শীঘ্রই দৃষ্টিসীমার মধ্যে আসিয়া পড়িল। সুবুক্তগীন তাঁহার সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করিয়া নিজে কেন্দ্রস্থলে স্থান গ্রহণ করিলেন। পুত্র মাহমুদ ও বোখারার তরুণ সুলতান তাঁহার সঙ্গে ছিলেন।

বিদ্রোহী বাহিনী এমন বিক্রমের সঙ্গে সুলতানের ফৌজকে আক্রমণ করিল যে সুবুক্তগীনের বাহিনীর উভয় পার্শ্ব পিছু হটিতে শুরু করিল এবং পরাজয়ের লক্ষণ প্রায় পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। সেই সঙ্কট মুহূর্তে ফখর-উদ-দৌলার সেনাপতি অশ্ব ছুটাইয়া সুবুক্তগীনের নিকট আসিয়া তাঁহার বর্ম পৃষ্ঠদেশে স্থাপন (বন্ধুত্বের ইঙ্গিত) করিয়া সুবুক্তগীনের দলে যোগদান করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। তারপর তিনি তাঁহার অনুচরবর্গসহ সুবুক্তগীনের দলে আসিয়া যোগদান করিয়া তাঁহার প্রাক্তন বন্ধুত্বের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইলেন। এই সময় শত্রুপক্ষে যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইল তাহারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া সুবুক্তগীন শত্রু বাহিনীকে প্রচণ্ড আঘাত হানিয়া পিছু হটাইয়া দিলেন। পলায়নকালে পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের বহু লোককে হত্যা করা হইল এবং অনেক লোক বন্দী হইল। এইভাবে হতভাগ্য ফাইক তাঁহার মালিকের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করিয়া ইজ্জত ও দৌলৎ উভয়ই খোয়াইলেন। তাঁহার যে ঐশ্বর্য ছিল উহার দশমাংশ দ্বারা তিনি সুখেস্বচ্ছন্দে শান-শওকতের সঙ্গে জীবিকা নির্বাহ করিতে পারিতেন। ফাইক ও বুয়ালী হাসান নিশাপুরের[৬] পথে পলায়ন করেন। এই স্মরণীয় বিজয় লাভের পর সুবুক্তগীন বোখারার সুলতানের নিকট হইতে নাসির-উদ-দীন (ধর্মবীর) এবং তাঁহার পুত্র মাহমুদ সাইফ-উদ-দৌলা (রাষ্ট্রের অসি) উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

৫ বল্‌খ আক্সাস বা আমু দরিয়ার নিকটে এবং বোখারার পশ্চিমে অবস্থিত এক প্রাচীন বড় শহর।

৬ নিশাপুর এখনও একটি জনবহুল বৃহৎ শহর। সর্বপ্রকার রেশমী বস্ত্র ও কার্পেটের জন্য এই শহর প্রসিদ্ধ।

আমীর নূহ বোখারায় চলিয়া গেলেন এবং সুবুক্তগীন ও তাঁহার পুত্র মাহমুদ নিশাপুর চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের আগমন সংবাদ পাইয়া ফাইক ও বুয়ালী নিশাপুর ত্যাগ করিয়া জুর্জানে পলাইয়া যাইয়া ফখর-উদ-দৌলার শরণাপন্ন হইলেন। এইরূপে দেশ শত্রুমুক্ত করিয়া সুবুক্তগীন গজনী ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার পুত্র মাহমুদ অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া নিশাপুরেই রহিয়া গেলেন। এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ফাইক ও বুয়ালী হাসান তাঁহাদের সৈন্য-দল সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া সুলতান কিংবা তাঁহার পিতার নিকট হইতে সাহায্য পৌঁছিবার পুর্বেই তাঁহারা আসিয়া মাহমুদকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। মাহমুদ পরাস্ত হইলেন এবং সর্বস্ব হারাইলেন।

পুত্রের বিপজ্জনক পরিস্থিতির সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সুবুক্তগীন উর্ধ্বশ্বাসে নিশাপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। পথে ফাইকের ফৌজের সঙ্গে সাক্ষাৎ মাত্রই আক্রমণ করিয়া বসেন। প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এমন সময় বুয়ালী হাসানের সেনাবাহিনীর পশ্চাতে সহসা ধুলি উড়িতে দেখা গেল। ইহা নিঃসন্দেহে মাহমুদের আগমন বার্তা ঘোষণা করিল। ফাইক ও হাসান প্রমাদ গণিলেন। তাঁহারা ভাবিলেন যে তাহাদের পরিবেষ্টিত হইতে আর দেরী নাই। তখন তাঁহারা মরিয়া হইয়া সুবুক্তগীনের উপর এক ব্যর্থ চাপ দিল। সেই মুহূর্তেই মাহমুদ ক্রুদ্ধ সিংহের মত তাহাদের উপর ঝাপাইয়া পড়িলেন। এই প্রচণ্ড আক্রমণের বেগ রোধ করিতে না পারিয়া রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলেন এবং কিলাতের দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

এই জয়লাভের পর সুবুক্তগীন কিছুকাল বল্‌খে শান্তি ও নিরিবিলিতে বাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু এক বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটিতে থাকে। ঔষধে কোন ফলোদয় না হওয়ায় তিনি হাওয়া বদলাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তদনুযায়ী তিনি গজনীর পথে রওয়ানা হন। কিন্তু তরমুজে পৌঁছিতেই তিনি এমন দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে তাহাকে সেখানেই থামিতে হইল। ৩৮৭ হিজরীর সাবান মাসে (খ্রীঃ ৯৯৭—আগস্ট) তিনি তিরমিজে ইন্তেকাল করেন। দাফনের জন্য তাহার লাশ বহন করিয়া গজনী লইয়া যাওয়া হয়।

সুবুক্তগীন অসাধারণ সাহসী ও চরিত্রবান নরপতি ছিলেন এবং কুড়ি বৎসর যাবৎ তিনি বিজ্ঞভাবে ন্যায় ও নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করিয়া প্রজা শাসন

করিয়াছেন। ৫৬ বৎসর বয়সে তাহার জীবনাবসান ঘটিয়াছিল। তাঁহার বংশের ১৪ জন সুলতান তাঁহার পরে গজনী ও লাহোরে রাজত্ব করেন। উজির আবুল আব্বাছ ফাজিল-বিন আহমদ ইস্‌পাহানী সেকালের একজন শ্রেষ্ঠ উজির হিসাবে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। সামরিক ও বেসামরিক সর্ববিষয়ে শাসন কার্যে তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

জামা-উল-হিকাইতের লেখক বলেন যে, সুবুক্তগীন প্রথমে আলপ্তগীনের অধীনে একজন সামান্য ঘোর-সওয়ার ছিলেন এবং তেজস্বী কর্মঠ প্রকৃতির লোক হিসাবে প্রায়ই বনজঙ্গলে শিকার করিয়া বেড়াইতেন। একদা শিকার কালে শাবকসহ এক হরিণীকে চড়িতে দেখিয়া তিনি অশ্ব ছুটাইয়া কোন প্রকারে হরিণ শাবকটিকে ধরিয়া ফেলেন এবং উহার পা বাঁধিয়া ঘোড়ায় উঠাইয়া গৃহাভিমুখে রওয়ানা হন। কিছুদূর চলিয়া আসিবার পর তিনি পিছু ফিরিয়া দেখেন যে হরিণীটি তাঁহাকে অনুসরণ করিতেছে এবং তাঁহার চক্ষে অসহনীয় ব্যথার এক করুণ ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুবুক্তগীনের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইল। তিনি বন্ধন খুলিয়া হরিণ শাবকটিকে ছাড়িয়া দিলেন। সে নাচিতে নাচিতে মাতার নিকট ফিরিয়া গেল। প্রসন্ন মাতা তাহার সন্তানকে লইয়া বনের দিকে ফিরিল এবং যাইবার সময় বার বার সুবুক্তগীনের দিকে মুখ ফিরাইয়া তাকাইতে লাগিল। কথিত আছে, সেই রাত্রে সুবুক্তগীন রাছুলাল্লার (সঃ) সাক্ষাৎ লাভ করেন। রসুলুল্লাহ (সঃ) তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তুমি আজ এক ব্যথাতুর প্রাণীর প্রতি যে করুণা প্রদর্শন করিয়াছ তাহাতে আল্লাহ্‌তায়ালা তোমার উপর প্রসন্ন হইয়া তোমাকে গজনীর সুলতানাত মঞ্জুর করিয়াছেন। কিন্তু লক্ষ্য রাখিবে ক্ষমতা হাতে পাইয়া যেন তোমার মানসিক পরিবর্তন না ঘটে। বন্য পশুর প্রতি যে করুণা প্রদর্শন করিয়াছ ততোধিক করুণা সহকারে আল্লার বান্দাকে যেন পালন করিতে পারো।" মাছির-উল-মুলকে বর্ণিত আছে যে, গজনী শহরের উপকণ্ঠে এক মনোরম উদ্যানে মাহমুদ একটি প্রমোদাগার নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রমোদ ভবনটির নির্মাণ কার্য শেষ হইবার পর মাহমুদ সেখানে এক ভোজসভায় পিতাকে আমন্ত্রণ করেন। সুলতান সেখানে উপস্থিত হইলে মাহমুদ সাগ্রহে উদ্যান ও প্রাসাদ সম্বন্ধে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করেন। উহাদের নির্মাণ কার্যে যে ছাপ ছিল

তাহাতে অনেকে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিল। কিন্তু পুত্রকে নিরাশ করিয়া বলিলেন, "সমস্ত ব্যাপারটাই আমার নিকট নিছক খেলা বলিয়া মনে হইতেছে। টাকা হাতে পাইলে আমার যে কোন প্রজা অনুরূপ জিনিস নির্মাণ করাইতে পারিত। কোন সুলতানের পক্ষে ইহা কোন গৌরবের বস্তু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সুলতানের কর্তব্য আরও সুদৃঢ় যশের সৌধ নির্মাণ করা, যাহা তাঁহার ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনুকরণের বিষয় হইয়া থাকিবে এবং যাহা কেহই অতিক্রম করিতে পারিবে না।" সমরকন্দ নিবাসী কবি নিজামী উড়াজী সুলতানের এই উক্তির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, "মাহমুদ অনেক প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়াছিলেন এবং উহাদের সৌন্দর্য ও বিরাটত্বের জন্য তিনি আত্মশ্লাঘা বোধ করিতেন। কিন্তু ঐসব প্রাসাদের একটা প্রস্তরও স্বস্থানে নাই। কিন্তু উনসারীর[৭] কবিতাগুলি আজিও তাঁহার প্রতিভার অম্লান ও সুরম্য স্মৃতিসৌধরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।"

তরজুমায়ে ইয়েমনীতে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর অল্প কয়েকদিন পূর্বে নাসির উদ-দীন সুবুক্তগীন বুস্টের শেখ আবুল ফাত্তারের সঙ্গে আলোচনাকালে বলিয়াছিলেন, "আরোগ্যলাভের আশায় ব্যাধি দূরীকরণের জন্য আমরা যে তৎপরতা প্রদর্শন করি তাহা আমাকে জোর করিয়া কসাই ও মেষ শাবকের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রথম দফায় মেষটাকে একটা অপরিচিত স্থানে আনিয়া হাত পা বাঁধা হয়। যেন তার অন্তিমকাল উপস্থিত। অনেক ধস্তাধস্তির পর সে আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু এ যাত্রা পশমগুলি ছাটিয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। এইরূপ ব্যাপার তাঁহার জীবনে অনেকবার আসে। শেষ পর্যন্ত সে অভ্যস্ত হইয়া যায় এবং সে আর তত ভয় পায় না। সে মনে করে পশম ছাটিয়াই তাহাকে নিষ্কৃতি দেওয়া হইবে। শেষে যখন তাহাকে সত্যসত্যই বধ করিবার জন্য ধরা হয়, তখন সে ভয় পায় না। শান্তভাবে নিজেকে বাঁধিতে দেয় এবং ছুরিকার নীচে গলা পাতিয়া দেয়। কেননা তার বিশ্বাস শুধু পশম ছাটিবার জন্যই তাহাকে ভূতলশায়ী করা হইয়াছে। বারবার রোগাক্রান্ত এবং তাহা হইতে আরোগ্যলাভ করিয়া আমরাও শেষটায় রোগশয্যায় অভ্যস্ত হইয়া পড়ি। মেষের মতই আমরা আশা করি, আমাদিগকে একটু

৭ উনসারী ছিলেন মাহমুদের দরবারের একজন খ্যাতনামা কবি।

লাঞ্ছনার পরই ছাড়িয়া দেওয়া হইবে। শেষ পর্যন্ত একবার সত্যই রোগশয্যা হইতে আমরা আর উঠিতে পারি না। উহা আমাদের শেষ শয্যায় পরিণত হয়। মৃত্যু আসিয়া গলায় তাঁহার ফাঁস পরাইয়া দিয়া একটানে শ্বাসরুদ্ধ করিয়া ফেলে।" কথিত আছে, মৃত্যুর চল্লিশ দিন পূর্বে তিনি এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন।

আমীর ইসমাইল

[জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাহমুদের অনুপস্থিতিতে আমীর ইসমাইল সুবুক্তগীনের স্থলাভিষিক্ত হন। সিংহাসনের প্রতি দাবী জ্ঞাপনের জন্য মাহমুদ গজনী আগমন করেন। ইসমাইল পরাজিত ও বন্দী হন।]

সুবুক্তগীনের মৃত্যুকালে মাহমুদ নিশাপুরে ছিলেন। সেই সুযোগে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র ইসমাইল শেষ মুহূর্তে তাঁহাকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে পিতাকে সম্মত করাইতে সমর্থ হন। সেই মোতাবেক সুবুক্তগীনের মৃত্যুর পর বল্‌খ শহরে মহাগাম্ভীর্যের সঙ্গে ইসমাইলের অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। ওমরাহদের সমর্থন লাভের জন্য তিনি পিতার ঐশ্বর্যের এক বিরাট অংশ উপহার-স্বরূপ তাহাদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন এবং জনসাধারণকে তুষ্ট করিবার জন্য ব্যয়-বহুল উৎসব ও ভোজের ব্যবস্থা করেন। তিনি সৈন্যদের বেতন বাড়াইয়া দিলেন এবং তুচ্ছ কার্যের জন্য তাহাদিগকে বেহিসাবী ইনাম দিতে লাগিলেন। সৈন্যরা ঠিকই বুঝিয়াছিল যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভয়েই তাহাদিগকে এতো খাতির ও তোয়াজ করা হইতেছে। তাহারা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে ছাড়িল না। দাবীর মাত্রা তাহাদের উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল এবং এতো করিয়াও সুলতান তাহাদিগের শ্রদ্ধা ও সমর্থন লাভ করিতে পারিলেন না। তাহারা ক্রমশঃ উচ্ছৃঙ্খল ও বিদ্রোহী ভাবাপন্ন হইয়া উঠিতে লাগিল। পিতার মৃত্যু ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইসমাইলের সিংহাসনারোহণের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মাহমুদ ইসমাইলকে পত্র লিখিয়া আবুল হাসান জুমভীর হস্তে সেই পত্র পাঠাইলেন। পত্রের মর্ম ছিল এইরূপ ঃ পিতার মৃত্যুর পর কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি মাহমুদের ভালবাসা একটুও ক্ষুণ্ণ হয় নাই বরং বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু রাজ্য পরিচালনায় যে জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও বয়সের পরিপক্কতার প্রয়োজন তাহা ইসমাইলের নাই। ইসমাইল সেই

গুরুদায়িত্ব বহনের যোগ্য হইলে মাহমুদ তাঁহার দাবী উত্থাপন করিতে আগাইয়া আসিতেন না। মাহমুদ এ কথা জোরের সঙ্গে বলিয়াছেন যে, জ্যেষ্ঠ পুত্র হিসাবে সুলতানাত তাহারই প্রাপ্য এবং তাহার অনুপস্থিতির কারণেই পিতা অন্তিম শয্যায় ইসমাইলকে উত্তরাধিকার মনোনীত করিতে অনিচ্ছা সত্ত্বেও সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। মাহমুদ ইসমাইলকে পরিস্থিতি গভীরভাবে বিবেচনা করিতে এবং ন্যায় হইতে অন্যায়কে পৃথক করিয়া দেখিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং অবিলম্বে সিংহাসনের প্রতি অন্যায় দাবী প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার উপদেশ মোতাবেক কার্য করিলে মাহমুদ তাঁহাকে খোরাসান ও বল্‌খ্‌ প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করিবেন বলিয়াছেন।

বলাবাহুল্য, ইসমাইল এই প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেন। তখন মাহমুদের পক্ষে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন পথ রহিল না। মাহমুদ তাঁহার পিতৃব্য বোঘরাজ ও সহোদর ভ্রাতা আমীর নাসির-উদ-দীন ইউসুফকে স্বপক্ষে লইয়া গজনীর পথে রওয়ানা হইলেন। ইসমাইলও বল্‌খ্‌ হইয়া দ্রুত গতিতে গজনী চলিয়া আসিলেন। দুই বাহিনী পরস্পরের নিকটবর্তী হইবার পরে মাহমুদ যুদ্ধ এড়াইবার জন্য আর একবার প্রয়াস পাইলেন। কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। অগত্যা মাহমুদ তাঁহার সৈন্যদল যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করিলেন। ইসমাইলও তাঁহার হস্তীদল-পুষ্ট সেনাবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী করিলেন। তারপর প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইল এবং বহুক্ষণ জয়পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। অবশেষে মাহমুদ নিজে শত্রু বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আঘাত হানিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন। তাহারা পলাইয়া গজনী দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই ইসমাইল আত্মসমর্পণ করিয়া ভ্রাতার হস্তে দুর্গের চাবি ও কোষাগার তুলিয়া দিলেন। মাহমুদ গজনীতে এক নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিয়া রাখিয়া সসৈন্যে বল্‌খ্‌ অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কথিত আছে যে, আত্মসমর্পণ করিবার কয়েকদিন পর মাহমুদ তাঁহার ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিয়া-

ছিলেন, "ভাগ্য তোমার প্রতি যদি সুপ্রসন্ন হইত তাহা হইলে তুমি আমার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে।" ইহার উত্তরে ইসমাইল বলিয়াছিলেন যে, তিনি মাহমুদকে যাবজ্জীবন কয়েদ করিয়া রাখিতেন। তবে স্বাধীনতা ব্যতীত তাহাকে আর সমস্ত সুবিধা প্রদান করিতেন। মাহমুদ তাঁহার ভাইয়ের এই কথার উপর তখন কোন মন্তব্য করেন নাই। পরে তিনি ইসমাইলকে জুর্জানের দুর্গে আটক করিয়াছিলেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত ইসমাইল সেই দুর্গে ছিলেন।[১]

---

১ দুই ভ্রাতার মধ্যে কে প্রকৃত উত্তরাধিকারী সে বিষয়ে ঐতিহাসিকেরা একমত নন। ডি-হার বেল্ট বলেন যে, সুবুক্তগীন তাঁহার পুত্র ইসমাইলকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিতে অভিলাষী ছিলেন এবং মৃত্যু শয্যায় তিনি করিয়াছিলেনও তাহাই। কিন্তু একথাও সত্য যে, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাহমুদের তুলনায় ইসমাইল ছিলেন বালকমাত্র। ফিরিশ্‌তার মতে মাহমুদ জাবুলী-স্থানের এক সম্ভ্রান্ত বংশীয় মহিলার সন্তান ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সর্বজন-বিদিত জাবুলী আখ্যা হইতে তাঁহাকে ক্রীতদাসী বলিয়াই অনুমিত হয়। ফেরদৌসীর বিদ্রূপেও এই ধারণাই জোরদার হয়। ফেরদৌসী স্পষ্ট ভাষায় মাহমুদকে পিতা ও মাতার দিক হইতে ক্রীতদাসের বংশোদ্ভূত বলিয়া গালি দিয়াছেন। এই কথা চিন্তা করিলে ইহাই বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় যে, সুবুক্তগীন তাঁহার অবৈধ সন্তান মাহমুদ ও নাসির উদ্দীনের পরিবর্তে তাহার বৈধ সন্তান ইসমাইলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিবার পক্ষপাতী ছিলেন।

সুলতান মাহমুদ গজনভী

[মাহমুদের আকৃতি। তাঁহার রাজত্বকালে সিস্তানে স্বর্ণখনি আবিষ্কৃত। তাঁহার উত্তরাধিকার দাবীর স্বীকৃতি আদায়ের জন্য বোখারার রাজা আমীর নূহের নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ। বোখারাধিপতি কর্তৃক তাহাকে খোরাসান প্রদেশ প্রদান করিতে অস্বীকৃতি এবং ঐ প্রদেশ আমীর তুজুন বেগকে প্রদান। মাহমুদের তুজুন বেগের বিরুদ্ধে অগ্রসর। তুজুনের বোখারার সুলতানের সঙ্গে মিলিত হইবার জন্য পলায়ন। বোখারার সুলতানের যুদ্ধে অবতীর্ণ এবং নিজে সেনানায়কগণ কর্তৃক ধৃত ও নিহত। তাঁহার পুত্র আব্দুল মালিকের সিংহাসন লাভ। কাসগড়ের সুলতানের বোখারা আক্রমণ এবং শিশু সুলতানকে হত্যা করিয়া রাজ্য দখল। মাহমুদের এলিক খানের নিকট দুত প্রেরণ এবং তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ। মাহমুদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা। পাঞ্জাবের রাজা জয়পালের পরাজয়। ভারতে দ্বিতীয় অভিযান; ভাটানা অবরোধ ও প্রবল প্রতিরোধ সত্তেও উহা অধিকার। মাহমুদের ভারতে অবস্থান-কালে, এলিক খানের খোরাসান আক্রমণ। মাহমুদ কর্তৃক এলিক খানকে পরাস্ত এবং আর কখনও মাহমুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হওয়া। মাহমুদের বাহিনী তুষারে ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে যাইতেছিল। ভারতবর্ষে তৃতীয় অভিযান। পেশোয়ার সীমান্তে জয়পালের পুত্র আনন্দ পাল কর্তৃক মাহমুদকে বাধাদান। হিন্দুদের বিপুল লোকক্ষয় ও পরাজয়। মাহমুদের নগরকোট অধিকার করিয়া গজনী প্রত্যাবর্তন। ভারতে ৪র্থ অভিযান, থানেশ্বরের যুদ্ধ। মাহমুদ কর্তৃক সেনাপতিকে জুজিস্থান অধিকার করিতে প্রেরণ। বাগদাদের খলিফা আল্ কাদির বিল্লাহর খোরাসান প্রদেশ মাহমুদকে চিরতরে প্রদান। ভারতে পঞ্চম অভিযান। পাঞ্জাবে নন্দুনা অধিকৃত। কাশ্মীর আক্রমণ। ভারতে ষষ্ঠ অভিযান, লোকোট অবরোধ। গজনী প্রত্যাবর্তনের পথে মাহমুদের সেনাবাহিনী প্রায় বিনষ্ট হইতে যাইতেছিল। খারিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা। আরকুন্দ সহ সমস্ত ট্রান্স-অকসিয়ানা গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্তকরণ। ভারতে সপ্তম অভিযান। কনৌজের রাজার করদানে অস্বীকৃতি। মাহমুদের মিরাট, মহাবন ও মথুরা অধিকার। ভারতে অষ্টম অভিযান। পাঞ্জাব আক্রমণ—লোকোট ও লাহোর অধিকার। অধিকৃত এলাকা শাসনের জন্য পাঞ্জাবে একজন শাসনকর্তা নিয়োগ। ভারতে নবম অভিযান। কালিঞ্জর অবরোধ—রাজা নন্দরাজের করদানে সম্মত হইয়া সন্ধিস্থাপন। গজনী ফিরিয়া মাহমুদের ট্রানস্-অকসিয়ানা গমন এবং সেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন। ভারতে দশম অভিযান। মাহমুদ কর্তৃক গুজরাট আসিয়া সোমনাথ পদানত। মন্দিরের বর্ণনা। মাহমুদের

গজনী প্রত্যাবর্তন। জলাভাবে পথে তাঁহার সেনাবাহিনী মৃত্যুর সম্মুখীন। সুলতানের জাঠদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা। সিন্ধুনদে নৌযুদ্ধে মাহমুদের রণতরী দ্বারা শত্রুর রণবহর আক্রমণ ও ধ্বংস। সেলজুক তুর্কীদের ট্রানস্-অক্সিয়ানা ও কাস্পিয়ান অঞ্চল আক্রমণ। শারীরিক দুর্বলতার জন্য মাহমুদ তাহাদিগকে বাধাদানে অসমর্থ। তাঁহার স্বাস্থ্যের অবনতি। তাঁহার স্বাস্থ্য ও চরিত্র। তাঁহার দরবারের বর্ণনা। বিদ্বানদের প্রতি তাঁহার বদান্যতা।]

ঐতিহাসিকগণ বলেন, পৃথিবীর মহান নরপতিদের সমস্ত গুণাবলী মাহমুদের চরিত্রে বিদ্যমান ছিল এবং তাঁহার দ্বারা ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি পাইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন, তাঁহার চরিত্রে লালসার প্রভাব ছিল সর্বাপেক্ষা অধিক। কিন্তু আমার মনে হয়, এ ব্যাপারে তাঁহাকে অন্যায়ভাবে দোষী সাব্যস্ত করা হইয়াছে। ইহা সত্য যে, তাঁহার ধন লিপ্সার শেষ ছিল না। কিন্তু তাঁহার সেইসব ধন দূরদেশে গৌরবোজ্জ্বল অভিযানগুলিতেই ব্যয়িত হইয়াছে। আমরা ফতহুল বালাদ, আবুনসর মাসকেটীর ভ্রমণ বৃত্তান্ত ও বিখ্যাত আবুল ফজল হইতে শুনিতে পাই যে, জগতে কোন রাজার দরবারে এত অধিক সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তির সমাবেশ ছিল না। কোন রাজা মাহমুদের ন্যায় উৎকৃষ্ট সেনাবাহিনী পোষণ করিতেন না বা মাহমুদের ন্যায় শানশওকতও প্রদর্শন করেন নাই। বিপুল অর্থব্যয় ব্যতীত এসব সম্ভবপর ছিল না। তাঁহাকে লোভী বলিয়া দোষারোপ করিবার সময় তাঁহার জীবনের কয়েকটি বিশেষ ঘটনার প্রতিই সর্বদা অঙ্গুলি নির্দেশ করা হইয়া থাকে, অথচ সেসব ঘটনা কোন প্রকারেই তাঁহার সমগ্র ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হইতে পারে না। দুইটি ব্যাপারে তাঁহার অর্থলোলুপতা প্রকটভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—এক ফেরদৌসীর প্রতি তাঁহার কার্পণ্য এবং দ্বিতীয় রাজত্বের শেষাংশে প্রজাদের নিকট হইতে অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করার ব্যাপারে।

কথিত আছে, মাহমুদ শারীরিক সৌন্দর্যে নিকৃষ্ট ছিলেন এবং একদা নিজের অবয়ব দেখিয়া তিনি দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "রাজাদের রূপ মানুষের চোখ ঝলসাইয়া দেয়, কিন্তু প্রকৃতি আমার উপর এত অকরুণ যে, আমার চেহারা মানুষের বিরক্তিই উৎপাদন করিয়া থাকে।" তাঁহার উক্তির উত্তর দিয়াছিলেন, "কোন রাজার দশ হাজার প্রজার মধ্যে এক জনেরও সৌভাগ্য হয় না রাজার দর্শন লাভের। কিন্তু আমাদের শাহানশাহের গুণাবলীর কথা সর্বজনবিদিত।"

যাক এইবার আমাদের ইতিহাস আরম্ভ করা যাউক। মাহমুদ ছিলেন সুবুক্তগীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র, তাঁহার মাতা ছিলেন জাবুলীস্তানের এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কন্যা—যে কারণে তাঁহাকে জাবুলী বলিয়া অভিহিত করা হইত। মাহমুদ ৩৫৭ হিজরীর ৯ই মহরম রাত্রে (১৫ই ডিঃ, ৯৬৭ খ্রীঃ) জন্মলাভ করেন এবং মিনহাজ-উস-সিরাজ জুরজানী বলেন, বৎসরের যে দিবসে রাছুলোল্লাহ্ (সঃ) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, মাহমুদও সেই দিনই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভূমিষ্ট হইবার কালে সুবুক্তগীন নিদ্রামগ্ন ছিলেন এবং স্বপ্নে দেখেন যে, গৃহাভ্যন্তরস্থ অগ্নিকুণ্ড হইতে একটা বৃক্ষ উপর দিকে ঠেলিয়া উঠিতেছে এবং এই বৃক্ষ দেখিতে দেখিতে সমস্ত পৃথিবীর উপর ছায়া বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান হইল এবং উহার শাখাপ্রশাখা দ্বারা সমস্ত প্রাণীজগতকে আসমানী ঝড় বৃষ্টি হইতে রক্ষা করিতে লাগিল। মাহমুদের ন্যায়বিচার দ্বারা এই স্বপ্নের যথার্থতা প্রমাণিত হইয়াছে। কারণ তাঁহার ন্যায়বিচার সম্বন্ধে উপমা দ্বারা বলা হইয়া থাকে যে, তাঁহার রাজত্বকালে নেক্ড়ে বাঘ ও মেষ এক নদীতে একই সঙ্গে জলপান করিত। তাঁহার রাজত্বের প্রথম মাসে সিস্তানে এক খনিতে তিন হাত গভীরে বৃক্ষাকৃতি এক স্বর্ণভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয় এবং মামুদের রাজত্বকাল পর্যন্ত ইহা হইতে বিশুদ্ধ স্বর্ণ উত্তোলন করা হইত। অতঃপর এক ভূমিকম্পের ফলে ঐ স্বর্ণ-খনি অদৃশ্য হইয়া যায়।

ভ্রাতাকে উচ্ছেদ করিবার পর মাহমুদ অতিসত্বর বল্খে আসিয়া হাজির হন এবং তথা হইতে বোখারার সুলতান আবুল মনসুরের নিকট দূত প্রেরণ করেন। গজনীর শাহী পরিবার তখন পর্যন্ত বোখারার সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু সম্প্রতি বোখারার সুলতান খোরাসানের শাসনকর্তার পদে তুজুন বেগকে মনোনীত করায়, মাহমুদ অপমান বোধ করেন এবং এই সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করিবার জন্যই তিনি দূত প্রেরণ করেন। খোরাসান বহুদিন যাবৎ তাঁহার পিতার অধিকারে ছিল। উত্তরে মাহমুদকে জানান হইল যে, তিনি ইতিপূর্বেই বথ্ল, তিরমিজ ও হিরাটের[১] অধিকার লাভ করিয়াছেন এবং বোখারার

১ খোরাসান প্রদেশের দক্ষিণাংশে ৩৪° উত্তর অক্ষাংশে হিরাট অবস্থিত। ইহা সর্বদাই একটা বড় শহর ছিল। উজবেগগণ কর্তৃক মেসেদ ধ্বংসের পর হইতে ইহা খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে এবং ইহা এখন খোরাসানের রাজধানী। ভারত ও পারস্যের মধ্যে বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র এই শহর।

সুলতান তাঁহার সমস্ত আমীরদের মধ্যে তাঁহার অনুগ্রহ সমভাবে বন্টন করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করেন। তাঁহাকে আরও জানানো হইল যে, তুজুনবেগ একজন বিশ্বস্ত ও অনুগত কর্মচারী। এই উক্তিতে গজনী পরিবারের প্রতি কটাক্ষপাত করা হয়, কারণ ; গজনী পরিবার সামানী রাজবংশের অধীনে শাসনকর্তারূপে কাজ করিবার সময়ই স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল।

এই উত্তরে কিছুমাত্র নিরুদ্যম না হইয়া মাহমুদ আবুল হাসান জুম্‌ভীকে বহুমূল্য উপঢৌকনসহ বোখারার শাহী দরবারে প্রেরণ করেন এবং সঙ্গে এই মর্মে লিখিত এক পত্রও প্রেরণ করেন যে, "আমি আশা করি আপনি আমার স্কন্ধে এমন কোন অসম্মানের বোঝা চাপাইবেন না, যাহার ফলে সামানী শাহীবংশের প্রতি আমরা এতকাল যে আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি তাহা আমি প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হই।"

সম্রাট এই পত্রের উত্তর না দিয়া, পত্রবাহককে কৌশলে তাঁহার পক্ষে ভিড়াইলেন এবং তাহাকে মন্ত্রী নিযুক্ত করিলেন। মাহমুদ তখন তুজুন বেগের নিকট হইতে নিশাপুর উদ্ধারের জন্য অগ্রসর হইলেন। মাহমুদের উদ্দেশ্য পূর্বাহ্নেই অবগত হইয়া তুজুন বেগ নিশাপুর ত্যাগ করেন এবং সম্রাট আমীর মনসুরকে নিজের অবস্থা জ্ঞাপন করান। মনসুর স্বয়ং মাহমুদকে বাধাদানের জন্য রওয়ানা হইলেন এবং অভিজ্ঞ যুবক সুলভ হটকারিতার সঙ্গে অবিরাম খোরাসানের দিকে ছুটিয়া মুরুথ্‌স পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলেন। মাহমুদ যদিও সম্যকরূপেই জানিতেন যে, তাঁহার মোকাবিলা করিবার সাধ্য সম্রাটের নাই তবুও সামানী শাহী পতাকার প্রতি সম্মানবোধ বশতঃ তিনি নিশাপুর ত্যাগ করিয়া মুবঘাবে পশ্চাদপসরণ করেন। ইত্যবসরে আমীর তুজুন বেগ, আমীর মনসুরের শিবিরে ফাইকের সঙ্গে এক ষড়যন্ত্রে জড়িত হইয়া সম্রাটকে বন্দী করেন এবং তাঁহার চক্ষুদ্বয় উপড়াইয়া ফেলিয়া তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল মালিককে (তখন বালক মাত্র) সিংহাসনে উপবেশন করান। মাহমুদের ক্রোধানল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ষড়যন্ত্রকারীরা দ্রুতবেগে মার্ভে[২] পালাইয়া যান।

২ ৩৭° উত্তর অক্ষাংশে এক বালুকাময় সমভূমিতে মার্ভ অবস্থিত। পূর্বে ইহা পারস্যের সর্বাপেক্ষা সুন্দর সমৃদ্ধিশালী শহর ছিল। কিন্তু চেঙ্গিজ খানের তাতারদের দক্ষিণ এশিয়া আক্রমণের সময় ইহা এমন ক্ষতিগ্রস্থ হয় যে, বর্তমানে ইহা পূর্ব গৌরবের ছায়ারূপে দণ্ডায়মান রহিয়াছে মাত্র।

মাহমুদ সেখানেই তাঁহাদের পিছু পিছু ছুটিলেন। বেগতিক দেখিয়া তাহারা যুদ্ধের জন্য রুখিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পরাজিত হইলেন। ফাইক বালক রাজাকে সঙ্গে লইয়া বোখারায় পালাইয়া গেলেন। তুজুন বেগও পলায়ন করে এবং কিছুকাল তাহার সম্বন্ধে কিছু শোনা যায় না। পরে তাঁহাকে তাঁহার বিক্ষিপ্ত সৈন্য দলকে একত্র করিতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে ফাইক অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং শীঘ্রই মারা যান। কাশগড়ের শাসক এলিক খান, এইসব বিরোধের সুযোগ গ্রহণ করিয়া কাশগড় হইতে সসৈন্যে বোখারায় আসিয়া হাজির হইলেন এবং আবদুল মালিককে সবংশে নিধন করিলেন। যে সামানী বংশ একশত আটাইশ বৎসর যাবৎ বোখারায় রাজত্ব করিয়া আসিতেছিল এইরূপে তাহার অবসান ঘটিল।

এই সঙ্কটকালে মাহমুদ, বল্‌খ্‌ ও খোরাসান প্রদেশে শাসনকার্যে শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন। তিনি শাসন ব্যবস্থা এমনভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করেন যে, বাগদাদের তদানীন্তন আব্বাসীয় খলিফা আলকাদির বিল্লার কানে তাহার সুখ্যাতি পৌঁছিয়াছিল। খলিফা তাহাকে এক মূল্যবান পোশাক প্রেরণ করেন। (এইরূপ পোশাক তিনি ইতিপূর্বে আর কোন সুলতানকেই প্রদান করেন নাই) এবং সেই সঙ্গে তিনি মাহমুদকে আমীন-উল-মিল্লাত ও ইয়েমিন-উদ-দৌলত* উপাধি দ্বারা সম্মানিত করেন। ৩৯০ হিজরীতে জিলকদ মাসের শেষের দিকে মাহমুদ বল্‌খ্‌ হইতে হিরাট এবং সেখান হইতে সিস্তান গমন করেন। সেখানে তিনি সেই প্রদেশের শাসনকর্তা আহম্মদের পুত্র খুলুপকে পরাস্ত করিয়া গজনী প্রত্যাগমন করেন। এই সময়েই তিনি ভারতাভিমুখে সমর যাত্রা করেন এবং বহু দুর্গ ও প্রদেশ অধিকার করিয়া সেইসব স্থানে নিজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন।

তাঁহার হুকুমত পরিচালনার পথে যত বিঘ্ন ছিল সব দূর করিবার পর তিনি কিছু কাল রাজ্যের উন্নতি সাধনে এবং ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয়-গুলির সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করেন। বোখারার নূতন সুলতানকে মানিয়া লওয়াই তিনি যুক্তিযুক্ত মনে করিলেন এবং তদুদ্দেশ্যে এলিক খানের সঙ্গে

৩ আমীন-উল-মিল্লাত অর্থ জাতির আশ্রয়স্থল এবং ইয়েমিন-উদ-দৌলতের অর্থ রাষ্ট্রের দক্ষিণ হস্ত।

মিত্রতা স্থাপন এবং তাঁহার সাম্প্রতিক বোখারা অধিকার উপলক্ষে তাঁহাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে মাহমুদ, তাঁহার নিকট আবুতাইউব শোহাইল বিন সোলায়মান সেলজুকীকে চমকপ্রদ উপহারাদিসহ প্রেরণ করেন। মাহমুদের দূত তুর্কীস্তানে প্রবেশ করিলে প্রতি শহরেই বহু লোক তাঁহার সঙ্গে মোলাকাত করেন। কারণ এই সময় তুর্কীদের অধিকাংশই মুসলমান হইয়াছিল। এলিক খান অরখন্দে তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়া অবধি তিনি এই স্থানেই ছিলেন। মাহমুদ তাঁহার রাজ্যের সমস্ত সমস্যার সমাধান করিবার পর হিন্দুস্থানের দিকে মনোযোগ দিলেন। ৩৯১ হিজরীর (১০০১ খ্রীঃ) শাওয়াল মাসে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মাহমুদ গজনী হইতে পেশোয়ারের দিকে রওনা হইলেন। সেখানে লাহোরের রাজা জয়পাল বার হাজার অশ্বারোহী, তিরিশ হাজার পদাতিক ও তিন শত হস্তীসম্বলিত এক বিরাট বাহিনী লইয়া ৩৯২ হিজরীতে (খ্রীস্টাব্দ ১০০১, নভেম্বর) মহরম মাসের অষ্টম দিবসে মাহমুদকে বাধাদান করেন। প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হয় এবং মাহমুদ জয়লাভ করেন। পুত্র ও আত্মীয়দের মধ্যে ১৫ জন প্রধান সেনাপতি সহ জয়পাল বন্দী হইলেন। তাঁহার পাঁচ সহস্র সৈন্য নিহত হয়। এই যুদ্ধে মাহমুদের প্রচুর যশ ও সম্পদ লাভ ঘটিয়াছিল। তিনি যেসব লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হন তাহার মধ্যে ১৬টি রত্ন খচিত কণ্ঠহারও ছিল। ইহাদের একটি ছিল জয়পালের নিজের। সেকালের জহুরীরা উহার ১,৮০,০০০ দিনার মূল্য ধার্য করিয়াছিল।

এই বিজয়ের পর পেশোয়ার হইতে অগ্রসর হইয়া মাহমুদ বিতুণ্ডা দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করেন। পরবর্তী বসন্তকালের প্রারম্ভে বিপুল অর্থের বিনিময়ে এবং বাৎসরিক করদানের প্রতিশ্রুতিতে মাহমুদ যুদ্ধ বন্দীদিগকে মুক্তিদান করেন। কিন্তু যে সব আফগান সর্দার তাঁহাকে বাধাদান করিয়াছিল, মাহমুদ তাঁহাদের অধিকাংশকে হত্যা করেন। অতঃপর তিনি গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। কথিত আছে, সে সময় হিন্দুদের মধ্যে এই প্রথা ছিল যে, কোন রাজা উপর্যুপরি দুইবার কোন বিদেশীর নিকট পরাভূত হইলে তাঁহাকে রাজ পদের অযোগ্য বিবেচনা করা হইত। এই প্রথানুযায়ী জয়পাল তাঁহার পুত্রকে রাজমুকুট প্রদান করিবার পর একটা চিতা সজ্জিত করিতে আদেশ করেন এবং নিজ হস্তে সেই চিতায় অগ্নি সংযোগ করিয়া, তিনি পুড়িয়া মরেন।

৩৯৩ হিজরী (১০০২ খ্রীঃ) মহরম মাসে মাহমুদ সিস্তান[4] যাইয়া, খুলুলকে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া আসেন।

হিন্দুস্তান হইতে রাজস্ব অনাদায়ে, ৩৯৫ হিজরীতে (১০০৪ খ্রীঃ) তিনি ভাটিয়া[5] শহরের দিকে সৈন্য চালনা করিলেন এবং মুলতান প্রদেশের মধ্যে দিয়া গমন করিয়া সেই স্থানের সম্মুখে আসিয়া হাজির হইলেন। ভাটিয়া শহরটি অতি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল এবং প্রাচীরের চতুর্দিকে পরীখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। এই শহর তখন রাজা বিজয় রায়ের শাসনাধীন ছিল। তিনি মাহমুদ নিয়োজিত মুসলমান শাসনকর্তাকে নানাভাবে উৎপীড়িত করিয়াছিলেন এবং জয়পালের পুত্র আনন্দ পালকেও তাঁহার প্রাপ্য করদানে অস্বীকার করিয়াছিলেন—যদিও তিনি তাঁহার অধীনস্থ রাজা ছিলেন। মাহমুদ বিজয় রায়ের এলাকায় প্রবেশ করিলে, তাঁহাকে বাধাদানের জন্য বিজয় রায় সৈন্য সামন্ত লইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। সুবিধাজনক স্থানে সৈন্য সমাবেশ করিয়া তিনি মুসলমানদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন এবং তিন দিন যাবৎ তাহাদিগকে যুদ্ধে লিপ্ত রাখিলেন। এই সময় মুসলমানদের এতো লোকক্ষয় হইয়াছিল যে, তাঁহারা অভিযান ত্যাগ করার কথা চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। চতুর্থ দিনে মাহমুদ তাঁহার সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন যে, সেইদিন তিনি নিজে আক্রমণ পরিচালনা করিয়া হয় জয়লাভ করিবেন না হয় মরিবেন—এই সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন। অপরপক্ষে বিজয় রায়ও দেবতাদিগকে তুষ্ট করিবার পর, তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ সাহসিকতার সঙ্গে যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। মুসলমানরা যদিও প্রচণ্ড বিক্রমের সঙ্গে আক্রমণ করিতে লাগিল, তবুও তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ পিছু হটিয়া আসিতে হইয়াছিল এবং তাহাদের বহু লোক এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও, তাঁহারা বার বার নবোদ্যমে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত এইরূপ পুনঃ পুনঃ হানা দিতেই থাকিল। এই সময় মাহমুদ তাঁহার সৈন্যদের সম্মুখে মাটিতে সেজদায় লুটাইয়া পড়িয়া রসূলুল্লাহ্ (সঃ)-এর সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিছুক্ষণ সেজদায় থাকিবার পর, সুলতান দাঁড়াইয়া উচ্চঃস্বরে বলিলেন, "অগ্রসর হও, অগ্রসর হও, আল্লাহ্ আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর

৪ সিন্ধু ও কিরমান বা প্রাচীন কারমেনিয়ার মধ্যবর্তী ও পারস্যের অন্তর্গত সমুদ্র তীরস্থিত প্রদেশ বিশেষ।

৫ এই স্থানটি ঠিক কোথায় ছিল নির্ধারিত হয় নাই।

করিয়াছেন।" সৈন্যরা হুঙ্কার দিয়া তাঁহাদের সংকল্পের দৃঢ়তা জ্ঞাপন করিল। ইহার পর মুসলমানরা প্রচণ্ডভাবে হানা দিয়া শত্রুবাহিনীকে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল এবং শহরের তোরণদ্বার পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

পরদিন প্রত্যূষে মাহমুদ ভাটিয়া ঘেরাও করিয়া খন্দক ভরাট করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই এই কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিল। দুর্গ রক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া, ক্ষুদ্র একদল সৈন্য রাখিয়া, বিজয় রায় দুর্গ ত্যাগ করিবেন স্থির করিলেন। তদনুযায়ী এক রাত্রে অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি দুর্গ হইতে নির্গত হইলেন এবং সিন্ধু নদীর তীরে এক বনে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন। মাহমুদ এই পলায়নের সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে সেখানেই অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্য পৃথকভাবে পাঠাইলেন। বিজয় রায়ের অধিকাংশ লোক তাহাকে ত্যাগ করিয়া সরিয়া পড়িল এবং তিনি দেখিলেন মুসলমানরা তাঁহাকে প্রায় পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছে। তখন তিনি বাহির হইবার জন্য একবার প্রাণপণ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু তাহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কিন্তু শেষে যখন তাহার বন্দী হইবার অবস্থা দাঁড়াইল তখন তিনি স্বীয় তরবারির ফলা নিজের বক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তাঁহার অধিকাংশ অনুচর প্রভুর মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ করিল। ইতাবসরে মাহমুদ ভাটিয়া দুর্গে হানা দিয়া উহা অধিকার করিয়া নেন। তিনি এই শহরে ২৮০টি হস্তী, বহু ক্রীতদাস ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শহর ও উহার অধীনস্থ এলাকা আপন সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়া মাহমুদ বিজয় গৌরবে গজনী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

৩৯৬ হিজরীতে (১০০৫ খ্রীঃ) মাহমুদ মুলতান পুনরাধিকারের সংকল্প গ্রহণ করেন। মুলতান বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল। মুলতানের প্রথম শাসনকর্তা শেখ হামিদ লোদী আমীর সুবুক্তগীনকে করদান করিতেন। তাঁহার পরে তাঁহার পৌত্র আবুল ফাত্তাহ্ দাউদ-বিন-নাসির-বিন শেখ হামিদ, ইসলামের নীতি পরিহার করেন।[৬] এবং সেই সঙ্গেগজনীর স্বাধীনতা পাশও ছিন্ন করেন। তারিখ-ই-আল্‌ফিতে

৬ এই উক্তি দ্বারা সম্ভবতঃ ধর্মের উপেক্ষা প্রদর্শন বুঝাইয়াছে। ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া হিন্দু হওয়ার কথা নিশ্চই বলা হয় নাই।

বর্ণিত আছে যে, মাহমুদের গজনী হইতে যাত্রা করার সংবাদ পাইয়া আবুল ফাত্তাহ্ দাউদ, তাঁহার মিত্র জয়পালের উত্তরাধিকারী আনন্দ পালের সাহায্য প্রার্থনা করেন। আনন্দ পাল মিত্রের কর্তব্যানুযায়ী, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যকে মাহমুদের বিরুদ্ধে পেশোয়ার প্রেরণ করেন। সেখানে তাঁহারা পরাস্ত হয় এবং মাহমুদের সৈন্যরা চেনাবের তীরস্থ সোদ্রা[৭] শহর পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। এই সময় আনন্দ পাল রাজধানী ত্যাগ করিয়া পার্বত্য পথে কাশ্মীর পলায়ন করেন। মাহমুদ অতঃপর বিতুণ্ডার পথে মুলতান প্রবেশ করেন। আনন্দ পালের সেনাবাহিনীর পরাজয়ের খবর ফাত্তাহ্র কর্ণগোচর হইল। তিনি বুঝিলেন, মাহমুদের বিরুদ্ধে একা দাঁড়াইবার শক্তি তাঁহার নাই, সুতরাং তিনিও পলায়ন করিলেন। এবং পরে বাৎসরিক ২০,০০০ স্বর্ণ দিরহাম[৮] কর স্বরূপ প্রদান করিবেন এবং ভবিষ্যতে সর্বদা আনুগত্য স্বীকার করিয়া চলিবেন। এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইলে তাঁহাকে মার্জনা করা হয়। মাহমুদ সাতদিনব্যাপী মুলতান অবরোধ করিয়া রাখিবার পর এই চুক্তি সম্পাদিত হয়। অতঃপর তিনি গজনী ফিরিবার উদ্যোগ ও আয়োজন করিতে থাকেন। এমন সময় হিরাটের শাসনকর্তা আরসালান জাজিবের নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, কাসগড়ের রাজা এলিক খান তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিয়াছেন। সেবক পাল নামক এক হিন্দু রাজার উপর হিন্দুস্তানের সমস্ত দায়িত্ব অর্পণ করিয়া মাহমুদ সত্বর গজনী চলিয়া আসিলেন। এই সেবক পাল ইতিপুর্বে পেশোয়ারে আবু আলী সানজারীর হস্তে বন্দী হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এলিক খানের সঙ্গে যুদ্ধের বিবরণ মোটামুটি এইরূপ: আমরা পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, এলিক খান ও মাহমুদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল এবং এলিক খান মাহমুদের সঙ্গে তাঁহার কন্যার বিবাহ দেন। কিন্তু এই দুইটি রাজ দরবারে কতিপয় বিভেদ সৃষ্টিকারী লোক ছিল। তাঁহারা মিথ্যা রটনা দ্বারা এই বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত করে। হিন্দুস্তানে যুদ্ধাভিযানে আসিবার কালে

---

৭ সোদ্রা ওয়াজিরাবাদ নামেও পরিচিত। ইহা লাহোরের ৫০ মাইল উত্তরে চেনাবের বাম তীরে অবস্থিত।

৮ দিরহাম পাঁচ পেনির মত মূল্য বিশিষ্ট একটা রৌপ্য মুদ্রা। স্বর্ণ দিরহাম বলিয়া কোন মুদ্রার উল্লেখ কোথাও পাই নাই এবং সেই জন্য মূল্য বুঝা মুশ্‌কীল।

মাহমুদ খোরাসানকে প্রায় সৈন্যহীন অবস্থায় রাখিয়া আসেন। এই অবস্থার সুযোগে এলিক খান ঐ প্রদেশটি স্বাধিকারে আনয়নের সংকল্প করেন। এই দুরভিসন্ধি কার্যকরী করিবার জন্য তিনি তাঁহার সেনাপতি সিপাক্তগীনকে খোরাসান আক্রমণ করিতে হুকুম দেন এবং জাকাতুর্গীন নামক অন্য সেনাপতিকে বল্‌খ্‌ আক্রমণের নির্দেশ দেন। হিরাটের শাসনকর্তা আরসালান জাজিব এই সমস্ত গতিবিধির সংবাদ পাইয়া রাজধানীর নিরাপত্তা বিধানের জন্য দ্রুত বেগে গজনী চলিয়া আসেন। খোরাসানের সৈন্যরা এইরূপে পরিত্যক্ত হইয়া শত্রুকে বাধা দানের সাহস হারাইয়া ফেলিয়া এলিক খানের নিকট আত্ম-সর্মপণ করে।

মাহমুদ প্রতিদিন দীর্ঘপথ অতিক্রম করিয়া গজনী পৌঁছেন এবং তথা হইতে বল্‌খের দিকে সৈন্যবাহিনী চালনা করেন। বল্‌খ শহর সম্পূর্ণ আয়ত্তাধীন থাকা সত্ত্বেও জাকাতুর্গীন তুর্মুজে পলায়ন করে। সিপাক্তগীনকে খোরাসান হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য মাহমুদ সেনাবাহিনীর এক বিরাট অংশসহ আরসালান জাজিবকে তথায় প্রেরণ করেন। গজনী বাহিনীর আগমনে সিপাক্তগীন হিরাট ত্যাগ করিয়া মা-উরা-উন্নাহারে [৯] পলাইয়া যান।

অবস্থা বুঝিয়া এলিক খান, খুর্তানের কুদ্দর খানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। কুদ্দর খান পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া তাহার সহিত যোগদানের জন্য রওয়ানা হন। এই মিত্র বাহিনী দ্বারা শক্তিশালী হইয়া এলিক খান জাইহুন নদী (অস্রান) পার হইয়া বল্‌খের চার ফারসুং [১০] অভ্যন্তরে আসিয়া শিবির স্থাপন করেন। মাহমুদও তাঁহার মোকাবিলা করিতে বিলম্ব করেন নাই। তিনি তাঁহার ভ্রাতা জুরজানের শাসনকর্তা শাহজাদা নাসির-উদ-দীন ইউসুফকে অগ্রগামী বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন এবং আবু নসর কুরিয়ুন ও আবদুল্লাহ্ তাইকে তাঁহার অধীনে যুদ্ধ করিতে পাঠান। সেনাবাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্ব নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব প্রদত্ত হইল আলতুন্‌তাস হাজিবের উপর এবং আফগান ও খিলজী

৯ ট্রানস্-অকসিয়ানা নদীর পরপারে অবস্থিত অঞ্চলকে মা-উরা-উন্নাহার বলা হয়।

১০ ভূমির এক প্রকার মাপ। ইহার পরিমাণ তিন হইতে চারি মাইলের সমান। এক ফারসুং ইউরোপের এক লিগের সমান।

সৈন্য-গঠিত বাম পার্শ্বের পরিচালনার ভার প্রদান করা হইল আরসালান জাজিবকে। পাঁচ শত হস্তী প্রধান বাহিনীর মধ্যে কিছু দূর পর পর স্থাপন করা হইল, যাহাতে পরাজয় ঘটিলে এই জন্তুগুলির পলায়নে কোন অসুবিধা না হয়।[১১]

কাশগড়ের সুলতান তাঁহার বাহিনীর কেন্দ্র ভাগে স্থান গ্রহণ করেন। আমীর কুদ্দুর খান দক্ষিণ পার্শ্বের এবং সিপাক্তুগীন বাম পার্শ্বের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যখন দুই বিপক্ষ দল অগ্রসর হইয়া পরস্পরকে আঘাত হানিল তখন যোদ্ধাদের হুঙ্কার, অশ্বের চিঁহিঁ রব, অস্ত্রের ঝনঝনানি এবং ধূলিকণায় দিনের মুখ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। এলিক খান তাঁহার দেহরক্ষী সৈন্যদের সাহায্যে নিজে মাহমুদের বাহিনীর কেন্দ্রভাগ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করেন। মাহমুদ তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময় তিনি অশ্ব হইতে লাফাইয়া মাটিতে নামিয়া ভূমি চুম্বন করিয়া সর্বশক্তিমান আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করেন। তারপর একটা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যদিগকে এলিক খানের আক্রমণের মোকাবিলা করিতে আদেশ দেন। তাঁহার হাতী শত্রুর নিশান বাহককে শুঁড়ে জড়াইয়া ঘুরাইতে লাগিল। মাহমুদ হস্তী বাহিনীকে অগ্রসর করিয়া দিলেন এবং উহারা শত্রু সৈন্যকে পতঙ্গের মত পদতলে নিষ্পিষ্ট করিয়া চলিতে লাগিল।

গজনী সৈন্যদল অসীম সাহসের সঙ্গে তাহাদের সুলতানকে সাহায্য করিল। উন্মত্তের মত শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে শত্রু

---

১১ এই অংশটির কিছু ব্যাখ্যার দরকার। হিন্দুদের মধ্যে হস্তীদের সাধারণতঃ পদাতিক বাহিনীর সম্মুখে রাখা হইত এবং তাহারা আশা করিত যে, উহারা শত্রুপক্ষের ব্যূহ ভেদ করিয়া যাইবে। এইরূপ ঘটিলে জয় একরূপ পূর্ণ হইত। কিন্তু যদি কোনক্রমে হস্তীগুলিকে হটাইয়া দেওয়া হইত এবং উহারা আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠিত তাহা হইলে ঘুরিয়া তাহারা নিজেদের সৈন্যদের মধ্য দিয়াই প্রবল বেগে ছুটিয়া চলিত। ফলে স্বপক্ষীয় সৈন্য বাহিনীদের বিষম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিত—যে বিশৃঙ্খলা শত্রুদের মধ্যে করিবে বলিয়া আশা করা হইয়াছিল। মাহমুদ ইহা লক্ষ্য করিয়া হস্তীদের তাহার সৈন্যশ্রেণীর একটি অংশবিশেষ হিসাবে ব্যবহার করিলেন। কেননা যদি তাহারা ভীত হইয়া পালাইয়া যায় তাহা হইলে তাহাতে স্থানের কোন অভাব হয় না। অন্য পক্ষে তাহাদের পরিত্যক্ত স্থান অন্য সৈন্য দ্বারা তখনই ভরিয়া ফেলা যাইত। প্রত্যেক জাতিই এখন বুঝিতে পারিয়াছে যে, এই ভীতু অতিকায় জন্তুটি যুদ্ধের জন্য আদৌ উপযুক্ত নয়।

তীরন্দাজকে সম্মুখে যাইয়া হিন্দু বাহিনীকে পরিখা আক্রমণের জন্য উস্কানী দিতে নির্দেশ দিলেন। তীরন্দাজদের মোকাবিলা করিতে আগাইয়া আসিল গোক্করেরা। সুলতানের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া গোক্করেরা তাঁহার অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে হটাইয়া লইয়া আসিল। নানা অস্ত্রে সজ্জিত প্রায় তিরিশ হাজার গোক্কর নগ্ন পদে ও নগ্ন মস্তকে মুসলমান ব্যূহ ভেদ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু করিয়া দিল। কয়েক মিনিটের মধ্যে ৫,০০০ মুসলমান শহীদ হইল। শেষ পর্যন্ত দুষমনদের আক্রমণ প্রতিহত হইল এবং যত দ্রুত আসিয়াছিল তত দ্রুতই তাহাদিগকে জাহান্নামে প্রেরণ করা হইল। হিন্দুদের আক্রমণের বেগ শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। এক হস্তীরূঢ় হিন্দুরাজা এই বিরাট হিন্দু বাহিনী পরিচালনা করিতেছিলেন। তাহার হস্তী সহসা ন্যাপথার[১৪] পিণ্ডের আঘাতে ও তীর বর্ষণে ক্ষিপ্ত হইয়া পিছু ফিরিয়া পলায়ন করিল। ইহাতে হিন্দুদের মধ্যে আতঙ্কের সঞ্চার হইল, তাহারা যখন দেখিল সেনাবাহিনীর অধিনায়ক তাহাদিগকে ফেলিয়া পালাইতেছেন, সৈন্যরাও তখন পিছু ফিরিয়া পলাইতে লাগিল। ছয় হাজার আরব অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আব্দুল্লাহ তাই এবং দশ হাজার তুর্কী, আফগান ও খিলজী সৈন্য লইয়া আরসালান জাজিব দিবারাত্র হিন্দুদের পশ্চাতে ছুটিলেন। ইহাতে পলায়ন পর ২০,০০০ হিন্দু সৈন্য নিহত হইল। লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য ছাড়াও কুড়িটি হাতী সুলতানের নিকট আনীত হইল।

ধর্ম প্রচারের উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়া সুলতান নগর কোটের হিন্দুদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং মন্দিরের প্রতিমাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া মন্দিরকে ধূলিস্মাৎ করিলেন। ইহার পর মুসলমানগণ ভীম নামে পরিচিত এক দুর্গ অবরোধ করিল। তাহার পূর্বে অবশ্য তাহারা চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চল তলোয়ার ও অগ্নি দ্বারা ছারখার করিয়াছিল। ভীম নামে এক রাজা পর্বত শীর্ষে এই দুর্গটি

১৪ এই শব্দ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন প্রকারে লেখা আছে। কতকগুলি পাণ্ডুলিপিতে ন্যাফথার স্থানে তোপ (বন্দুক) এবং খুদুং (তীর) স্থানে তুফাং (গাদাবন্দুক) লেখা আছে। কিন্তু ১৩১৭ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে লেখা কোন আরবী বা পারস্য ভাষায় লিখিত ইতিহাসে বারুদের উল্লেখ নাই। বারুদ যুদ্ধের জন্য আরও অনেক পরে ব্যবহৃত হইয়াছিল। মনে হয় বাবরই প্রথম উত্তর ভারতে বৃহদাকার কামান ব্যবহার করিয়াছেন। অজ্ঞ নকল নবিসরা সাম্প্রতিকালে ভুলক্রমে তোফ তুফাং প্রভৃতি লিখিয়াছে।

নির্মাণ করিয়াছিলেন। দুর্গটি অত্যন্ত মজবুত ছিল বলিয়া পার্শ্ববর্তী রাজ্যের হিন্দুরা দেবতাকে উৎসর্গীকৃত সমস্ত সম্পদ ঐ দুর্গে মজুদ রাখিত। তাহার ফলে, ঐ দুর্গে এত স্বর্ণ, রৌপ্য, মূল্যবান প্রস্তর ও মুক্তারাজি সঞ্চিত করিয়া ছিল যে, পৃথিবীর কোন রাজার ভাণ্ডারেই এত ছিল বলিয়া মনে হয় না। এরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মাহমুদ দুর্গটি ঘেরাও করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, দুর্গরক্ষীর জন্য হিন্দুরা দুর্গে আর কোন সৈন্য আমদানী করিতে সমর্থ হয় নাই। দুর্গ-বাসী অধিকাংশ সৈন্যই ইতিপূর্বে যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়াছিল। দুর্গে যাহারা ছিল তাহারা অধিকাংশই ছিল পুরোহিত সম্প্রদায়ের লোক—রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের দিকে যাহাদের কোন প্রকার ঝোঁক ছিল না। তাহারা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠাইল। ফলে তৃতীয় দিবসে মাহমুদ বিনা বাধায় ও বিনা রক্তপাতে দুর্গের মালিক হইলেন।

ভীমদুর্গে পাওয়া গিয়াছিল সাতলক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা (দিনার), সাতশত মণ[১৫] ওজনের সোনা ও রূপার থালা, দুইশত মণ খাঁটি সোনার পিণ্ড, দুই হাজার মণ রূপার বাঁট এবং কুড়ি মণ ওজনের মুক্তা ও প্রবাল, হিরক চুনী প্রভৃতি রত্মরাজি। ভীমের সময় হইতে এইসব সংগ্রহীত হইয়া আসিতেছিল এবং ইহাদের বিস্তৃত বিবরণ দান কষ্টকর। এই বিপুল পরিমাণ লুন্ঠিত দ্রব্য লইয়া মাহমুদ গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। ৪০০ সালে (হিঃ) (১০০৯ খ্রীঃ) তিনি এক জমকালো ভোজের আয়োজন করেন এবং এই সময় শহরের বাইরে এক বিরাট প্রান্তরে তাঁহার ঐসব সম্পদ স্বর্ণ-সিংহাসন, মূল্যবান অলঙ্কারাদি ও অন্যান্য দ্রব্য জনসাধারণকে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন এবং প্রত্যেক পদস্থ ব্যক্তিকে একটি রাজকীয় উপহার প্রদান করেন।

পর বৎসর মাহমুদ ঘুর অভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। ঐ অঞ্চলের শাসক

---

১৫ প্রাচ্যের বিভিন্ন স্থানে মণের ওজন বিভিন্ন। আরবের কোন কোন স্থানে ইহার ওজন মাত্র দুই পাউণ্ডের মত, তাব্রিজে এগার পাউণ্ড, গ্যামরুনে সাত পাউণ্ড আট আউন্স, মস্কটে আট পাউণ্ড বার আউন্স। ফিরিশতা আরব ও পারসিক ঐতিহাসিকদের নিকট হইতে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন এবং আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে, তাঁহাদের নিজ নিজ দেশে মনের যে ওজন তাঁহারা সেই অর্থে ইহার ব্যবহার করিয়াছেন, মণের সর্বনিম্ন ওজন লইলেও দাঁড়ায় ১,৪০০ পাউণ্ড স্বর্ণ ও রৌপ্য-থালা, ৪০০ পাউণ্ড স্বর্ণ পিণ্ড, ৪,০০০ পাউণ্ড রূপার বাঁট, ৪০ পাউণ্ড ওজনের মুক্তা, হিরা, চুনী ও প্রবালাদি। দিনারের ওজন দশ শিলিং ধরিলেও ৩,১৩,৩৩৩ পাউণ্ড স্টার্লিং হয়।

মুহাম্মদ ছিলেন শূর বংশীয় আফগান (এই বংশ হইতেই এমন এক রাজ বংশের উদ্ভব হয়, যাহা পরে সুবুক্তগীনের বংশকে উচ্ছেদ করে)। তিনি দশ হাজার সৈন্য লইয়া এক পরিখা বেষ্টিত স্থানে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। মাহমুদ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত বার বার আক্রমণ করিয়া প্রতিবারই পিছু হটিতে বাধ্য হইলেন। পরিখা যুদ্ধে ঘুর সৈন্যদের দুর্ধর্ষতা লক্ষ্য করিয়া মাহমুদ তাহাদিগকে বাহিরে আসিতে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য, নিজের সৈন্যবাহিনীকে বাহ্যিক বিশৃঙ্খলা প্রদর্শন করিয়া পশ্চাদ্ধাপসরণ করিবার নির্দেশ দিলেন। এই কৌশলে প্রতারিত হইয়া ঘুররা গজনী বাহিনীর অনুসরণ করিতে বাহির হইল। অমনি সুলতান মুখ ফিরাইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং বহু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তাহাদিগকে পরাস্ত করিলেন। মুহাম্মদ শূর বন্দী অবস্থায় সুলতানের নিকট আনীত হইল; কিন্তু শূর দলপতি অঙ্গুরীর নিম্নে সর্বদা বিষ রাখিতেন, সেই বিষ ভক্ষণ করিয়া কয়েক ঘন্টার মধ্যেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার রাজ্য গজনী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

তারিখ-ই-ইউমিনির লেখক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, এই যুদ্ধে পূর্বে ঘুরের রাজা বা অধিবাসীরা কেহই মুসলমান ছিল না। অপরপক্ষে তাব্‌কাতে নাসিরির লেখক ও ফকর-উদ্‌-দীন মুবারক শাহ লোদী যিনি পদ্যে ঘুর বংশের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন—উভয়ই নিশ্চয় করিয়া বলেন যে, তাহারা বহু বৎসর পূর্বেই এমন কি রাসুলুল্লার (সঃ) জামাতা আলীর সময়েই ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাহারা আরও বলেন, উমাইয়া খলিফাদের রাজত্বকালে ঘুররা ব্যতীত সমস্ত মুসলমানরাই মহামান্য আলীকে গালাগালি করিত। সেই বৎসরই বিদ্রোহ দমন করিতে মাহমুদকে মুলতান আসিতে হইয়াছিল এবং সেখানকার কিছু সংখ্যক বিধর্মী অধিবাসীকে হত্যা করিবার পর নাসিরের পুত্র দাউদকে বন্দী করিয়া লইয়া গজনী ফিরিয়া আসেন। তাঁহাকে ঘুরুকের দুর্গে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ রাখা হয়।

মাহমুদ ৪০২ হিজরীতে (১০১১ খ্রীঃ) হিন্দুস্তানে থানেশ্বর[১৬] জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, মুমিনদের নিকট মক্কা যেমন, পৌত্তলিকদের নিকট থানেশ্বর তেমনিই পবিত্র এবং এও শুনিয়াছিলেন, সেখানে কতিপয় মূর্তি আছে, তাহাদের মধ্যে যেটি জাগ সোমা নামে অভিহিত, সেটি নাকি

১৬ দিল্লীর ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত একটি শহর।

সৃষ্টির আদিকাল হইতেই সেখানে আছে—হিন্দুদের এই বিশ্বাস। পাঞ্জাবে পৌঁছিয়া পূর্ব শর্তানুযায়ী মাহমুদ আনন্দ পালের নিকট আশ্বাস চাহিলেন যে তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া চলিবার কালে মাহমুদের সৈন্যদিগকে কোন প্রকারে বিরক্ত করা হইবে না। সুলতান রাজাকে তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিবার জন্য দুত পাঠাইলেন এবং রাজা যেসব গ্রাম ও শহর সুলতানের অনুচরদের হাত হইতে রক্ষা করিতে উৎকণ্ঠিত সেইসব স্থানে তাঁহাকে রক্ষী সৈন্য পাঠাইতে অনুরোধ করা হইল।

সুলতানের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া আনন্দ পাল সুলতানের অভ্যর্থনার জন্য এক ভোজের আয়োজন করেন এবং সেই সঙ্গে সুলতানের শিবিরে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য প্রজাদের উপর আদেশ জারি করেন।

রাজা তাঁহার ভ্রাতাকে দুই হাজার অশ্বসহ সুলতানের শিবিরে পাঠাইলেন এবং তাঁহার ভ্রাতা রাজার পক্ষ হইতে সুলতানের নিকট নিবেদন করিলেন, "আমার ভ্রাতা সুলতানের প্রজা এবং কর দাতা। তিনি সুলতানকে এইটুকু নিবেদন করিবার অনুমতি প্রার্থনা করেন যে, থানেশ্বর অত্র দেশের অধিবাসীদের সর্বশ্রেষ্ঠ ভজনালয়। অন্য ধর্ম ধ্বংস করাই যদি মুহাম্মদের (সঃ) ধর্মের নীতি হয় তবে নগরকোট ধ্বংস করিয়া সুলতান তাঁহার সেই কর্তব্য পালন করিয়াছেন এবং তিনি যদি অনুগ্রহপূর্বক তাঁহার কল্পনা ত্যাগ করেন, তাহা হইলে আনন্দ পাল থানেশ্বরে যে কর আদায় হয় তাহার সমপরিমাণ অর্থ সুলতানকে প্রতি বৎসর প্রেরণ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকিবেন। উপরন্তু এই অভিযানে যত অর্থ ব্যয় হইয়াছে, তিনি সব নিজে প্রদান করিবেন এবং তদুপরি নিজের পক্ষ হইতে তিনি পঞ্চাশটি হস্তী ও বহু টাকা মূল্যের রত্নাদি উপহার স্বরূপ প্রদান করিবেন।"

মাহমুদ উত্তরে জানাইলে, "ইসলাম ধর্মের শিক্ষা এই : রাসুলের (সঃ) বাণী যে ব্যক্তি যতদূর বিস্তার করিবে এবং রাসুলের (সঃ) আনুগামীদের মধ্যে যাহারা পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ সাধনে যতটা তৎপরতা দেখাইবে, বেহেশ্‌তে তাহাদের জন্য তত বেশী ইনাম মজুদ থাকিবে এবং সেই জন্যই খোদার ইচ্ছায় সমস্ত ভারতবর্ষ হইতে মূর্তি পূজা দূর করিবার জন্য আমি বদ্ধপরিকর হইয়াছি। এমতাবস্থায় থানেশ্বরকে কি প্রকারে রেহাই দিতে পারি?"

এই উত্তর দিল্লীর রাজাকে জ্ঞাত করান হয়। তিনি হামলাকারীদিগকে বাধা-দানে কৃতসংকল্প হইয়া হিন্দুস্তানের সর্বত্র দুত পাঠাইয়া অন্যান্য রাজন্যবর্গকে

জানাইলেন যে, মাহমুদ বিনা কারণে তাঁহার রাজ্যস্থিত থানেশ্বর ধ্বংস করিতে আসিতেছেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, এই গর্জনকারী জল প্রবাহের মুখে অবিলম্বে যদি বাঁধ নির্মাণ না করা হয় তাহা হইলে শীঘ্রই সমস্ত হিন্দুস্তান ইহার দ্বারা প্লাবিত হইবে। সুতরাং এই বিপদ রোধ করিতে হইলে ভারতের রাজাদিগকে থানেশ্বরে তাঁহাদের সৈন্যদল সমবেত করিতে হইবে।

হিন্দুদিগকে থানেশ্বর রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় না দিয়াই মাহমুদ থানেশ্বর আসিয়া পৌঁছেন। শহর লুণ্ঠিত হইল এবং মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া চুরমার করা হইল এবং পদদলিত করিবার জন্য জাগসোমাকে গজনী প্রেরণ করা হইল। হাজী মুহাম্মদ কান্দাহারীর বিবরণে প্রকাশ : একটি মন্দিরে ৪৫০ মিস্কাল ওজনের একটা পদ্মরাগমণি পাওয়া গিয়াছিল। ইহা যাহারা দেখিয়াছে, তাহারা স্বীকার করিয়াছিল উহা এক অত্যাশ্চার্য বস্তু—এরূপ আর একটিও কেহ কোথাও আছে বলিয়া শোনে নাই।

থানেশ্বর অধিকারের পর মাহমুদ দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার আমীর ওমরাহরা তাহাকে বুঝাইয়া দেন, যতদিন মুলতানকে তিনি তাঁহার অধীনস্ত প্রদেশে পরিণত না করিয়াছেন এবং যত দিন পর্যন্ত তিনি লাহোরের রাজা আনন্দ পাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভয়শূন্য না হইতে পারিতেছেন ততদিন দিল্লীকে শাসনাধীন রাখা সম্ভবপর হইবে না। ইহা শুনিয়া মাহমুদ স্থির করিলেন, ঐসব কার্য হাসিল করিবার পূর্বে তিনি আর অগ্রসর হইবেন না। ওদিকে আনন্দ পাল মাহমুদের সঙ্গে এমন সৌজন্য ও আতিথ্যপূর্ণ আচরণ করেন যে গজনী প্রত্যাগমনের পথে সুলতানকে কোন প্রকার অসুবিধায় পড়িতে না হয়। এই সময় মুসলমান বাহিনী বহু ধন-সম্পদ ও দুই লক্ষ লোককে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া যায়। ইহাতে রাজধানী একটা ভারতীয় নগরে পরিণত হইয়াছিল। এমন কোন সৈনিক রহিল না যিনি অনেক দাস-দাসী ও সম্পদের মালিক হইলেন না। ৪০৩ হিজরীতে (১০১২ খ্রীঃ মাহমুদ তাঁহার সেনাপতি আলতুনতান ও আরসালান জাজিবকে জুর্জিস্তান[১৭] অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। ওখানকার সুলতান সর-আবু নসরকে বন্দী করিয়া আনা হয়। হিন্দুস্তানে যে অর্থে রাজা এবং রোমে সিজার ব্যবহার

১৭ জুর্জিস্তানকে কোন কোন স্থানে ঘিরজিস্তান বলা হইয়াছে।

করা হয়, তুর্কীদের মধ্যে সেই অর্থে সর আখ্যা ব্যবহৃত হয়। এই সময় মাহমুদ বোগদাদের খলিফাকে লিখিয়াছিলেন, "যেহেতু খোরাসানের বৃহত্তর অংশ তাঁহার অধিকারে আছে, সেই জন্য খলিফা যেন অবশিষ্ট অংশও তাঁহাকে (মাহমুদকে) হস্তান্তর করিবার জন্য তাঁহার শাসনকর্তাকে নির্দেশ দান করেন। মাহমুদের অপরিমিত শক্তিতে ভীত হইয়া খলিফা বিনাদ্বিধায় ইহাতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। খলিফা সহজেই রাজী হইলেন দেখিয়া মাহমুদ এইবার তাঁহাকে সমরকন্দ হস্তান্তর করিবার আদেশ প্রেরণ করিতে বলেন। খলিফা এই প্রস্তাবে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবার পর মাহমুদ তাঁহাকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া পত্র লিখিয়া দিলেন এবং তাহার দাবীর পুনরুক্তি করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "যদি অবিলম্বে সমরকন্দ হস্তান্তরের আদেশ প্রেরণ করা না হয় তবে তিনি বোগদাদ আক্রমণ করিয়া খলিফাকে হত্যা করিবেন। এবং তাঁহার সমস্ত সম্পদ গজনী লইয়া আসিবেন।" খলিফা রুষ্ট হইয়া তাঁহাকে শান্ত অথচ দৃঢ়তাব্যঞ্জক স্বরে এক পত্র লিখিলেন। ইহার পর মাহমুদ আর কখনও তাঁহার এই দাবী উত্থাপন করেন নাই।

৪০৪ হিজরীতে (১০১৩ খ্রী:) মাহমুদ বুলনাত পর্বতে[১৮] অবস্থিত নিন্দুনা দুর্গের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনী রওনা করিয়া দেন। এই দুর্গ তখন লাহোরের রাজার অধীনে ছিল। কিছুদিন পূর্বে আনন্দ পালের মৃত্যু হইয়াছিল এবং তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জয়পাল তাহার স্থলাভিষিক্ত হইয়াছিলেন। জয়পাল[১৯] বুঝিলেন সুলতানের মোকাবিলা করা তাঁহার সাধ্যাতীত। এই জন্য রাজধানী রক্ষার জন্য সামান্য কিছু সৈন্য রাখিয়া অবশিষ্ট বাহিনী লইয়া তিনি কাশ্মীর চলিয়া যান। মাহমুদ সঙ্গে সঙ্গেই দুর্গ অবরোধ করেন এবং সুরঙ্গ খনন ও আরও অন্য প্রকারে আক্রমণ চালাইয়া দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। মাহমুদ অবরুদ্ধ সৈন্যদিগকে প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। কিন্তু দুর্গে যা কিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল সব তিনি হস্তগত করিলেন। সেখানে নূতন শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া মাহমুদ কালবিলম্ব না করিয়া কাশ্মীরের

---

১৮ বুলনাতের বিবরণের জন্য লেডেন-এর বাবুর দ্রষ্টব্য।

১৯ হিন্দুরা সাধারণত: তাহাদের সন্তানদের পিতামহের নাম দেয়, এই বিশ্বাসে যে, মৃত্যুর পর পিতামহের যদি পুনরায় জন্ম হয় তাহা হইলে তাহার আত্মা ঐ শিশুর শরীরে প্রবিষ্ট হইবে।

পথে রওয়ানা হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া লাহোরের রাজা কাশ্মীর ত্যাগ করিয়া পার্বত্যাঞ্চলে পলাইয়া গেলেন, মাহমুদ কাশ্মীর লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসীদিগকে রাসুলুল্লার (সঃ) প্রতি ঈমান আনিতে বাধ্য করিলেন এবং প্রচুর লুন্ঠিত দ্রব্য লইয়া রাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন।

৪০৬ হিজরীতে (১০১৫ খ্রীঃ) কতকগুলি বিদ্রোহী দলপতিকে শাস্তিদান করিতে এবং প্রাক্তন অভিযানে যে সব দুর্গ অধিকার করেন নাই, সেগুলি অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে মাহমুদ পুনরায় সসৈন্যে কাশ্মীর আগমন করেন।

উচ্চতা ও দৃঢ়তার জন্য প্রসিদ্ধ লোকোট ছিল ইহাদের মধ্যে প্রধান। এই দুর্গ জয়ে সুলতানের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল এবং সারা গ্রীষ্মকালে ইহা অধিকার করিতে না পারিয়া শীতের আগমনে প্রচেষ্টা ত্যাগ করিয়া গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। ফিরিবার কালে পথ প্রদর্শক কর্তৃক বিপথে পরিচালিত হইয়া তিনি এক বিশাল জলাভূমিতে প্রবেশ করেন এবং কয়েকদিন পর্যন্ত সেই জলাভূমি হইতে সৈন্য বাহিনী নিষ্ক্রান্ত করিতে না পারায় অনেক সৈন্য মারা যায়। তাঁহার এই অভিযান সর্বোতোভাবেই ব্যর্থ হইয়াছিল।

খারিজমের সুলতান আবুল আব্বাস মামুন এই বৎসরই তাঁহার ভগ্নীর পাণিপ্রার্থী হইয়া মাহমুদের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন এবং সুলতান এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া তাঁহার ভগ্নীকে খারিজম পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

৪০৭ হিজরীতে (১০১৫ খ্রীঃ) আবুল আব্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হয় এবং ষড়যন্ত্রকারীরা তাঁহার দেহরক্ষী বাহিনীকে পরাস্ত করে; সুলতান উহাদের হাতে ধৃত হন এবং তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই দুঃসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মাহমুদ প্রথম বল্‌খ এবং পরে সেখান হইতে খারিজম গমন করেন। খুজারবন্দে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার সেনাপতি মাহমুদ-বিন-ইব্রাহীম তাইকে অগ্রগামী হইতে নির্দেশ দেন। এই বিচ্ছিন্ন বাহিনী সীমান্ত অতিক্রম করিবার পর একদিন যখন নামাজে রত ছিল, সেই সময় খারিজম সেনাপতি খামারতাস নিকটস্থ জঙ্গল হইতে নির্গত হইয়া উহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং তাহাদের বহু লোককে হত্যা করিয়া অবশিষ্ট সৈন্যদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করে। এই দুর্ঘটনার সংবাদ পাইয়া মাহমুদ তাহাদের সাহায্যার্থে বিরাট বাহিনী প্রেরণ করেন। তাহাদের মধ্যে তাঁহার দেহরক্ষী সৈন্যদলও

ছিল। ইহাতে ইব্রাহিম তাই-এর সৈন্যদের মনোবল ফিরিয়া আসে এবং তাহারা একত্রিত হইয়া শত্রুবাহিনীকে আক্রমণ ও পরাস্ত করিয়া তাহাদের সেনাপতিকে বন্দী করিয়া সুলতানের সম্মুখে হাজির করে। হাজারাস্প্ নামক স্থানে খারিজমরা তাঁহার মোকাবিলা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল, কিন্তু তাহারা শীঘ্রই পরাস্ত হইল এবং তাহাদের সেনাপতি বোখারানিবাসী সিপাতগীন বন্দী হইলেন। আবুল আব্বাসের খুনীকে তার পাপের উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা হইল। মাহমুদ শাসন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করিতে কিছু সময় ব্যয় করিবার পর আলতুনতাস আমীর হাজিবের হস্তে শাসনভার ন্যস্ত করিলেন এবং তাহাকে খারিজমের[২০] সুলতান উপাধি প্রদান করিলেন। তিনি অরকুণ্ডী[২১] প্রদেশও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। বল্খে ফিরিয়া মামুদ তাঁহার পুত্র শাহজাদা আমীর মাসুদকে হিরাটের শাসনকর্তার পদ অর্পণ করেন এবং আবু সোলে মুহম্মদ-বিন-হোসেন জওজুনীকে তাঁহার উজির নিযুক্ত করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা আমীর মুহাম্মদকে আবুবকর কোহিস্তানীর তত্ত্বাবধানে কুরকানের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। খারিজমের ব্যাপার চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি করিবার পর গজনী বাহিনীকে শীতকালের জন্য বুস্টে ঘাটি করিয়া রাখা হইল।

৪০৯ হিজরীর (১০১৭ খ্রীঃ) বসন্তকালে মাহমুদ সমস্ত তুর্কীস্তান, মা-উরা-উন্নাহার, খোরাসান ও তৎসংলগ্ন প্রদেশগুলি হইতে ১,০০,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী এবং ২০,০০০ পদাতিক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কনৌজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। দরবারে পিতা গুশ্তাসপের পর আর কোন বিদেশী শত্রু কনৌজে আগমন করেন নাই। গজনী হইতে কনৌজ তিন মাসের পথ এবং পথে সাতটি নদী অতিক্রম করিতে হয়, মাহমুদ কাশ্মীর সীমান্তে উপস্থিত হইলে কাশ্মীরে মাহমুদ কর্তৃক নিয়োজিত রাজা কাশ্মীরে প্রাপ্ত বহু মূল্যবান চমকপ্রদ দ্রব্য মাহমুদকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। তাঁহাকেও মাহমুদের বাহিনীর সঙ্গে গমনের নির্দেশ দেওয়া হইল। অনেক কষ্টে, সুদীর্ঘ দুর্গম পথে সৈন্য চালনা করিয়া

---

২০ খারিজমের প্রাচীন নাম কোরাস্মিঞা। খারিজম একটি শহর—ইহার নামানুসারে সেই প্রদেশ পরিচিত যেমন আমরা বলিয়া থাকি ইয়র্ক শহর ও ইয়র্ক জিলা।

২১ ইহাকে অনেকস্থানে অরগুনজ্ লেখা হইয়াছে।

সুলতান অবশেষে হিন্দুস্তানের সমভূমিতে আসিয়া প্রবেশ করেন এবং সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া কনৌজের দিকে অগ্রসর হইলেন।

এখানে এক শহর তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল, যাহার গর্বোন্নত শির[২২] আকাশ স্পর্শ করিয়াছে এবং দৃঢ়তা ও সৌন্দর্যে জগতে যহোর জুড়ি নাই। এই সমৃদ্ধশালী নগরের অধিপতি কুবর রায় মহাআড়ম্বর ও প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু সহসা আক্রান্ত হওয়ায় তিনি আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা সৈন্য সমাবেশ করিতে পারিলেন না। বিশাল শত্রুবাহিনী ও তাহাদের বীরত্বব্যঞ্জক আকৃতি দেখিয়া ভীত হইয়া তিনি শান্তি প্রার্থনা করিবেন স্থির করিলেন এবং তদনুযায়ী সমস্ত পরিবার-পরিজনসহ গজনী শিবিরে যাইয়া সুলতান মাহমুদের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন। হাবিব-উস-সিয়ারের লেখক এমনও বলিয়াছেন যে, তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। গজনী সুলতান সেখানে মাত্র তিন দিন অবস্থান করিবার পর মিরাটের পথে রওয়ানা হন। তথাকার রাজা হরদত্ত দুর্গে সামান্য কিছু সৈন্য রাখিয়া অধিকাংশ সৈন্যসহ পলায়ন করেন এবং দুর্গবাসী সৈন্যরা কয়েক দিনের মধ্যেই আত্মসমর্পণ করিয়া মাহমুদকে ২,৫০,০০০ রৌপ্য দিনার ও ৩০টি হস্তী প্রদান করে।

সুলতান সেখান হইতে যমুনা তীরস্থ মহাভন দুর্গে গমন করেন। মহাভনের রাজা কুল চাঁদ তাহার সৈন্যবাহিনীসহ আত্মসমর্পণ করিবার জন্য বাহির হইয়া আসেন; কিন্তু উভয় পক্ষের কতিপয় সৈন্যের মধ্যে আকস্মিকভাবে কলহ সৃষ্টি হওয়ায়, তুমুল যুদ্ধ বাঁধিয়া যায়। অধিকাংশ হিন্দু সৈন্যই যমুনায় ঝাঁপাইয়া পড়ে। রাজা নিরাশ হইয়া সেখানেই স্ত্রী ও পুত্র কন্যাকে হত্যা করিয়া তলোয়ারের ফলা নিজের দেহে প্রবেশ করাইয়া প্রাণ ত্যাগ করেন। দুর্গ পরে আত্মসমর্পণ করে এবং বিজয়ীদের হাতে প্রভূত ধন সম্পদ ও অন্যান্য লুণ্ঠিত দ্রব্য পতিত হয়। উহাদের মধ্যে ৮০টি হস্তীও ছিল।

মাহমুদ এখানে শুনিলেন কিছু দূরেই মথুরা নগর অবস্থিত। হিন্দুদের নিকট ঈশ্বরের অবতাররূপে পূজিত কৃষ্ণবাসুদেবের নামে এই নগর উৎসর্গীকৃত। সৈন্যদিগকে বিশ্রাম দানে সতেজ করিবার পর মাহমুদ মথুরাভিমুখে

---

২২ প্রাচ্যদেশে এই প্রকার উপমায় অত্যধিক গর্ব প্রকাশ করা হয়।

যাত্রা করিলেন। মথুরা দিল্লীর অধীন ছিল। দিল্লী রাজ্যের সেনাবাহিনী কর্তৃক মৃদু বাধাপ্রাপ্তির পর, তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া লুটপাট আরম্ভ করেন এবং মূর্তিগুলির কতকগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন ও কতকগুলি জ্বালাইয়া দিলেন। তিনি এখানে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য লাভ করেন। কারণ মূর্তিগুলি স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত ছিল। মন্দিরটাও তিনি ভাঙ্গিবেন স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা অত্যন্ত পরিশ্রম সাপেক্ষ হইবে বিবেচনায় তিনি বিরত হন। আবার কেহ কেহ বলেন, মন্দিরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। গজনীর শাসনকর্তার নিকট মাহমুদ যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চয়ই এই নগর ও ইহার অট্টালিকাগুলির অতিরঞ্জিত বিবরণ প্রদান করিয়াছিলেন। সেই পত্রের এক স্থানে লেখা ছিল ঃ "এখানে হাজার খানেক প্রাসাদ আছে যাহা বিশ্বাসীদের ঈমানের মতই মজবুত। অসংখ্য মন্দির এবং প্রাসাদাবলীর অধিকাংশই মার্বেল প্রস্তরে নির্মিত। এই নগরী বর্তমান অবস্থায় আসিতে সম্ভবতঃ বহু লক্ষ দিনার ব্যয় হইয়া গিয়াছে। দুই শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও এরূপ আর একটি প্রাসাদ নির্মাণ করা সম্ভবপর হইবে না।"

মথুরার মন্দিরগুলিতে চারিটি স্বর্ণনির্মিত মূর্তি ছিল, যাহাদের চক্ষু ছিল পদ্মরাগ মণি দ্বারা গঠিত। ঐ মূর্তিগুলির মূল্য ছিল ৫০,০০০ দিনার।[২৩] অন্য আর একটি মূর্তিতে ৪০০ মিস্‌কাল ওজনের একটি নীলকান্ত মণি পাওয়া গিয়াছিল এবং মূর্তিটা গলাইয়া ৯,৮৩,০০০ বিশুদ্ধ স্বর্ণ পাওয়া গিয়াছিল। সুবর্ণ মূর্তিগুলি ছাড়াও সেখানে একশতের উপর রৌপ্য মূর্তি ছিল, যে-সব বহন করিতে শতাধিক উষ্ট্র লাগিয়াছিল।[২৪] সুলতান মথুরায় কুড়িদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। এই সময় লুণ্ঠনের ক্ষতি ছাড়াও অগ্নিকাণ্ড দ্বারা শহরের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করা হইয়াছিল। অবশেষে, সুলতান এক নদীর তীর বরাবর চলিতে আরম্ভ করেন। ঐ নদী তীরে সাতটি সুরক্ষিত দুর্গ ছিল। একাদিক্রমে উহাদের সবগুলির পতন ঘটে। এইসব স্থানে আরও কতকগুলি অতি প্রাচীন মন্দির দেখা গিয়াছিল। হিন্দুদের মতে সেগুলি চারি হাজার বৎসর যাবৎ সেখানে বিদ্যমান ছিল।

---

২৩ ২,২২,৩৩৩ পাউণ্ড।

২৪ একশত উট ১,৫০,০০০ পাউণ্ডের অধিক রৌপ্য বহন করিতে পারে না।

এইসব মন্দির ও দুর্গ লুণ্ঠন করিবার পর মুন্‌য্[২৫] দুর্গাভিমুখে সৈন্য চালনা করা হয়। এই দুর্গ রাজপুত সৈন্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। উহারা পঁচিশ দিন যাবৎ আক্রমণ প্রতিহত করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু শেষে যখন তাহারা দেখিল যে দুর্গ রক্ষার কোন উপায় নাই, তখন তাহারা দুর্গের ভগ্নস্থানের মধ্য দিয়া শত্রু-বাহিনীর উপর লাফাইয়া পড়িয়া মৃত্যুবরণ করিতে লাগিল। কেহ কেহ প্রাচীরের উপর হইতে লাফ দিয়া নীচে পড়িয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইতে লাগিল। অনেকেই আবার স্ত্রী সন্তান সহ স্ব স্ব গৃহে পুড়িয়া মরিল। এইরূপে দুর্গে একটি প্রাণীও জীবিত রহিল না। এখানে যাহা কিছু মূল্যবান দ্রব্য ছিল, সব সংগ্রহ করিয়া মাহমুদ চাঁদ পালের দুর্গ অবরোধ করেন। তিনি পূর্বাহ্ণেই তাহার সমস্ত ধনরত্ন পাহাড়ে পাঠাইয়া দিয়া সুলতানের আগমনের পূর্বেই দুর্গ খালি করিয়া ভাগিয়া পড়িয়াছিলেন। যাহাহউক ইহা সত্ত্বেও সেখানে লুট করিবার মত অনেক দ্রব্য ও খাদ্য পাওয়া গিয়াছিল। মাহমুদ সে-সব তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিয়াছিলেন।

মাহমুদ সেখান হইতে চন্দ্র রায় নামক আর এক রাজার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কয়েকটি সংঘর্ষের পর রাজা বুঝিলেন, মুসলমানদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তাঁহার কর্ম নয়। তখন তিনি তাঁহার ধনরত্ন ও অন্যান্য দ্রব্যাদি পাঠাইয়া দিয়া, নিজে পর্বতাভ্যন্তরে পালাইয়া গেলেন। চন্দ্র রায়ের বিশালকায় এক হস্তী ছিল। এত বড় হাতী ইতিপূর্বে হিন্দুস্তানে কখনও দেখা যায় নাই। কিন্তু বিশালতা অপেক্ষা আনুগত্য ও সাহসের জন্যই ইহা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। এই হাতীর সুখ্যাতি শুনিয়া মাহমুদ লোক মারফত রাজাকে হাতীটি তাঁহাকে প্রদান করিতে বলিলেন এবং বিনিময়ে অনেক অর্থ ও সুবিধাজনক সন্ধির শর্ত প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু চন্দ্র রায়ের অহঙ্কার তাঁহাকে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হতে বিরত রাখে। সুতরাং মাহমুদের আশা পূর্ণ হইল না। কিন্তু হাতীটি পরে এক রাত্রে শিকল ছিঁড়িয়া মাহুতের নিকট হইতে পলাইয়া গজনভী শিবিরে চলিয়া আসে। সেখানে ইহা পৃষ্ঠে

২৫ নাম যদি শুদ্ধভাবে লেখা হইয়া থাকে, তবে বলিতে হয় এই স্থানের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণীত হয় নাই।

আরোহণ করিতে দিল এবং তাহাকে সুলতানের সম্মুখে হাজির করা হইল। সুলতান উহার নাম দিলেন, "খোদাদাদ" বা "খোদার দান"। কেননা অপ্রত্যাশিতভাবে ইহা সুলতানের হাতে পড়িয়াছিল। লুটের মাল ভারাক্রান্ত ও অসংখ্য বন্দী পরিবৃত হইয়া মাহমুদ গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। গজনীতে তিনি তাহার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ইহাদের মধ্যে ছিল ২০,০০০,০০০ দারম্[২৬] স্বর্ণ ও রৌপ্য পিণ্ড, ৫৩,০০০ বন্দী, ৩৫০টি হস্তী। ইহা ছাড়াও এত অধিক মণি মুক্তা ও অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্যাদি ছিল যে তাহাদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সরকারী কোষাগারে যাহা জমা হইল, সৈন্যদের ব্যক্তিগত লুটের মালগুলি একত্রে তাহা অপেক্ষা কম ছিল না।

ফিরিবার পর মাহমুদ মার্বেল ও গ্রানাইট প্রস্তর দ্বারা এমন এক সুরম্য মস্‌জিদ নির্মাণ করাইলেন যাহার সৌন্দর্য প্রত্যেক দর্শককে মুগ্ধ করিত। এই মস্‌জিদটি তিনি মহামূল্য কার্পেট, ঝাড় লণ্ঠন এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যালঙ্কার দ্বারা সুসজ্জিত করেন এবং ইহাকে সকলে "বেহেশতী দুলহীন" নামে অভিহিত করিয়াছিল। এই মস্‌জিদের পার্শ্বে সুলতান একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তাহাতে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত বহু চমকপ্রদ গ্রন্থের সমাবেশ করেন এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বহু অর্থ মঞ্জুর করেন। উপরন্তু ছাত্রদের ব্যয় নির্বাহের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ করিয়া তাহাদিগকে কলা ও বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

প্রাসাদাদি নির্মাণের দিকে সুতানের ঝোঁক লক্ষ্য করিয়া আমীর ওমরাহরাও পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করিয়া ব্যক্তিগত প্রাসাদ ও সরকারী ভবনগুলি জমকালো করিয়া নির্মাণ করতঃ শহরের শোভা বর্ধন করিতে লাগিলেন। এইভাবে অল্পকালের মধ্যেই রাজধানীর মস্‌জিদ, ফোয়ারা, সরোবর, পয়নালা, চৌবাচ্চা প্রভৃতি দ্বারা অলংকৃত হইল। প্রাচ্যে আর কোন শহর ইহার সমকক্ষ রহিল না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, হিন্দুস্তান হইতে তিনি যে-সব আশ্চর্য জিনিস আনিয়াছিলেন উহাদের মধ্যে ঘুঘুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট একটি পাখী ছিল। এই পাখীটির একটি আশ্চর্য গুণ ছিল। যে গৃহে সে

---

২৬ দারমের মূল্য ৫ পেঃ ধরিলে, এই সংখ্যা ৪১৬, ৬৬৬ পাউণ্ডের স্টার্লিং-এর অধিক হইবে না।

থাকিত সেখানে যত গোপনেই কোন বিষাক্ত দ্রব্য রাখা হউক সে তাহা টের পাইত। কথিত আছে, ঘরে বিষ থাকিলে পাখীটি উহার গন্ধে অতিষ্ঠ হইয়া খাঁচার মধ্যে ছটফট করিতে থাকিত এবং এই সময় তাহার চক্ষু দিয়া অবিরল অশ্রু ঝরিত। অন্যান্য চমকপ্রদ বস্তুর সঙ্গে এই পাখীটিও বাগ্দাদের খলিফা আলকাদির বিল্লাকে উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকরা একটা পাথরের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। এই পাথর পানিতে ডুবাইয়া কোন ক্ষতস্থানে লাগাইলে ক্ষত সত্বর শুকাইয়া যাইত।

৪১০ হিজরীতে (১০১৯ খ্রীঃ) সুলতান তাঁহার অভিযানগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া খলিফার নিকট প্রেরণ করেন। খলিফা এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিয়া এই বিবরণ জনসাধারণকে পাঠ করিয়া শুনাইবার ব্যবস্থা করেন। এইরূপে খলিফা সুলতানের ধর্মানুরাগে আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৪১২ হিজরীতে (১০২১ খ্রীঃ) প্রজারা সুলতানের নিকট এক অভিযোগ আনয়ন করিলেন। অভিযোগে বলা হইয়াছিল যে, কতিপয় আরব সম্প্রদায়ের লোক বহু বৎসর যাবৎ মক্কা গমনের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। উহাদের ভয়ে এবং নিজেদের দুর্বলতার দরুন খলিফা উহাদিগকে দমন করিতে অবহেলা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন। খলিফার ক্ষমতায় অবশ্য অনেকদিন পূর্বেই ভাটা পড়িয়াছিল। ফলে হজ্জযাত্রীদের পক্ষে রাসুলুল্লাহর (সঃ) পুণ্যভূমিতে যাইয়া ভক্তি নিবেদন করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুলতান অবিলম্বে কাজী-উল-কুজ্জাত[২৭] আবু মুহাম্মদকে বহু সংখ্যক সৈন্যসহ কাফেলার সঙ্গে মক্কা গমনের জন্য নিযুক্ত করিলেন। শত্রুরা অধিক শক্তিশালী হইলে উহাদের নিকট হইতে নিরাপদে মক্কা পর্যন্ত ভ্রমণের সুবিধা ক্রয়ের জন্য সঙ্গে ৩০,০০০ দারম্ অর্থও প্রেরণ করেন। ইহার ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর কয়েক সহস্র লোক হজ্জ গমনে প্রস্তুত হইল।

কাফেলা কায়েদ নামক মরুভূমিতে পৌছিলে, পথের উপর আরবদের এক বিরাট ছাউনি দৃষ্টিগোচর হইল। হজ্জযাত্রীদের আক্রমণ করিবার জন্য এই দস্যুদল কাতারবন্দী হইয়া দাণ্ডায়মান হইল। আপোসের জন্য আবু মুহাম্মদ উহাদের সর্দারের নিকট দূত পাঠাইয়া ৫,০০০ দারম্ প্রদান করিতে

২৭ একাধারে প্রধান বিচারপতি ও প্রধান ধর্মযাজক।

চাহিলেন। সর্দার হামিদ বিন-আলী এই প্রস্তাবের কথা শুনিয়াই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল। প্রস্তাবে রাজী হওয়াতো দূরের কথা তৎক্ষণাৎ কাফেলা আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। আবু মুহাম্মদ ইতিমধ্যেই তাঁহার সৈন্যদিগকে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। কাফেলার সঙ্গে এক তুর্কী ক্রীতদাস ছিল। সে ছিল এক জন সুদক্ষ তীরন্দাজ। সৌভাগ্যক্রমে যুদ্ধের শুরুতেই সে হামিদ-বিন আলীর মগজে একটা তীর বিদ্ধ করেন। সর্দারের পতনে আরবরা পলাইয়া গেল। অতঃপর কাজী নির্বিঘ্নে মক্কা গমন করেন এবং হজ্জ কার্য সমাধা করিয়া একই পথে গজনী ফিরিয়া আসেন।

মাহমুদ এই বৎসর ভারত হইতে সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে প্রতিবেশী রাজারা কনৌজাধিপতি কুবর রায়কে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতেছে। তাঁহার অপরাধ—তিনি সুলতানের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করিয়াছিলেন এবং সুলতানের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। মাহমুদ তৎক্ষণাৎ কনৌজ-রাজের সাহায্যে রওয়ানা হন, কিন্তু তিনি পৌঁছিবার পূর্বেই কালিঞ্জরের রাজা নন্দ রায় কনৌজ অবরোধ করিয়া কুবর রায় ও তাঁহার কয়েকজন সেনাপতিকে হত্যা করেন। মাহমুদ যমুনার তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করিলেন যে, যে লাহোরের রাজা তাঁহার সৈন্যের আগমনে পলাইয়া গিয়াছেন, এইবার তিনি নদীর অপর পাড়ে শিবির স্থাপন করিয়া তাঁহাকে বাধা দানের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। নদী গভীর ও প্রশস্ত বলিয়া তখনই আক্রমণ করা সম্ভব হইল না। এই উৎকণ্ঠায় মধ্যে একদিন ভোরে মাহমুদের দেহরক্ষীবাহিনীর ৮ জন সৈন্য বিনা হুকুমে সন্তরণ করিয়া নদী পার হইয়া সহসা শত্রু-শিবিরে প্রবেশ করিয়া এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করিয়াছিল যে হিন্দুরা সকলে পলায়ন করিতে লাগিল। তাঁহাদের চেষ্টা সাফল্যজনক হইয়াছিল, কিন্তু তবুও সুলতান দেহরক্ষী সৈন্যদের এই হটকারিতার নিন্দা করিয়াছিলেন। যাহা হউক, সুলতান উহাদের জন্য অবশিষ্ট সৈন্য তৎক্ষণাৎ প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহারা শত্রুর পশ্চাতে ধাবিত হইল। আটজন লোক এক বিরাট সৈন্যবাহিনীকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিল, ইহা বিশ্বাস্য নয়। এই আট ব্যক্তির প্রত্যেকেই সেনানায়ক ছিল এবং নিশ্চয়ই তাহাদের বাহিনী পিছু পিছু গিয়াছিল।

কালিঞ্জরের নন্দরায় তাহার রাজ্যের সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করিলেন এবং ৩,৬০০০ অশ্বারোহী, ৪৫,০০০ তিন পদাতিক ও ৬৪০টি হস্তী লইয়া মাহমুদকে বাধাদানের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গজনীর সুলতান একটা উচ্চস্থান হইতে শত্রুবাহিনী দর্শন করিয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া আল্লার নিকট মোনাজাত করিলেন, এবার যেন ইসলামের পতাকা সমুন্নত থাকে। তখন বেলা অনেক হইয়াছিল। এই জন্য তিনি পলদিন সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু এই বিলম্বের ফলে তাঁহার রণ-পিপাসা অতৃপ্ত রহিয়া গেল। কারণ নন্দরায় রাত্রিকালে শিবির ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি পরিত্যাগ করিয়া বিশৃঙ্খলভাবে পলায়ন করেন।

মাহমুদ দূর হইতে স্থানটি দর্শন করিয়া বুঝিলেন উহা সত্য সত্যই শত্রুশূন্য। তখন তিনি তাহার সৈন্যবাহিনীকে শত্রু শিবিরে প্রবেশ করিবার আদেশ করেন। শিবিরে প্রচুর লুটের মাল পাওয়া গেল। তদুপরি নিকটবর্তী অরণ্যে ৫৮০টি হস্তীও পাওয়া গেল। তলোয়ার ও অগ্নি দ্বারা দেশ ছারখার করিয়া মুসলমান বাহিনী গজনী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

সুলতান এই সময় অবগত হইলেন যে, কুরিয়াত ও নারডাইন[২৮] নামক দুইটি এলাকার পার্বত্য জাতি তখন পর্যন্ত মূর্তিপূজা করিয়া আসিতেছিল এবং তাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাই। হিন্দুস্তান ও তুর্কীস্তানের মাঝখানে অবস্থিত এই অঞ্চলটির আবহাওয়া অত্যন্ত শীতল। কিন্তু এই অঞ্চল উৎকৃষ্ট ফলের জন্য বিখ্যাত ছিল। এই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প লইয়া মাহমুদ তাহাদের দেশের দিকে রওয়ানা হইলেন এবং তিনি ফিরিয়া আসিবার পরও যাহাতে উহাদের মনে ভয় থাকে, সেই জন্য তিনি সেই অঞ্চলে একটি দুর্গ নির্মাণের উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক ওস্তাগার, সূত্রধর, কর্মকার ও মজুর সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। কুরিয়াতের শাসক, সুলতানকে বাধাদানে অসমর্থ হইয়া আত্ম-সমর্পণ করেন এবং সেই সঙ্গে রসুলুল্লার (সঃ) ধর্ম গ্রহণ করেন। আরসালান জাজিবের পুত্র গজনীর সেনাপতি আমীর আলীকে একদল সৈন্যসহ নারডাইন অধিকারে প্রেরণ করা হয়। তিনি নারডাইন অধিকার করেন এবং দেশ লুণ্ঠন করিয়া বহুলোককে বন্দী করিয়া আনেন। নারডাইনে একটা মন্দির ছিল,

২৮ শত চেষ্টা করিয়াও এই স্থানগুলির অবস্থিতি নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই।

আমীর আলী ইহা ধ্বংস করেন। ঐ মন্দির হইতে একটা প্রস্তর আনা হইয়াছিল, যাহাতে কিছু অদ্ভুত লিপি খোদিত ছিল। হিন্দুদের মতে উহা ৪০,০০০ বৎসর পূর্বেকার শিলালিপি। সুলতান সেই স্থানে একটি দুর্গ নির্মাণের হুকুম দিলেন এবং সেই দুর্গটি আমীর-বিন-কুদ্দর সেলজুকীর কর্তৃত্বাধীনে রাখিয়া আসেন। ইহার অনতিকাল পরে মাহমুদ কাশ্মীরের পথে যাত্রা করেন এবং পথে সুদৃঢ় লোকোট দুর্গ ঘেরাও করেন; কিন্তু ইহাকে অজেয় বিবেচনা করিয়া তিনি সেখান হইতে রওয়ানা হইয়া লাহোর পৌঁছেন এবং বিনা বাধায় শহরে প্রবেশ করিয়া সৈন্যদিগকে বেপরোয়াভাবে লুটপাটের জন্য ছাড়িয়া দেন। এখানে এতো ধনসম্পদ ও মূল্যবান দ্রব্যাদি সুলতানের হাতে পড়িয়াছিল যে, তাহা পরিমাপ করা সাধ্যাতীত ছিল। এমন শক্তিশালী শত্রুর মোকাবিলা করা তাহার পক্ষে সম্ভব নয় বলিয়া, লাহোরের রাজা নিরাপত্তার জন্য আজমীর পলাইয়া যান। মাহমুদ তাহার সেনাপতিকে এই স্থানের শাসনকর্তা এবং অন্য কয়েকজন সেনাপতিকে হিন্দুস্তানের অন্যান্য অঞ্চলের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া নিজে বসন্ত-কালে গজনী প্রত্যাবর্তন করেন।[২৯] মাহমুদের রণদুর্মদ স্বভাব বেশীদিন শান্তিতে রহিল না। ৪১৪ হিজরীতে (১০২৩ খ্রীঃ) তিনি পুনরায় লাহোরের পথে কালি-ঞ্জরের নন্দ রায়ের বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। গোয়ালিয়র দুর্গের পার্শ্ব দিয়া চলিবার কালে তিনি উহা অবরোধ করিবার হুকুম দিলেন। গোয়ালিয়রের রাজা সময় মত নানা মূল্যবান উপহার ও ৩৫টি হস্তী প্রদান করিয়া মাহমুদকে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করিয়া লইতে রাজী করিলেন। গজনী বাহিনী অতঃপর কালিঞ্জরের দিকে রওয়ানা হইল। দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে নন্দ রায় অন্যান্য উপহারাদি ছাড়াও ৩০০টি হস্তী প্রদান করিবার অঙ্গীকারে শান্তি ভিক্ষা করিলেন। সুলতান ইহাতে রাজী হইলেন। রাজা সুলতানের সৈন্যদের বাহাদুরী পরীক্ষা করিবার জন্য হস্তীগুলিকে মাদকদ্রব্য সেবন করাইয়া উন্মত্তাবস্থায় বিনা মাহুতে সুলতানের শিবিরের দিকে তাড়াইয়া দিলেন। মাহমুদ হাতীগুলিকে আসিতে দেখিলেন এবং উহাদের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব লক্ষ্য করিয়া প্রকৃত কারণ উপলব্ধি করিয়া ফেলিলেন। তিনি তখন একদল বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্যকে হস্তীগুলি ধরিতে এবং তাহা

---

২৯ ২৩ বৎসর পরে সিন্ধু নদীর পশ্চিম পাড়ে এই প্রথম মুসলমান শাসনকর্তা মোতায়েন করা হয়।

সম্ভব না হইলে বধ করিতে অথবা তাড়াইয়া দিতে হুকুম দিলেন। সুলতানের সম্মুখে বাহাদুরী দেখাইতে কতিপয় উদগ্রীব তুর্কী বীর নির্ভয়ে অগ্রসর হইয়া কয়েকটি হাতীতে আরোহণ[৩০] পূর্বক অবশিষ্ট হস্তীগুলিকে নিকটবর্তী জঙ্গলে তাড়াইয়া দিলেন। সেখানে পরে সবগুলি জন্তুকে বশীভূত করা হয়। গজনভীদের অসীম সাহস দেখিয়া শক্ররা অত্যন্ত ভীত হইল, নন্দরায় মাহমুদকে তোষামদে খুশী করিবার জন্য তাঁহার সৈন্যদের প্রশংসা করিয়া ভারতীয় ভাষায় এক কবিতা রচনা করিয়া সুলতানকে প্রেরণ করেন। সুলতান এই প্রশংসাসূচক কবিতা শুনিয়া অত্যন্ত প্রীত হইলেন। এবং মাহমুদের সভায় যত আরব ও পারসিক পণ্ডিত ছিল ঐ কবিতা সকলের প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। বিনিময়ে সুলতান নন্দরায়ের উপর ১৫টি দুর্গের কর্তৃত্ব ন্যস্ত করেন—উহাদের মধ্যে কালিঞ্জরও ছিল। নন্দরায় অবশ্য এই সময় স্বর্ণ ও রত্নাদি সম্বলিত বহু মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিয়াছিলেন এবং প্রধানতঃ তাহার দৌলতেই রেহাই পাইয়াছিলেন।

মাহমুদ ৪১৫ হিজরীতে (১০২৪ খ্রীঃ) সমস্ত ফৌজ একত্রিত করিয়া দেখিলেন যে, উহাদের মধ্য হইতে ৫৪,০০০ বাছাই অশ্বারোহী ১,৩০০ হস্তী বিদেশে নিয়োগ করিতে পারেন। এই বাহিনী লইয়া তিনি মা-উরা-উন্নাহার হইতে আলিতুগীনকে বহিষ্কার করিবার জন্য বল্‌খ্‌ রওয়ানা হইলেন। আলিতুগীন মা-উরা-উন্নাহারের শাসনকর্তা ছিলেন এবং প্রজারা তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া সুলতানের নিকট তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিল। সুলতান মাহমুদ আমু দরিয়া পার হইয়াছেন শুনিয়া মা-উরা-উন্নাহার আমীররা নানা উপহারাদি লইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। খুতামের কুদ্দুর খানও তাঁহার সঙ্গে সৌজন্যসূচক মোলাকাত করিতে আসিলেন এবং তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হইল। মাহমুদ এক ভোজের আয়োজন করেন এবং তাহাদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর রাজকীয় উপহারাদি বিনিময়ের পর দুই নরপতি পরস্পরের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করেন। এই অবসরে আলিতুগীন ভাগিয়া পড়েন এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য সুলতান একদল অশ্বারোহী

---

৩০ হাতী অত্যন্ত অনুগত প্রাণী। কিন্তু পরিচালনা করিবার কলাকৌশল যাহার জানা নাই তাহার পক্ষে হাতীতে আরোহণ করিয়া ইহাকে চালাইয়া লইয়া যাওয়া প্রায় অসম্ভব ব্যাপার।

সৈন্য পাঠাইয়া দেন। তাহারা অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে ধরিয়া শিবিরে লইয়া আসে। ইহার পর তাহাকে সমস্ত জীবনের মত ভারতের কোন এক দুর্গে আটক করিয়া রাখা হইয়াছিল।

গুজরাট প্রদেশে দিউ[৩১] দ্বীপের সন্নিকটে বিখ্যাত সোমনাথ মন্দির অবস্থিত। সেখানে বহু ধনরত্ন সঞ্চিত ছিল। হিন্দুস্তানের নানা স্থান হইতে ভক্তরা সেখানে আসিত। বিধর্মীদের এই বিশ্বাস ছিল যে, মৃত্যুর পর আত্মা সোমনাথের নিকট গমন করে এবং সোমনাথ তাহাদের কৃতকর্মের ফলানুযায়ী ঐসব আত্মাকে অন্যদেহে পুনর্জন্ম দান করে। তাহারা দাবী করিত জোয়ারভাটা আর কিছুই নয়—সোমনাথ[৩২] মন্দিরে ভক্তি নিবেদনের জন্য সমুদ্রের আসা যাওয়া মাত্র। সাবান মাসে (৪১৫ হিঃ, ১০২৪ খ্রীঃ) মাহমুদ তাঁহার সেনাবাহিনীসহ গজনী হইতে যাত্রা করেন। তুর্কীস্থান ও পার্শ্ববর্তী দেশগুলি হইতে ৩০,০০০ যুবক তাঁহার সহযাত্রী হইয়াছিল। সোমনাথ আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইহারা বিনা বেতনেই সুলতানের ফৌজের অনুগমন করিয়াছিল।

এই মন্দিরের নামেই পরিচিত সোমনাথ নগর সমুদ্র তীরেই অবস্থিত ছিল। এখন উহা ফিরিঙ্গি অধিকৃত দিউ জিলার অন্তর্ভুক্ত। কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, মূর্তিটি মক্কা হইতে আনীত হইয়াছিল। মুহাম্মদের (সঃ) পূর্বে ইহা নাকি সেখানেই ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা উহা অস্বীকার করে। তাহারা বলে শ্রীকৃষ্ণের সময়াবধি উহা দিউ পোতাশ্রয়ের নিকট দণ্ডায়মান ছিল। প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্বে কৃষ্ণ সেখানে আত্মগোপন করিয়াছিলেন।

মুসলমান বাহিনী রমযান মাসের মাঝামাঝি (৪১৫ হিঃ, অক্টোঃ ১০২৪ খ্রীঃ) মুলতান শহরে আসিয়া পৌঁছে। বিশাল মরুভূমি। সেইজন্য সুলতান প্রত্যেক সৈন্যকে পানি, নিজের রসদ ও ঘোড়ার খাদ্য সঙ্গে লইতে আদেশ করিলেন। ইহা ছাড়াও রসদ বোঝাই কুড়ি হাজার উষ্ট্র সঙ্গে চলিল। মরুভূমি অতিক্রম করিয়া সৈন্যবাহিনী আজমীর শহরে পৌঁছিল। এখানে আসিয়া তিনি দেখিলেন, রাজা এবং অধিবাসীরা আত্মসমর্পণের পরিবর্তে ভাগিয়া পড়িয়াছে। সুলতান শহর

---

৩১ ফিরিশ্‌তা যখন লেখেন তখন ইহা পর্তুগীজদের অধিকারে ছিল।

৩২ সংস্কৃত ভাষায় সোম শব্দের অর্থ চন্দ্র। চন্দ্র কি প্রকারে জোয়ার আনয়ন করে তাহা সকলের জানা ছিল। সোমনাথের মহিমা বৃদ্ধির জন্য সোমনাথের পুরোহিতরা এই ব্যাপারটাকে কাজে লাগাইতো।

লুণ্ঠন ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছারখার করিবার জন্য সৈন্যদের উপর হুকুম জারি করিলেন। আজমীর দুর্গ অধিকার করা সময় সাপেক্ষ বিবেচনায় তিনি সেখানে কোন হাম্‌লা না করিয়াই রওয়ানা হইলেন। যাত্রাকালে পথে কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিলেন। অবশেষে গুজরাটের সীমান্তে নিহারওয়ালায় আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহার আগমনের পুর্বেই উহা জনশূন্য হইয়া পড়ে। অতঃপর পুর্বের মত সতর্কতার সহিত দ্রুতবেগে অগ্রসর হইয়া নির্বিঘ্নে সোমনাথ পদার্পণ করিলেন। এখানে এক সঙ্কীর্ণ উপদ্বীপের উপর একটা সুরক্ষিত দুর্গ পরিলক্ষিত হইল, উহার তিনদিক সমুদ্র বিধৌত। ঐ দুর্গের ছিদ্রযুক্ত প্রাচীরের উপর অসংখ্য সশস্ত্র লোক দৃষ্টিগোচর হইল। তাহারা সুলতানের একজন নকীবকে তাহাদের নিকট যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিল এবং নকীবকে বলিল, "তাহাদের মহান দেবতা সোমনাথ মুসলমানদিগকে ধ্বংস করিবার জন্য সেখানে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছেন। ভারতে দেবদেবী ধ্বংসের প্রতিশোধ এইবার গ্রহণ করা হইবে।"

প্রভাতে মুসলমান সৈন্যগণ প্রাচীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আক্রমণ শুরু করিল। তীরন্দাজগণ অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গ প্রাকার জনশূন্য করিয়া ফেলিল। বিস্মিত ও ভীত হইয়া হিন্দুরা মন্দিরের মধ্যে জড় হইল এবং মূর্তির সম্মুখে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া সাশ্রুলোচনে দেবতার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। ইত্যবসরে মুসলমানরা মই প্রয়োগ করিয়া আল্লাহু-আক্‌বর নিনাদে প্রাচীরের উপর আরোহণ করিয়া বসিল। হিন্দুরা মৃত্যুপণ করিয়া রক্ষণভাগে ফিরিয়া আসিল এবং এমন বীর-বিক্রমে আক্রমণ করিল যে মুসলমানেরা তিষ্টিতে না পারিয়া সকল স্থান হইতে পিছু হটিয়া গেল এবং অবশেষে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইল। পরদিন প্রভাতে পুনরাক্রমণ শুরু হইল এবং অবরোধকারীরা যেরূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গে প্রাচীরে আরোহণ করিল, তদ্রূপ ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই অবরুদ্ধ সৈন্যগণ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হইল। মনে হইল তাহারা এইবার মন্দির রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এইরূপে দ্বিতীয় দিনের চেষ্টা প্রথম দিনের অপেক্ষা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। তৃতীয় দিবসে দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে সাহায্য করিবার জন্য পৌত্তলিকদের অন্য এক বাহিনী আসিয়া গজনী শিবিরের সম্মুখে যুদ্ধের জন্য ব্যূহ রচনা করিল। অবরোধ বানচাল করিবার এই চেষ্টা ব্যর্থ করিবার জন্য কৃতসকল্প হইয়া মাহমুদ একদল সৈন্যকে দুর্গ আক্রমণ করিতে নিযুক্ত করিয়া স্বয়ং এই নূতন শত্রু বাহিনীর মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলেন।

মহাবিক্রমে উভয় পক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হইল এবং বহুক্ষণ জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিল। শেষে ব্রহ্মদেব ও দাবিস্‌লিম নামক দুই ভারতীয় রাজা অন্য আর এক সাহায্যকারী বাহিনীসহ আসিয়া তাহাদের স্বদেশীয়দের সঙ্গে যোগদান করিয়া তাহাদিগকে নবোৎসাহে বলীয়ান করিয়া তুলিল। মাহমুদ এই সময় তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে ভাঙ্গিয়া পড়িবার লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিয়া অশ্ব হইতে লাফাইয়া পড়িলেন এবং মাটিতে সেজদায় লুটাইয়া পড়িয়া আল্লার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন।[৩৩] তারপর অশ্বারোহণ করিয়া উৎসাহ দান করিবার নিমিত্ত সারকেসিয়ার আবুল হাসান (অন্যতম সেনাপতি)-এর হস্তধারণ করিয়া শত্রুর দিকে অগ্রসর হইলেন। এই সময় তিনি সৈনিকদের মনে এমন উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইলেন যে, যাঁহারা সুলতানকে ফেলিয়া পলায়নের কথা চিন্তা করিয়াছিল তাঁহারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া এই জীবন-মরণের সন্ধিক্ষণে সুলতানের সঙ্গে নিজদিগকে অবিচ্ছেদ্য রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। যে সুলতানের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহারা এতকাল যুদ্ধ করিয়াছে ও রক্তদান করিয়াছে আজ তাহারই সঙ্গে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিবার জন্য তাঁহারা প্রস্তুত হইল। তাহারা সমস্বরে আল্লাহু আকবর রবে আকাশ প্রকম্পিত করিয়া শত্রু ব্যূহের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সে প্রচণ্ড বেগ প্রতিহত করিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। শত্রু ব্যূহ ভাঙ্গিয়া গেল এবং মুহূর্তকাল মধ্যে ৫,০০০ হিন্দুর মৃতদেহ তাহাদের পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। হিন্দুরা ঊর্ধ্বশ্বাসে দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন করিল। মন্দিরে অবস্থানকারী সৈন্যগণ এই পরাজয় লক্ষ্য করিয়া মন্দির রক্ষার সংকল্প ত্যাগ করিল। প্রায় ৪,০০০ সৈন্য পশ্চাতের তোরণ দিয়া নির্গত হইয়া সরণ দ্বীপে (সিংহল)[৩৪] পলায়ন করিবার জন্য নৌকায় আরোহণ করিল। কিন্তু তাহাদের এই গতিবিধি সুলতানের দৃষ্টি এড়াইল না। নিকটবর্তী খাঁড়িতে কতকগুলি নৌকা বাঁধা ছিল। সুলতান তাহাতে দাঁড় টানিবার লোক ও কতকগুলি উৎকৃষ্ট যোদ্ধা উঠাইয়া শত্রুবহরের অনুসরণে বাহির হইলেন এবং শত্রুদের কতকগুলি নৌকা

৩৩ মাহমুদ এইভাবেই ভারত বিজয়কালে তাঁহার সৈন্যদের মনে উৎসাহ আনয়ন করিতেন।

৩৪ তখনকার ঐতিহাসিকদের সিংহলে যাওয়ার কথা বলায় ইহাই প্রমাণিত হয় যে, ভারতের ভূগোল সম্বন্ধে তাঁহাদের ধারণা নিতান্ত ভ্রান্ত ছিল। আসলে হয়ত তাহারা দেবী বংশের রাজাদের অধীনস্ত দীরবিদিউ দ্বীপে যাইতেছিল।

ধরিয়া ডুবাইয়া দিলেন। মাত্র কয়েকটি নৌকা পালাইতে সক্ষম হইয়াছিল। প্রাচীরের চারিধারে ও তোরণে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া মাহমুদ তাঁহার পুত্রগণ, কয়েকজন সেনাপতি ও প্রধান দেহরক্ষী সঙ্গে লইয়া সোমনাথে প্রবেশ করিলেন। নিকটবর্তী হইয়া দেখিলেন, মন্দিরটি প্রস্তর নির্মিত এক চমৎকার সৌধ। ইহার সুউচ্চ ছাদ পঞ্চাশটি স্তম্ভের উপর স্থাপিত, স্তম্ভগুলি অদ্ভুত কারুকার্য খচিত এবং উহাতে স্থানে স্থানে মূল্যবান জিনিস সন্নিবিষ্ট। মন্দিরের কেন্দ্র স্থলে পাঁচ গজ দীর্ঘ প্রস্তর মূর্তি সোমনাথ অবস্থিত। ইহার নিম্নাংশের দুই গজ পরিমিত অংশ ভূমিতে প্রোথিত। মূর্তির নিকটবর্তী হইয়া সুলতান পদাঘাতে উহার নাক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। মূর্তিটির দুইটি খণ্ড ভাঙ্গিয়া গজনী প্রেরণ করা হইয়াছিল—এক খণ্ড জামে মসজিদের চৌকাঠে স্থাপন করা হইয়াছিল এবং অপর খণ্ড সুলতানের প্রাসাদের সদর দরওয়াজায় স্থাপন করা হইয়াছিল। এই দুই খণ্ড মূর্তি এখনও (৬০০ শত বৎসর পর) গজনীতে আছে। আরও দুই খণ্ড মক্কা ও মদিনা প্রেরণের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছিল। ইহা সত্য কথা (প্রমাণ সিদ্ধ) যে, মাহমুদ মূর্তিটি ভাঙ্গিতে উদ্যত হইলে একদল ব্রাহ্মণ মাহমুদের দেহরক্ষীদের মারফত এই নিবেদন পেশ করিয়াছিলেন যে, সুলতান যদি মূর্তিটিকে আর অধিক বিকৃত করিতে বিরত হন, তবে তাহারা ইহার বিনিময়ে কিছু স্বর্ণ প্রদান করিবে। তাঁহার কর্মচারীরা সুলতানকে এই অর্থ গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বলিলেন, একটা মূর্তি ভাঙ্গিয়া মূর্তি পূজার মূলোচ্ছেদ করা যাইবে না। সুতরাং মূর্তিটি সম্পূর্ণ ভাঙ্গিয়া এমন কিছু ফায়দা হাসিল করা যাইবে না, বরং ঐ অর্থ গ্রহণ করিয়া ইমানদারদের মধ্যে বিতরণ করিলে অনেক সওয়াব হাসিল হইবে। সুলতান স্বীকার করিলেন, তাহাদের কথার মধ্যে যুক্তি আছে। কিন্তু তিনি বলিলেন, "এই প্রস্তাবে যদি আমি সম্মত হই, তবে ভবিষ্যৎ বংশধরদের নিকট আমি পুতুল বিক্রেতারূপে পরিগণিত হইব। কিন্তু আমি চাই ভবিষ্যৎ বংশধররা আমাকে পুতুল ধ্বংসকারী মাহমুদ হিসাবেই জানিবে।" তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে কাজ চালাইয়া যাইতে বলিলেন। পরবর্তী এক আঘাতে সোমনাথের উদর খুলিয়া গেল এবং ঐ ফাঁপা উদরের মধ্য হইতে প্রচুর হিরা পদ্মরাগ মণি ও মুক্তা বাহির হইয়া পড়িল—যাহার মূল্য ব্রাহ্মণদের প্রস্তাবিত অর্থ অপেক্ষা অনেকগুণ বেশী।

হাবিবুস্‌ সিয়ারের লেখক এক প্রমাণের উপর ভিত্তি করিয়া বলিয়াছেন যে, মূর্তিটির নাম ছিল সোমনাথ। তাঁহাকে প্রতিবাদ করিয়া শেখ ফরিদ-উদ-দীন আত্তার বলিয়াছেন যে, মাহমুদের সৈন্যরা সোমনাথে যে মূর্তিটি পাইয়াছিল, তাঁহার নাম ছিল নাথ। আমি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিয়াছি যে, সোম ছিল এক রাজার নাম যাঁহার নামানুসারে নাথ মূর্তিটি সোমনাথ নামে অভিহিত হইয়াছিল। হিন্দুরা প্রভু বা মালিক অর্থে নাথ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকে এবং দেবতার ক্ষেত্রে ঐ শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন আমরা পাইয়াছি—'জগন্নাথ' বা জগতের প্রভু। কথিত আছে, চন্দ্রগ্রহণ কালে দুই তিন লক্ষ ভক্ত এই মন্দিরে আগমন করিত এবং হিন্দুস্তানের বিভিন্ন রাজা সর্বমোট ২,০০০ গ্রাম দান করিয়াছিল—যাহার রাজস্বে পুরোহিতদের ভরণ পোষণ চলিত। এই রাজস্ব ছাড়াও দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু মূল্যবান উপহারাদি আসিত। এই পৌত্তলিকরা সোমনাথকে প্রতিদিন দুইবার নূতন গঙ্গাজলে স্নান করাইতো—যদিও সে নদী প্রায় ১,০০০ মাইল দূরে অবস্থিত ছিল।

মন্দিরে প্রাপ্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে ২০০ মণ ওজনের একটা সোনার শিকল ছিল। উহা মন্দিরের চূড়ায় বাঁধা একটা স্বর্ণ বলয় হইতে ঝুলানো ছিল। এই শিকলের সঙ্গে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা বাঁধা ছিল। ঘণ্টা বাজাইয়া লোককে পূজার জন্য আহ্বান করা হইত। দুই হাজার ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ছাড়াও, মন্দিরে ৫০০ নর্তকী ৩০০ গায়ক এবং মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে ভক্তদের মস্তক মুণ্ডনের জন্য ৩০০ নাপিত ছিল। হিন্দুস্তানের রাজারা পর্যন্ত তাঁহাদের কন্যাদিগকে মন্দিরে সেবা করিতে পাঠাইতেন। গজনীর সুলতান এই মন্দিরে যে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্ন পাইয়াছিলেন জগতে কোন রাজার ভাণ্ডারে তত ছিল না। যয়নুল মাসিরে বর্ণিত আছে যে, একটা ঝুলানো প্রদীপ ব্যতীত মন্দিরে আর কোন দীপ ছিল না। এই প্রদীপের আলো মন্দিরগাত্রে বসানো রত্নাবালীর উপর হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া সমস্ত মন্দির কক্ষ জ্যোতির্ময় করিয়া তুলিত। পূর্বোল্লিখিত প্রধান মূর্তি ছাড়াও স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত নানা প্রকার আকৃতির কয়েক হাজার ক্ষুদ্র মূর্তি ছিল।

সোমনাথের ধনরত্ন হস্তগত করিবার পর মাহমুদ নিহারওয়ালার হিন্দু রাজা ব্রহ্মদেবকে শাস্তি দিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। এই ব্রহ্মদেব মন্দির

অবরোধ কালে তাহার দেশবাসীকে সাহায্য করিতে আসিয়া ৩,০০০-এর উপর মুসলমান হত্যা করিয়াছিল। সোমনাথের পতনের পর ব্রহ্মদেব নিহারওয়ালা না যাইয়া সোমনাথের ৪০ ফারসুং দূরে 'গন্ধরা'[৩৫] দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দুর্গের নিকটবর্তী হইয়া সুলতান দেখিলেন দুর্গের চতুস্পর্শ্ব খাল দ্বারা বেষ্টিত এবং এই খাল এমন গভীর ও প্রশস্ত যে উহা পার হইয়া দুর্গে পৌছা অসম্ভব বলিয়া মনে হইল। লোক নিযুক্ত করিয়া পরীক্ষা করিয়া জানা গেল যে ঐ খালের এক স্থান অগভীর—পারের যোগ্য। কিন্তু সেই পথে সৈন্যবাহিনী পার করা সহজসাধ্য নয়। মাহমুদ সকলকে নামাজে সমবেত হইতে হুকুম দিলেন। নামাজান্তে কোরান স্পর্শ করিয়া সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে গমন করিয়া তিনি পানিতে নামিয়া পড়িলেন এবং নিরাপদে অপর পাড়ে পৌছিলেন এবং তৎ-ক্ষণাৎ দুর্গ আক্রমণ করিয়া বসিলেন। মুসলমানদিগকে দেখিয়াই ব্রহ্মদেব পলায়ন করিলেন। যে সমস্ত হিন্দু দুর্গ রক্ষায় রত ছিল, তাহারা যখন দেখিল যে তাহাদিগকে ফেলিয়া রাজা পালাইতেছেন, তখন তাহারাও দুর্গ প্রাচীর ছাড়িয়া দিয়া সরিয়া পড়িল। আক্রমণকারীরা অনায়াসে দুর্গটি দখল করিল এবং তারপর পুরুষদে উপর এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করিল। স্ত্রীলোক ও শিশুদিগকে বন্দী করা হইল। ব্রহ্মদেবের ধনদৌলত সুলতানের ধনাগারে জমা করা হইল।

এইরূপে জয়লাভ করিয়া মাহমুদ গুজরাটের রাজধানী নিহারওয়ালা অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। তিনি দেখিলেন এই স্থানের ভূমি অত্যন্ত উর্বর, বায়ু বিশুদ্ধ ও স্বাস্থ্যপ্রদ এবং দেশটি কৃষিপ্রধান ও মনোরম। কথিত আছে, এই-সব লক্ষ্য করিয়া তিনি কয়েক বৎসরের জন্য এই দেশে বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া ছিলেন এবং নিহারওয়ালাকে রাজধানী করিয়া গজনীর শাসন-ভার তাঁহার পুত্র শাহজাদা মাসুদের উপর ন্যস্ত করিতে চাহিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, সেই সময় গুজরাটে স্বর্ণ খনি ছিল এবং তজ্জন্যই মাহমুদ সেখানে বাস করিতে উৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু এখন ঐ সব খনির কোন চিহ্ন নাই। তবে তখন হয়তো ছিল। কেননা, এরূপ খনি উধাও

---

৩৫ এই স্থান কোথায় ছিল তাহা জানা যায় নাই তবে সম্ভবতঃ ইহা গন্ধভী হইবে।

হইয়া যাওয়ার নজির আছে, যেমন সিস্তানের স্বর্ণ খনি পরবর্তীকালে ভূমিকম্পে গ্রাস করিয়াছিল। সিংহল ও পেগুতে স্বর্ণ খনি ছিল শুনিয়া সুলতান নাকি ঐ অঞ্চলদ্বয় জয় করিবার জন্য রণতরী প্রস্তুত করিবার কথা গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাকে এই পরিকল্পনা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহাকে নিজ রাজ্য ত্যাগ করিতে বারণ করিয়াছিলেন।

মাহমুদ তাঁহাদের উপদেশানুযায়ী গজনী ফিরিতে সম্মত হইয়াছিলেন। কিন্তু গুজরাটের শাসনকার্য চালাইবার জন্য এক যোগ্য ব্যক্তির নাম সুপারিশ করিতে তিনি মন্ত্রীদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করিয়া তাঁহারা সুলতানকে বলেন যে, সাম্রাজ্যের অন্যান্য স্থান হইতে ইহা এত দূরে যে এই প্রদেশকে রক্ষা করিতে বিরাট সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন হইবে এবং সেইজন্য স্থানীয় কোন লোকের উপর শাসনভার ন্যস্ত করাই তাঁহারা সমীচীন মনে করেন। অনুসন্ধান করিয়া সুলতান জানিতে পারিলেন, দাবিস্‌লিম পরিবার ঐ অঞ্চলের সর্বাপেক্ষা সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং সেই পরিবারের এক ব্যক্তি শিবিরের নিকটেই সন্ন্যাসীরূপে বাস করিতেছেন। তিনি তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইবেন স্থির করিলেন।

এই গল্পের বিপক্ষে কোন কোন ঐতিহাসিক জানাইয়াছেন যে, সন্ন্যাসী দাবিস্‌লিম একজন নিষ্ঠুর ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজপুত ছিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতাদের নিকট হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইবার জন্য কয়েকবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত একটা মন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

যাহাহউক প্রথম যে দাবিস্‌লিমের কথা বলা হইয়াছে তিনি সেই বংশেরই অন্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি জ্ঞানী ও বিদ্বান হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং একটা ক্ষুদ্র প্রদেশের শাসনকর্তা হইলেও সেই অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা তাঁহাকে তাঁহার সূক্ষ্ম বিচারবুদ্ধি ও সদ্‌গুণাবলীর জন্য অত্যন্ত সম্মান করিত। সুলতান দাবিস্‌লিমকে হাজির হইবার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং একটা বাৎসরিক কর ধার্য করিয়া তিনি তাঁহাকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন।

সেই রাজা তাহার নিরাপত্তার জন্য সুলতানের নিকট কিছু সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া যাওয়ার আবেদন জানাইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, মাহমুদ দেশ ত্যাগ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তাহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার

পূর্বেই অন্য দাবিস্‌লিম তাঁহাকে নিঃসন্দেহে আক্রমণ করিয়া বসিবে, যাহার পরিণাম সহজেই অনুমেয়। সুলতান যদি তাঁহার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেন তবে তিনি কাবুলিস্তান ও জাবুলিস্তানের রাজস্বের দ্বিগুণ রাজস্ব প্রতি বৎসর প্রেরণ করিবেন। এই কথা চিন্তা করিয়া মাহমুদ দেশত্যাগের পূর্বেই দাবিস্‌লিমকে দমন করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন এবং এতোদ্দেশ্যে তাঁহাকে ধরিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। উহারা অল্প সময়ের মধ্যেই দাবিস্‌লিমকে বন্দী করিয়া মাহমুদের নিকট আনিয়া হাজির করিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই হতভাগ্য রাজকুমারকে তাঁহার জ্ঞাতি গুজরাটের নূতন শাসকের হস্তে সমর্পণ করিলেনে।

শাসনকর্তা সুলতানকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কোন রাজাকে হত্যা করা তাঁহার ধর্ম মতে অনুচিত এবং রীতি অনুযায়ী কোন রাজা যখন তাঁহার শত্রু অন্য আর এক রাজাকে বন্দী করেন, তখন তাঁহার সিংহাসনের নীচে এক গর্ত খনন করিয়া সেই অন্ধকার গহ্বরে এই রাজাকে বন্দী রাখা হয় এবং বিজয়ী এই রাজার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে সেখানেই থাকিতে হয়। কিন্তু তাঁহার দিক হইতে তিনি এরূপ প্রথাকে অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে করেন। অপরপক্ষে রাজাকে যদি অন্য কোন কারাগারে আটক করিয়া রাখা হয়, তবে সুলতানের প্রস্থানের পরেই তাঁহার অনুচরেরা তাঁহাকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিবে।" নূতন রাজা সেইজন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, সুলতান বন্দী রাজাকে সঙ্গে করিয়া গজনী লইয়া যাইবেন। মাহমুদ ইহাতে রাজী হইলেন। দুই বৎসর ছয় মাস রাজধানীতে অনুপস্থিত থাকিবার পর তিনি গজনী অভিমুখে পা বাড়াইলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, রাজা ব্রহ্মদেব ও আজমীরের রাজা আরও অনেকের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক বিরাট সৈন্য বাহিনী লইয়া মরুভূমিতে তাঁহার পথ রোধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। মাহমুদ সিন্ধের পথে সোজা মুলতান যাইবেন স্থির করিলেন। এই পথেও তাঁহাকে মরুভূমিতে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল এবং পানির অভাবে সৈন্যদের এবং তৃণাভাবে অশ্বাদির ভীষণ কষ্ট হইয়াছিল। যাহাহউক, ৪১৭ হিজরীতে (১০২৬ খ্রীঃ) অনেক কষ্টে ও অনেক ক্ষতির পরে তিনি গজনী পৌঁছেন। সিন্ধু প্রদেশের মধ্যে দিয়া ফিরিবার পথে এক হিন্দু পথপ্রদর্শক কর্তৃক বিপথগামী হইয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনী তিন দিন তিন রাত্রি এক বালুকাময়

মরুভূমির মধ্যে ঘুরিয়াছিল। এই সময় অনেক সৈন্য অসহনীয় উত্তাপে ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া পাগলের ন্যায় প্রলাপ করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। পথ-প্রদর্শকের উপর সন্দেহ হওয়ায় মাহমুদ তাহাকে নির্যাতন করিতে হুকুম দেন। তখন সে স্বীকার করিয়াছিল যে, সে ছিল সোমনাথের একজন পুরোহিত। মন্দিরের ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সে গজনী বাহিনীকে এই প্রকারে ধ্বংস করিবার মতলব আঁটিয়াছিল। সুলতান তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। তখন সন্ধ্যা সমাগত। সুলতান সেজদায় লুটাইয়া পড়িয়া আল্লার নিকট আশু পরিত্রাণের জন্য প্রার্থনা জানাইলেন। সহসা আকাশের উত্তর দিকে একটা উল্কা দৃষ্টিগোচর হইল। তিনি সেই দিকে পথ অঙ্কন করিয়া চলিবার নির্দেশ দিলেন এবং প্রভাতে তাঁহারা একটা হ্রদের[৩৬] তীরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

বিজ্ঞ দাবিস্‌লিম গুজরাটের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া সুলতানকে নিয়মিত কর পাঠাইতে লাগিলেন এবং এক বিচক্ষণ দূত মারফত সুলতানকে অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন, যেন বন্দী রাজাকে তাহার হস্তে প্রদান করা হয়। সেই রাজা ইতিমধ্যে মাহমুদের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন এবং সুলতান তাঁহাকে ছাড়িতে নারাজ হইলেন। যাহাহউক, সভাসদদের পীড়াপীড়িতে তাহাকে সম্মত হইতে হইল। হতভাগা রাজা সুলতানের অতিরিক্ত অনুগ্রহ ভাজন হওয়ায় ওমরাহরা তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইয়াছিলেন। যাহাহউক গুজরাটের কর লইয়া যে ব্যক্তি আসিয়াছিলেন, রাজাকে তাহার হস্তে প্রদান করা হইল। তাঁহারা গুজরাট আসিয়া পৌঁছিল। জ্ঞানী দাবিস্‌লিম তাঁহার সিংহাসনের নিম্নে একটা ভাড়ার ঘর নির্মাণ করিবার আদেশ দিলেন। হতভাগা রাজাকে হিন্দু প্রথানুযায়ী সেইখানে আবদ্ধ রাখিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। তাঁহার আড়ম্বর প্রদর্শনের জন্য, তিনি তাহার বন্দীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য রাজধানী হইতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া

---

৩৬ এই হ্রদটি সম্ভবতঃ একটি লবণাক্ত জলাভূমি ছিল। মাহমুদের ফিরিবার পথের বিবরণ এমন অস্পষ্ট যে, আমাদের পক্ষে উহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। প্রচলিত বিশ্বাস এই যে, মাহমুদ হাওপা বংশের প্রাচীন রাজধানী চতুন আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিলেন। ইহা অমরকোটের প্রায় ৫০ মাইল পূর্বে অবস্থিত। এই ঘটনা যদি তাহার প্রত্যাবর্তনের পথে ঘটিয়া থাকে তবে আমরা তাঁহার পথ নির্ণয়ের কিছুটা সূত্র পাইতে পারি। তাঁহার পথ বোধ হয় অমরকোটের পার্শ্ব দিয়া গিয়াছিল এবং সেখান হইতে নদী বরাবর বাক্কার পর্যন্ত গিয়াছিল, যেখানে ঐ নদী সিন্ধু নদে পতিত হইয়াছে।

আসিলেন এবং সেই হতভাগা রাজাকে কলসী ও পাত্র হাতে তাঁহার অশ্বের সম্মুখে দৌড়াইতে বাধ্য করিলেন।

কথিত আছে, গুজরাট-রাজ এই সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত হইয়া একটা ছায়াবহুল গাছের নীচে বিশ্রামের জন্য শুইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার মুখের উপর একটি লাল রুমাল বিছাইয়া দিয়াছিলেন এবং দেহরক্ষীদের সরিয়া যাইতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। একটা শকুন তখন ঘটনাক্রমে ঐ স্থানের উপর দিয়া উড়িতেছিল। লাল রুমালটাকে একটা শিকার ভ্রমে সে দাবিস্‌লিমের মুখে ছোঁ মারিল এবং চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে পায়ের নখ বসাইয়া দিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অন্ধ করিয়া ফেলিল। ফলে দেশের প্রথানুযায়ী তিনি রাজ্য শাসনের অযোগ্য বিবেচিত হইলেন। এই দুর্ঘটনার কথা যখন জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হইল তখন শিবিরে ও শহরে বিষম গোলমাল সৃষ্টি হইল। সেই সময় বন্দী রাজা আসিয়া পড়ায়, সকলে হর্ষধ্বনি সহকারে তাঁহাকে বরণ করিল এবং তখনই রাজা বলিয়া ঘোষণা করিল।

তিনি এইবার অন্ধ দাবিস্‌লিমের মাথায় জলপাত্র বসাইয়া হাতে জলপূর্ণ কলসী দিয়া তাঁহাকে ঘোড়ার সম্মুখে তাড়াইয়া সেই গহ্বরে প্রবেশ করাইলেন—যে গহ্বর তিনি নিজে তৈরী করিয়াছিলেন। সেইখানেই তাঁহাকে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। হে আল্লাহ্, আশ্চর্য, তোমার বিধান! চক্ষের পলকে এক রাজা কর্তৃক অন্য রাজাকে প্রদত্ত শাস্তি ফিরাইয়া তাহারই ধ্বংসে প্রয়োগ করিতে পার! এইরূপে ধর্মগ্রন্থের সেই বাণী প্রমাণিত হইল —"যে ব্যক্তি তাহার ভাই-এর জন্য গর্ত খনন করে, সে নিজে সেই গর্তে পতিত হয়।"

জামি-উল-হিকায়েতের লেখক বলিয়াছেন, গুজরাটে অবস্থান কালে মাহমুদ গম্বুজাকৃতি মন্দিরের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র কৃষ্ণবর্ণ মূর্তি দেখিয়াছিলেন। ঐ মূর্তিটি সম্পূর্ণ শূন্যে ঝুলানো ছিল। ইহা দেখিয়া বিস্মিত সুলতান তাঁহার দরবারের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁহারা বলিলেন, "আমাদের বিশ্বাস মূর্তিটা লৌহ নির্মিত এবং গম্বুজের প্রস্তরগুলি চুম্বক-শক্তিসম্পন্ন।" সুলতান বলিলেন, "আমার মনে হয় মূর্তির ওজন ও চুম্বকের আকর্ষণের মধ্যে এরূপ সমতাস্থাপন করা সম্ভব নয়।' পরীক্ষামূলকভাবে তিনি গম্বুজের একটা

প্রস্তর খুলিয়া ফেলিতে হুকুম করিলেন। প্রস্তরটি স্থানচ্যুত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূর্তিটি মাটিতে পড়িয়া গেল। পাথরটি যে চুম্বক ছিল তাহাতে আর কোন সন্দেহ রহিল না।

সুলতানের এই বিজয়াভিযানের সংবাদ পাইয়া বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। এই পত্রে তিনি সুলতানকে, 'রাষ্ট্র ও ধর্মের অভিভাবক' আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমীর মাসুদকে "সাম্রাজ্যের জ্যোতি ও ধর্মের ভূষণ" এবং দ্বিতীয় পুত্র আমীর ইউসুফকে "সৌভাগ্যের বাহুবল ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা" আখ্যা প্রদান করেন। সেই সঙ্গে খলিফা মাহমুদকে নিশ্চয়তাদান করেন যে, মৃত্যু-কালে তিনি (মাহমুদ) যাহাকেই সিংহাসন দান করিয়া যাইবেন, খলিফা তাহাকেই বহাল ও সমর্থন করিবেন। বৎসরের শেষ ভাগে মাহমুদ জুদ পর্বতে বস-বাসকারী জাটদের[৩৭] বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সোমনাথ হইতে প্রত্যাবর্তনকালে জাটরা তাঁহার ফৌজকে উত্যক্ত করিয়াছিল। তিনি মুলতান আসিয়া দেখিলেন যে, জাটদের অঞ্চল নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন। সেই জন্য তিনি ১৪০০ নৌকা নির্মাণের হুকুম দিলেন এবং প্রত্যেক নৌকায় ছয়টি করিয়া লোহার কাঁটা বসাইলেন। এই কাঁটাগুলি নৌকার গলুই ও পার্শ্বদেশ হইতে বাহির করানো হইয়াছিল। যাহাতে শত্রুরা নৌকায় উঠিতে না পারে। কারণ উহারা জলযুদ্ধে খুব পারদর্শী ছিল। শত্রুর রণতরী আক্রমণ ও উহাতে ন্যাপ্‌থা নিক্ষেপ করিবার জন্য প্রত্যেক নৌকায় কুড়িজন তীরন্দাজ ও পাঁচজন করিয়া ন্যাপ্‌থা নিক্ষেপকারী স্থাপন করিলেন। মাহমুদের এই প্রকার রণসজ্জার সংবাদ পাইয়া জাটরা তাহাদের স্ত্রী, সন্তান ও মূল্যবান মালপত্র নিকটবর্তী এক চরে পাঠাইয়া দিল।

---

৩৭ এই জাটদের সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্তোষজনক বিবরণ জানা নাই। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে যে, তাহারা হয়ত গীটা গোষ্ঠী উদ্ভূত একদল তাতার, যে গীটা জাতি সম্বন্ধে প্রাচীন ইতিহাসে উল্লেখ আছে এবং যাহাদের কথা ইবনে আরব শাহ ও শরীফউদ্দীন আলী তৈমুরের যুদ্ধের বর্ণনা দিতে গিয়া বার বার উল্লেখ করিয়াছেন। এও অনুমান করা যায় যে, ভরতপুরের সাহসী রক্ষকদল তাহাদেরই বংশধর। আমার বন্ধু কর্নেল টডের কাছে এই জাটদের সম্বন্ধে দীর্ঘ বিবরণ ও বৌদ্ধ উৎকীর্ণ-লিপি রহিয়াছে এবং সেগুলি খ্রীস্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর। তাহাদের তখন উত্তর ভারতে একটি রাজ্য ছিল যাহার নাম ছিল মলিস্ত্রাপুর।

তারপর ৮,০০০ নৌকায় সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র উঠাইয়া তাহারা মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইল। উভয় পক্ষের রণবহর পরস্পরের নিকটবর্তী হইলে প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মুসলমান রণতরীগুলি দ্রুতবেগে ছুটিয়া যাইয়া যখন জাটদের নৌকাগুলিতে ধাক্কা মারিল, তখন শত্রু বহরে এমন বিপর্যয় সৃষ্টি হইল যে, কতকগুলি নৌকা একেবারে উল্টাইয়া গেল। তীরন্দাজরা এই সময় এমন মারাত্মকভাবে তীর বর্ষণ করিতে লাগিল যে, শত্রুদের অনেকেই নৌকা হইতে জলে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে জাটদের কয়েকটি নৌকায় আগুন ধরাইয়া দেওয়া হইল এবং সেই নৌকাগুলি হইতে অন্যান্য নৌকায় আগুন ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। কতকগুলি নৌকা ডুবিয়া গেল। মুসলমানেরা কতকগুলি দখল করিয়া ফেলিল এবং কতকগুলি পালাইবার চেষ্টা করিল। এই গোলযোগের মধ্য হইতে অল্প সংখ্যক জাটই প্রাণ লইয়া পলাইতে সক্ষম হইয়াছিল। যাহারা যুদ্ধে হত হয় নাই তাহারা মাহমুদের হাতে বন্দী হইল।[৩৮] এই জয়লাভের পর সুলতান বিজয়গর্বে গজনী প্রত্যাবর্তন করেন এবং ৪১৮ হিজরীতে (১০২৭ খ্রীঃ) সেলজুক তুর্কীদিগকে শাস্তিদানের জন্য তিনি তুষের শাসনকর্তাকে (আবুল হারব আরসালান)[৩৯] বার্দাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। সেলজুক তুর্কীরা[৪০] আমু দরিয়া পার হইয়া আসিয়া বার্দাদ আক্রমণ করিয়াছিল। গজনী সেনাপতি কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হইবার পর সুলতানের নিকট লিখিলেন যে, তাঁহার উপস্থিতি ছাড়া শত্রুর বিরুদ্ধে কোন প্রকার সাফল্য লাভ করা সম্ভবপর হইবে না। মাহমুদ সসৈন্যে রওয়ানা হইলেন এবং সেলজুকদের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিলেন। এই সময়েই তাঁহার সেনাপতিরা ইরাক[৪১] জয় করে এবং মাহমুদ স্বয়ং সেখানে যাইয়া বুইয়া

---

৩৮ এটা অত্যন্ত কৌতুকজনক ব্যাপার যে মাহমুদ যে স্থানে জল-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন. ১৩০০ বৎসর পূর্বে আলেকজাণ্ডারও সেখানেই রণবহর সজ্জিত করিয়াছিল।

৩৯ ইনি বোধহয় তাঁহার প্রিয়পাত্র এবং বিখ্যাত সেনাপতি আরসালান জাজিবের পুত্র ছিলেন।

৪০ মনে হয় এইটিই ঐ বিখ্যাত সম্প্রদায়ের প্রথম প্রচেষ্টা যে তাহারা অকসিয়ানা এবং ইরান, তুরান ও পারস্য ভেদ করিয়া দুই ইরাকীদেরই দমন করে এবং মনে হয় সমগ্র এশিয়া জয় করে।

৪১ রাইকাসান, ইস্পাহান ও হামাদান লইয়া পারস্য দেশের ইরাক গঠিত।

রাজবংশের সঞ্চিত সমস্ত সম্পদ হস্তগত করেন। সে দেশের অধিবাসীরা ভ্রান্ত ধর্মমত পোষণ করিত। ধর্মসম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি নূতন আইন প্রবর্তন[৪২] করিয়া রাই ও ইস্‌পাহানের শাসনকর্তার পদে শাহজাদা মাসুদকে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া মাহমুদ গজনী ফিরিয়া আসিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই মাহমুদ পাথুরী রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং রোগ যন্ত্রণা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এই অবস্থায় তিনি বল্‌খ্‌ চলিয়া যান এবং বসন্তের প্রারম্ভে আবার গজনী ফিরিয়া আসেন। এইখানে ৪২১ হিজরী ২৩শে রবি-উস্‌সানীতে (২৯শে এপ্রিল, ১০৩০ খৃঃ) ৬৩ বৎসর বয়সে এই মহান বিজেতা জনগণের অশ্রু বর্ষণের মধ্যে মৃত্যুর হস্তে তাঁহার দেহ হেফাজতে আত্মসমর্পণ করেন।

মাহমুদ ৩৫ বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। মশাল জ্বালাইয়া মহা আড়ম্বর ও গাম্ভীর্যের মধ্যে গজনী শহরে কেসর ফিরোজীতে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হয়। সুলতান মাহমুদের দৈহিক আয়তন মাঝারি রকমের হইলেও দেহ সুগঠিত ছিল। তাহার শরীরে সুস্পষ্ট বসন্তের দাগ ছিল।

মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে যে তাঁহার স্বর্ণ ও বহুমূল্য প্রস্তরের বাক্সগুলি তাঁহার সম্মুখে রাখিতে বলিয়াছিলেন, সেটা প্রমাণসিদ্ধ ঘটনা। এইসব দেখিয়া তিনি অশ্রু সংবরণ[৪৩] করিতে পারিলেন না। পুনরায় সেসবকে ধনাগারে লইয়া যাইতে নির্দেশ দিলেন; কাহাকেও কিছু দান করিলেন না। এইজন্য তাহাকে ধন-পিপাসু বলিয়া দোষারোপ করা হইয়াছে। পরদিন তিনি হুকুম করিলেন: তাঁহাকে সেনাবাহিনী, হস্তী, উষ্ট্র, অশ্ব ও শকটাদি দেখাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। ভ্রাম্যমান সিংহাসনে বসিয়া কিছুক্ষণ যাবৎ নয়ন ভরিয়া এইসব দেখিলেন এবং পুনরায় পূর্ববৎ অশ্রু বর্ষণ করিলেন। অতঃপর দুঃখ ভারাক্রান্ত অন্তরে প্রাসাদে ফিরিয়া আসিলেন।

---

৪২ ঠিক কি আইন তাহার কোন উল্লেখ নাই। কিন্তু মনে হয় তিনি পারস্যের জাতীয় ধর্মরূপে শীয়ার পরিবর্তে সুন্নী মতবাদ গ্রহণ করিতে জেদ করিয়াছিলেন মাহমুদ এই বিষয়ে খুব লোভী ছিলেন। যেমন ফেরদৌসীর প্রতি তাঁহার ব্যবহার প্রমাণ করে।

৪৩ ধনরত্ন ত্যাগ করিয়া যাওয়ার চিন্তায় তিনি কিরূপ দুঃখিত হইয়াছিলেন তাহা শেখ সাদী তাঁহার 'গুলিস্তানে' সুন্দরভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

হাসন মাইমুন্দীর পুত্র আবুল হাসান আলী বলেন যে, সুলতান একদিন আবু তাহির সামানীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, নির্মূল হইবার প্রাক্কালে সামানী বংশের ভাণ্ডারে কত মূল্যবান রত্ন সঞ্চিত ছিল। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন, আমীর নূহ্ সামানীর রাজত্বকালে রাজকোষে সাত রাটেল ওজনের মূল্যবান প্রস্তর ছিল। মাহমুদ অমনি সেজদা করিয়া উচ্চঃস্বরে বলিলেন, "হে সর্বশক্তিমান প্রভু! তোমাকে ধন্যবাদ! তুমি আমাকে ১০০ রাটেলের অধিক সঞ্চয় করিতে সক্ষম করিয়াছ।"

আরও বলা হইয়াছে যে, রাজত্বের শেষের দিকে নিশাপুরের কোন এক নাগরিকের প্রচুর ধনসম্পদের কথা শুনিয়া মাহমুদ তাহাকে সম্মুখে হাজির করাইতে হুকুম দেন। সে ব্যক্তি আসিলে মাহমুদ তাঁহাকে অযথা পৌত্তলিক ও ধর্মত্যাগী বলিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। ইহাতে ঐ ব্যক্তি বলিয়াছিলেন, "হে শাহানশাহ্! আমি মূর্তি পূজকও নই ধর্মত্যাগীও নই, তবে আমার ধন আছে এবং সেই ধন আপনি লইতে পারেন। কিন্তু অনুগ্রহপূর্বক আমার প্রতি এই দ্বিগুণ অবিচার করিবেন না; ধন ও মান উভয়ই কাড়িয়া লইবেন না।" সুলতান তাহার সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার পর শাহী মোহরযুক্ত প্রমাণ পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, ধর্ম-মত সম্বন্ধে সে নিষ্কলুস। তাব্‌কাত-ই-নাসিরি পড়িয়া মনে হয়, মাহমুদ ধর্মের কতকগুলি বিষয়ের প্রতি সন্দিহান ছিলেন এবং আলেমদের অনেক গোঁড়া মতের প্রতিবাদ করিতেন, বিশেষ করিয়া কৃচ্ছ্র সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। তিনি এমনকি পরকাল সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করিতেন এবং তিনি ইহা বলিতেও দ্বিধাবোধ করিতেন না যে তিনি সুবুক্তগীনের পুত্র। সে বিষয়ে তার সন্দেহ হয়।[৪৪] যাহাহউক, তিনি এক রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, রাসুলুল্লাহ্ (সঃ) তাঁহার সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "হে আমীর নাসির সুবুক্তগীনের পুত্র, আল্লাহ্ তোমাকে দুই জাহানেই সম্মানিত করুন—যেমন তিনি তাঁহার বাণীতে মানুষকে প্রতিশ্রুতিদান করিয়াছেন।" তাঁহার সংশয়বাদ সম্পর্কীয় তিনটা অভিযোগই এই ক্ষুদ্র বাক্য দ্বারা খণ্ডিত হইয়াছে। বর্ণিত আছে যে, তাঁহার মৃত্যুর পরের বৎসর গজনীতে এক ভয়াবহ বন্যা হইয়াছিল,

৪৪ একথা বিশ্বাস করা মুশ্‌কিল। তবে ফেরদৌসী একরূপ স্পষ্টভাবেই তাঁর বিদ্রুপাত্মক কবিতায় মাহমুদের মাতার চরিত্রহীনতার প্রতি ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তাহাতে গজনীর প্রধান অট্টালিকাগুলির অধিকাংশই ধূলিসাৎ হইয়াছিল এবং অনেক লোকের প্রাণহানি হইয়াছিল। আমর-বিন-লাইস সাফারের রাজত্বকালে যে বাঁধ নির্মিত হইয়াছিল তাহা এই বন্যাতেই ভাসিয়া যায় এবং এর কোন চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট থাকে না। এই বিপদকে সাম্রাজ্যের উপর আসন্ন শেষ গজবের পূর্বাভাস বলিয়া সে সময় মনে করা হইয়াছিল।

তাঁহার ন্যায়বিচার সম্বন্ধে নিম্নোক্ত কাহিনীটি ভবিষ্যৎ বংশধরদের মধ্যে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছে। এক আবেদনকারী একদিন এই মর্মে এক অভিযোগ করেন যে, তাহার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হইয়া সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রতিরাত্র সশস্ত্র অনুচর লইয়া তাঁহার গৃহে হানা দেয় এবং তাহাকে প্রহার করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিয়া তাঁহার স্ত্রীর উপর তাঁহার অবৈধ বাসনা চরিতার্থ করেন; যাহাদের নিকট বিচার পাইবার কথা তাঁহাদের নিকট সে পুনঃ পুনঃ অভিযোগ করিয়াছে, কিন্তু দুর্বৃত্তের পদমর্যাদা তাঁহাকে এ পর্যন্ত রক্ষা করিয়া আসিয়াছে।

অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধে সুলতানের চক্ষু হইতে অশ্রুপাত হইতে লাগিল এবং আরও পূর্বে অভিযোগ না করার জন্য তিনি গরীব লোকটিকে তিরস্কার করিলেন। লোকটি উত্তরে বলিল, সে অনেকবার চেষ্টা করিয়াছে কিন্তু প্রবেশাধিকার পায় নাই। সুলতান তাহাকে গৃহে ফিরিতে বলিলেন এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র পুনর্বার এইরূপ জুলুম করিতে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাকে খবর দিবার জন্য তাহাকে নির্দেশ দিলেন। যাহারা সেখানে উপস্থিত ছিল তাহাদিগকে মৃত্যুদণ্ডের ভয় দেখাইয়া সতর্ক করিয়া দেওয়া হইল, যেন এই কথা কেহ ঘুর্ণাক্ষরে জানিতে না পারে এবং ঐ গরীব ব্যক্তিকে যেন যে-কোন সময়ে অবাধে প্রাসাদে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। লোকটি গৃহে ফিরিয়া আসিল।

তৃতীয় দিন রাত্রে সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র পূর্বের মতই আসিয়া স্বামীকে নির্মম-ভাবে বেত্রাঘাত করিয়া রাস্তায় বাহির করিয়া দিলেন। গরীব লোকটি সুলতানের নিকট ছুটিয়া গেল, কিন্তু সুলতান তখন হারেমে ছিলেন বলিয়া প্রহরীদের সর্দার তাহাকে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিল। লোকটি তৎক্ষণাৎ চিৎকার করিয়া কথা বলা শুরু করিল। পাছে দরবারের লোকদের বিরক্তি উৎপাদন হয় এবং চিৎকার সুলতানের কর্ণে পৌঁছে, সেইজন্য প্রহরী বাধ্য হইয়া তাহাকে শয়নকক্ষের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর নিকট লইয়া গেল। সেই কর্মচারী তৎক্ষণাৎ খবরটি সুলতানের কর্ণগোচর করিল।

সুলতান তৎক্ষণাৎ উঠিয়া পড়িলেন এবং একটা চাদরে নিজের দেহ আবৃত করিয়া লোকটির পিছু পিছু তাহার গৃহে গমন করিলেন এবং যাইয়া দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ও লোকটার স্ত্রী একই বিছানায় নিদ্রামগ্ন এবং তাহাদের পার্শ্বে কার্পেটের উপর একটা মোমবাতি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। মাহমুদ মোমবাতি নিবাইয়া ফেলিলেন এবং তলোয়ার টানিয়া বাহির করিয়া তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিলেন। তারপর লোকটিকে সত্বর আলো ও পানি আনিতে বলিলেন এবং গভীরভাবে এক চুমুক পানি পান করিয়া লোকটিকে বলিলেন, "তোমার স্ত্রীর প্রতি বিশ্বাস থাকিলে তুমি এখন নিরাপদে তাহার সহিত নিদ্রা যাইতে পার।" দরিদ্র লোকটি কৃতজ্ঞতার ভারে সুলতানের পদতলে লুটাইয়া পড়িল এবং সানুনয় জিজ্ঞাসা করিল ; কেন তিনি বাতি নিবাইয়াছিলেন এবং কেনই বা অতিব্যস্তভাবে পানি চাহিয়াছিলেন। উত্তরে সুলতান বলিয়াছিলেন : তিনি বাতি নিবাইয়াছিলেন এই জন্য যে তাঁহার ভয় ছিল, মুখদর্শনে করুণার সঞ্চার হইবে এবং তাঁহার কর্তব্যের হস্ত শিথিল হইয়া আসিবে। কারণ ঐ যুবককে তিনি অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। আর বলিলেন, অভিযোগ শুনিবার পর তিনি শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, অপরাধীকে শাস্তিদান করিবার পূর্বে তিনি পানাহার করিবেন না। সেই জন্যই তিনি অত তৃষ্ণার্ত ছিলেন। আমার বিদ্বান পাঠকদের নিকট একথা দ্বিধাহীনভাবে বলিতে পারি যে ; আমরা কোন কোন ধার্মিক রাজার কঠোর ন্যায়বিচারের অনেক প্রামাণ্য কাহিনী শুনিয়াছি, কিন্তু ইহার সমকক্ষ একটিও শুনি নাই। আল্লাহ্ শুধু মানুষের মনের কথা জানেন। হাবিবুস্ সিয়ারের মতে যে ব্যক্তি মাহমুদের দরবারে প্রথম উজিরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি আহমদ ইস্ফারাহীর পুত্র আবুল আব্বাছ ফাজিল। প্রথমে তিনি সামানী বংশের অন্যতম আমির ফাইকের কর্ম-সচিব ছিলেন এবং ফাইকের পতনের পর তিনি সুবুক্তগীনের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার উজির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মাহমুদের অধীনেও তিনি এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। আবুল আব্বাস বিদ্বান অপেক্ষা কাজের লোক ছিলেন বেশী এবং তিনি আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন। এই জন্য তিনিই প্রথম পারস্য ভাষায় সরকারী কাগজপত্র লিখিবার রীতি প্রবর্তন করেন। কিন্তু হাসান মাইমুন্দির পুত্র খাজা আহমদ মন্ত্রী হইবার পর পুনরায়

সমস্ত স্থায়ী সরকারী দলিলপত্র আরবী ভাষাতে লেখার প্রবর্তন করেন। সরকারী কার্যাদি পরিচালনায় দক্ষতা এবং অসাধারণ আপোষজনক মনোভাবের জন্য আবুল আব্বাছ ফাজিল বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। যাঁহাদের সঙ্গে তাঁহার কারবার বা সংশ্রব ছিল তাহাদের সকলের মনে তিনি আগ্রহ ও আস্থা সৃষ্টি করিতে পারিতেন। মাহমুদ উত্তরাধিকারী হওয়ার পর যাহা হউক, তিনি দুই বৎসরের জন্য উজিরের পদ হইতে অপসৃত হইয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, আবুল আব্বাসের পরিবারের কোন কিছুর প্রতি সুলতানের আসক্তি জন্মিয়াছিল, কিন্তু আবু আব্বাছ গোঁয়ারের মত সুলতানকে তাহা প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া সুলতানের অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তাঁহাকে কারারুদ্ধ করা হইয়াছিল বলিয়া বিবৃত আছে এবং তাঁহার ধনসম্পদ আদায় করিবার জন্য তাহাকে যন্ত্রণা দানের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহাতেই নাকি শেষ পর্যন্ত তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। তাঁহার শূন্য আসনে হাসান মাইমুন্দীর পুত্র খাজা আহমদ উপবেশন করেন। তিনি সুলতানের পোষ্য ভ্রাতা ও সহপাঠী ছিলেন। হাসান সুবুক্তগীনের রাজত্বকালে তাঁহার পিতা বুস্টের তহশীলদার ছিলেন; কিন্তু অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের অপরাধে এবং প্রচুর পরিমাণে অর্থ আত্মসাতের ব্যাপারে সুবুক্তগীনের আদেশে তাঁহার ফাঁসি হইয়াছিল। সুতরাং হাসান মাইমুন্দী সুলতান মাহমুদের উজির ছিলেন বলিয়া অনেকের মনে যে বদ্ধমূল ধারণা আছে তাহা ভ্রান্তিজনক। তাঁহার পুত্র খাজা আহমদ প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার জন্য যেমন প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমনি প্রসিদ্ধ ছিলেন সুন্দর হস্তাক্ষরের জন্য। তিনি প্রথমে প্রধান কর্ম-সচিবের পদে কাজ করেন এবং ক্রমাগত উন্নতি লাভ করিতে তিনি শেষ পর্যন্ত মুস্তফী-উল-মুমালিক, 'কর নিয়ন্ত্রক ও সেনাবাহিনীর প্রধান বেতনদাতা'র পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে খোরাসান অধিকার করিয়া ঐ প্রদেশ শাসন করিতে প্রেরণ করা হয় এবং আবুল আব্বাছ ফাজিলের অপসারণের পর তিনি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। নিরবচ্ছিন্নভাবে আঠার বৎসর কাল তিনি ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইহার পর সিপাহসালার আল্তুনতাস ও আমীর আলী চেসাউদ্দির ষড়যন্ত্র সম্পর্কে তাঁহাকে দণ্ডিত করিয়া কাশ্মীর সীমান্তে কালিঞ্জর দুর্গে আটক রাখা হয়। যাহাহউক, তিনি পরে মুক্তিলাভ করিয়া

সুলতান মাসুদের রাজত্বকালে উজিরের পদ লাভ করিয়াছিলেন। ৪২৪ হিজরীতে (১০৩৩ খ্রীঃ) তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্তেকাল করেন। খাজা আহমদ মাইমুন্দীর পদের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন মেকাইলের পুত্র আহমদ হোসেন। তিনি তরুণ বয়স হইতেই সুলতানের বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিলেন এবং বুদ্ধিমত্তার জন্য যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মাসুদ কর্তৃক বল্‌খে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপরাধ—তিনি মক্কায় হজ্জে গমন করিয়া মিশরের খলিফার নিকট হইতে লেবাস উপহার লইয়াছিলেন এবং সেই লেবাস পরিধান করিয়াছিলেন।

মাহমুদের দরবারে যে-সব মনীষী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইহারাই ছিলেন প্রধান। পারস্যের রাই প্রদেশের অধিবাসী উজারী রাজী তিনি এক সময় এক ক্ষুদ্র স্তুতি কবিতার জন্য মাহমুদের নিকট ১৪০০০ দারমু পুরস্কার লাভ করিয়াছিলেন। খোরাসান প্রদেশের অধিবাসী আসাদী তুসীও একজন খ্যাতনামা কবি ছিলেন। তাঁহাকে সুলতান অনেকবার শাহনামা রচনার কাজ হাতে লইতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু বার্ধক্যের জন্য তিনি অক্ষমতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তিনি ফেরদৌসীর শিক্ষক ছিলেন—যে ফেরদৌসী পরে শাহনামা রচনা করেন। ফেরদৌসী যখন গজনী ত্যাগ করিয়া তুসে চলিয়া আসেন এবং শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বুঝিতে পারেন যে, কাব্য সম্পূর্ণ করার মত শক্তি তাহার নাই, তখন তিনি তাঁহার বৃদ্ধ শিক্ষক আসাদীর নিকট এই মর্মে আবেদন জানাইয়াছিলেন: "আমি মৃত্যুর দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, কিন্তু এই মিথ্যা জগত পরিত্যাগের পুর্বে আমার এক মাত্র দুঃখ থাকিয়া যাইতেছে যে, আমার কাব্য এখনও অসম্পূর্ণ।" বৃদ্ধ আসাদী কাঁদিয়া উত্তর দিলেন: যদিও আমি সুলতানের নিকট এই কার্য অস্বীকার করিয়াছিলাম তবুও তোমার প্রতি স্নেহের টানে এই দায়িত্ব গ্রহণ করিলাম।" মুমূর্ষ ফেরদৌসী উত্তরে লিখিলেন: "আমি জানি ঐ কাব্য সম্পুর্ণ করিবার মত প্রতিভা আপনি ব্যতীত এ যুগের আর কোন লোকের নাই, কিন্তু আমার ভয় হইতেছে বার্ধক্য ও শারীরিক দুর্বলতা আপনার সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিবে। বন্ধুত্বের অনুপ্রেরণায় বৃদ্ধ লোকটি চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই এবং আরবদের পশ্চিম পারস্য বিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া কাব্যের সমাপ্তি পর্যন্ত ৪,০০০ শ্লোকযুক্ত শেষাংশ তিনি রচনা করেন।

মনুচেহের ছিলেন বল্খের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তিনিও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা ও কবি-প্রতিভার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। দার্শনিক উনসারীকে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিভা বলিয়া গণ্য করা হইত। কারণ তিনি একজন প্রথম শ্রেনীর কবি তো ছিলেনই তদুপরি বিজ্ঞানেও ছিল গভীর জ্ঞান এবং সমস্ত ভাষাতেই তাঁহার দক্ষতা ছিল। গজনী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়াও চারিশত কবি তাঁহাকে গুরু বলিয়া মান্য করিত। সুলতান তাঁহাদের উপর সাহিত্য বিচারের ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার নিকট অনুমোদনের জন্য পূর্বাহ্নে দাখিল না করিয়া কোন রচনাই সম্মুখে আনা হইত না।

উনসারীর অন্যান্য রচনার মধ্যে মাহমুদের যুদ্ধের কাহিনীগুলি অবলম্বনে রচিত 'বীরগাঁথা' অন্যতম। সুলতান এক রাত্রে কামোন্মত্ত অবস্থায় তাঁহার প্রিয়তমা প্রমোদবালার সুদীর্ঘ বেণী কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। পরদিন প্রভাতে সেই কৃতকর্মের জন্য দারুণ অনুশোচনা বোধ করেন এবং পাগলের ন্যায় একবার বসেন একবার উঠেন আবার পায়চারী করিতে থাকেন। তাঁহার অনুচরেরা কেহই নিকটে আসিতে সাহস করিতেছিল না। উপস্থিত লেখা কয়েক পংক্তি কবিতা আবৃত্তি করিয়া দার্শনিক উন্সারী তাঁহাকে অভিবাদন করেন। কথাগুলি তাঁহার এতো ভাল লাগিল যে, তিনি তৎক্ষণাৎ উন্সারীর মুখ তিনবার রত্নদ্বারা ভরিয়া দিবার হুকুম দিলেন। তারপর শরাব আনাইয়া কবির সঙ্গে একত্রে পান করিয়া মানসিক অনুশোচনা ধৌত করিয়া ফেলিলেন। ৪৩১ হিজরীতে উন্সারী ইন্তেকাল করেন।

মার্ভ নিবাসী আমজাদীও একজন শক্তিশালী কবি ছিলেন এবং তিনি উন্সারীর অন্যতম ছাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার রচনায় অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কবিতার সংখ্যা খুব কম এবং তাহাদের অধিকাংশই এখন নিখোঁজ। ফারুকীও ছিলেন উন্সারীর ছাত্র। তিনি সিস্তানের রাজবংশের অন্যতম অধঃস্তন পুরুষ ছিলেন। কিন্তু ভাগ্যচক্রে এমন নিম্নে পতিত হইয়াছিলেন যে, বাৎসরিক ২০০ কাইলিস[৪৫] গম ও ১০০ দারম্ অর্থের বিনিময়ে এক কৃষকের নিকট মজুর খাটিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এমতাবস্থায় স্বগোত্রীয় দূর সম্পর্কীয়া এক মহিলাকে তিনি শাদী করিবার অভিলাষী হইয়াছিলেন।

৪৫ এক কাইলিস পাঁচ পাউণ্ড ওজনের সমান।

কিন্তু বেতন বৃদ্ধি না হইলে তিনি শাদী করেন কি প্রকারে? এজন্য তিনি তাহার মালিককে বেশী বেতন মঞ্জুর করিতে অনুরোধ করেন। কৃষক বলিলেন, তিনি নিশ্চয়ই অনেক বেশী পাইবার যোগ্য, কিন্তু তাহার অবস্থা এমন নয় যে সে আরও বেশী বেতন দিতে পারে। এই দুরবস্থার মধ্যে ফারুকী একটি কবিতা লিখিয়া সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র আবুল মুজাফফারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এই কবিতার জন্য তিনি একটি ঘোড়া ও পোশাক ছাড়াও মোটা পারিতোষিক লাভ করিয়াছিলেন। অতঃপর সেই শাহজাদাই তাঁহাকে সুলতানের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহার জন্য একটা বৃত্তি নির্ধারিত করিয়া দেন—যাহা দ্বারা তিনি কুড়িজন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী অনুচর পরিবৃত হইয়া চলিতে পারিতেন।

এই সুলতানের রাজত্বকালেই দাউকী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি শাহনামা রচনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু মাত্র এক হাজার শ্লোক রচনার পরেই ইন্তেকাল করিয়াছিলেন।

সুলতান মুহাম্মদ গজনভী

[সিংহাসনারোহণ। সর্দারের নেতৃত্বে গৃহরক্ষী সৈন্যদলের গজনী ত্যাগ। সুলতানের সৈন্যদল তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজয় বরণ। সুলতানের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাসুদের সঙ্গে যোগদানের জন্য গৃহরক্ষী সৈন্যদের নিশাপুর গমন। সিংহাসন দাবী করার জন্য মাসুদের গজনী যাত্রা। চাচা আমীর ইউসুফ ও অন্যান্য ব্যক্তিগণ কর্তৃক মুহাম্মদ বন্দী ও সিংহাসনচ্যুত। ষড়যন্ত্রকারীদের মাসুদের সঙ্গে যোগদানের উদ্দেশ্যে অগ্রসর এবং তাঁহাকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা।]

মাহমুদের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ ছিলেন জুরজান প্রদেশে এবং শাহজাদা মাসুদ ছিলেন ইস্‌পাহানে। মাহমুদের শ্বশুর, কাজিল আরসালানের পুত্র আমীর আলী, মুহাম্মদকে গজনী ডাকিয়া আনিলেন এবং তাঁহার পিতার অভিলাষানুযায়ী তাহার মাথায় তাজ পরাইয়া দিলেন। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুহাম্মদ তাঁহার চাচা আমীর ইউসুফ সুবুক্তগীনকে সিপাহ্‌সালারের পদ এবং হাসান হামাদানীর পুত্র আবু হোসেন আহম্মদকে উজিরের পদ প্রদান করেন। তিনি কোষাগার খুলিয়া বন্ধুবান্ধবকে পুরস্কৃত করিলেন এবং সরকারী কর্মচারীদিগকেও দরাজ হস্তে দান করিলেন। কিন্তু সৈন্য ও জনসাধারণ তাহার ভ্রাতা আমীর মাসুদের প্রতিই অনুরক্ত রহিল।

মাহমুদের মৃত্যুর ৫০দিন পরে ইস্‌হাকের পুত্র আবুল নজম আমীর আয়াজ, আলী দাবের সঙ্গে চক্রান্ত করিয়া গৃহরক্ষী সৈন্যদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন এবং প্রকাশ্য দিবালোকে শাহী আস্তাবলে প্রবেশ করিয়া সুলতানের উৎকৃষ্ট অশ্বগুলিতে আরোহণপূর্বক বুস্টের দিকে ছুটিলেন। মুহাম্মদ এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া সুঅন্দ রায় নামক এক ভারতীয় সেনাপতিকে বিপুল সংখ্যক হিন্দু অশ্বারোহী সৈন্যসহ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন। কয়েকদিনের মধ্যে ইহারা তাহাদের নিকটবর্তী হইয়া পড়ে এবং এক সংঘর্ষ হয়। তাহাতে সুঅন্দ রায় ও তাহাদের অধিকাংশই নিহত হয়। বিদ্রোহীদের পক্ষেও বহু লোক মারা পড়িয়াছিল। বিদ্রোহী সেনাপতিরা শাহজাদা মাসুদের উদ্দেশ্যে চলিতে লাগিল এবং নিশাপুরে তাঁহার সাক্ষাৎ পাইল। হামাদান অবস্থান

কালে পিতার মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া মাসুদ পারস্যদেশীয় ইরাকের প্রদেশগুলিতে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া খোরাসানাভিমুখে ধাবিত হন। সেখানে উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতার নিকট লিখিলেন যে, তাঁহার (মাসুদের) অগ্রাধিকার থাকা সত্ত্বেও পিতা খুশী হইয়া যেসব প্রদেশ মুহাম্মদকে দান করিয়া গিয়াছেন, সেসব প্রদেশের শর্ত লইয়া বিবাদ করার কোন অভিপ্রায় তাঁহার নাই। জুর্জিস্তান, তাব্রিস্তান এবং ইরাক প্রভৃতি প্রদেশ যাহার অধিকাংশই তিনি স্বীয় তরবারি দ্বারা অর্জন করিয়াছেন, সেইগুলিই তাঁহার জন্য যথেষ্ট এবং জন্মগত অধিকার হিসাবে তিনি মাত্র এইটুকু দাবী করেন যে, সমস্ত রাজ্যে খোত্‌বায় প্রথম তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে হইবে। এই দুই শাহজাদা ছিলেন যমজ সন্তান এবং মুহাম্মদ কয়েক ঘণ্টার বড় ছিলেন। সেইজন্যই নিঃসন্দেহে তিনিই উত্তরাধিকারী হইবার যোগ্য ছিলেন। তাহাদের মধ্যে শত্রুতা বরাবরই ছিল এবং মুহাম্মদ তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং সভাসদদের নিষেধ অমান্য করিয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সভাসদরা সকলেই এই অস্বাভাবিক কলহের বিপক্ষে ছিলেন। সৈন্যবাহিনী পূর্বেই রওয়ানা করিয়া দিয়া পহেলা রমজান (৪২১ হিঃ ১০৩০ খ্রীঃ) মুহাম্মদ গজনী হইতে বাহির হইলেন এবং মাসুদের সঙ্গে মোকাবিলার জন্য তুকিয়াবাদের[১] দিকে যাত্রা করিলেন। তুকিয়াবাদে তিনি সমস্ত রমজান মাস অপেক্ষা করিলেন এবং এই বিলম্ব তাঁহার জন্য অত্যন্ত অশুভ বিলম্ব হইয়াছিল। সেখানে অবস্থান কালে একদা আকস্মিকভাবে তাঁহার মস্তক হইতে তাজ পড়িয়া যায়। তাঁহার সৈন্যরা উহাকে অমঙ্গলের পূর্বাভাস মনে করে। ইহার ফলে আমীর আলী চেসাওয়ান্দি, আমীর ইউসুফ সুবুক্তগীন ও হোসেন মিকাইল এক ষড়যন্ত্রে মিলিত হইয়া ৩রা সওয়াল (অক্টোবর ২৬) রাত্রিকালে সৈন্যদিগকে অস্ত্রধারণ করিতে হাঁক দেন এবং তাঁহারা সৈন্য বাহিনীকে পরিচালিত করিয়া যাইয়া সুলতানের তাঁবু ঘেরাও করিয়া ফেলেন। সুলতান ধৃত হইলেন এবং তাঁহাকে কয়েদীরূপে ওয়ালী দুর্গে প্রেরণ করা হইল, যে দুর্গকে কান্দাহারের লোকেরা আজকাল খালিজ বলিয়া থাকে।[২]

---

১ এই শহরটি গজনীর ৩০ মাইল উত্তরে অবস্থিত।

২ এ স্থানটির স্থান্ত নির্ধারিত হয় নাই, যদি না ইহা মিঃ এল্‌ফিন্‌সটোনের কিলাই মীর হয়।

এইবার তাঁহারা সৈন্যবাহিনী লইয়া হিরাট গমন করিলেন এবং মাসুদের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার প্রতি আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন।

মাসুদ ইহর পর বল্‌খ চলিয়া যান এবং সেখানে হোসেন মিকাইলকে ফাঁসি দেওয়ার হুকুম দেন। তাঁহার অপরাধ ছিল এই যে, মক্কা হইতে হজ্জ করিয়া ফিরিয়া, মিসরের খলিফা কর্তৃক তাঁহাকে প্রদত্ত পোশাক তিনি হৃষ্টচিত্তে পরিধান করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বলা হইয়া থাকে যে, একটা ব্যক্তিগত আক্রোশ ছিল, যাহা হোসেনের মৃত্যু ত্বরান্বিত করিয়াছিল; কারণ তাঁহাকে একবার বলিতে শোনা গিয়াছিল যে, মাসুদ যদি কখনও সুলতান হয় তবে তিনি স্বেচ্ছায় ফাঁসি যাইবেন। আমীর আলীকেও ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহার মালিকের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার জন্য। অন্য ষড়যন্ত্রকারী আমীর ইউসুফ তাঁহার চাচা হইলেও তাঁহাকেও চিরজীবনের মত কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। অনতিকাল পরেই শাহাজাদা মুহাম্মদকে দৃষ্টিহীন করা হয়। সুতরাং মুহাম্মদের রাজত্বকাল পাঁচ মাসও স্থায়ী হয় নাই। কিন্তু নয় বৎসর কারাজীবন যাপনের পর তিনি পুনর্বার এক বৎসরের জন্য তখ্‌তে বসিয়াছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (মাসুদের পুত্র) মওদুদ কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন।

সুলতান মাসুদ (১) গজনভী

[মাসুদের সিংহাসনে আরোহণ। তাঁহার অসাধারণ দৈহিক শক্তি। সেলজুকী তুর্কীদের খোরাসান ও সমরকন্দ আক্রমণ। সেলজুকদিগকে বাধাদানের জন্য সেনাপতি আলতুনতাস সমরকন্দে প্রেরিত এবং যুদ্ধে নিহত। মৃত্যুর প্রাক্কালে আলতুনতাসের মহানুভবতা। সন্ধি স্থাপন। আলী তুগিল সেলজুককে সমরকন্দ সমর্পণ। মাসুদের ভারত আগমন এবং স্বরস্বতী দুর্গ আক্রমণ। সমগ্র পারস্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষের পরে প্লেগ আরম্ভ এবং ইস্পাহানে ৪০,০০০ লোকের মৃত্যু। সেলজুকদের নিশাপুর আক্রমণ। সুলতান কর্তৃক তাহাদের বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ। সেলজুকদের প্রথম পরাজয় এবং পরে পাল্টা আক্রমণ করিয়া গজনভীদিগকে পরাস্তকরণ। সুলতানের গজনী যাত্রা। তাঁহার পুত্র মহুদকে ওয়ারিশ ও উত্তরাধিকারী ঘোষণা এবং তাঁহার উপর বল্খের শাসনভার অর্পণ। সুলতান কর্তৃক ভারতে প্রবেশ করিয়া হান্সী আক্রমণ ও অধিকার। সোনপুতের লোকের পলায়ন। পুত্র মহুদকে লাহোরে রাখিয়া সুলতানের গজনী প্রত্যাবর্তন। সর্দার তোগরল বেগের অধীনে সেলজুকদের বল্খে অনুপ্রবেশ। সুলতানের আমু দরিয়ায় সেতু নির্মাণ ও ট্রানস্-অকসিয়ানায় প্রবেশ। তোগরল বেগের গজনী বাহিনীর পশ্চাতে গমন এবং গজনীতে উপস্থিত। সুলতান কর্তৃক মঙ্গু খান সেলজুকের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন ও কিছু অঞ্চল তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতে সম্মতি প্রকাশ এবং ইহার পর বাদাসে আক্রমণ করিয়া একদল সেলজুককে পরাস্তকরণ। পরে সুরুখ্সে তাহাদের হস্তে পরাস্ত। মাসুদের ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সাহস। জ্যেষ্ঠ পুত্র মহুদকে বল্খ্ রক্ষার্থে প্রেরণ এবং কনিষ্ঠ পুত্র মউদকে লাহোর প্রেরণ। আফগানদিগকে দমন করিবার জন্য শাহজাদা ইয়াযদিগারকে প্রেরণ। সুলতানের লাহোর যাত্রা। তাঁহার সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ। বিদ্রোহীদের রাজকোষ অধিকার। মাসুদ সিংহাসনচ্যুত। সৈন্যদের দ্বারা তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মদের। পুনরায় সিংহাসনরোহন মাসুদের মৃত্যু। তাঁহার চরিত্র এবং সাহিত্যানুরাগ।]

সাহস ও উদারতার প্রতিমূর্তি মাসুদ দ্বিতীয় রোস্তম উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার তীর দুর্ভেদ্য বর্মভেদ করিয়া একটা হস্তী চর্মে প্রবেশ করিয়াছিল। তাঁহার লৌহগদা এত ভারী ছিল যে, সমসাময়িক আর কোন লোক ইহা একহাতে উত্তোলন করিতে পারিত না। নির্ভীক ও দুর্বিনীত উক্তি দ্বারা তিনি বার বার তাঁহার পিতার অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং এইজন্য পিতা,

তাঁহার ভ্রাতা মুহম্মদের উপর তাঁহার সমস্ত স্নেহ নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ছিলেন অপেক্ষাকৃত শান্ত ও নম্র প্রকৃতির মানুষ।

খাজা আবু নসর মুকুটির বিবরণের উপর ভিত্তি করিয়া তাব্‌কাতে নাসিরিতে বলা হইয়াছে, সুলতান মাহমুদ নাকি গোপনে বাগদাদের খলিফাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে যে পত্র লিখিবেন সেখানে তিনি যেন মুহাম্মদের নাম মাসুদের নামের পূর্বে লেখেন। সেই মোতাবেক, যে পত্র পরে আসে তাহা দরবারে উচ্চঃস্বরে পাঠ করা হয় এবং অধিকাংশ ওমরাহই এই অস্বাভাবিক কাণ্ডে বিস্ময় ও ক্রোধ প্রকাশ করেন। আবু নসর বলেন, তিনি দরবার ত্যাগ করিয়া মাসুদের পিছু পিছু তাঁহার দরজা পর্যন্ত গমন করেন এবং সেখানে তাহাকে বলেন, "যাহা শুনিলাম তাহাতে আমি নিরতিশয় উদ্বেগবোধ করিতেছি ; কারণ আমার নিজের এবং অধিকাংশ ওমরাহের অন্তর আপনার দিকে নিবদ্ধ।" শাহজাদা মৃদু হাসিয়া উত্তর দিয়াছিলেন, "এ বিষয়ে আপনি মোটেই মাথা ঘামাইবেন না, কারণ দীর্ঘ তলোয়ার যার রাজ্যও তার।" সুলতানের এক অনুচর এই কথোপকথন শুনিয়া সুলতানকে জানাইয়া দেয়। মাহমুদ আবু নসরকে ডাকিয়া শাহজাদা মাসুদ ও তাঁহার মধ্যে কি কথাবার্তা হইয়াছিল জিজ্ঞাসা করেন। আবু নসর চিন্তা করিয়া দেখিলেন, এ ক্ষেত্রে সত্য কথা বলাই তাঁহার শ্রেয়। তিনি সব কথা বলিলেন। সুলতান মন্তব্য করেন, 'মাসুদ সম্বন্ধে আমিও উচ্চ ধারণা পোষণ করি, কিন্তু অকৃত্তিম পিতৃসেবা ও আনুগত্য দ্বারা মুহাম্মদ আমার স্নেহ জয় করিয়া লইয়াছে।'

মাসুদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়া হাসান মাইমুন্দীর পুত্র আহমদকে মুক্ত করিয়া দিলেন, যিনি সম্রাট মাহমুদের আদেশে ভারত সীমান্তে কালিঞ্জর[১৫] দুর্গে আটক ছিলেন। তিনি পুনরায় উজির নিযুক্ত হইলেন। কোষাধ্যক্ষ দানিয়েল তুগীনের পুত্র, আমীর আহমদের হিসাবে ঘাটতি পাওয়া যায় এবং সরকারী দফতরে এই দুর্নীতির জন্য সুলতান অনেক টাকা ফিরাইয়া দিতে বাধ্য করেন। পরে তাঁহাকে হিন্দুস্তানে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া তাঁহাকে লাহোর গমন করিতে আদেশ করা হয়। এই সময়েই মুজ্‌দ-উদ-দৌলা দেলিমীকে মুক্তিদান করিয়া দরবারে তলব করিয়া আনা হয়। তিনি ভারতের কোন এক দুর্গে বন্দী ছিলেন।

---

১৫ ফিরিশ্‌তা এখানে বুন্দেল খণ্ডের কালিঞ্জর দুর্গের কথা বলেন নাই। ইহা পাঞ্জাবের কালিঞ্জর।

৪২২ হিজরীতে (১০৩১ খ্রীঃ) বল্‌খ ত্যাগ করিয়া মাসুদ গজনী গমন করেন এবং কেচ[২] ও মিক্‌রানে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে। উভয় প্রদেশেই তাঁহার নামে মুদ্রা ছাপাইবার ব্যবস্থা করা হইল। ঐ দেশদ্বয়ের সুলতান ঐ সময় মারা যান এবং আবুল আসাকির ও ঈসা নামক দুই পুত্র রাখিয়া যান। কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্য দখল করিয়া লইলে জ্যেষ্ঠ আসাকির সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনার জন্য মাসুদের নিকট আগমন করেন। পলাতক শাহজাদা তাঁহাকে একটা বাৎসরিক কর প্রদান করিতে এবং উদ্ধারকৃত রাজ্য মাসুদের নামে শাসন করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন। তদনুযায়ী মাসুদ আবুল আসাকিরের সঙ্গে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। সেনাপতির প্রতি নির্দেশ ছিল সম্ভব হইলে ভ্রাতৃবিরোধ নিষ্পত্তি করিয়া তাহাদের দুই ভ্রাতার মধ্যে রাজ্য সমভাবে বণ্টন করিয়া দিবে; আর যদি তাহা সম্ভব না হয় তবে আবুল আসাকিরকে সমস্ত রাজ্যের মালিক করিবে।

গজনী বাহিনী সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিল, কিন্তু ঈসা এমন উদ্ধত প্রকৃতির লোক যে, কোন প্রকার আপোষের প্রস্তাবেই তিনি কর্ণপাত করিলেন না—যদিও তাঁহার অনেক বন্ধু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া তাঁহার ভাইয়ের পক্ষে যোগদান করিল। ঈসা তলোয়ার দ্বারাই বিরোধ মীমাংসা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। যাহাহউক, তিনি অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। এইরূপে প্রদেশদ্বয় সম্পূর্ণ আবুল আসাকিরের হস্তগত হইল এবং ইহার পর হইতে তিনি গজনীর সম্রাটকে কর প্রদান করিয়া যাইতে লাগিলেন।

এই বৎসরই মাসুদ পারস্যের রাই, হামাদান ও সমগ্র জুব্জিস্তানের তাস্‌কে (তাঁহার অন্যতম ঝাড়ুদার) প্রদান করেন। তাস্‌কে যদিও শিবিরের নিম্নতম স্থান হইতে উত্তোলন করা হইয়াছিল, তবুও তিনি ঐ প্রদেশগুলিকে বশীভূত করিতে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। পূর্বে, সুলতান নিজে ঐ প্রদেশগুলির শাসনকর্তা ছিলেন এবং তাহার প্রস্থানের পরেই ঐসব এলাকায় বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। তাস্‌ বিদ্রোহ দমন করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, উপরন্তু খোরাসানের গজনভী শাসনকর্তা আলা-উদ্‌-দৌলা—যিনি বিদ্রোহীদিগকে গোপনে সাহায্য করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহাকেও শাস্তিদান করিলেন।

২ ইহাকে গুজরাটের নিকটবর্তী কাচের সঙ্গে যেন ভুল করা না হয়।

গজনীর সমস্ত ব্যাপার সুব্যবস্থিত করিয়া মাসুদ ইস্‌পাহান ও রাই-এ গমন করিবেন মনস্থ করিলেন। কিন্তু তিনি হিরাট পৌছিবা মাত্র সুরুখ্‌স্‌ ও বার্দাদের অধিবাসীরা সেলজুকী তুর্কীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁহার নিকট ফরিয়াদ জানাইল। সুলতান তাঁহার প্রজাদের ফরিয়াদ শুনিয়া অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন এবং তিনি সাহসী সেনাপতি আবুল আজিমের আবদুল রাইস্‌কে বিপুল সৈন্যবাহিনী লইয়া হানাদারদিগকে আক্রমণ করিতে আদেশ করিলেন। এই সেনাপতি, তুর্কীদের নিকট হইতে প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। ওদিকে সুলতান তাঁহার উদ্দেশ্য হাসিল করিবার পূর্বেই গজনী প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন।

৪২৩ হিজরীতে (১০৩২ খ্রীঃ) সুলতান আলতুনতাস্‌কে তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া, খরিজম হইতে আলীতুগীন সেলজুকের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে বলিলেন। আলীতুগীন সমরকন্দ ও বোখারা আক্রমণ ও অধিকার করিয়াছিল। আলতুনতাস বল্‌খের নিকটে গজনী হইতে প্রেরিত ১৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের সঙ্গে মিলিত হইয়া মা-উরা-উন্নাহার গমন করিলেন। তিনি আমু দরিয়া পার হইয়া বোখারা অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। বোখারা অধিকার করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না। অতঃপর তিনি সমরকন্দ অভিমুখে রওনা হইলেন। আলীতুগীন শহর ছাড়িয়া নিকটবর্তী এক গ্রাম দখল করিয়া সেখানে ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। এই গ্রামের এক দিকে ছিল নদী ও জঙ্গল এবং অন্য দিকে ছিল উচ্চ পাহাড়। এইখানে আল তুনতাস তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন. কিন্তু আলীতুগীনের একদল অশ্বারোহী সৈন্য পার্শ্ববর্তী পর্বতের অন্তরাল হইতে নির্গত হইয়া গজনী বাহিনীকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ করিল। ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু হইল এবং আলতুনতাস শরীরের এক অংশে গুরুতরভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হইলেন—ভারতের কোন দুর্গ অধিকারকালে ঐ স্থানেই পূর্বে আর একবার তাঁহার বাটুল বিদ্ধ হইয়াছিল। ইহা সত্বেও অসাধারণ বীরত্বের সহিত শত্রুবাহিনীর সঙ্গে জুঝিয়া এক দুর্গম রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তাহাদিগকে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। যুদ্ধের পর আলতুন তাস প্রধান সেনাপতিদিগকে সমবেত করিয়া তাঁহার যখম দেখাইলেন এবং বলিলেন, তাঁহার অন্তিমকাল ঘনাইয়া আসিয়াছে, অতঃপর তাঁহারা নিজেরাই তাহাদের বিষয় নিয়ন্ত্রণ করিবেন, তবে তিনি মনে করেন শত্রুর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করাই

মঙ্গলজনক। এই প্রস্তাবগুলি সকলে সমর্থন করায় সেই রাত্রেই আলীতুগীনের নিকট দূত প্রেরণ করা হয়। সন্ধির শর্ত—সমরকন্দ আলীতুগীনের দখলে থাকিবে এবং বোখারা মাসুদের হাতে থাকিবে। দুই বাহিনী পরদিন পৃথক হইল এবং এক বাহিনী সমরকন্দ এবং অন্য বাহিনী বোখারার পথে যাত্রা করিল। উহার পরদিন আলতুন তাস ইন্তেকাল করেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুসংবাদ ফৌজের নিকট গোপন রাখা হইল এবং অন্যান্য সেনাধ্যক্ষগণ খারিজম পর্যন্ত সেনাবাহিনী পরিচালনা করিয়া লইয়া আসিলেন। এই বিবরণ সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি আলতুন তাসের পুত্র হারুনকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। এই বৎসর সুযোগ্য প্রধান মন্ত্রী হাসান মাইমুন্দীর পুত্র খাজা আহমদ পরলোক গমন করেন এবং আবুনসর আহমদ বিন-মুহাম্মদ-বিন-আবুল সামাদ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি আলতুন তাসের পুত্র হারুনের কর্মসচিব ছিলেন। সরকারী সীল মহরাদি প্রদান করিবার জন্য তাঁহাকে খারিজম হইতে ডাকিয়া আনা হইল।

৪২৪ হিজরীতে (১০৩৩ খ্রীঃ) সুলতান ভারত অভিযানে গমন করিবেন মনস্থ করিয়া কাশ্মীরের পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত সুরসুতি দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উক্ত দুর্গের সৈন্যরা ভীত হইয়া সুলতানের নিকট দূত মারফত প্রস্তাব পাঠাইলেন যে, সুলতান যদি দুর্গ জয়ের সংকল্প ত্যাগ করেন তবে সুলতানকে বহুমূল্য উপঢৌকন প্রদান করিবেন এবং বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিবেন। মাসুদ প্রস্তাবটি বিবেচনা করিতেছিলেন, এমন সময় জানিতে পারিলেন যে, দুর্গবাসী সৈন্যরা কয়েকজন মুসলমান সওদাগরকে ধরিয়া দুর্গে আটক রাখিয়াছে। এই কারণে তিনি আলোচনা ভাঙ্গিয়া দিয়া দুর্গ অবরোধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এতোদ্দেশ্যে তিনি নিকটবর্তী ইক্ষুর ক্ষেতগুলি হইতে ইক্ষুর গাছ কাটিয়া দুর্গের চতুষ্পার্শ্বস্থ খন্দক ভরাট করিবার হুকুম দিলেন। এই কাজ শেষ হইলে তিনি প্রাচীরে আরোহণ করিবার জন্য মই লাগাইবার ব্যবস্থা করিলেন এবং এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দুর্গ অধিকার করিলেন। শিশু ও স্ত্রীলোক ব্যতীত দুর্গের সমস্ত লোককে নির্বিচারে হত্যা করা হইল। শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে সৈন্যরা গোলাম করিয়া লইল। যেসব মুসলমান বণিক সুরসুত দুর্গে আটক ছিল এবং যাহারা ইতিপূর্বে তাহাদের মাল-পত্র হারাইয়াছিল, সুলতান তাহাদিগকেও লুটের মালের অংশ প্রদান করিতে নির্দেশ দিলেন।

পৃথিবীর অনেক স্থানে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষের জন্য এই বৎসর স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। দুর্ভিক্ষের পরে আসিল মাহামারী। তাহাতেও বহু সহস্র লোকের অস্তিত্ব ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গেল। শুধু ইস্পাহানেই এক মাসে ৪০,০০০ লোক মারা গিয়াছিল। হিন্দুস্তানেও মহামারীর প্রকোপ কম হয় নাই; সমগ্র দেশ প্রায় জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। মসুল ও বাগদাদের নিকটবর্তী অঞ্চলে এমন ব্যাপকভাবে প্লেগের আক্রমণ হইয়াছিল যে, সে অঞ্চলে এমন কোন গৃহ ছিল না, যে গৃহে দুই এক জন লোক মারা না গিয়াছিল।

৪২৫ হিজরীতে (১০৩৪ খ্রীঃ) মাসুদ উত্তর দিকে আমোল ও সারীর পথে সৈন্য চালনা করেন। পথে অধিবাসীরা বাধা দান করে এবং সুলতানের সৈন্যরা অনায়াসে তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। তাব্রিস্তানের রাজা আবা-কালুঞ্জর[৩] নিজেকে ও তাহার দেশকে সুলতানের অধীনস্থ ঘোষণা করিয়া এক দূত প্রেরণ করিলেন এবং সেই সঙ্গে পুত্র বাহমুন ও ভ্রাতুষ্পুত্র সুরখাব-তনয় সেরোয়ারকে কুরকান প্রদেশে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে প্রেরণ করিলেন। মাসুদ সেখান হইতে গজনীর পথে রওয়ানা হইয়া নিশাপুর আসিয়া পৌঁছিলে সেখানকার অধিবাসীরা সেলজুক তুর্কীদের উপদ্রবের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে নালিশ করিতে লাগিল। সুলতান বখ্‌তুদি ও মেকাইলের পুত্র হোসেনকে একদল সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে বলিলেন। গজনী বাহিনী সেল্‌জুকদের গ্রামে পৌঁছিলে তুর্কীদের নিকট হইতে এক দূত নিম্নমর্মে লিখিত এক পত্র লইয়া হাজির হইল। "আমরা সুলতানেরই প্রজা এবং সুলতানের শত্রু ব্যতীত আর কাহাকেও উত্যক্ত করিতে ইচ্ছুক নই; লুটপাট না করিয়া আমরা যাহাতে গৃহে বাঁচিয়া থাকিতে পারি, সুলতান আমাদিগকে তজ্জন্য বাৎসরিক কিছু ভাতাদানের ব্যবস্থা করুন অথবা আমাদিগকে তাঁহার সমর যাত্রায় শরীক করুন, যেখানে আমরা আমাদের চিরাচরিত পেশা কাজে লাগাইতে পারি।" বাখ্‌তুদি উদ্ধত ও তাচ্ছিল্যপূর্ণ উত্তর দিলেন; "যতদিন পর্যন্ত তোমরা লুট-তরাজ বন্ধ করিয়া বিনা বাক্যে সুলতানের আনুগত্য মানিয়া না

৩ এতদিন পরেও (৪২৫ হিঃ) প্রাচীন পারসিক বংশের এক রাজা তাব্রিস্তানে অমুসলমান না হইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন; ইহা যদি সত্য হয়—তবে তাহা আশ্চর্য মনে করিতে হইবে।

লইতেছ, ততদিন পর্যন্ত তোমাদের সাথে তলোয়ারের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোন সম্পর্ক স্থাপন করিতে চাই না।"

সেলজুকরা দূতের নিকট এই সংবাদ পাইয়া যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইল এবং বখ্‌তুদির শিবিরে প্রবলভাবে হামলা করিল। কিন্তু তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। বখ্‌তুদি পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের সমস্ত মালপত্র, শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পশ্চাদ্ধাবন হইতে ফিরিবার পরে তাঁহার সৈন্যরা যখন বিক্ষিপ্তভাবে লুটপাটে মত্ত হইয়াছে, সেই সময় নিকটবর্তী দুইটি পাহাড়ের মাঝখান হইতে একদল সেলজুক সহসা তাহাদের উপর আপতিত হইয়া ভয়াবহ হত্যালীলা আরম্ভ করিয়া দেয়। বখ্‌তুদি শত চেষ্টা করিয়াও সৈন্যদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রত্যেক গজনী সৈন্য স্বতন্ত্রভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া দুইদিন ও দুই রাত্রি যাবং পশ্চাদ্ধাপসরণ করিয়া আসিল। মেকাইলের পুত্র হোসেনকে কোন ক্রমেই যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করানো গেল না। ফলে তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইল এবং তিনি সেলজুকদের হস্তে বন্দী হইলেন। বখ্‌তুদি পলায়ন করেন এবং নিশাপুরে সুলতানের নিকট পরাজয়ের কথা নিজেই বহন করিয়া লইয়া আসেন।

মাসুদ চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ক্রোধ ও লজ্জা গোপন রাখিতে পারিলেন না এবং ৪২৬ হিজরীতে (১০৩৫ খ্রীঃ) তিনি গজনী ফিরিয়া আসিলেন। এই বৎসরই দানিয়েল তুগীনের পুত্র আহমদকে আক্রমণ করিবার জন্য তাতিয়া[৪] নামক এক ভারতীয় সেনাপতিকে নিযুক্ত করা হয়। কারণ আহমদ তাঁহার শাসিত এলাকায় বিদ্রোহ ঘোষনা করিয়াছিল। যুদ্ধে তাতিয়া নিহত হয় এবং বহু হতাহতের মধ্যে তাহার বাহিনী পরাস্ত হয়। এই বিপর্যয়ের সংবাদ পাইয়া মাসুদ ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সর্বময় নেতা তিলককে[৫] সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন। তিলক সন্নিহিতভাবে শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। ফলে বহু সহস্র শত্রু সৈন্য তাঁহার হাতে ধরা পড়িল। তিনি নাক কান কাটিয়া তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করিয়া দিলেন। আহমদ সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং নদী অতিক্রম

৪ এই নামটি বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ভিন্ন ভিন্নভাবে লিখিত আছে।

৫ এটা আশ্চর্যের কথা যে অতপূর্বে গজনী সুলতানদের সেনাবাহিনীতে হিন্দু ছিল—নামেই যাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। মনে হয়, উহারা লাহোরের স্থানীয় সৈন্য ছিল।

কালে ডুবিয়া মরিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার মৃতদেহ পাওয়া যায় এবং তাঁহার মস্তক দেহ হইতে আলাদা করিয়া গজনী প্রেরণ করা হয়।

৪২৭ হিজরীতে (১০৩৬ খ্রীঃ) গজনীতে একটা নূতন প্রাসাদের নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা হয়। এই প্রাসাদে অতি মনোরম এবং বৃহৎ এক প্রকোষ্ঠে বহু রত্ন খচিত এক স্বর্ণ সিংহাসন স্থাপন করা হয়। এই সিংহাসনের উপর সোনার শিকলে বাঁধা ৭০ মান্‌স্‌[৬] ওজনের একটি সুবৃহত মুকুট ঝুলানো ছিল। ঐ মুকুটে অসংখ্য রত্ন হইতে আলোকরশ্মি বিচ্ছুরিত হইত। জনসাধারণকে সাক্ষাৎ দানের সময় সুলতান যখন সিংহাসনে উপবেশন করিতেন, তখন মুকুটটি মাথার উপর চাঁদোয়ার মত শোভা পাইত। এই বৎসরই তিনি তাঁহার পুত্র শাহজাদা মহুদকে শাহী নিশান ও নাকাড়া প্রদান করিয়া বল্‌খ্‌ শাসন করিতে প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে এক সৈন্যবাহিনী লইয়া হান্‌সী দুর্গ জয়ের জন্য ভারতাভিমুখে যাত্রা করেন। তাব্‌কাতে নাসিরির মতে, হান্‌সী প্রাচীন সেবালিকের রাজধানী ছিল। হিন্দুরা এই দুর্গকে অজেয় মনে করিত এবং তাহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছিল যে, মুসলমানরা কোন দিন এই দুর্গ জয় করিতে সক্ষম হইবে না। ভারতীয় গণকরা এই ব্যাপারে অন্য জাতের গণকের মতই তাহাদের লোকদিগকে প্রত্যারিত করে—কারণ ছয় দিনের মধ্যেই সুলতান মই দ্বারা ঐ দুর্গের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করেন এবং এক প্রচণ্ড আক্রমণের পর উহা অধিকার করেন। সুলতান এই দুর্গে প্রভূত ধনরত্ন লাভ করেন। দুর্গটি এক বিশ্বস্ত সেনাপতির দায়িত্বে রাখিয়া সুলতান সনপুত দুর্গাভিমুখে যাত্রা করেন। সনপুতের রাজা দিপাল হরি দুর্গ ত্যাগ করিয়া জঙ্গলে পালাইয়া যান। কিন্তু সময়াভাবে তিনি ধনসম্পদ সঙ্গে লইতে পারেন নাই—সেসব কিছু বিজয়ীদের হাতে ছাড়িয়া দিলেন। মাসুদ সেখানকার সমস্ত মন্দিরকে ভূমিস্মাৎ করিতে এবং মূর্তিগুলি চূর্ণবিচূর্ণ করিতে হুকুম দিলেন। অতঃপর তিনি দিপাল হরির অনুসরণে বাহির হন। দিপাল হরি সুলতান কর্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইলেন। তাঁহার অধিকাংশ সৈন্য বন্দী হইল। কিন্তু তিনি নিজে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেখান হইতে সুলতান রাম রায়ের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া রাম রায় বহুল পরিমাণ স্বর্ণ ও হস্তী উপহার স্বরূপ প্রেরণ

৬ ১৩১ পাউণ্ড।

করেন এবং বার্ধক্যজনিত দুর্বলতার জন্য নিজে হাজির হইতে না পারায় ক্ষমা ভিক্ষা করেন। সুলতান, তাঁহার উপহার ও ওজরে তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতি আর কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই। সুলতান অতঃপর সনপুত্রে একজন বিশ্বস্ত সেনানায়ক রাখিয়া এবং উহার পার্শ্ববর্তী সমস্ত এলাকা অধিকার করিয়া গজনী ফিরিবেন মনস্থ করেন। লাহোর পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার পুত্র মাহ্দুদের উপর ঐ প্রদেশের শাসনভার অর্পণ করেন এবং তাঁহাকে রাজকীয় নাকাড়া ও নিশান প্রদান করিয়া সেখানে রাখিয়া স্বদেশ গমন করেন। তাঁহার প্রিয় মন্ত্রী ও পরামর্শদাতা আয়াজ খানকেও তাঁহার নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন।

৪২৮ হিজরীতে (১০৩৭ খ্রীঃ) তুর্কীদের অবিরাম অনধিকার প্রবেশ রোধ করিবার জন্য মাসুদ বল্‌খ গমন করেন। তুর্কীরা সুলতানের আগমন বার্তা শুনিয়া দেশ ছাড়িয়া পলায়ন করে। বল্‌খের অধিবাসীরা মাসুদকে জানাইল যে, তাঁহার প্রস্থানের পর তুগরল বেগ সেলজুকী পুনঃ পুনঃ তাঁহার রাজ্যে অনুপ্রবেশ করিয়াছিল এবং নদী পার হইয়া আসিয়া তাঁহার প্রজাদের ধনসম্পদ বেপরোয়াভাবে লুণ্ঠন করিয়াছে। আসন্ন শীতকালেই সুলতান, তোগরল বেগকে আক্রমণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন এবং বসন্তের প্রারম্ভে খোরাসানে সেলজুকদের অন্যান্য বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন স্থির করিলেন। পরিষদবর্গ সকলে এক বাক্যে তাঁহাকে প্রথম জাকির বেগের অধীনস্ত তুর্কীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন, কারণ উহারা গত দুই বৎসর যাবৎ খোরাসান বাহিনীর বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিতেছে এবং প্রতিদিন তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতেছে। এই সময়েই মাসুদ ঐ প্রদেশের এক ওমরাহের নিকট হইতে একটা কবিতার নকল প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কবি বলিয়াছিলেন, "সেলজুকরা একদিন পিপীলিকা ছিল, এখন আদার (এক প্রকার বিষধর সাপ) হইয়াছে; এবং তাহাদিগকে শীঘ্র ধ্বংস না করিলে তাহারা ড্রাগনে পরিণত হইতে পারে।"

কিন্তু সুলতানের সৌভাগ্য-সূর্য তখন মাধ্যহ্নগগনে পৌঁছিয়াছিল এবং তিনি কিছুতেই আমীরদের উপদেশে কর্ণপাত করিলেন না। তিনি সম্মুখের দেশগুলি অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে আমু দরিয়ার নদীর উপর সেতু স্থাপন করিয়া নির্বিঘ্নে সৈন্য বাহিনী পার করিলেন এবং সমস্ত মা-উরা-উন্নাহার অধিকার করিয়া ফেলিলেন। শীতকালে সে অঞ্চলে এত তুষারপাত হইল যে তিনি অতি কষ্টে

তাঁহার সৈন্যবাহিনী লইয়া গজনী ফিরিয়া আসিলেন। ইতিমধ্যে জাকির বেগ সেলজুকী সুরুখ্‌স্‌ হইতে বল্‌খের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। সেখান হইতে উজির খাজা আহমদ সুলতানের নিকট আবেদন জানাইয়া পত্র লিখিলেন যে, যেহেতু শত্রুকে বাধাদানের মত যথেষ্ট সৈন্য তাঁহার নাই, সুলতান যেন তাঁহাকে সাহায্য প্রেরণের ব্যবস্থাবলম্বন করেন। তদনুযায়ী মাসুদ তাঁহার সৈন্য বাহিনীকে পুনরায় ঘুরাইয়া বলখে্‌র দিকে রওয়ানা দিলেন।

এই অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিয়া তোগরল বেগ সেলজুকী দ্রুতবেগে গজনী পৌঁছিয়া সুলতানের আস্তাবল লুণ্ঠন করিয়া লইলেন এবং বিতাড়িত হইবার পূর্বে রাজধানীর কিছু অংশও লুণ্ঠন করেন। মাসুদ বলখের সীমান্তে উপনীত হইলে জাকির বেগ সেলজুকী মার্ভের দিকে পশ্চাদাপসরণ করেন। সুলতান তাঁহার পুত্র মওদুদের সঙ্গে যোগদান করিয়া কুরবান পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। এই সময় কতিপয় ব্যক্তি শিবিরে প্রবেশ করিয়া আলী কুন্‌ ডুজীর দৌরাত্মের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। আলী একজন সাধারণ দস্যু বৈ কিছু নয়। কিন্তু সে অত্যন্ত বুদ্ধিবান ও ধূর্ত ছিল। তাহার আচরণের জন্য কৈফিয়ত দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করায় এবং উপদ্রব অব্যাহত রাখায়, সুলতান তাহাকে আক্রমণ করিবার জন্য একদল সৈন্যকে হুকুম দিলেন। সুলতানের সৈন্যগণ তাগাকে তাড়াইয়া নিকটবর্তী এক দুর্গের প্রাচীরের অভ্যন্তরে লইয়া গেল। সে সেখানে সপরিবারে ধৃত হইল এবং তাঁহার ফাঁসির হুকুম দেওয়া হইল।

মার্ভের দিকে সুলতানের অগ্রগতির সংবাদ পাইয়া তুর্কীরা দূত মারফত সুলতানকে জানাইল যে, যদি তাহাদের বসবাসের জন্য কোন এক অঞ্চল ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে তাহারা সুলতানের আনুগত্য মানিয়া লইবে। সুলতান এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন এবং তাহাদের সর্দার মঙ্গু খানের নিকট দূত পাঠাইয়া শান্তি চুক্তি সম্পাদনের জন্য তাঁহাকে শিবিরে আমন্ত্রণ জানাইলেন। ভবিষ্যতে আর কখনও অসদাচরণ করিবে না, এই প্রতিশ্রুতিতে সুলতান তাঁহাদের ভরণপোষণের জন্য একটা এলাকা বিচ্ছিন্ন করিয়া দিলেন।

এই ঘটনার পর মাসুদ হিরাট যাত্রা করেন। কিন্তু সেলজুকরা তাহাদের প্রতিশ্রুতির বিন্দুমাত্র মর্যাদা রক্ষা না করিয়া সুলতানের বাহিনীর পশ্চাদভাগ আক্রমণ করিয়া বসিল এবং কয়েকজন রক্ষীকে হত্যা করিয়া মালপত্রের কিছু অংশ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গেল। এই আচরণে ক্রোধান্ধ হইয়া, সুলতান একদল সৈন্যকে

তাহাদের পিছু ছুটিতে আদেশ করিলেন। তাহারা সামান্য কয়েকজনকে বন্দী করিয়া আনিল এবং সুলতান তৎক্ষণাৎ তাহাদের মাথা কাটিয়া মঙ্গু খানের নিকট পাঠাইবার হুকুম দিলেন। মঙ্গু খান এই বলিয়া নিজের দোষস্খালন করিলেন যে, তাহারা কৃতকর্মের ফল ভোগ করিয়াছে এবং তিনি উহাতে খুশীই হইয়াছেন, কারণ তাহারা তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই সেই দুষ্কর্মে লিপ্ত হইয়াছিল।

মাস্উদ হিরাট হইতে রওয়ানা হইয়া নিশাপুরের দিকে অবিরাম চলিলেন এবং সেখান হইতে তুস্ গমন করিলেন। তুসে তিনি অন্য এক সেলজুক বাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইলেন এবং বহু হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া দিলেন। কিন্তু এই সময় খবর পাইলেন যে, বার্দাদের অধিবাসীরা সেলজুকদের হস্তে তাহাদের এলাকার দুর্গ সমর্পণ করিয়াছে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই দিকে ছুটিলেন এবং দুর্গ পুনরুদ্ধার করিয়া ঐ অঞ্চল শত্রু শূন্য করিলেন। তিনি অতঃপর নিশাপুর ফিরিয়া আসিলেন এবং শীতকালটা সেখানেই কাটাইলেন। ৪৩০ হিজরী (১০৩৯ খ্রীঃ) বসন্তকালে তিনি বার্দাদ ফিরিয়া আসিলেন। সুলতানের অনুপস্থিত কালে পুনরায় তোগরল বেগ কর্তৃক উহা আক্রান্ত হইয়াছিল। বার্দাদ ও তেজেন অভিমুখে সুলতানের আগমনের সংবাদ পাইয়া তোগরল বেগ পালাইয়া গেলেন। মাস্উদ সুরুখ্স্ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। সুরুখ্সের অধিবাসীরা কর দান রহিত করিয়াছিল। তাহাদের কয়েকজন সর্দারকে শাস্তি দান করিবার পর আর সকলে বশে আসিল এবং তাহাদের আত্মসমর্পণের পর সুলতান দান্দানাকেন পর্যন্ত গমন করিলেন। সেলজুকরা এইখানে তাহাদের সৈন্যদল একত্রিত করিয়া ৪৩১, হিজরী ৮ই রমজান (মে ২৪, ১০৪০ খ্রীঃ) সুলতানের ফৌজকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং চতুর্দিকের গিরিপথগুলি বন্ধ করিয়া দিল। শত্রুকে যুদ্ধে লিপ্ত করিবার জন্য মাস্উদ তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য কাতারবদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান করাইলেন। শত্রুরা যুদ্ধে নামিতে একটুও ইতস্ততঃ করিল না। চতুর্দিক হইতে বর্বরদের মত বিকট ধ্বনি করিয়া অমিততেজে মাস্উদের ফৌজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। এই অভিনব আক্রমণ পদ্ধতিতে গজনী সৈন্যরা ঘাবড়াইয়া গেল এবং ভয়েই হউক বা বিশ্বাসঘাতকতার কারণেই হউক যুদ্ধের প্রারম্ভেই কয়েকজন সেনাধ্যক্ষ সদলবলে অশ্ব ছুটাইয়া শত্রুদলে যাইয়া যোগদান করিল। সেনাপতিদের দলত্যাগে বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া যুদ্ধ যেখানে সর্বাপেক্ষা অধিক রক্তক্ষয়রূপ ধারণ করিয়াছিল

সুলতান অশ্ব ছুটাইয়া সেখানে হাজির হইলেন এবং এমন অপরিসীম সাহসের পরিচয় দান করিলেন যাহা আর কোন সুলতানের পক্ষে কখনও সম্ভব হয় নাই। কিন্তু তাঁহার বীরত্ব কোন কাজে আসিল না; চতুর্দিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, তাঁহার নিজস্ব দল ব্যতীত প্রায় সমস্ত বাহিনীই ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিতেছে। এইরূপে আপন সৈন্যগণ কর্তৃক পরিত্যাক্ত হইয়া তিনি যখন বুঝিলেন তাঁহার একমাত্র তলোয়ার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয়, তখন অশ্বের মুখ ফিরাইয়া শত্রু সৈন্য পদদলিত করিয়া এবং তলোয়ারের সাহায্যে পথ পরিষ্কার করিয়া সমরক্ষেত্র হইতে নির্গত হইলেন। মার্ভে পৌঁছিবার পর কিছু সংখ্যক পলাতকের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। উহারা চতুর্দিক হইতে আসিয়া একত্রিত হইতে লাগিল। সেখান হইতে ঘুরের পথে গজনী চলিয়া আসিলেন। যেসব সৈন্যাধ্যক্ষ তাঁহাকে নির্লজ্জভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, গজনী আসিয়া তিনি তাহাদিগকে বন্দী করিলেন এবং আলিদাবে, বগ্‌তদী এবং আমীর হাজিব সামানীকে হিন্দুস্তানে লইয়া কোন পার্বত্য দুর্গে যাবজ্জীবন আটক করিয়া রাখিবার হুকুম দিলেন। মাসুদ বুঝিলেন সেলজুকদের শক্তিরোধ করা তাঁহার সাধ্যাতীত। সেইজন্য যতদিন পর্যন্ত হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করিবার জন্য যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ না হইতেছেন, ততদিন পর্যন্ত ভারতে সরিয়া থাকিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। এই সঙ্কল্পে অটল থাকিয়া তিনি পুত্র মওদুদকে মন্ত্রী খাজা আহমদ-বিন-মুহাম্মদ-বিন আলপ্তগীন হাজিবকে বল্‌খ রক্ষার জন্য রাখিলেন এবং লাহোর হইতে ২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ আগত অন্য পুত্র শাহাজাদা মাওদুদকে সুলতানের নিরাপত্তা বিধানে প্রেরণ করিলেন। ইত্যবসরে, অন্য পুত্র শাহজাদা এজিদিয়ারকে একদল সৈন্যসহ গজনীর নিকটবর্তী এলাকার বিদ্রোহী পার্বত্য আফগানদিগকে দমন করিতে পাঠাইলেন। গজনীর বিভিন্ন দুর্গ হইতে সমস্ত ধন সম্পদ বাহির করিয়া উষ্ট্রে বোঝাই করিয়া লাহোরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই সময় তিনি তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মদকে ডাকিয়া আনাইলেন, যাহাকে সিংহাসনচ্যুত ও দৃষ্টিশক্তিহীন করার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

মাসুদ সিন্ধু নদের তীরে মুরিয়ালার সরাইখানায় পৌঁছিলে (অন্যদের মতে ঝিলাম যার অন্য নাম ভিউট) গৃহরক্ষী সৈন্যরা উষ্ট্র চালকদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র

করিয়া সমস্ত ধনরত্ন নিজেদের মধ্যে বন্টন করিয়া লইতে লাগিল। সুলতানের ক্রোধানলের ভয়ে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রত্যার্পণের অনিচ্ছায়, সৈন্তরা দল বাধিয়া অন্ধ শাহজাদা মুহাম্মদ সমীপে হাজির হইল (যিনি পূর্বে একবার সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন) এবং তাঁহাকে স্কন্ধে উঠাইয়া লইয়া সিংহাসনে উপবেশন করাইল এবং সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিল। মাসুদ যেসব সৈন্তের উপর নির্ভর করিতে পারিতেন, তাহাদিগকে সজ্ববদ্ধ করিয়া সেনাবিদ্রোহ দমনের জন্ত প্রস্তুত হইতেছিলেন। কিন্তু যখন প্রকাশ হইল যে, তাঁহার ভ্রাতা সুলতান বলিয়া ঘোষিত হইয়াছেন, তখন সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল এবং তিনি সরাইখানায় বন্দী হইলেন। জনতা চতুর্দিক হইতে আসিয়া চাপ দিতে থাকিলে তিনি তাহাদের হস্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে নূতন সুলতান মুহাম্মদের সম্মুখে হাজির করা হইল এবং মুহম্মদ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমার প্রাণনাশের কোন ইচ্ছা আমার নাই, আমি চাই তুমি কোন এক দুর্গ নিবাচন করিয়া লও, সেখানে তোমাকে সপরিবারে বন্দী জীবন যাপনের জন্ত আটক করিয়া রাখা হইবে।" এই চরম সঙ্কটাবস্থায়, মাসুদ কারির দুর্গ বাছিয়া লইলেন। কিন্তু সেখানে এমন নিঃসম্বল অবস্থায় তাঁহাকে রাখা হইল যে, মাত্র কয়েকজন পারিবারিক ভৃত্যকেও বেতন দানের ক্ষমতা তাঁহার রহিল না। এই অবস্থায় নিরুপায় হইয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতার নিকট কিছু অর্থ চাহিলেন।

মুহাম্মদ তখন সামান্ত ৫০০ দিনার পাঠাইবার হুকুম দিলেন। ইহা দেখিয়া মাসুদ চিৎকার করিয়া বলিলেন, "হায়রে কি অভাবনীয় ভাগ্য বিপর্যয়। কি নিষ্ঠুর নিয়তির খেলা। গতকাল আমি ছিলাম প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাট—আমার সম্পদের ভারে ৩,০০০ উষ্ট্রের পৃষ্ঠ বক্র হইয়া যাইত আর আজ আমি ভিক্ষা করিতে বাধ্য এবং আমার ব্যঙ্গ করার মত তুচ্ছ অর্থ আমাকে গ্রহণ করিতে হইতেছে।" এই বলিয়া তিনি তাঁহার ভৃত্যদের নিকট হইতে ১,০০০ দিনার ধার লইয়া তাঁহার ভ্রাতার লোককে বখশিস দান করিলেন এবং যে তাঁহার নিকট ৫০০ দিনার লইয়া আসিয়াছিল তাহাকে সেই ৫০০ দিনার তাঁহার ভাইয়ের নিকট ফেরৎ লইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মুহাম্মদ তাঁহার পুত্র শাহজাদা আহমদের উপর সমস্ত রাজকার্য পরিচালনার ভার অর্পণ করিয়া নিজে শুধু সুলতান উপাধিটি

রাখিলেন। অনেকের মতে, আহমদ বিকৃত-মস্তিস্ক ছিলেন। রাজ্য লাভের অল্পকাল পরেই, ৪৩৩ হিজরী (১০৪২ খ্রীঃ) তিনি তাঁহার চাচাতো ভাই আমীর ইউসুফ সুবুক্তগীনের পুত্র সোলেমানের সঙ্গে এবং আলী চেসাউন্দির পুত্রের সঙ্গে মিলিত হইয়া কারির দুর্গে গমন করেন এবং স্বহস্তে মাসুদকে হত্যা করেন। কেহ কেহ বলেন, তিনি তাঁহাকে জীবন্ত একটা কূপে কবর দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আবার অন্যরা বলিয়াছেন যে, মুহাম্মদের আদেশেই মাসুদকে হত্যা করা হইয়াছিল। কোনটা সত্য আল্লাহ্‌ই জানেন। তারিখ-ই-গুজিদা অনুযায়ী মাসুদ নয় বৎসর নয় মাস কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্য ঐতিহাসিকরা বলেন, তিনি বার বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি অসাধারণ দৈহিক শক্তি-সম্পন্ন ও সাহসী সুলতান ছিলেন। তাঁহার ব্যবহার অত্যন্ত অমায়িক এবং লোকে সহজেই তাঁহার নিকট পৌঁছিতে পারিত। দানে তিনি মুক্তহস্ত ছিলেন—বিশেষ করিয়া বিদ্বান ব্যক্তিদের সম্পর্কে। তিনি তাঁহাদের সাহচর্য খুব ভালবাসিতেন। এজন্য নানা স্থান হইতে বিদ্বান ব্যক্তিরা তাঁহার দরবারে আসিতেন। অতি বিখ্যাত যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মহা দার্শনিক ও জ্যোতির্শাস্ত্রবিদ্ আনওয়ারী খানকে গণনা করিতেই হইবে। জ্যোতির্বিদ্যার উপর তিনি 'মাসুদী' নামক এক গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পুরস্কারস্বরূপ তাহাকে এক হস্তী বোঝাই রৌপ্য প্রদান করা হইয়াছিল। আবু মুহাম্মদ নাসাহি সে যুগের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। আবু হানিফার মতবাদকে সমর্থন করিয়া তিনিও মাসুদী নামে একটা বই লিখিয়া সুলতানকে উপহার দিয়াছিলেন। রজতুস-সাফার লেখক বলেন, তাঁহার বদান্যতা এমন ছিল যে একদা রমজান মাসে তিনি একলক্ষ দারম্ দান করিয়াছিলেন। রাজত্বের প্রথম ভাগে তিনি অনেক সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাহার রাজ্যের বিভিন্ন শহরে কয়েকটি কলেজ ও স্কুল নির্মাণ করিয়াছিলেন।

সুলতান মওদুদ গজনভী

[মওদুদের সিংহাসনারোহণ ও পিতার হত্যাকারীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ। ভারতে অবস্থানকারী শাহজাদা মাদুদ কর্তৃক তাঁহাকে সুলতান বলিয়া মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি। মওদুদের লাহোর গমন। তাঁহার ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যু। সেলজুকদের দ্বারা ট্রানস্-অকসিয়ানা আক্রমণ এবং বল্খ অধিকার। হিন্দু-রাজাদের থানেশ্বর, হানসী ও নগরকোট পুনরাধিকার করিয়া লাহোরের দিকে অগ্রসর এবং সাত মাস যাবৎ লাহোর অবরোধ। অবশেষে অবরোধ ত্যাগ। আলপ্তগীন হাজিবের ট্রানস্-অকসিয়ানায় সেলজুকদিগকে পরাস্তকরণ। তোগরল বেগ সেলজুকও বুস্টে পরাজিত। গজনী সাম্রাজ্যের নানাস্থানে বিদ্রোহ। মওদুদের সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ। তাঁহার মৃত্যু]

মাসুদের হত্যার সংবাদ অন্ধ মুহাম্মদের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি দারুণ কান্না কাঁদিয়াছিলেন এবং হত্যাকারীদিগকে কঠোর ভাষায় ভৎর্সনা করিয়াছিলেন। এই সময় তিনি বল্খে অবস্থানরত শাহজাদা মওদুদকে লিখিয়া জানাইলেন, কোন্ কোন্ ব্যক্তি তাহার পিতাকে খুন করিয়াছে এবং আল্লাকে সাক্ষী মানিয়া বলিয়াছেন, এই জঘন্য কার্যে তাহার কোন হাত ছিল না। উত্তরে মওদুদ শ্লেষপূর্ণ ভাষায় লিখিয়াছিলেন, 'আল্লাহ এমন নিষ্কলুষ ও দয়ালু সুলতানের হায়াৎ দরাজ করুন এবং তাঁহার উন্মাদ পুত্র আহমদকে রাজহত্যার গৌরব দান করিতে থাকুন যতদিন না সে আমার হস্ত হইতে পুরস্কার লাভ না করিতেছে।' পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য মওদুদ তখনই যাত্রা করিতে চাহিলেন; কিন্তু সভাসদরা তাঁহাকে প্রথম গজনী ফিরিতে সম্মত করাইলেন। সেখানকার নাগরিকরা তাঁহার আগমনের সংবাদ পাওয়া মাত্র তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ভীড় করিতে লাগিল এবং হর্ষধ্বনি ও অভিনন্দন দ্বারা তাহাদের আনন্দোচ্ছ্বাস প্রকাশ করিল।

৪৩৩ হিজরীতে (১০৪২ খ্রীঃ) তিনি গজনী হইতে রওয়ানা হইলেন। ওদিকে অন্ধ মুহাম্মদ কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা নামীকে পেশোয়ার ও মুলতানের শাসনকর্তাদের বাধাদানের জন্য প্রেরণ করিলেন এবং নিজে মওদুদকে বাধা দানের জন্য সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া হাজির হইলেন। দাস্তুরে দুই বাহিনী পরস্পর সম্মুখীন হইল এবং চাচা ও ভাতিজার মধ্যে এক সংগ্রাম বাঁধিল। বিজয় মওদুদের পক্ষে রায়

প্রকাশ করিল এবং মুহাম্মদ তাঁহার পুত্রের সঙ্গে এবং আমীর আলী চেসাউদ্দির পুত্র নস্তুগীন বল্খী ও আমীর ইউসুফের পুত্র সোলেমানসহ বন্দী হইলেন। মুহাম্মদের পুত্রদের মধ্যে আবদুর রহিম ব্যতীত আর সকলকে কতল করা হইল। মওদুদ যে তাঁহাকে রেহাই দিলেন তাহার কারণ ছিল: তাঁহার পিতা মাসুদ যখন কারারুদ্ধ ছিলেন, তখন একদিন আবদুর রহিম তাহার ভ্রাতা আবদুর রহমানের সঙ্গে তাহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। আবদুর রহমান অপমানজনকভাবে মাসুদের মাথা হইতে রাজকীয় টুপি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছিল। রহিম তৎক্ষণাৎ উহা উঠাইয়া সুলতান মাসুদের মাথায় সম্রমের সঙ্গে পুনঃস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ভাইকে তাহার অনুদার আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়াছিলেন।

পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের যুদ্ধে যে স্থানে জয়লাভ করিয়াছিলেন, মওদুদ সেখানে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া নাম দিয়াছিলেন ফতেহাবাদ। তিনি পরলোকগত মাসুদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের লাশ দাফনের জন্য গজনী লইয়া গিয়াছিলেন। গজনী ফিরিয়া তিনি হাসন মাইমুন্দীর পুত্র আহমদকে উজির নিযুক্ত করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাঁহাকে অপসারণ করিয়া খাজা তাহিরকে সেই পদ প্রদান করেন এবং আহমদকে চাচা মুহাম্মদের পুত্র নামীর বিরুদ্ধে সসৈন্যে মুলতান প্রেরণ করেন। নামী আক্রান্ত ও নিহত হইয়াছিল। আপন ভ্রাতা মাহ্‌দুদ ব্যতীত সুলতানের এমন আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, যাঁহাকে তিনি ভয় করিতে পারেন। মাহ্‌দুদ এই সময় লাহোর ও লাহোরের অধীনস্থ এলাকার মালিক ছিলেন। মওদুদের এই ভাই পিতার খুনের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া মুলতান হইতে রওয়ানা হইয়াছিলেন এবং মন্ত্রী আয়াজ খানের পরামর্শে হান্‌সী ও থানেশ্বর পর্যন্ত সিন্ধুনদের পূর্ব পাড়ের সমস্ত দেশ স্বাধিকারে আনয়ন করেন।

মওদুদ যখন দেখিলেন তাঁহার ভ্রাতা কিছুকেই আনুগত্য স্বীকার করিতেছেন না তখন তিনি তাহার বিরুদ্ধে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং মাহ্‌দুদও এই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সমস্ত ফৌজ লইয়া মওদুদের বাহিনীর মোকাবিলার জন্য হান্‌সী হইতে রওয়ানা হইলেন। সে সময় তিনি হান্‌সীতে বাস করিতেছিলেন। ৪৩৩ হিজরী, ৬ই জ্বিলহজ্জ (১০৪১ খ্রীঃ) শত্রুবাহিনী লাহোর পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি তাহাদের সম্মুখীন হইলেন। মওদুদের সৈন্য সংখ্যা এতো বিপুল ছিল যে মাহ্‌দুদের সৈন্যরা পলায়নের উপক্রম করিতেছিল।

এই সময় মওদুদের কয়েকজন সেনাপতি তাহাদের পতাকা ত্যাগ করিয়া মাহ্‌দের পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইল। কিন্তু ভাগ্য এবং বিশ্বাসঘাতকতা মওদুদের সহায় হইল। কোরবানীর ঈদের দিন প্রভাতে মাহ্‌দকে তাঁহার শয্যায় মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল। পূর্বে কোন অসুখের কথা শোনা যায় নাই এবং স্পষ্ট কোন কারণও দেখা গেল না। যেহেতু ইহার পরদিন তাঁহার মন্ত্রী খাজা আয়াজকেও মৃতাবস্থায় পাওয়া গেল, সেই জন্য সন্দেহ করা হইল তাঁহাদিগকে বিষ প্রয়োগ করা হইয়াছে। অতঃপর মাহ্‌দের সৈন্য বাহিনী মওদুদের পতাকাতলে চলিয়া আসিল। এই ঘটনার পর দক্ষিণের সমস্ত এলাকাগুলি নিঃশব্দে বশ্যতা স্বীকার করিয়া লইল। উত্তর দিকেও মওদুদ কম লাভবান হইলেন না। মা-উরা-উন্নাহারও তাঁহার আধিপত্য মানিয়া লইল, যে অঞ্চল কিছুদিন পূর্বে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল। সেলজুকরা অবশ্য (সুলতান যদিও জারিক বেগের কন্যাকে শাদী করিয়াছিলেন) তাঁহার রাজ্য নূতন করিয়া হানা দেওয়া শুরু করিল। ৪৩৫ হিজরী (১০৪৩ খ্রীঃ) দিল্লীর রাজা অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া মওদুদ নিয়োজিত শাসনকর্তাদের নিকট হইতে হান্‌সী, থানেশ্বর ও উহাদের আওতাভুক্ত অঞ্চল পুনরাধিকার করিয়া লইলেন। সেখান হইতে হিন্দুরা নগরকোট দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তাহারা চারি মাস যাবৎ নগরকোট অবরোধ করিয়া রহিল। দুর্গবাসী সৈন্যগণ খাদ্যাভাবে এবং লাহোর হইতে কোন সাহায্য প্রাপ্তি সম্বন্ধে নিরাশ হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। হিন্দুরা তাহাদের স্বভাবানুযায়ী মন্দিরে নূতন করিয়া মূর্তি স্থাপন করিয়া মূর্তি পূজা আরম্ভ করিল। আমরা শুনিয়াছি, এই সময় দিল্লীর রাজা (নিশ্চয়ই গজনী সাম্রাজ্যের দুরবস্থার কথা জ্ঞাত হইয়া একটা ছায়ামূর্তি দর্শন করিয়াছেন বলিয়া ভাণ করেন এবং নগরকোটের সেই প্রধান দেবতাই নাকি তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "গজনীর উপর প্রতিশোধ গ্রহণ শেষ হইয়াছে, এইবার আমি নগরকোটে আমার প্রাক্তন মন্দিরে আসিয়া দর্শনদান করিব।" এই গল্পটি খুব সম্ভব ব্রাহ্মণেরা গোপনে গোপনে প্রচার করিয়াছিল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন লোকেরা সহজেই ইহা বিশ্বাস করিয়াছিল। এই প্রচারণার ফলে সকল স্থান হইতে গোঁড়া হিন্দুরা দলে দলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিল এবং দিল্লীর রাজা অতি শীঘ্রই এক বিশাল বাহিনীর অধিনায়ক হইলেন। এই বাহিনীর সাহায্যেই তিনি নগরকোট অবরোধ ও অধিকার করেন—যাহা

পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পর তিনি সর্বপ্রযত্নে সাবেক মূর্তির আয়তন ও আকৃতি বিশিষ্ট একটি মূর্তি (ইহা তিনি দিল্লীতে নির্মাণ করিয়াছিলেন) আনিয়া রাত্রিকালে নগরকোটের কেন্দ্রস্থলে এক উদ্যানে স্থাপন করাইলেন। প্রভাতে এই মূর্তিটি দেখিতে পাইয়া নির্বোধ ভক্তরা তুমুল আনন্দোৎসব আরম্ভ করিল। তাহারা চিৎকার করিয়া প্রচার করিতে লাগিল যে, তাহাদের দেবতা গজনী হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। রাজা ও ব্রাহ্মণরা জনসাধারণের বিশ্বাস প্রবণতার সুযোগ কার্যে লাগাইয়া মহাধুমধামের সঙ্গে মূর্তিটি মন্দিরে লইয়া গেলেন এবং সেখানে ইহা সকলের অর্ঘ্যলাভ করিল। এই গল্পের ফলে মন্দিরের খ্যাতি বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল এবং হিন্দুস্তানে সকল স্থান হইতে প্রতিদিন হাজার হাজার লোক ভক্তিনিবেদন করিতে এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে দৈববাণী জানিবার জন্য আসিতে লাগিল। এই সময়েই দূর ও নিকটবর্তী দেশের রাজন্যবর্গ কর্তৃক আনীত ও প্রেরিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদির পরিমাণ প্রায়, মাহমুদ যাহা লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছিল তাহার সমান হইয়া পড়িয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল। দেবতার পরামর্শ গ্রহণ করিবার পদ্ধতি ছিল এইরূপ : যে লোক ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানিতে আসিত, ব্রাহ্মণরা তাহাকে স্বপ্ন-উদ্রেককারী ঔষধ সেবন করাইত। ঔষধ সেবনান্তে ঐ ব্যক্তি মন্দিরের মেঝের প্রতিমার সম্মুখে নিদ্রা যাইত। পরদিন প্রভাতে তাহাদের নিকট হইতে স্বপ্নের বিবরণ শুনিয়া লইয়া ব্রাহ্মণ নিজের খুশীমত তাহাদের ভাগ্য সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করিত।

দিল্লী রাজের সাফল্য পাঞ্জাবে (যে প্রদেশের মধ্য দিয়া সিন্ধুনদের পঞ্চশাখা প্রবাহিত) ও অন্যান্য স্থানের রাজাদের মনে এমন আত্মবিশ্বাস আনিয়া দিল যে, পূর্বে যাহারা মুসলমানদের ভয়ে শৃগালের মত গর্তে পলাইত, এখন তাহারাই সিংহের ন্যায় আস্ফালন করিতে লাগিল এবং প্রকাশ্যে তাহাদের মালিকদিগকে অগ্রাহ্য করিতে লাগিল। ঐ সব রাজাদের মধ্যে তিন জন রাজা ১০,০০০ অশ্বারোহী ও অগণিত পদাতিক সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইয়া লাহোর অবরোধ করিলেন। মুসলমানরা তাহাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার পরিজন রক্ষার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে লাগিল এবং সাত মাস যাবৎ শহর অবরোধ চলিল। প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধ হইয়াছিল—কারণ প্রাচীর দুর্বল ছিল বলিয়া সহজেই ভূমিস্মাৎ হইয়াছিল। মুসলমানরা তখন বুঝিল যে, সাহায্য আসিয়া

না পৌছিলে তাহারা নিশ্চিতই হারিয়া যাইবে, তখন তাহারা শপথ গ্রহণ করিল, হয় জয় লাভ করিবে না হয় শাহাদৎ বরণ করিবে। তাহারা দুর্গ হইতে নির্গত হইল এবং সামরিক কায়দায় শত্রু শিবিরের সম্মুখে আসিয়া পড়িল। তাহাদের আকস্মিক আবির্ভাবে হতবুদ্ধি হইয়া অথবা তাহাদের দৃঢ়তায় শঙ্কিত হইয়া হিন্দুরা পলায়নের পথ অবলম্বন করিল এবং মুসলমানরা তাহাদের পশ্চাদগমন করিয়া বহুলোক নিহত করিল।

ইহার আগের বৎসর (৪৩৪ হিঃ) সুলতান আলপ্তগীন হাজিবকে একদল সৈন্যসহ অশান্ত সেলজুকদের বিরুদ্ধে তুর্কীস্তান প্রেরণ করিয়াছিলেন। সেখানে পৌছিয়া তিনি শুনিলেন যে, দাউদের জাকির বেগ আরমানে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছেন। যখন দুই বাহিনী যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান হইতেছিল, তখন সেলজুক সেনাপতি এমন আনাড়িভাবে সৈন্য পরিচালনা করিলেন যে অশ্বারোহী সৈন্যরা সংগঠিত হইবার পূর্বেই তিনি আক্রমণের সঙ্কেতদান করিয়া বসিলেন, ইহার ফলে দারুণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল এবং শত্রু কর্তৃক প্রবলভাবে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা সহজেই ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল এবং বিপুলভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইল। শত্রুর অনুসরণ হইতে ফিরিয়া আলপ্তগীন বল্‌খ পুনরুদ্ধারের জন্য রওয়ানা হইলেন—যাহা সেলজুকরা ইতিপূর্বে অধিকার করিয়া লইয়াছিল। অল্প সময়ের মধ্যেই সেলজুকরা শক্তিশালী বাহিনী লইয়া আসিয়া পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বল্‌খ উদ্ধার করা হইল না। আলপ্তগীন দেখিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মোকাবিলা করিবার শক্তি তাঁহার নাই এবং সেইজন্য তিনি মওদুদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু সাহায্যকারী বাহিনী আসিয়া না পৌছায় এবং প্রতিদিন তাঁহার অসুবিধা বৃদ্ধি পাইতে থাকায়, আলপ্তগীন বল্‌খ্ উদ্ধারের সঙ্কল্প পরিহার করেন এবং সামান্য সংখ্যক সৈন্য লইয়া কাবুলের পথে গজনী ফিরিয়া আসেন। এই হতভাগ্য সেনানায়কের বিরুদ্ধে এমন গণ-বিক্ষোভ হয় যে লোকের চিৎকার বন্ধ করিবার জন্য মওদুদকে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করিতে হইয়াছিল। এই সময়েই তোগরল বেগের অধীনস্থ তুর্কীরা বুস্টের গজনী রাজ্যে প্রবেশ করে। মওদুদ ইহাদের বিরুদ্ধে এক বাহিনী প্রেরণ করিয়া তাহাদিগকে গুরুতরভাবে পরাস্ত করেন।

৪৩৬ হিজরীতে (১০৪৪ খ্রীঃ) উজির খাজা তাহির ইন্তেকাল করেন এবং আহমদের পুত্র খাজা আবুল ফাত্তাহ্ আবুল রাজ্জাককে সেই পদ প্রদান করা হইল। এই বৎসরই তোগরল বেগকে[১] একদল সৈন্যসহ বুস্টের দিকে প্রেরণ করা হয় এবং তিনি সেখান হইতে সিস্তান গমন করিয়া আবুল ফজল উজবেকীর ভ্রাতা আবু মনসুরকে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া আসেন। আবু মনসুর সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন। সেলজুকরা পর বৎসর সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনীর দিকে আগুয়ান হইল এবং বুস্ট ও বারাত আমীরের প্রাসাদাবলী লুণ্ঠন করিল। তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে তোগরল বেগকে আদেশ করা হইল। তিনি তাহাদের বহু লোককে হত্যা করিয়া তাহাদিগকে পরাভূত করেন এবং তাড়াইয়া দেশের বাহিরে লইয়া যান। এই জয়লাভের পরেই তোগরল বেগ, কাজিলবাস[২] নামে পরিচিত কান্দাহারের তুর্কী সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। লালটুপী পরিধান করিত বলিয়া তাহাদিগকে কাজিলবাস বলা হইত। তোগরল বেগ তাহাদিগকে পরাস্ত করেন এবং তাহাদের বহুসংখ্যক লোককে বন্দী করিয়া গজনী লইয়া আসেন।

৪৩৮ হিজরীতে (১০৪৬ খ্রীঃ) বিশাল এক বাহিনী লইয়া তোগরল বেগকে পুনরায় বুস্টে গমন করিতে বলা হইল। কিন্তু তুকিয়াবাদ পৌঁছিয়া তিনি সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। এই বিদ্রোহের সংবাদ মওদুদের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাকে ক্ষমার প্রতিশ্রুতি দানে ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাহার নিকট কয়েক ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন। সুলতানের প্রস্তাবের উত্তরে তোগরল বেগ বলেনঃ নিজের নিরাপত্তার জন্যই তিনি ঐ পন্থা অবলম্বন করিয়াছেন। কারণ সুলতানের মোসাহেবরা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন বলিয়া তিনি সংবাদ পাইয়াছেন—যেসব মোসাহেবের একমাত্র কাজ সিংহাসনের পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া সুলতানের কর্ণে মধুবর্ষণ করা। যার জন্য বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইয়া তিনি এতদুর অগ্রসর হইয়াছেন যে আর

---

১ এই সেনাপতিকে বিখ্যাত তোগরল বেগ সেলজুকী বলিয়া যেন ভুল করা না হয়।

২ কাজিলবাস শব্দের অক্ষরগত অর্থ লাল মাথা। পূর্ব পারস্য নিবাসী তুর্কীরা এখনও ঐ আখ্যা পাইয়া আসিতেছে।

ফিরিবার উপায় নাই। সুলতানের দূতরা তোগরল বেগের উপর কোন প্রকার প্রভাব বিস্তার করিতে পারিল না কিন্তু তাঁহারা লক্ষ্য করিল যে তোগরল বেগের সহকর্মী সেনানায়কদের মধ্যে অনেকেরই তখনও রাজভক্তি রহিয়াছে। এই সেনাপতিরা অন্য সৈন্যদিগকেও তোগরলকে পরিত্যাগ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিল—যেসব সৈন্য প্রকৃত কোন অসন্তোষবশতঃ নয়—কেবল নূতনত্বের জন্য বিদ্রোহে যোগদান করিতে আগ্রাহান্বিত হইয়াছিল। দূতরা ফিরিয়া আসিয়া সুলতানকে সেখানকার অবস্থা সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল করিলেন। সুলতান, রাব্বিয়ার পুত্র আলীকে ২০,০০০ অশ্বারোহীসহ বিদ্রোহীদের সঙ্গে যোগদানের জন্য প্রেরণ করিলেন এই উদ্দেশ্যে যে, বিদ্রোহী শিবিরে বিদ্যমান ফাটলকে তাহারা আরও প্রশস্ত করিয়া দিবে। ফলে তোগরল বেগ শীঘ্রই তাঁহার সৈন্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন এবং কয়েকজন মাত্র সঙ্গী লইয়া পলায়ন করিলেন।

আমীর বাস্তগীন হাজিব নামক আর একজন সেনাপতিকে ইয়াহিয়া খুরীর পুত্রকে সাহায্য করিবার জন্য ঘুরে সেই বৎসর প্রেরণ করা হয়। ইয়াহিয়া খুরী সসৈন্যে তাহার সহিত যোগদান করেন এবং এই সম্মিলিত বাহিনী ঘুরের শাসনকর্তা আবু আলীর বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাঁহাকে হটাইয়া একটি দুর্গের[৩] মধ্যে প্রবেশ করিতে বাধ্য করে। তিনি সেখানে অবরুদ্ধ অবস্থায় বন্দী হন। এই দুর্গটিকে এমন মজবুত মনে করা হইত যে, গত ৭০০ বৎসর যাবৎ কেহ ইহা অধিকার করিবার চেষ্টা করে নাই। দুর্গ সম্পূর্ণভাবে করায়ত্ত করিবার পর আমীর বাস্তগীন হাজিব, ইয়াহিয়া খুরীর পুত্রের উপর হাত উঠাইলেন—যাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তাঁহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া আবু আলীর সঙ্গে গজনী প্রেরণ করা হইল। সুলতান উভয়ের শিরোচ্ছেদের আদেশ দেন। ইহার অনতিকাল পরেই আমীর বাস্তগীনকে বাহরাম দানিয়েল নামক এক সেলজুক দলপতির বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হয়। বুস্ট অঞ্চলে শত্রুর সঙ্গে তাঁহার মোকাবিলা হয় এবং তিনি তাহাদিগকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন। ৪৩৯ হিজরীতে (১০৪৭ খ্রীঃ) তিনি খুজদারে প্রেরিত হন। কারণ খুজদারের শাসনকর্তা বরাদ্দকৃত কর প্রদানে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন।

৩ দুর্গের নাম পাণ্ডুলিপিতে কোথায়ও উল্লেখ করা হয় নাই।

তাঁহাকে সুলতানের দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য করিবার পর তিনি সসৈন্যে গজনী প্রত্যাগমন করেন।

পর বৎসর একইদিনে মওদুদ তাঁহার দুই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ-বেশ, নাকাড়া ও নিশান প্রদান করেন। ইহাদের মধ্যে মাহমুদকে তিনি লাহোর ও মনসুরকে বুর কিস্ট্ ওয়ার প্রদেশে প্রেরণ করেন। এই সময়েই আবু আলী কোতোয়ালকে ভারতীয় বাহিনীর নেতৃত্ব করিবার জন্য এবং ভারতের বিজিত রাজ্যগুলি রক্ষার জন্য গজনী হইতে ভারতে প্রেরণ করা হয়। আবু আলী প্রথম পেশোয়ার গমন করিয়া মহটিলার দুর্গ অধিকার করেন—এই দুর্গ সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করিয়াছিল। সেখান হইতে তিনি বিজয় রায় নামক এক হিন্দু সেনা-পতিকে গজনী দরবারে হাজির হইবার নিমন্ত্রণ জানাইয়া এক পত্র লেখেন। এই বিজয় সুলতান মাহমুদের সময় যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। কোন রাজনৈতিক বিরোধের জন্য তিনি গজনী হইতে পালাইয়া আসিয়া কাশ্মীরের পর্বতে আশ্রয় লইয়াছিলেন।

আবু আলী যে সময় সিন্ধুনদ এলাকার দেশগুলিতে শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় তাঁহার শিবিরের কতিপয় ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে সুলতানের নিকট অভিযোগ পেশ করে। সুলতান তাঁহাকে গজনী তলব করিয়া আনাইয়া বন্দী করেন এবং হোসেনের পুত্র মিরাকের হস্তে তাঁহাকে সমর্পণ করেন। এই সেনাপতি প্রাক্তন শত্রুতার কারণে এবং তাঁর নিকট হইতে অর্থ আদায়ের নিমিত্ত তাঁহাকে অমানুষিক যন্ত্রণাদান করেন এবং ইহাতেই তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। কয়েদী সম্বন্ধে সুলতান পরে অনুসন্ধান করেন এবং তাঁহাকে হাজির করিতে আদেশ করেন, সেইজন্য যতদিন আবু আলীর মৃত্যুর কোন মিথ্যা হেতু আবিষ্কার করিতে না পারিতেছেন, ততদিন মওদুদের মনোযোগ যাহাতে অন্যদিকে নিযুক্ত থাকে—তারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথম দফা তিনি সুলতানকে কাবুলের পথে খোরাসানে যুদ্ধাভিযান প্রেরণে রাজী করাইলেন। মওদুদ সুজাওয়ান্দ ও লগুরের[4] পথে অগ্রসর হইয়া শিয়ালকোটের[5] দুর্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এইখানে প্রচুর ধনরত্ন গচ্ছিত ছিল। এইখানে তিনি এক

৪ মিঃ এলফিনস্টোনের মানচিত্রে এই স্থানটি গজনীর ৪০ মাইল উত্তরে ও কাবুলের প্রায় ২০ মাইল দক্ষিণে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

৫ ইহা ভারতের শিয়ালকোট নয়।

গুরুতর অন্ত্র-ব্যথায় আক্রান্ত হইলেন এবং পাল্‌কীতে চড়িয়া গজনী ফিরিতে বাধ্য হইলেন। অন্যদিকে তাঁহার উজির আবদুর রাজ্জাক সসৈন্যে সিস্তান গমন করিয়া সেলজুকদিগকে বাধাদান করিলেন এবং সেই দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন।

গজনী প্রত্যাগমন করিয়া সুলতান বন্দী আবু আলীকে হাজির করিবার জন্য মিরাক হোসেনকে আদেশ করিলেন। সুলতান তাঁহাকে মুক্তিদান করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু মিরাক নানা অজুহাত দেখাইতে লাগিলেন এবং এক সপ্তাহ না যাইতেই ৪৪১ হিঃ ২৪শে রজব (ডিসেম্বর ২৪, ১০৪৯) সুলতান ইন্তেকাল করিলেন। তিনি নয় বৎসরের উপর রাজত্ব করিয়াছিলেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বামিয়ান ও মা-উরা-উন্নাহার প্রদেশদ্বয়কে সেলজুকদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন; কিন্তু এই জাতির ভাগ্য-তারকা তখন উদয়ের পথে—তাই পরিপূর্ণ ও চরম সাফল্যের পথে তাহারা কোন প্রকার বাধাপ্রাপ্ত হয় নাই।

সুলতান ২ মাসুদ-বিন-মাহুদ গজনভী

[আলী-বিন-রাব্বিয়া কর্তৃক মাহুদের শিশুপুত্র মাসুদকে সিংহাসনে বশানো। আলপ্তগীন প্রথম মাসুদের অন্যতম পুত্র আবুল হাসান আলীর পক্ষাবলম্বন। শিশু মাসুদ সিংহাসনচ্যুত।]

মওদুদের মৃত্যুর পর আলী ইবনে রাব্বিয়া খাদিম, সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার মতলব আঁটিলেন, কিন্তু তাঁহার দুরভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিবার জন্য তিনি প্রথমতঃ মাহুদের পুত্র মাসুদকে (৪ বৎসরের শিশু) মসনদে বসাইলেন। সুলতান মাহমুদের দরবারের অন্যতম প্রধান সদস্য আলপ্তগীন হাজিবকে এ সম্পর্কে কিছু বলা হইল না। সেইজন্য তিনি অপমান বোধ করিলেন এবং তাঁহার পক্ষীয় অর্ধেক সৈন্যকে লইয়া তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন; সৈন্যবাহিনী এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত হইয়া পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইল। ইহাতে আলী বিন রাব্বিয়া পরাস্ত হইলেন এবং আলপ্তগীন হাজিবের দল সম্রাট প্রথম মাসুদের অন্যতম পুত্র আবুল হাসান আলীর দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন—যিনি আলী-বিন-রাব্বিয়ার ক্রোধাগ্নি হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। মাসুদকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাঁহাকে সুলতান ঘোষণা করা হইল। মাসুদ নাম মাত্র ছয়দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুলতান আবুল হাসান আলী গজনভী

[আবুল হাসান আলীর সিংহাসনারোহণ এবং ভূতপূর্ব সুলতান মওদুদের বিধবা পত্নী জাকির বেগ সেলজুকীর কন্যাকে সাদীকরণ। আলী-বিন-রাব্বিয়া কর্তৃক গৃহরক্ষী সৈন্যদের সহযোগে ধনাগার লুণ্ঠনকরতঃ রাজধানী হইতে পলায়ন এবং আফগান দেশের কিয়দংশ অধিকার। সুলতান মাহমুদের অন্যতম পুত্র আবুল রশীদ কর্তৃক এক সৈন্যবাহিনী গঠন এবং সিংহাসন দাবী করিয়া গজনী আগমন। সুলতান আবুল হাসান আলী কর্তৃক বাধা দান; পরাস্ত ও বন্দী।]

৪৪১ হিজরী, ১লা সাবান শুক্রবার (১০৪৯ খ্রীঃ) সুলতান আবুল হাসান আলী গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং তাহার ভ্রাতা মওদুদের বিধবা পত্নী জাকির বেগ সেলজুকীর কন্যাকে শাদী করেন। ইতিমধ্যে আলী-বিন-রাব্বিয়া মিরাক হোসেনের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া খাজাঞ্চীখানা উন্মুক্ত করিয়া স্বচ্ছন্দে বহন করিতে পারেন সেই পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নাদি লইয়া একদল গৃহরক্ষী সৈন্য ও তাঁহাদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কতিপয় সর্দারের সঙ্গে ভারত সীমান্তে পেশোয়ার—অতঃপর পাঞ্জাবাভিমুখে পলায়ন করিলেন।

পেশোয়ারের স্থানীয় লোকদের লইয়া এক বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া তিনি মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করিলেন এবং যেসব আফগান সেই অঞ্চলে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিল তাহাদিগকে বাহুবলে দমন করিলেন। সুলতান রশীদের সিংহাসনারোহণকাল হইতে আলী রাব্বিয়া যেসব প্রদেশ স্বাধীনভাবে ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন, সরকারী গোলযোগের সুযোগে আফগানরা সেইসব অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়াছিল।

৪৪৩ হিজরীতে (১০৫১ খ্রীঃ) সুলতান তাঁহার ভ্রাতা মারদান শাহ ও ইয়েদিয়ারকে বুলামিয়া[১] দুর্গ হইতে আনিতে পাঠাইলেন—যেখানে তাঁহারা কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন এবং তাহাদের সঙ্গে স্নেহপূর্ণ

---

১ খুরামের উত্তর তীরে এবং গজনীর প্রায় ৪০ মাইল সোজা পূর্বদিকে এই নামের একটি শহর আছে।

সদয় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সময়, যাহাহউক, সম্রাট মাহমুদের অন্যতম পুত্র আবুল রশীদ ক্ষমতালাভের জন্য দল গঠন করেন। সুলতান কোষাগার খুলিয়া দিয়া সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করিলেন, কিন্তু তাঁহার শক্তি দিন দিন হ্রাস পাইতে লাগিল। আবুল রশীদ গজনী আগমন করিলেন এবং সম্পূর্ণ জয়লাভ করিয়া সেই বৎসরেরই শেষভাগে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সুলতান আবুল হাসান আলী দুই বৎসরের কিছু বেশী সময় রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুলতান আবুল রশীদ গজনভী

[সুলতান আবুল রশীদের সিংহাসন দাবীর কারণ। আলী-বিন-রাব্বিয়ার (কাবুলের পূর্ব পারের অধিপতি) গজনীর সুলতানের প্রভুত্ব মানিয়া লইতে স্বীকৃতি জ্ঞাপন। হিন্দুদের নিকট হইতে নগরকোট পুনরাধিকার। রাজ্যের অন্যতম সেনাপতি তোগরলকে এক সৈন্যবাহিনীসহ সিস্তান প্রেরণ। সিংহাসন লাভের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বুদ্ধ হইয়া তৎকর্তৃক গজনী অবরোধ। বিদ্রোহীদের নিকট সুলতানের আত্মসমর্পণ এবং বিদ্রোহী কর্তৃক নিহত। তোগরলের সহিত প্রথম মাসুদের কন্যাকে শাদীতে বাধ্যকরণ। নস্তগীন হাজিব কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া তিনি তোগরলকে খুন করাইবার ব্যবস্থা করেন।]

ইহা প্রমাণসিদ্ধ সত্য যে, সুলতান আবুল রশীদ, সম্রাটের অন্যতম পুত্র ছিলেন এবং মওদুদের আদেশে বুস্ট ও ইস্‌ফিরার মাঝখানে এক দুর্গে আটক ছিলেন। যেসব ঘটনা পরিক্রমায় তিনি সিংহাসন লাভ করেন তাহা হইল: আবদুর রাজ্জাক-বিন-আহমদ-বিন হাসান মাইমুন্দী সুলতান মওদুদের মন্ত্রী ছিলেন এবং তিনি প্রকৃতই সিস্তানে বিদ্রোহ দমনের জন্য লিপ্ত ছিলেন। এই সময় তাঁহার মালিকের মৃত্যুর সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তিনি অভিযান স্থগিত রাখেন এবং সৈন্য-বাহিনী লইয়া তুকিয়াবাদ অবস্থান করেন। এইখানে খাজা আবুল ফজল, আলতুনতাসের পুত্র রশীদ এবং নস্তগীন হাজিব জুর্জীর সঙ্গে পরামর্শ করিয়া ৪৪৩ হিজরীর শেষভাগে আবদুর রাজ্জাক ভূতপূর্ব সুলতান মওদুদের প্রকাশিত ইচ্ছানুযায়ী শাহজাদা আবুল রশীদকে মুক্ত করিয়া দিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন (তাঁহার নিজের বিবরণ অনুযায়ী)।

ক্ষমতাসীন আবুল হাসান আলী কোন প্রকার বাধা প্রদান না করিয়া পলায়ন করিলেন এবং দেশের কতকগুলি জমিদার কর্তৃক ধৃত হইয়া আবুল রশীদের সম্মুখে আনীত হন এবং তাঁহাকে দিদিরু[১] দুর্গে আটক করিয়া রাখা হয়। সুলতান এই সময় আলী-বিন-রাব্বিয়াকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে সমর্থ হইলেন—যে আলী-বিন-রাব্বিয়া ভারতে গজনী সম্রাটদের বিজিত রাজ্যগুলি

---

১ আমি যে সব মানচিত্র দেখিয়াছি, তাহাদের কোথাও এই স্থান নাই।

আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে গজনী ডাকিয়া আনা হইল। নস্তগীন হাজিবকে সিন্ধুর পূর্বপারের প্রদেশগুলির শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং তিনি আমীরের মর্যাদা প্রাপ্ত হইয়া এক সৈন্যবাহিনী লইয়া লাহোরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

লাহোর পৌছিয়া তিনি শুনিলেন যে, হিন্দুরা নগরকোট অধিকার করিয়া লইয়াছে। তখন তিনি সেখানে গমন করিয়া ঐ স্থান অবরোধ করিলেন এবং ষষ্ঠ দিনে মই দ্বারা প্রাচীরে আরোহণ করিয়া দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করিলেন। যে তোগরল হাজিবকে সুলতান মওদুদের ওমরাহের পদে উন্নীত করিয়াছিলেন এবং যিনি মওদুদের কন্যাকে শাদী করিয়াছিলেন, তাহাকেও এই সময় সিস্তানে বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করা হইল এবং তিনি শীঘ্রই ঐ স্থানে পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিলেন। উচ্চাশার বশবর্তী হইয়া তিনি রাজমুকুট লাভের আশা পোষণ করিতে লাগিলেন; এবং এক বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করিয়া গজনী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সুলতান আবুল রশীদ তখন প্রায় ফৌজহীন অবস্থায় ছিলেন এবং তিনি শহরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে বাধ্য হইলেন। শহর শীঘ্রই তোগরলের হস্তগত হইল এবং সেখানে সুলতান ও শাহী-পরিবারের নয় ব্যক্তিকে অন্যায়রূপে নৃশংসভাবে হত্যা করিলেন এবং সিংহাসনারোহণের পূর্বে তিনি জোরপূর্বক গজনী পরিবারের এক কন্যাকে (ভূতপূর্ব সুলতান মাসুদের কন্যা) শাদী করিলেন। তাঁহার দুষ্কৃতির ফল, তোগরল বেশী দিন উপভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি আমীর নস্তগীন হাজিবের নিকট তাঁহাকে স্বীকৃতিদান করিবার অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন, কিন্তু তিনি ঘৃণার সহিত তাঁহার সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন। অস্বীকার করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি মাসুদের যে কন্যাকে জালিম জোর-পূর্বক শাদী করিয়াছিলেন, তাঁহার এবং যেসব ওমরাহকে তিনি শাহী-পরিবারের প্রতি অনুরক্ত বলিয়া জানিতেন, তাহাদের সকলের নিকট সুলতানের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইবার তাগিদ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। ফলে তৎক্ষণাৎ এক ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়া উঠিল এবং নওরোজের দিন উহা কার্যে পরিণত করা হইল; জনসাধারণকে সাক্ষাৎদানের জন্য তোগরল যখন সিংহাসনে আরোহণ করিতে যাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহাকে খুন করা

হইল। এইরূপে জালিম চল্লিশ দিন পরেই তাঁহার কৃতকর্মের উপযুক্ত ফল ভোগ করিলেন।

এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার পর নস্তুগীন সসৈন্যে গজনী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং এক রাজসভা আহ্বান করিয়া সুবুক্তগীনের পরিবারে কেহ জীবিত আছেন কি-না জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি যখন শুনিলেন যে, শাহজাদা ফারুকজাদ, ইব্রাহিম ও মুজা তখনও জীবিত আছেন এবং তাহাদিগকে এক দুর্গে আটক করিয়া রাখা হইয়াছে, তখন তিনি তাহাদিগকে আনাইলেন এবং স্থির করিলেন যে, ভাগ্য পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিবেন—কে সুলতান হইবেন। ভাগ্য ফারুকজাদকে অনুগ্রহ করিল এবং তদনুযায়ী তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করানো হইল।

তাব্‌কাতে নাসিরীর লেখক বলেন, একদিন তোগরলের অন্যতম বন্ধু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, কি কারণে তিনি সাম্রাজ্যলাভের কথা চিন্তা করিলেন। তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন: সুলতান আবুল রশীদ যখন তাঁহাকে সিস্তানের শাসনভার গ্রহণের জন্য প্রেরণ করেন তখন তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, তাঁহার হাত কাঁপিয়াছিল; ইহা হইতে তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, রাজ্য স্বাধিকারে রাখিবার জন্য যে দৃঢ়তা প্রয়োজন তাহা তাঁহার নাই।

সুলতান আবুল রশীদের রাজত্বকাল এক বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

সুলতান ফারুকজাদ গজনভী

[নস্তগীন কর্তৃক ফারুকজাদকে সিংহাসনারোহণে সাহায্য এবং নিজের মন্ত্রী নিযুক্তি। জাকির বেগ সেলজুকীর গজনীর বিরুদ্ধে অগ্রসর এবং নস্তগীন কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ও পরাস্ত। সুলতানের মন্ত্রী সমভিব্যাহারে খোরাসান গমন এবং সেলজুকদের হাত হইতে খোরাসান পুনরুদ্ধার। সেলজুক ও গজনভীদের মধ্যে বন্দী বিনিময়। ফারুকজাদের মৃত্যু।]

মাসুদ তনয় ফারুকজাদ রাজমুকুট ধারণ করিয়া রাজ্য শাসনের সমস্ত দায়িত্ব নস্তগীন হাজিবের উপর অর্পণ করেন। সাম্রাজ্যের সাম্প্রতিক গোলযোগের কথা শ্রবণ করিয়া, সেলজুক সর্দার জাকির বেগ অসংখ্য সৈন্য-সামন্ত লইয়া গজনী আক্রমণ করিতে আগমন করেন। নস্তগীন হাজিব তাঁহার সৈন্যদলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া বাধাদান করিতে অগ্রসর হন। উভয়পক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হইলে এক প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয় এবং সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত এই সংগ্রাম স্থায়ী হয় এবং জয়-পরাজয় অনিশ্চিত রহিয়া যায়। উভয় পক্ষে হাজার হাজার সৈন্যের প্রাণনাশ সত্ত্বেও মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া তাহারা যুদ্ধ করিতেই থাকে। সাফল্য অবশেষে নস্তগীনের পক্ষে রায় দান করে। শত্রুরা তাহাদের শিবিরের সমস্ত মালপত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করে এবং সেসব বিজয়ীদের হস্তগত হয়। অতঃপর তাহারা বিজয়োল্লাসে গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। এই যুদ্ধের ফলে ফারুকজাদের ক্ষমতা এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল যে, তিনি অতঃপর সেলজুকদের হস্ত হইতে খোরাসান পুনরুদ্ধার করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। সেলজুক বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন তাহাদের অন্যতম প্রধান সর্দার কুলবারিক। বিপুলসংখ্যক সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করিয়াও কুলবারিক মহা হত্যাকাণ্ডের মধ্যে পরাস্ত হন। এই বিপর্যয়ের সংবাদ জাকির বেগের নিকট পৌঁছিলে তিনি তাঁহার পুত্র আল্‌প্‌-আরসালানের অধীনে এক সেনাবাহিনীকে অগ্রসর হইবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। আল্‌প্‌-আরসালান অগ্রসর হইয়া অমিতবিক্রমে গজনীর সুলতানকে আক্রমণ করেন এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া সেলজুকদের হৃতগৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চাদ্ধাবনকালে তিনি বহু সংখ্যক গজনী সেনাপতিকে বন্দী করেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়া ফারুকজাদ, কুলবারিক ও সমস্ত

সেলজুক বন্দীকে সম্মুখে হাজির করান এবং প্রত্যেককে একটি করিয়া পোশাক দান করিয়া তাহাদিগকে মুক্ত করিয়া দেন। সেলজুকরা স্বদেশে পৌঁছিয়া সুলতানের দয়ার এমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে যে, পাছে মহানুভবতায় তাহার পরাজয় হয়, সেইজন্য জাকির বেগও সমস্ত গজনীর বন্দীদিগকে মুক্ত করিয়া দেন।

রজাতুম্-সাকা অনুযায়ী ফারুকজাদ ছিলেন মাসুদের পুত্র (যদিও আহমদুল্লাহ মুস্তাফী তাহাকে আবুল রশীদের পুত্র বলিয়াছেন) এবং তিনি ছয় বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ৪৫০ হিজরী (১০৫৮ খ্রীঃ) আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি মারা যান। মৃত্যুর পূর্বের বৎসরে তাঁহার কয়েকজন ভৃত্য স্নানাগারে তাঁহার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু ফারুকজাদ তাহাদের একজনের হাত হইতে একটি তলোয়ার ছিনাইয়া লইয়া কয়েকজনকে হত্যা করেন এবং অবশিষ্টের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করিয়া যাইতে থাকেন। শেষে গোলমাল শুনিয়া তাহার দেহরক্ষী সৈন্যরা তাঁহাকে রক্ষা করিতে আসিলেন এবং গোলামদের সকলকে হত্যা করে। মেহ্‌রামের পুত্র হাসান ছিলেন তাঁহার প্রথম উজির এবং তাঁহার রাজত্বের শেষের দিকে উজির ছিলেন আবুবকর সালেহ।

সুলতান ইব্রাহিম-বিন-মসউদ গজনভী

[ফারুকজাদের ভ্রাতা ইব্রাহিম তাঁহার স্থলাভিষিক্ত। সেলজুকরা গজনী সুলতানের নিকট হইতে যেসব এলাকা কাড়িয়া লইয়া নিজেদের অধিকারভুক্ত করিয়াছিল, সেইসব এলাকার উপর সেলজুকদের কর্তৃত্ব স্বীকার। সুলতানের পুত্র শাহজাদা মসউদের সঙ্গে মালিক শাহ্-সেলজুকীর কন্যার শাদী। ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া ইব্রাহীমের অনুধন, রুদপাল ও ডেরা অধিকার। তাঁহার মৃত্যু ও চরিত্র।]

ফারুকজাদের ভ্রাতা ইব্রাহীম তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তিনি নৈতিক চরিত্র ও খোদাভক্তির জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন এবং তরুণ বয়সেই যৌনক্ষুধা দমন করিয়াছিলেন। সাবান ও রজব মাস পর্যন্ত তিনি রমজানের রোজা পালন করিয়া যাইতেন এবং সবিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে এই তিন মাসই তিনি চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষা করিয়া চলিতেন। এইসব ইবাদত কার্য সত্ত্বেও তিনি রাজকার্য ও ন্যায়বিচারের প্রতি মনোযোগী ছিলেন এবং প্রভূত পরিমাণ ধনরত্ন দরিদ্রদিগকে প্রদান করিতেন। জামি-উল-হীকাইতে বর্ণিত আছে যে, সুলতান ইব্রাহিম ইমাম ইউসুফ সুজাউন্দীর নিকট হইতে ধর্ম ও সুনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। বক্তৃতাকালে ইউসুফ সুজা-উন্দী প্রায়ই সুলতানকে তিরস্কার করিতেন, কিন্তু সুলতান কোন দিন তাঁহার প্রতিবাদ করিতেন না। সুলতানের হস্তাক্ষর অতীব সুন্দর ছিল। তাঁহার হস্ত লিখিত যে দুইখানা কোরানের নকল তিনি খলিফার নিকট উপহারস্বরূপ প্রেরণ করিয়াছিলেন, সে দুইটি এখনও মক্কা ও মদিনার গ্রন্থাগারে মওজুদ আছে। রাজত্বের প্রথম বৎসর তিনি সেলজুকদিগকে তাহাদের অধিকৃত সমস্ত এলাকা ছাড়িয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে এই শর্তে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদন করেন যে, অতঃপর তাঁহার রাজ্যের আর কোন অংশের উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিবেন না। এই সময়েই তাঁহার পুত্র মসউদ মালিক শাহ সেলজুকীর কন্যাকে শাদী করেন এবং ইহার ফলে দুই জাতির মধ্যে বন্ধুত্ব ও মিলামিশার পথ প্রশস্ত হয়।

কথিত আছে যে, এই সন্ধি স্থাপনের পূর্বে মালিক শাহ গজনী আক্রমণের উদ্যোগ করিতেছিলেন এবং তাহাতে ইব্রাহীম অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কারণ, তাঁহাকে মোকাবিলা করিবার মত অবস্থা তখন ইব্রাহিমের ছিল না। তিনি

এক কৌশল অবলম্বন করিলেন। মালিক শাহের সেনাবাহিনীর প্রধান সেনাপতিদের নামে পত্র লিখিয়া এক দুত প্রেরণ করিলেন এবং দুতকে বিশেষভাবে তালিম দিয়া পাঠাইলেন। পত্রের বিষয়বস্তু ছিল এইরূপ—"সুলতান, সেনাপতিদিগকে মালিক শাহের গজনী আক্রমণ ত্বরান্বিত করিতে অনুরোধ করিতেছেন নতুবা চক্রান্ত ফাঁস হইয়া যাইবে। তাহাদিগকে আশ্বাস দিতেছেন যে, তিনি তাহাদের তুষ্টি মাফিক তাহার প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন,—সে বিষয়ে তাঁহারা যেন নিঃসন্দেহ থাকেন।"

মালিক শাহ একদিন গজনীর পথে শিকাররত ছিলেন। গজনীর দুত এই সুযোগ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া আসিলেন এবং এমন ভাণ করিলেন যে, যেন শাহকে চিনিতে পারিয়া চুপি চুপি সরিয়া পড়িবার চেষ্টা করিতেছে। ইহাতে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ায় কয়েকজন অশ্বারোহী পিছু পিছু আসিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। অনুসন্ধান করিবার পর তাহার নিকট একটা পুটলী পাওয়া গেল—যদিও ইতিপুর্বে পদতলে কঠোর বেত্রাঘাত করাতেও সে স্বীকার করে নাই যে তাহার নিকট কোন কাগজ আছে। শাহ পত্রগুলি পাঠ করিলেন। কিন্তু যাহাদিগকে ষড়যন্ত্রকারী বলিয়া প্রকাশ করা হইয়াছে, তাঁহারা এমন শক্তিশালী যে তিনি মনে করিলেন, তাঁহাদিগকে অভিযুক্ত করায় বিশেষ বিপদ আছে। কিন্তু এই ঘটনার ফলে তাহার মনে এমন সন্দেহের সৃষ্টি হইল যে, সেই সময় হইতে তিনি শান্তি স্থাপনের প্রয়াসী হইলেন এবং যুদ্ধাভিযান পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে সেলজুকদের দিক হইতে নিরাতঙ্ক হইয়া ইব্রাহীম ভারতে এক সৈন্য-বাহিনী প্রেরণ করিলেন এবং সে দেশের এমন অনেক স্থান অধিকার করিলেন যেসব স্থানে ইতিপূর্বে কোন মুসলমান বাহিনী কখনও প্রবেশ করে নাই।

৪৭২ হিজরীতে (১০৭৯ খ্রীঃ) তিনি স্বয়ং ভারতে যুদ্ধ যাত্রা করিয়া অজুধুন পর্যন্ত জয় করেন। অজুধুন এখন শেখ ফরিদ শুকুরগঞ্জের পুতুন নামে পরিচিত। এই দুর্গ অধিকার করিবার পর তিনি এক উত্তুঙ্গ পর্বত শীর্ষে অবস্থিত রুদপাল[১] নামক এক দুর্গে ফিরিয়া আসেন। এই দুর্গের তিন পার্শ্ব নদী দ্বারা বেষ্টিত ছিল এবং এক স্বল্প পরিসর ভূমিখণ্ড দ্বারা ইহা অন্য পাহাড়গুলির সঙ্গে সংলগ্ন ছিল। এই ভূমি-খণ্ডও অভেদ্য জঙ্গলে সম্পূর্ণ আচ্ছাদিত ছিল এবং এই জঙ্গল ছিল বিষধর সর্পে

১ এই স্থানের অবস্থান এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই।

পরিপূর্ণ। সুলতান ইহাতে নিরুদ্যম হইলেন না। তিনি কয়েক সহস্র শ্রমিককে জঙ্গল পরিষ্কার কার্যে নিযুক্ত করিলেন। তাহারা প্রবল বাঁধা সত্ত্বেও এই কার্য সুসম্পন্ন করিল। দুর্গটি নরম মাটির উপর অবস্থিত থাকায় সুলতানের খননকারী শ্রমিকরা অল্প সময়ের মধ্যেই সুড়ঙ্গ কাটিয়া দুর্গ প্রাকারের নিম্ন পর্যন্ত লইয়া গেল এবং তাহাতে দুর্গ ধ্বসিয়া পড়িল এবং দুর্গবাসী সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করিল। সুলতান সেখান হইতে ডেরা নামক[২] অন্য আর একটি শহরে গমন করিলেন। এখানকার অধিবাসীরা খোরাসান হইতে আসিয়াছিল এবং পুনঃ পুনঃ বিদ্রোহ করিত বলিয়া আফ্রাসিয়াদ তাহাদিগকে সেখানে সপরিবারে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ইহারা এই স্থানে একটা ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। দুর্গম পর্বত শ্রেণী দ্বারা প্রতিবেশী এলাকাগুলি হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ইহারা তাহাদের সাবেক রীতিনীতি অক্ষুন্ন রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং অন্য কোন শ্রেণীর লোকের সঙ্গে ইহারা বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে নাই। অনেক পরিশ্রমে সুলতান পর্বতের উপর দিয়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীর গমনের জন্য পথ প্রস্তুত করাইয়া ডেরায় প্রবেশ করেন। ডেরার রক্ষাব্যবস্থা বেশ মজবুত ছিল। দেড় ফার্সং পরিধি বিশিষ্ট এক মনোরম হ্রদ ছিল ইহার শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। আবহাওয়ার উষ্ণতা ও সৈন্যদের ব্যবহারের দরুন ইহার পানি একটুও হ্রাস পায় নাই। সুলতান এই স্থানে পৌছিলে বর্ষা শুরু হয় এবং তাঁহার সৈন্যবাহিনী অশেষ দুর্দশার মধ্যেও এই হ্রদের তীরে তিন মাস অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। বৃষ্টিপাত বন্ধ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি শহরবাসীদিগকে আত্মসমর্পণ ও ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে আহ্বান জানান।

সুলতান ইব্রাহীমের প্রস্তাব তাহারা প্রত্যাখ্যান করিল, ফলে শহর অবরোধ কয়েক সপ্তাহ স্থায়ী হইল এবং উভয় পক্ষে বহুলোক নিহত হইল। শেষ পর্যন্ত হাম্‌লা করিয়া শহর দখল করা হইল এবং মুসলমানেরা ইহাতে প্রভূত ধন-রত্ন প্রাপ্ত হইলেন। এখান হইতে একলক্ষ লোককে বন্দী করিয়া গজনী আনা হইল। কিছুদিন পরে সুলতান দৈবাৎ হতভাগ্য লোকদের একজনকে একটা ভারী প্রস্তর অতিকষ্টে বহন করিয়া তাঁহার নির্মীয়মান প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতে দেখিতে পান। সুলতানের মনে করুণার

২ মুলতানের নিকটবর্তী স্থানে এই শহরকে ডেরা বলা হইত।

সঞ্চয় হয় এবং তিনি তাঁহাকে ঐ স্থানে পাথরটি ফেলিয়া দিতে বলেন এবং তাঁহাকে তখনই আজাদ করিয়া দেন। প্রস্তরখণ্ডটি সদর রাস্তাতেই পড়িয়া রহিল এবং পথিকদের বিশেষ অসুবিধা সৃষ্টি করিতে লাগিল। কিন্তু সুলতানের হুকুম তামিলের কঠোরতার কথা স্মরণ করিয়া কেহই ঐ প্রস্তরখণ্ডে হাত দিতে সাহস করিল না। এক সভাসদ একদিন অশ্বারোহণে চলিবার কালে ঐ পাথরে হোঁচট খাইয়া অশ্বসহ ভূ-লুণ্ঠিত হন এবং তিনি সুলতানের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া পাথরটি অপসারণের আরজী পেশ করেন। ইহাতে সুলতান বলেন, "আমি উহাকে ঐখানে নিক্ষেপ করিতে এবং ফেলিয়া রাখিতে হুকুম দিয়াছি এবং যুদ্ধজনিত গজবের স্মৃতিস্তম্ভস্বরূপ এবং যুদ্ধের প্রতি আমার বিতৃষ্ণাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবার জন্য উহা ঐখানেই অবস্থিত থাকিবে। অনভিপ্রেত হইলেও শাহী ফরমান দৃঢ়তার সঙ্গে বলবৎ রাখাই সুলতানদের কর্তব্য।" ফলে পাথরটি যেখানে ছিল, সেইখানেই পড়িয়া রহিল এবং কয়েক বৎসর পরে সুলতান বৈরামের রাজত্বকালে উহা দর্শনীয় বস্তু হিসাবে প্রদর্শন করা হইত।

নানা শ্রেণীর রমণীর গর্ভে সুলতানের ৩৬ জন পুত্র ও ৪০ জন কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাদিগকে তিনি বিদ্বান ও ধার্মিক ব্যক্তিদের সঙ্গে শাদী দিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ৪৮১ হিজরীতে সুলতান ইন্তেকাল করেন। ইহাতে তাঁহার রাজত্বকাল হয় ৩১ বৎসর। অন্যেরা ১০৯৮ খ্রীঃ বলিয়া ধার্য করেন এবং তাহাতে তাঁহার রাজত্বকাল ৪২ বৎসর পর্যন্ত প্রসারিত হয়। রাজত্বের প্রথম ভাগে আবু হোসেন খুজুন্দী ও খাজা মাসুদ রুজেহী পর পর উজির নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং রাজত্বের শেষ ভাগে আবদুল হামিদ আহমদ-বিন-আবদুস, সামাদ উজিরের পদ অলঙ্কৃত করেন। এই উজিরের প্রশস্তি গাহিয়া আবুল ফারাহ্ একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন। আবুল ফারাহ্ এই সময়ে জীবিত ছিলেন। কাহারও মতে, এই বিখ্যাত কবি সিস্তানের অধিবাসী ছিলেন, আবার কেহ কেহ বলেন, তিনি গজনীর অধিবাসী ছিলেন।

সুলতান মসউদ (৩) বিন ইব্রাহীম গজনভী

[সুলতান মসউদ কর্তৃক পিতার উত্তরাধিকারীত্ব গ্রহণ। সুলতান সানজার সেলজুকীর ভগ্নীকে শাদী। সেনাপতি হাজিব তোগাস্তগীনকে ভারতে বিজয়াভিযানে প্রেরণ। সুলতানের মৃত্যু।]

সুলতান ইব্রাহীমের মৃত্যুর পর পুত্র মসউদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি দানশীল ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং শাসনকার্য অপেক্ষা ন্যায় বিচারের জন্য অধিক খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি রাজ্যের পুরাতন আইন ও বিধানাবলীর সংস্কার সাধন করেন এবং যেগুলি আপত্তিকর বিবেচিত হইয়াছিল সেসব বাতিল করিয়া তদস্থলে সুষ্ঠু ন্যায়-ভিত্তিক নূতন বিধান প্রবর্তন করেন। তিনি সুলতান সানজার সেলজুকীর ভগ্নী শাহজাদী মেহ্দী ইরাককে শাদী করেন।

তাঁহার রাজত্বকালে তোগাস্তগীন নামক তাঁহার অন্যতম সেনাপতি এক সৈন্যবাহিনী লইয়া হিন্দুস্তানের দিকে অগ্রসর হন। তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি গঙ্গা পার হইয়া বহুদূর পর্যন্ত বিজয়াভিযান প্রসারিত করেন। সম্রাট মাহমুদ ব্যতীত আর কোন মুসলমান এতো অধিক দূর অগ্রসর হন নাই। মাহমুদের মতই তিনি বহু নগর ও মন্দির লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ধন-রত্ন লইয়া বিজয়গর্বে লাহোর প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় লাহোরই প্রকৃতপক্ষে সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়। কেননা সেলজুকরা গজনী পরিবারকে ইরান ও তুরানের অধিকাংশ স্থান হইতে বঞ্চিত করিয়াছিল এবং গজনীর শাহী পরিবার ভারতে বাস করিতে আসেন।

গৃহ-বিবাদ ও বৈদেশিক আক্রমণমুক্ত ১৬ বৎসরের নির্ঝঞ্ঝাট রাজত্বের পর ৫০৮ হিজরীর (১১১৮ খ্রীঃ) শেষভাগে সুলতান মসউদ পরলোক গমন করেন। তারিখে গুজিদাতে বর্ণিত আছে যে, তাঁহার পুত্র কামাল-উদ-দৌলা শীরনিজাদ অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মাত্র এক বৎসর রাজত্ব করেন এবং তাহার ভ্রাতা আরসালান কর্তৃক গোপনে নিহত হন। আরসালান তাহার স্থলাভিষিক্ত হন। কিন্তু অন্যান্য ঐতিহাসিকরা কামাল-উদ-দৌলার নাম পর্যন্ত উল্লেখ করেন নাই।

সুলতান আরসালান গজনভী

[সিংহাসনে আরোহণের পর বৈরাম ব্যতীত সকল ভাইকে বন্দী। বৈরামের খোরাসান পলায়ন এবং মালিক শাহ সেলজুকীর ভ্রাতা মুহাম্মদের নিকট আশ্রয়প্রাপ্তি। সানজার সেলজুকী কর্তৃক সুলতান আরসালানের কারারুদ্ধ ভ্রাতাদের মুক্তি দাবী এবং আরসালানের অসম্মতি। ফলে যুদ্ধারম্ভ। সুলতানের আম্মাকে শান্তির প্রস্তাবসহ প্রেরণ। কিন্তু মাতা কর্তৃক সানজারকে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিতকরণ এবং তাঁহার পুত্র বৈরামের দাবী সমর্থন। গজনীতে সুলতান সানজার ও আরসালানের মধ্যে যুদ্ধ। আরসালানের পরাজিত হইয়া ভারতে পলায়ন। পরে গজনী প্রত্যাবর্তন এবং পুনরায় পরাজয়বরণ। এইবার আফগানদের আশ্রয় প্রার্থনা। পরে নিজ সৈন্যদের হস্তে বন্দী হইয়া ভ্রাতার নিকট সমর্পিত। বৈরাম কর্তৃক নিহত।]

সুলতান মাস্‌উদ-বিন-ইব্রাহীমের পুত্র আরসালান গজনীর সুলতান হইয়াই একজন ব্যতীত সমস্ত ভ্রাতাকে ধরিয়া আটক করিলেন। একজন পলায়ন করিয়া এই বিপদ এড়াইলেন। সেই ভাগ্যবান শাহজাদা বৈরাম, সুলতান সানজার সেলজুকীর শরণাপন্ন হইলেন। সানজার সেই সময় তাহার ভ্রাতা মুহাম্মদের (মালিক শাহ সেলজুকীর পুত্র) পক্ষে খোরাসান প্রদেশ শাসন করিতেছিলেন। আরসালানের মামা সুলতান সানজার, অন্যান্য ভাইদের মুক্তি দাবী করিলেন এবং উহা প্রত্যাখ্যাত হইলে তিনি অন্যান্য শাহজাদাদের পক্ষাবলম্বন করিলেন এবং আরসালানের অসম্মতিকে অজুহাত ধরিয়া গজনী সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলেন।

আসন্ন আক্রমণের সংবাদ পাইয়া আরসালান, সুলতান সানজারের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুহাম্মদের নিকট ফরিয়াদ জানাইয়া পত্র লিখিলেন এবং তাঁহাকে এই আক্রমণ রোধ করিতে অনুরোধ করিলেন। সুলতান মুহাম্মদ আপোস করিবেন বলিয়া মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিলেন। কিন্তু সুলতান সানজার গজনীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। শেষে আরসালান বুঝিতে পারিলেন যে, তলোয়ার ছাড়া আর কোনকিছুর উপরই তিনি নির্ভর করিতে পারেন না। তাঁহার মাতা মেহদী ইরাক তাঁহার অন্যান্য সন্তানের প্রতি নিষ্ঠুর আচরণের জন্য আরসালানের প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তিনি কপট স্নেহপূর্ণ কথায় নিজেকে শান্তির প্রস্তাব লইয়া সুলতান সানজারের নিকট প্রেরণ করিতে আরসালানকে রাজী করিলেন এবং পথ খরচ বাবদ ২,০০,০০০ দিনার গ্রহণ

করিলেন। কিন্তু শিবিরে পৌঁছিয়াই তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি অনুযায়ী পুত্র বৈরাম ও ভ্রাতা সানজারকে পুর্ণোদ্যমে যুদ্ধ চালাইতে উস্কানী দিতে লাগিলেন। সুতরাং অপেক্ষা না করিয়া ৩০,০০০ অশ্বারোহী ও ৫০,০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া সানজার খোরসানের বুস্ট হইতে যাত্রা করিলেন এবং ক্রমাগত অগ্রসর হইয়া গজনীর এক ফার্সংয়ের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। আরসালানের সৈন্যরা এইখানে তাঁহার মোকাবিলার জন্য কাতারবন্দী হইল। সানজার তখনই আক্রমণ কবিতে অগ্রসর হইলেন। তিনি তাঁহার অশ্বারোহী দলকে কয়েকটি দলে বিভক্ত করিলেন এবং মাঝে মাঝে বর্শাধারী সৈন্য সমাবেশ করিলেন। প্রয়োজনমত অগ্রসর হইবার জন্য প্রস্তুত হস্তীবাহিনীকে পশ্চাতে রাখিলেন। এইসব ব্যবস্থাবলম্বনের পর তিনি ধীরে ধীরে শত্রুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। উভয় বাহিনী মহা পরাক্রমের সঙ্গে যুদ্ধ করিল। অবশেষে মালিক আবুল ফজল সিস্তানীর অসাধারণ বীরত্বের জন্য গজনী-বাহিনী পরাজিত হইল এবং পুনরাক্রমণ করিতে অসমর্থ হইয়া আরসালান অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী লইয়া হিন্দুস্তান পলায়ন করিলেন। সুলতান সানজার বিজয়গর্বে গজনী প্রবেশ করিয়া সেখানে ৪০ দিন অবস্থান করিলেন। অতঃপর ভাগনেয় শাহজাদা বৈরামকে রাজ্য প্রদান করিয়া তিনি নিজের দেশে ফিরিয়া গেলেন। সুলতান সানজারের প্রস্থানের সংবাদ শুনিবামাত্র আরসালান হিন্দুস্থানে মুসলমান প্রদেশগুলি হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজধানী উদ্ধার করিতে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহাকে বাধাদানে অসমর্থ হইয়া বৈরাম মামার নিকট হইতে যতদিন সাহায্য না আসিতেছে, ততদিন বামিয়ান দুর্গে আবদ্ধ থাকিবেন স্থির করিলেন। সুলতান সানজার পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া আরসালানকে দ্বিতীয়বার গজনী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। আরসালান আফগানদের শরণাপন্ন হইলেন। কিন্তু শত্রু এমনভাবে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করে যে, তাহার সৈন্যবাহিনী বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং যে কয়জন সেনাপতি রহিল তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া বৈরামের নিকট লইয়া আসিলেন। আরসালানকে নিষ্ঠুরভাবে যন্ত্রণা দিয়া হত্যা করা হয়। তিন বৎসর মাত্র রাজত্ব করিবার পর ২৭ বৎসর বয়সে তিনি প্রাণ হারান। তাব্‌কাতে নাসিরীতে বর্ণিত আছে যে, আরসালানের রাজত্বকালে গজব নাজিল হয়; উহাদের মধ্যে বজ্রপাতেরও উল্লেখ আছে। গজনী শহরে এই বজ্রপাতের ফলে যে অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়, তাহাতে শহরের অধিকাংশ ইমারতই বিনষ্ট হয়[৭]।

সুলতান বৈরাম-বিন-মসউদ (৩) গজনভী

[সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা। মুহাম্মদ ভাইলিমের ভারতে রাজ্য জয় করিয়া স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা। সুলতান কর্তৃক পরাস্ত এবং তাঁহাকে ও তাঁহার দশ পুত্রকে হত্যা। সুলতান বৈরাম কর্তৃক জামাতা কুতুব-উদ-দীন ঘুরীকে বন্দী করিয়া হত্যা। কুতুব-উদ-দীনের ভ্রাতা সাইফ-উদ-দীন শূর কর্তৃক তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ। তাঁহার আগমনে বৈরামের গজনী ছাড়িয়া পলায়ন। সুলতানের পরে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন। গজনীর বিশ্বাসঘাতক অধিবাসীদের দ্বারা সাইফ-উদ-দীনকে বৈরামের হস্তে সমর্পণ। বৈরাম কর্তৃক তাঁহাকে মহা অবমাননাকর মৃত্যুদণ্ড প্রদান। ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্ম আলা-উদ-দীন শূরের ঘুর হইতে যাত্রা। গজনীর যুদ্ধে বৈরামের পরাজয় ও লাহোর পলায়ন। তাঁহার মৃত্যু।]

মসউদ পুত্র সুলতান বৈরাম মহৎ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহার জ্ঞান পিপাসা ছিল অসাধারণ এবং তাঁহার দ্বারা সাহিত্যের বিশেষ উৎকর্ষ সাধিত হয়। তিনি বিদ্বান ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহাদের অনেকেই তাঁহার দরবারে স্থায়িভাবে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে সুলতানের নামে উৎসর্গীকৃত মখজুন আসবার নামক গ্রন্থের রচয়িতা শেখ নিজামী এবং সৈয়দ হাসান গজনভীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উভয়েই প্রখ্যাত কবি এবং দার্শনিক ছিলেন। সুলতানের আদেশে বিভিন্ন ভাষা হইতে কতিপয় গ্রন্থ ফারসী ভাষায় অনূদিত হয়। 'কালিলা ও দীমনা' নামক এক ভারতীয় গ্রন্থ ছিল ইহাদের অন্যতম। ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য পতনের পূর্বে তদ্দেশের রাজা একটি দাবার ছকের সঙ্গে এই গ্রন্থটি পারস্যাধিপতি নওশেরওয়াঁকে (ওরফে ন্যায় বিচারক) উপহার প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার উজির বুজুর্জমেহের সেই সময় উহা পাহলভী ভাষায় অনুবাদ করেন। কথিত আছে যে, দাবা খেলা শিখিয়া লইবার পর বুজুর্জমেহের - যে ভারতীয় দূত উহা আনিয়াছিল, তাহারই উপর কয়েকটি বাজী জিতিয়াছিলেন। পারস্য মন্ত্রী নিজে এই সময় নার্দ নামক একটা খেলার উদ্ভাবন করেন এবং সেই খেলায় তিনি নিজে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। উজিরের বুদ্ধিমত্তা পরখ করিবার জন্যই নাকি দাবার ছক উপহারস্বরূপ প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং রাজ্য পরিচালনার মহা খেলায় ভাগ্যের চেয়ে একাগ্রতা ও

দুরদৃষ্টির মূল্যই যে অধিক, দাবার ছক দ্বারা তাহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছিল। আর যে গ্রন্থটি প্রেরণ করা হইয়াছিল তাহাতে আগাগোড়া এই মূল্যবান নীতিই প্রচার করা হইয়াছিল যে, পরিণামে সর্বক্ষেত্রেই "জ্ঞানের নিকট শক্তি পরাজিত হয়।" প্রতিদানে যে নার্দের ছক প্রেরণ করা হয়, তাহাতে ইহাই নির্দেশ করা হয় যে, একাগ্রতা ও দুরদৃষ্টির দ্বারাই সর্বদা সাফল্য অর্জন করা যায় না। জীবনের দাবা খেলায় জয়-পরাজয় নির্ভর করে অনেকটা ভাগ্যের উপর।

নওশেরওঁয়ার রাজত্বকালে এই কালিলা ও দীমনা সংস্কৃত হইতে পাহলভীতে অনূদিত হয় এবং হারুন-উর-রশীদের রাজত্বকালে ইবনুল মকৃবা কর্তৃক ইহার আরবী অনুবাদ সম্পন্ন হয়। সুলতান বৈরাম গজনভীর রাজত্বকালে আরবী হইতে ইহাকে ফারসীতে তরজমা করা হয়। পরে সুলতান হোসেন মির্জা খারিজ-মীর রাজত্বকালে মোল্লা হাসান ওয়াইজ কাস্‌ফি আরবী শব্দ ও কবিতা বহুল পুরাতন ফারসী অনুবাদটিকে সহজ ও সাবলীল ফারসী ভাষায় রূপান্তরিত করেন এবং ইহার নাম দেন 'আনওয়ার সোহেলী'। যখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিল, তখন অবাধ্য প্রজা ও তহশীলদারদিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য বৈরাম দুইবার হিন্দুস্তানে গমন করিয়াছিলেন। প্রথম দফা তিনি মুহাম্মদ ভাইলিমের গর্ব খর্ব করেন। ভাইলিম সুলতানের ভ্রাতা আরসালানের পক্ষে লাহোর শাসন করিয়া আসিতেছিল। ৫১২ হিজরীর (৫ই ডিসেম্বর ১১১৮ খ্রীঃ) ২৭শে রমজান তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করা হয় ও বশ্যতার শপথ গ্রহণের পর তাহাকে মার্জনা করা হয়। অতঃপর তাঁহাকে পূর্বপদে বহাল করিয়া সুলতান গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। অনতিকাল পরেই মুহাম্মদ ভাইলিম সেবালিক প্রদেশে নগোর নামক এক দুর্গ নির্মাণ করিয়া সেখানে তাঁহার ধনরত্ন পরিবার-পরিজন ও আসবাবাদি স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর তিনি আরব পারসিক আফগান ও খিলজী সম্প্রদায়ের লোকদিগকে লইয়া এক উৎকৃষ্ট সেনাবাহিনী গঠন করেন এবং ইহার সাহায্যে স্বাধীন হিন্দু রাজাদের রাজ্যে সাফল্যের সঙ্গে লুটতরাজ করিয়া যাইতে লাগিলেন। এইসব সাফল্যে স্ফীত হইয়া তিনি অবশেষে স্বাধীন সুলতান হইবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার এইসব কার্যকলাপের সংবাদ পাইয়া সুলতান বৈরাম বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া দ্বিতীয়বার ভারতাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সুলতানকে বাধাদানের নিমিত্ত মুহাম্মদ ভাইলিম ও তাঁহার দশ পুত্র মুলতান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহার পুত্রেরা প্রত্যেকেই

এক একটি বিরাট প্রদেশের আমীর ছিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল এবং বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহীর মস্তকে অকৃতজ্ঞতার অভিশাপ বজ্রের মত আপতিত হইল। পলায়নকালে এক পঙ্কে পতিত হইয়া তিনি দশ পুত্র ও অনুচরবর্গসহ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলেন। যুদ্ধ জয়ের পরে ইব্রাহিম পুত্র সালার হাসানকে ভারতীয় বিজিত রাজ্যগুলির প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিয়া সুলতান বৈরাম গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। ইহার অনতিকাল পরেই সুলতান তাঁহার জামাতা কুতুব-উদ-দীন মুহাম্মদ ঘুরী আফগানকে সর্বসমক্ষে প্রাণদণ্ড প্রদান করেন। ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সাইফ-উদ-দীন শুরী এক বিরাট সেনাবাহিনী গঠন করেন। সাইফ-উদ-দীন শুরী ছিলেন ঘুরের সুলতান। তিনি সসৈন্যে গজনী পৌঁছিবার পূর্বেই বৈরাম গজনী খালি করিয়া কার্মানে পলায়ন করেন। এই কার্মান, গজনী ও হিন্দুস্তানের মধ্যে অবস্থিত একটি শহর—পারস্যের সেই সুপরিচিত কার্মান নয়। এক পার্বত্য গিরিপথ প্রহরার জন্য আফগানরা এই শহর নির্মাণ করিয়াছিলেন। সাইফ-উদ-দীন ঘুরী নির্বিঘ্নে গজনী প্রবেশ করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে গজনীর আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তিনি তাঁহার ভ্রাতা আলা-উদ-দীন শুরকে নিজরাজ্য ঘুর শাসন করিতে প্রেরণ করেন। শত চেষ্টা করিয়াও সাইফ-উদ-দীন গজনীতে জনপ্রিয়তা অর্জন করিতে সমর্থ হইলেন না। গজনীবাসীরা ক্রমশঃ তাহার সরকারের প্রতি বীতরাগ হইতে লাগিল এবং প্রাক্তন সুলতানকে ফিরিয়া আনিবার দুরভিসন্ধি পোষণ করিতে লাগিল। এই অনুকূল অবস্থার পটভূমিকায় কতিপয় প্রধান ব্যক্তি বৈরামকে আমন্ত্রণ জানাইলেন এবং তাঁহার পক্ষাবলম্বনের প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপন করিলেন। তখন ছিল শীতকাল। ঘুর সুলতানের সমস্ত সৈন্যরাই প্রায় দেশে তাহাদের পরিবার বর্গের নিকট ফিরিয়া গিয়াছিল। এই সময় বৈরাম বিশাল বাহিনী লইয়া অপ্রত্যাশিতভাবে গজনীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁর নিজস্ব সৈন্যদের সংখ্যা এত কম ছিল যে তাহাদিগের সাহায্যে বাধাদানের কোন অর্থই হয় না। ওদিকে গজনী সরকারের উপরও নির্ভর করা যায় না। সুতরাং তিনি ঘুরে পলাইয়া যাইবেন সাব্যস্ত করিলেন। এই সময় গজনীর লোকরা তাহাকে প্রাণপণে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিয়া তাহাকে বৈরামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে প্ররোচিত করিল। বলা বাহুল্য, সুলতানকে বন্দী করিবার জন্যই তাহারা এইরূপ ফাঁদ পাতিয়াছিলেন। ঘুর সুলতান বাধাদানে অগ্রসর হইলেন এবং শীঘ্রই

গজনী সৈন্যদের হস্তে বন্দী হইলেন। বৈরাম ঘুর সৈন্যদিগকে সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। ললাটে কালিমা লেপন করিয়া হতভাগ্য বন্দীকে লেজের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা বলদের পৃষ্ঠে আরোহণ করানো হইল এবং জনতার চিৎকার ও অশেষ লাঞ্ছনার মধ্যে তাঁহাকে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করানো হইল। অতঃপর অমানুষিক নির্যাতনের পর তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া সুলতান সানজার সেলজুকীর নিকট প্রেরণ করিলেন। তাঁহার উজির মুজদ্-দীনকে শূলে বধ করা হইল।

এই দুঃসংবাদ যখন তাঁহার ভ্রাতা আলা-উদ-দীন শূরের কর্ণে পৌঁছিল তখন তিনি ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া নির্মম প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হইয়া গজনী আক্রমণ করিলেন। তাহার আগমন বার্তা শ্রবণ করিয়া বৈরাম মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং সেই সঙ্গে তাহার মনেও আতঙ্ক সৃষ্টির জন্য স্বীয় সৈন্যবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্বের দম্ভ করিয়া এবং ঘুর পরিবারকে একই প্রকার দুর্ভাগ্যের অতলগর্ভে নিক্ষেপ না করিবার জন্য তাহাকে উপদেশ প্রদান করিয়া এক পত্র লিখিলেন। উত্তরে আলা-উদ-দীন লিখিলেন: "আপনার ভীতি প্রদর্শন আপনার সামরিক শক্তির মতই অন্তঃসার শূন্য। সুলতানরা প্রতিবেশী সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াই থাকেন, ইহা কোন অভিনব ব্যাপার নয়। কিন্তু আপনি যে বর্বরতা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহার নজির ইতিহাসে বিরল—ইহা আপনার কাপুরুষতারই পরিচায়ক। কোন সুলতান অন্য সুলতানের উপর এমন বর্বরোচিত আচরণ করিয়াছেন বলিয়া আমি শুনি নাই। আল্লাহ্ যে আপনার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন সে সম্বন্ধে আপনি স্থির নিশ্চিত হইতে পারেন এবং স্বাধীন ও সুপ্রাচীন ঘুর বংশের সন্তানকে হত্যা করার ন্যায়সঙ্গত প্রতিশোধ গ্রহণের দায়িত্ব আল্লাহ্ যে আমার উপরই ন্যস্ত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধেও আপনি নিঃসংশয় হইতে পারেন।"

আপোষের সমস্ত সম্ভাবনা এইভাবে তিরোহিত হইলে বৈরাম আলা-উদ-দীনকে যুদ্ধে আহ্বান করেন। আলা-উদ-দীন তজ্জন্য প্রস্তুত ছিলেন। দুই পক্ষে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হইল। প্রথমদিকে গজনীবাহিনী তাহাদের সংখ্যাধিক্যের বলে ঘুরবাহিনীকে পিছু হটাইয়া দিতে লাগিল। আলা-উদ-দীনের নিজের অবস্থাও সঙ্কটজনক হইয়া পড়িল। এই সময় তিনি বড় ও ছোট খুরমিল[১]

১ আমার সন্দেহ হইতেছে এ শব্দটি যেভাবে লেখা হইল তাহা ঠিক কি না। অথবা, ইহা ফারসিল হইবে। এই নামের একটা জাতি আছে।

নামক দুই বিশালদেহী ভ্রাতাকে তাহার সাহায্যে আহ্বান করিলেন। ইহারা তখন দুই পর্বতের ন্যায় সম্মুখভাগে যুদ্ধের চাপ ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান ছিলেন। এই বীর ভ্রাতৃদ্বয় তখন সম্মুখের সমস্ত বাঁধা অপসারণ করিয়া আলা-উদ-দীনের হস্তী বৈরামের দিকে আগাইয়া লইলেন। আলা-উদ-দীনকে দেখিয়া বৈরাম সরিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু তাহার পুত্র দৌলৎশাহ—যিনি পিতার বাহিনীর সিপাহসালার ছিলেন, তিনি শত্রুর মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হইলেন। জ্যেষ্ঠ খুরমিল তখন আগাইয়া আসিয়া দৌলৎশাহের হস্তীর উদর ফাঁক করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু জন্তুটি তাহার উপরই আপতিত হওয়ায় তিনি নিহত হইলেন। ইত্যবসরে আলা-উদ-দীন দৌলৎ শাহকে বর্শাবিদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দ্বিতীয় খুরমিল বৈরামের হস্তীকে আক্রমণ করিলেন এবং আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করিয়া সেই বিশাল জন্তুকে ভূতলশায়ী করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু হাতীর পতনে তাহার দেহও থেঁতলাইয়া যায় এবং হাতীর পার্শ্ব হইতে তিনি নির্গত হইবার পূর্বেই বৈরাম সরিয়া পড়েন এবং একটা অশ্বে আরোহণ করিয়া তাঁহার পলায়নপর সৈন্যদের সঙ্গে যোগদান করেন। তাঁহার সৈন্যরা সমরক্ষেত্রের সর্বস্থানেই পরাস্ত হয়।

বৈরাম তাঁহার হতাবশিষ্ট বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে একত্র করিয়া হিন্দুস্তানের দিকে পলায়ন করেন। কিন্তু দুঃখভারে অবনত সুলতান শীঘ্রই কালগ্রাসে পতিত হইলেন। ৩৫ বৎসর রাজত্বের পর ৫৪৭ হিজরীতে (১১৫২খ্রীঃ) তিনি ইন্তেকাল করেন।

সুলতান খসরু-বিন-বৈরাম গজনভী

[গজনী অধিকারের পর গজনী অধিবাসীদের প্রতি আলা-উদ-দীনের আচরণ। খসরু কর্তৃক গজনী পুনরুদ্ধারের প্রয়াস এবং সুলতান সানজার সেলজুকীর মৃত্যু সংবাদে পশ্চাদাপসরণ। খীজা তুর্কীগণ কর্তৃক গজনী অধিকার। সুলতান খসরুর মৃত্যু।]

বৈরাম তনয় সুলতান খসরু শত্রুকে গজনী রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া লাহোর আগমন করেন এবং তথায় জনসাধারণ একবাক্যে তাঁহাকে সুলতান রূপে সাদরে গ্রহণ করে। ইত্যবসরে আলা-উদ-দীন নির্বিঘ্নে গজনী প্রবেশ করিয়া সেই মহান নগরীতে অগ্নিকাণ্ড নরহত্যা ও ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা শুরু করিয়া দেন। সাতদিন ব্যাপী অবিরাম নরহত্যা চলিয়াছিল এবং এই সময় মনে হইয়াছিল যে দুনিয়া হইতে দয়ামায়া চিরতরে বিদায় গ্রহণ করিয়াছে এবং মানুষের হৃদয় দানবীয় রোষে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই সময়ই সুলতান আলা-উদ-দীন জাহান-সুজ বা বিশ্বদাহক আখ্যা অর্জন করেন। তাঁহার প্রতিহিংসার আগুন ইহাতেও নির্বাপিত হইল না। তাহার বিজয় গৌরবকে আরও উজ্জ্বল করিবার নিমিত্ত তিনি গজনীর কতিপয় মহামান্য ও বিদ্বান ব্যক্তিকে শৃঙ্খলিত করিয়া ফিরোজ কোহ্‌তে লইয়া আসিয়া তাহাদের গলা কাটিবার হুকুম দান করেন। তাহাদের শোনিতে মাটি সিক্ত করিয়া সেই কাদামাটি দ্বারা শহরের প্রাচীর লেপন করাইবার হুকুম দেন।

আলা-উদ-দীন ঘুরে প্রত্যাগমন করিবার পরে সুলতান খসরু হৃত গজনী রাজ্য পুনরুদ্ধারের আশায় লাহোর হইতে গজনী অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান সানজার সেলজুকীর সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়াই তিনি এই দুঃসাহসিক কার্যে পদক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু গজনী সীমান্তে পৌঁছিয়া তিনি শুনিলেন যে সুলতান সানজার সেলজুকী খীজার তুর্কীদের হস্তে পরাস্ত ও বন্দী হইয়াছেন এবং খীজার তুর্কীরা বিশাল বাহিনী লইয়া গজনী রাজ্য অধিকারের জন্য অগ্রসর হইতেছে। এই ঘটনার পর তিনি লাহোরে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন—কেননা উহাদের মোকাবিলা করিবার মত শক্তি তাঁহার ছিল না।

তিনি ধার্মিক রাজাদের মত ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে নির্বিবাদে তাঁহার অধীনস্থ ভারতীয় প্রদেশগুলি শাসন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ওদিকে খোজা তুর্কীরা ঘুর সৈন্যদিগকে বিতাড়িত করিয়া গজনী অধিকার করিয়া লইল। দুই বৎসরকাল গজনী তাহাদের অধিকারে ছিল। তারপর ঘুরীগণ কর্তৃক তাহারা বিতাড়িত হয়। কিন্তু ঘুরীগণও বেশীদিন তাহাদের বিজয়ের ফল ভোগ করিতে পারে নাই। সুলতান খসরুর অন্যতম সেনাপতি আসামুদ পুনরায় তাহাদিগকে গজনী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। তিনি গজনী পুনরুদ্ধার করিয়া কিছুকাল উহা স্বীয় অধিকারে রাখিয়াছিলেন।

সাত বৎসর কাল রাজত্বের পর ৫৫৫ হিজরীতে (১১৬০ খ্রীঃ) সুলতান খসরু লাহোরে ইন্তেকাল করেন।

সুলতান খসরু মালিক-বিন-খসরু গজনভী

[পিতামহ বৈরাম কর্তৃক অধিকৃত ভারতীয় রাজ্য ভোগ। শাহাবুদ্দীন মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক তুর্কীদের নিকট হইতে গজনী পুনরুদ্ধার। পেশোয়ার এবং সিন্ধুর পশ্চিম পাড়ের সমস্ত রাজ্য শাহাবুদ্দীন কর্তৃক অধিকৃত। পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া শাহাব-উদ-দীন কর্তৃক খসরু মালিককে লাহোরে অবরুদ্ধকরণ। অতঃপর শান্তি চুক্তি সম্পাদিত এবং জামিনস্বরূপ খসরু মালিকের পুত্র মালিক শাহকে শাহাব-উদ-দীনের হস্তে সমর্পণ। পুনরায় লাহোর আক্রমণ করিয়া শাহাব-উদ-দীন বিফল মনোরথ। খসরু মালিককে ধরিবার জন্য শঠতার আশ্রয় গ্রহণ এবং কৃতকার্যতা। গজনী রাজবংশের অবসান।]

সুলতান খসরুর তিরোধানের পর তাঁহার পুত্র খসরু মালিক তখ্‌তে আরোহণ করেন এবং করুণা ও সুবিচার দ্বারা ঐ আসনের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি প্রাক্তন সম্রাট সুলতান ইব্রাহীম ও সুলতান বৈরাম কর্তৃক বিজিত সমস্ত ভারতীয় রাজ্যের উপর স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করেন। তাহার সময়েই আলা-উদ-দীনের ভাই সুলতান শাহাব-উদ-দীন মুহাম্মদ ঘুরী গজনী রাজ্য আক্রমণ ও অধিকার করেন। এই সাফল্যে তৃপ্ত না হইয়া রাজ্যলিপ্সা চরিতার্থ করিবার জন্য তিনি ভারতের দিকে সৈন্য চালনা করেন এবং আফগানিস্তান, পেশোয়ার, মুলতান প্রভৃতি প্রদেশ অধিকার করিয়া সিন্ধু নদের তীর পর্যন্ত অগ্রসর হন। শেষ পর্যন্ত তিনি লাহোরের তোরণে আসিয়া হানা দেন এবং ৫৭৬ হিজরীতে (১১৮০ খ্রীঃ) খসরু মালিককে লাহোরে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলেন। কিন্তু তিনি লাহোর অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না এবং শেষ পর্যন্ত শান্তি চুক্তি সম্পাদন করাই শ্রেয় বিবেচনা করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী লাহোর ত্যাগ কালে মুহাম্মদ ঘুরী সুলতান খসরু মালিকের চার বৎসর বয়স্ক পুত্র মালিক শাহকে সঙ্গে লইয়া যান।

খসরু মালিক কর্তৃক সন্ধির শর্তগুলি যথাযথ প্রতিপালিত না হওয়ায় ৫৮০ হিজরীতে (১১৮৪ খ্রীঃ) মুহাম্মদ ঘুরী পুনরায় লাহোর আগমন করেন। কিন্তু তাঁহার শহর অধিকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। তখন তিনি তলোয়ার ও অগ্নি দ্বারা দেশ ছারখার করিতে আরম্ভ করেন এবং শেষ পর্যন্ত শিয়ালকোট পৌঁছিয়া সেখানকার দুর্গ পুনর্গঠন করেন এবং সেখানে এক শক্তিশালী বাহিনী রাখিয়া গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। মুহাম্মদ ঘুরীর অনুপস্থিতি

কালে খসরু মালিক গোক্করদের সঙ্গে মিলিত হইয়া শিয়ালকোট দুর্গ অবরোধ করেন। কিন্তু তাহার সে উদ্যম ব্যর্থ প্রমাণিত হয় এবং তিনি পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন।

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুহাম্মদ ঘুরী তৃতীয়বার লাহোর অধিকারের প্রয়াস পান। এই বার তিনি বিশ্বাসঘাতকতার দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য হাসিল করেন। এই অভিযানের উদ্যোগকালে তিনি ঘোষণা করেন যে, তার এই সমরায়োজন সেলজুকদের বিরুদ্ধে। খসরু মালিককে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, আপোস আলোচনার মাধ্যমেই তিনি তাঁহাদের মধ্যেকার বিরোধ নিরসনের পক্ষপাতী। তাহার দুরভিসন্ধি ঢাকিবার জন্য এবং খসরু মালিককে তাহার সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য মুহাম্মদ ঘুরী মালিক শাহকে মুক্তি দান করেন এবং বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে অনুচর পরিবৃত করিয়া তাহাকে লাহোরের পথে রওয়ানা করিয়া দেন। অনুচরদের প্রতি নির্দেশ ছিল তাহারা যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়। ওদিকে পুত্রের দর্শন লাভের জন্য অধৈর্য্য হইয়া খসরু মালিক লাহোর হইতে বহির্গত হইয়া বেশ কিছুদূর আগাইয়া আসেন। এই সময় মুহাম্মদ ঘুরী ২০,০০০ বেগবান অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রগতিতে বৃত্তাকার পথে পর্বত ঘুরিয়া খসরু মালিকের পশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে লাহোর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলেন। রাত্রিকালে গোপনে তাঁহার ক্ষুদ্র শিবির ঘিরিয়া ফেলা হইল। প্রভাতে নিদ্রা ভঙ্গের পর সম্রাটের মনে হইল তিনি যেন স্বপ্ন দেখিতেছেন। যাহা হউক, পরিত্রাণের কোন উপায় না দেখিয়া তিনি নিজেকে শত্রুর কৃপার উপর ছাড়িয়া দিলেন। মুহাম্মদ ঘুরী লাহোর দাবী করিলেন এবং তদনুযায়ী তাহার অভ্যর্থনার জন্য লাহোরের তোরণগুলি খুলিয়া দেওয়া হইল। এইরূপে গজনী বংশের শেষ সাম্রাজ্যটিও ঘুর বংশের হাতে চলিয়া গেল। ঘুর বংশের ইতিহাসে আমরা ইহার পূর্ণ বিবরণ প্রাপ্ত হইব। সুলতান খসরু মালিকের রাজত্বকাল ২৮ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল (৫৪২ হিঃ ১১৮৬ খ্রীঃ)।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানদের ইতিহাস

মুহাম্মদ ঘুরী

[মুহাম্মদ ঘুরীর বংশ পরিচয়। গজনী ও ঘুরের সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তদীয় সেনাপতি মুইজ-উদ-দীনকে গজনীর শাসনকর্তা নিযুক্তি। মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক উচা অবরুদ্ধ ও অধিকার। গুজরাট পর্যন্ত অগ্রসর ও হিন্দুদের নিকট পরাজয়বরণ। মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক দ্বিতীয় বার ভারত আক্রমণ এবং বিতুণ্ডা অধিকার। সরস্বতী নদী তীরে থানেশ্বরের নিকট আজমীর ও দিল্লীর রাজাগণ কর্তৃক তাঁহাকে বাধা দান। নারাইনের যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া মুহাম্মদ ঘুরীর লাহোরে পশ্চাদাপসরণ এবং তথা হইতে ঘুরে প্রস্থান। হিন্দুদের বিতুণ্ডা পুনরুদ্ধার। ১,২০,০০০ হাজার সৈন্যের বিরাট বাহিনী লইয়া মুহাম্মদ ঘুরীর তৃতীয় বার ভারত আক্রমণ। হিন্দুগণ কর্তৃক পূর্ব সমর ক্ষেত্রেই তাঁহাকে বাধাদান। হিন্দুদের বিশাল সেনাবাহিনী গঠন। তাহাদের পরাজয়। দিল্লীর রাজা চাউন্দ রায় নিহত। কুতুব-উদ-দীন আইবেককে কোহ্‌রাম ও প্রাচ্যের অন্যান্য বিজিত রাজ্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া মুহাম্মদ ঘুরীর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন। মুহাম্মদ ঘুরীর পুনরায় ভারতে আগমন। কনৌজ ও বেনারসের জয় চাঁদের পরাজয়। আস্‌নি, বেনারস ও কোল অধিকার করিয়া মুহাম্মদ ঘুরীর গজনী প্রত্যাবর্তন। পুনরায় ভারতে আগমন এবং বিয়ানা ও গোয়ালিয়র অধিকার। মুহাম্মদের গজনী প্রত্যাবর্তন। কুতুব-উদ-দীন আইবেকের কাল্‌পি, বাদায়ুন ও কালিঞ্জর অধিকার। গিয়াস-উদ-দীন ঘুরীর মৃত্যু এবং ভ্রাতা মুহাম্মদ ঘুরী তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রাপ্ত। গজনীর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধাভিযান। তাঁহার সেনাপতিদের গজনী ও মুলতান অবরোধ এবং প্রত্যাবর্তনকালে মুহাম্মদ ঘুরী পথে অবরুদ্ধ। শত্রুদের হটাইয়া দিয়া লাহোরে আগমন। পাঞ্জাবে এক গোক্কর আততায়ীর হস্তে তাঁর প্রাণহানি। সমস্ত সাম্রাজ্যে গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলা।]

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে, ফরিদুন যখন যোহাকমারীকে[১] বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন, তখন সুরীৎসাম নামক যোহাকমারীর দুই পুত্র ফরিদুনের অধীনে

১ যোহাক মারী পারস্যের প্রাচীনতম রূপকথার রাজাদের অন্যতম। তিনি কি প্রকারে মারী আখ্যাপ্রাপ্ত হন তাহা শাহানামায় বর্ণিত আছে—মারী শব্দের অর্থ সর্পবৎ। ইহার উপর আর কোন মন্তব্যের প্রয়োজন নাই।

কর্মগ্রহণ করেন। কিন্তু ফরিদুনের কোপানলে পতিত হইয়া একদল বন্ধুবান্ধব সমভিব্যাহারে তাহারা নেহাওয়ান্দে পলাইয়া যাইয়া সেখানে বসতি স্থাপন করেন এবং নিজেদের জন্য একটা ক্ষুদ্র অঞ্চল অধিকার করিয়া লন। শূরী হইলেন সেই ক্ষুদ্র এলাকার রাজা এবং সাম হইলেন তাঁহার সেনাপতি। শূরী তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র (সামের পুত্র) শুজার[২] সঙ্গে স্বীয় কন্যার বিবাহ দেন। পিতার মৃত্যুর পর শুজা পিতার স্থলে সেনাপতি নিযুক্ত হন। কিন্তু শত্রুদের প্ররোচনায় তাঁহার পিতৃব্য তাহার প্রতি রুষ্ট হন এবং বিদ্বেষ ও ঈর্ষা পরবশ হইয়া শুজার নিকট হইতে কন্যাকে কাড়িয়া লইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। ইহা জানিতে পারিয়া শুজা নিজের মালপত্র উষ্ট্রের পিঠে চাপাইলেন এবং দশ জন অশ্বারোহী সৈন্যসহ রাত্রিকালে স্ত্রী ও সন্তানদের লইয়া ঘুরের পর্বতাঞ্চলে পলাইয়া যান। সেখানে তিনি এক দুর্গ নির্মাণ করিয়া উহার নাম দিলেন জুমিয়ান্দেশ। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অধিকাংশ বন্ধুই এখানে আসিয়া তাহার সঙ্গে মিলিত হইল। তিনি বহুদিন যাবৎ ফরিদুনের বিরুদ্ধে নিজের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং ফরিদুনকে কর প্রেরণ করিতে বাধ্য হন।

এইভাবে যোহাকের বংশধর এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তাঁহারা ক্রমশঃ শক্তিবৃদ্ধি করিয়া রাসূলুল্লার (সঃ) সময় পর্যন্ত চলিয়া আসেন। এই সময় যিনি এই অঞ্চলের শাসক ছিলেন তাঁহার নাম শিস্ত। কেহ কেহ বলেন, তিনি আলী কর্তৃক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন এবং এই অঞ্চলের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হন। এই বংশের ধারাবাহিক ইতিহাস এইরূপ :—শিস্তের পিতা হারিক, হারিকের পিতা ইউনুস, ইউনুসের পিতা ভিশ্‌তি, ভিশ্‌তির পিতা যোজুন, যোজুনের পিতা হেইন, হেইনের পিতা ভারাম, তাহার পিতা হিজাশ, হিজাশের পিতা ইব্রাহীম, ইব্রাহীমের পিতা সা'দ, সাদের পিতা যোহাক, যোহাকের পিতা বোস্তাম, বোস্তামের পিতা কিত্‌মাজ, কিত্‌মাজের পিতা নরিমান, নরিমানের পিতা আফ্রিদুন, আফ্রিদুনের পিতা সামুদ, সামুদের পিতা আফিদাস্‌প, তদীয়

২ শুজা খুব সম্ভব ভুলক্রমে লেখা হইয়াছে—কেননা ইসলামের আবির্ভাবের এতকাল পূর্বে তুরানের লোকেরা তাহাদের পারিবারিক নামের জন্য এমন একটা খাঁটি আরবী শব্দ নির্বাচন করিবে, তাহা বিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয় না।

পিতা যোহাক, তাঁহার পিতা শিমরাম, শিমরামের পিতা হিন্দাস্‌প্‌, হিন্দাসপের পিতা সিয়ামুক, সিয়ামুকের পিতা জাম, জামের পিতা করুস্তাপ, তাঁহার পিতা যোহাক।[৩] এই কারণে এই বংশের লোকদিগকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই শিস্তী বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। উমায়াইয়াদ খলিফাদের হুকুমতকালে প্রায়শঃই খোতবা পাঠকালে মিম্বারে দণ্ডায়মান হইয়া আলীর বংশধরদের প্রতি নিন্দাবাদ বর্ষণ করা হইত। ঘুরীরা কখনই এইরূপ আচরণ করেন নাই। বরং আবু মুসলিমের সময়ে ফোলাদ শিস্তী নবী বংশের দুশ্‌মনদিগকে দমন করিতে সাহায্য করিয়াছিলেন। আমীর এহিয়া-বিন-নাথান-বিন-উর-মিস-বিন-উরমুনিস-বিন-পারভিজ-বিন শিস্ত, হারুন-উল-রশীদের সমসাময়িক ছিলেন। আমীর এহিয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র মুহাম্মদের পুত্র শূরী সফরী বংশের সমসাময়িক এবং শূরীর পুত্র মুহাম্মদ, মাহমুদ গজনভীর সমসাময়িক ছিলেন। তিনি মাহমুদকে করদানে অস্বীকার করিয়াছিলেন এবং মাহমুদ তাঁহাকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া তাঁহার স্থানে তাঁহার পুত্র আবু আলীকে বহাল করিয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই আবু আলীর ভ্রাতা আব্বাস-বিন-শিস্ত-বিন-মুহাম্মদ শূরী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার রাজত্বকালে ঘুরে সাত বৎসর বৃষ্টিপাত না হওয়ায় মাটি পুড়িয়া খাক হইয়া গিয়াছিল; হাজার হাজার মানুষ ও বোবা জীব জন্তু খাদ্যাভাবে ও উত্তাপে মারা গিয়াছিল। আবুল আব্বাস সুলতান ইব্রাহীমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া পরাস্ত ও বন্দী হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ গজনী সাম্রাজ্যের আনুগত্য মানিয়া চলিবার শপথ গ্রহণ করিলে তাঁহাকে পিতার স্থলাভিষিক্ত করা হয়। তাঁহার পুত্র কুতুব-উদ-দীন হাসান তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। তিনি একটা দুর্গ আক্রমণকালে তীর বিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তীরটি তাঁহার চক্ষু কোটরে প্রবেশ করিয়াছিল। কুতুব-উদ-দীন হাসানের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র সাম ভারতে পালাইয়া আসিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এখানে তিনি সওদাগরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতে থাকেন এবং প্রচুর ধনোপার্জন করিয়া সমুদ্র পথে স্বদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে জাহাজডুবি হইয়া

৩ এইসব প্রাচীন বংশপঞ্জী বিশ্বাসযোগ্য নয়। হয় ইহা বিকৃত হইয়া বংশ-পরম্পরায় চলিয়া আসে অথবা বংশে কেহ রাজা হইলে তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য কোন প্রাচীন রাজা হইতে তাঁহার উৎপত্তি দেখাইয়া বংশ-পঞ্জী প্রস্তুত হয়।

তাঁহার সলিল সমাধি ঘটে। তাঁহার পুত্র আইজ-উদ-দীন হোসেন একটা তক্তা অবলম্বন করিয়া ভাসিতে থাকেন। তাঁহার ভারতবর্ষ হইতে যে ব্যাঘ্রটি আনিয়াছিল তাহাও ঐ তক্তা চাপিয়া ধরিয়াছিল। মানুষ ও ব্যাঘ্র উভয়েই তিন দিন যাবৎ সমুদ্রে ভাসমান থাকিবার পর জোয়ারের স্রোতে তীরে আসিয়া পতিত হয়। তীরে উঠিবার পরেই তিনি নিকটবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি যখন শহরে পৌঁছিলেন তখন গভীর রাত্রি—কোথাও আশ্রয় প্রাপ্তির সম্ভাবনা ছিল না। প্রথম যে চালা ঘরটি তাহার সম্মুখে পড়িল, হামাগুড়ি দিয়া তিনি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রহরারত চৌকিদার তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিয়াছিল এবং তস্কর ভ্রমে তাহাকে ধরিয়া লইয়া কয়েদ খানায় পুরিয়া রাখা হইল। অতঃপর বিনা বিচারে তাঁহাকে সাত বৎসর গোলাম করিয়া রাখা হইল। অবশেষে সেই প্রদেশের শাসনকর্তা এক গুরুতর রোগ হইতে আরোগ্য লাভের পর যখন সকল কয়েদীকে মুক্তিদান করেন তখন তিনিও মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর আইজ-উদ-দীন হোসেন গজনী অভিমুখে যাত্রা করেন। পথে তিনি একদল দস্যুর হাতে পড়িলেন; এই দস্যুরা বহুদিন যাবৎ এই পথে উৎপাত করিয়া আসিতেছিল। দস্যুদের নিকট তিনি একজন অসাধারণ শক্তিশালী, সাহসী ও নির্ভীক পুরুষ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেন এবং তাঁহারা তাহাকে দলে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই রাত্রেই সুলতান ইব্রাহীমের একদল সৈন্য এই দস্যুদলকে ঘেরাও করিয়া ফেলিল এবং সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় রাজধানীতে লইয়া আসিল। সেখানে সকলের উপর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হইল। ঘাতক যখন আইজ-উদ-দীনের চক্ষু বাঁধিতে যাইতেছিল তখন অতি করুণস্বরে আল্লাহকে সাক্ষ্য করিয়া তাহাকে জানাইল যে তিনি সম্পূর্ণ নিরাপরাধ। ইহাতে ঘাতকের প্রাণে করুণার সঞ্চার হইল এবং স্বপক্ষে তাঁহার কি বলিবার আছে তাহা তাঁহাকে বলিতে বলিল। আইজ-উদ-দীন তখন এমন সরলভাবে ও প্রত্যয়ের সঙ্গে নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী বর্ণনা করিলেন যে সঙ্গে যে ফৌজদার ছিল তাঁহার দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে তিনি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। তিনি তাঁহার অনুকূলে সুলতানের নিকট আবেদনপত্র প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তাঁহাকে সুলতানের নিকট হাজির করা হইল। তিনি এমন বিনয় ও বাগ্মিতার সঙ্গে নির্দোষিতা

প্রতিপন্ন করিলেন যে সুলতান তাঁহাকে সানন্দে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার সরকারে চাকুরী প্রদান করিলেন। তাঁহার কার্যে সন্তুষ্ট হইয়া কিছুদিন পরে সুলতান ইব্রাহীম, আইজ-উদ-দীন হোসেনকে আমীর হাজিব মনোনীত করিলেন। এই কার্যে তিনি এমন দক্ষতা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দান করিলেন যে, গুণমুগ্ধ সুলতান গজনী পরিবারের এক শাহজাদীকে তাঁহার সঙ্গে শাদী দিলেন। সুলতানের নিকট তাঁহার আদর ও কদর দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে ইব্রাহীমের পুত্র সুলতান মাসুদ কর্তৃক তিনি ঘুর প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে আইজ-উদ-দীন হোসেন কুতুব-উদ-দীন হোসেনের পুত্র ছিলেন—পৌত্র নয়। গজনীর শাহজাদীর গর্ভে তাঁহার সাতজন পুত্র সন্তান জন্মলাভ করে, যথা:—প্রথম—বামিয়ানের সুলতান ফখর-উদ-দীন মাসুদ; দ্বিতীয়—কুতুব-উদ-দীন মুহম্মদ—যিনি তাঁহার ভগ্নী সম্পর্কীয়া গজনী রাজ-কুমারী সুলতান বৈরামের কন্যাকে শাদী করিয়াছিলেন। তৃতীয়—সাজা-উদ-দীন আলী—জন্মের অব্যবহিত পরেই মারা গিয়াছিলেন; চতুর্থ—নাসির-উদ-দীন মুহাম্মদ, ঘুরের নিকটস্থ কান্দাহারের অন্তর্ভুক্ত জুমিন দোয়ারের শাসনকর্তা ছিলেন; পঞ্চম—সাইফ-উদ দীন শূরী; ষষ্ঠ—বাহা-উদ-দীন সাম এবং সপ্তম—আলা-উদ-দীন হুসেন।

আইজ-উদ-দীন যতদিন বাঁচিয়াছিলেন ততদিন তিনি সেলজুক ও গজনী উভয় সুলতানকে কর প্রদান করিয়াছেন। আইজ-উদ-দীন হোসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণ (সপ্ত-তারকা নামে অভিহিত) দুই দলে বিভক্ত হইয়া যায়। একদল হইতে বামিয়ান (ইহাকে তোখারিস্তান ও মহাটিলাও বলা হইয়া থাকে) রাজবংশের উৎপত্তি হয় এবং অন্যদল হইতে গজনীর ঘুর বংশের গোড়া পত্তন হয়। দ্বিতীয় দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুতুব-উদ-দীন মুহাম্মদ (পর্বতের রাজা বলিয়া অভিহিতি)। তিনি গজনীর সম্রাট সুলতান বৈরামের কন্যাকে শাদী করেন এবং ফিরোজকোহ্ শহর প্রতিষ্ঠা করিয়া সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। এই স্থানের নিকটে দুই ফার্সং পরিধিযুক্ত একটা স্থানকে প্রাচীরবেষ্টিত করিয়া সেখানে তিনি মৃগয়ার উদ্যান প্রস্তুত করেন। তিনি স্বাধীন সুলতানের সমস্ত শানশওকত প্রদর্শন করিয়া চলিতে লাগিলেন।

অবশেষে তিনি গজনী আক্রমণ করিবার দুরাশা পোষণ করিতে থাকেন। বৈরাম তাঁহার দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া কৌশলে তাঁহাকে মুঠির মধ্যে লইয়া আসেন এবং বিষ প্রয়োগে তাঁহার জীবনাবসান ঘটান। এইখান থেকেই গজনী ও ঘুর বংশের মধ্যে শত্রুতার সূত্রপাত হয়।

আইজ-উদ-দীনের পঞ্চম পুত্র সাইফ-উদ-দীন শূরীও ভ্রাতার সঙ্গে গজনী গিয়াছিলেন এবং তিনি সেই জাল হইতে কোন প্রকারে মুক্ত হইয়া ফিরোজ-কোহ্‌তে পলাইয়া আসেন। সেখানে আসিয়াই তিনি ভ্রাতার সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন এবং ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য গজনীর দিকে ধাবিত হন। এসব আমরা গজনীর ইতিহাসেই পড়িয়াছি। গজনীর পতন হইল এবং সুলতান বৈরাম ভারতবর্ষে পালাইয়া গেলেন। শীতকালে তিনি ফিরিয়া আসেন। এই সময় সাইফ-উদ-দীনের অধিকাংশ সৈন্য ফিরোজ-কোহ্ ও ঘুরে চলিয়া গিয়াছিল। পথের দুর্গমতা ও তুষারপাতের জন্য সেখান হইতে তাহাদের আগমন সহজসাধ্য ছিল না। গজনীর অধিবাসীরা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে বৈরামের হস্তে সমর্পণ করে -যাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে— এবং তিনি মন্ত্রীসহ অবমাননাকর মৃত্যুদণ্ড ভোগ করেন।

এই নৃশংস কার্যের প্রত্যুত্তরে ষষ্ঠ ভ্রাতা বাহা-উদ-দীন সাম ফিরোজ-কোহ্ ও ঘুর হইতে সৈন্যবাহিনী লইয়া গজনী আক্রমণ করিতে আসেন। কিন্তু তিনি আকস্মিকভাবে বসন্তরোগে প্রাণত্যাগ করেন। সপ্তম ভ্রাতা আলা-উদ-দীন হোসেন (বিশ্বদাহী আখ্যায়িত) অবশ্য চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং গজনী নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেন। তাহার শত্রুতা এখানেই শেষ হয় না—মাহমুদ, মাসুদ ও ইব্রাহীম ব্যতীত সমস্ত গজনী সম্রাটের প্রতিটি স্মৃতিচিহ্ন তিনি মুছিয়া ফেলেন। মাহমুদ, মাসুদ ও ইব্রাহীমের আমলের সরকারী ইমারতগুলির গাত্রেও যেসব লেখা ছিল, সেসব মুছিয়া ফেলা হয়। ঘুরে ফিরিয়া তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র গিয়াস-উদ-দীন ও মুইজ-উদ-দীন সামকে (অল্পকাল পূর্বে পরলোকগত বাহা-উদ-দীন সামের পুত্র) ঘুর প্রদেশের সানুজ নামক প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন; কিন্তু তাঁহারা দেখিল যে ঐ ক্ষুদ্র এলাকার রাজস্ব দ্বারা শানশওকত বজায় রাখা সম্ভব নয়। তখন তাঁহারা প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে আধিপত্য বিস্তারে প্রয়াসী হইলেন। এইসব ঘটনার কথা আলা-উদ-দীনের কর্ণগোচর হইলে তিনি তাঁহাদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং

উভয়কে ধৃত করিয়া আনিয়া জুজিস্তানের দুর্গে আটক করিয়া রাখেন। নূতন রাজ্যলাভে স্ফীত হইলে আলা-উদ-দীন সুলতান সানজার সেলজুকীকে করদান বন্ধ করিয়াছিলেন—যাহা তাঁহার পিতা বরাবর দিয়া আসিয়াছেন। এমনকি, সুলতান সেলজুকির সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী হন। এতদসত্ত্বেও সুলতান সানজার সেলজুকী তাহাকে তাঁহার রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। ৫৫১ হিজরীতে (১১৫৬ খ্রীঃ) তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্তেকাল করেন।

আলা-উদ-দীনের পরে তাঁহার পুত্র মালিক সাইফ-উদ-দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি রাজ্যাভিষেকের পরেই জুজিস্তানে বন্দী তাঁহার দুই চাচাতো ভাইকে পুনরায় সানজারের শাসনভার ন্যস্ত করেন। বৎসরাধিককাল পরেই মালিক সাইফ-উদ-দীন ঘীজা তুর্কীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন এবং এই সময় সমরক্ষেত্রে তাঁহার নিজের এক সৈন্যের হস্তে তাঁহার প্রাণনাশ হয়।

চাচাতো ভাইদের জ্যেষ্ঠ গিয়াস-উদ-দীন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন এবং তিনি তাঁহার ভ্রাতা মুইজ-উদ-দীন মুহাম্মদ ঘুরীকে সেনানায়ক নিযুক্ত করেন। এই মহান সিপাহ্সালার ভ্রাতার নামে খোরাসান ও ভারতের অনেক স্থান অধিকার করিলে গিয়াস-উদ-দীন সেইসব অঞ্চলকে নিজের রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। ৫৯৯ হিজরীতে গিয়াস-উদ-দীন পরলোক গমন করেন। সে সম্পর্কে পরে বলা হইবে।

গজনী ও ঘুরের তখ্‌তে আরোহণ করিয়া গিয়াস-উদ-দীন তদীয় ভ্রাতা মুইজ-উদ-দীন[৪] মুহাম্মদকে টুকিয়াবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। মুহাম্মদ ঘুরী সেই সময় হইতেই গজনীর উপর আক্রমণ চালাইতে লাগিলেন। এই সময় গজনী সুবুক্তগীনের কয়েকজন বংশধরের হাতে ফিরিয়া আসিয়াছিল। ৫৬৭ হিজরীতে (১১৭১ খ্রীঃ) গিয়াস-উদ-দীন স্বয়ং খসরু মালিকের লোকদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাহাদের নিকট হইতে গজনী পুনরাধিকার করিয়াছিলেন। তিনি ভ্রাতা মুহাম্মদের উপর গজনীর শাসনভার অর্পণ করেন। ৫৭২ হিজরীতে (১১৭২ খ্রীঃ) মুহাম্মদ মুলতানের দিকে সৈন্য চালনা করেন এবং সেই প্রদেশ অধিকার করিয়া উচার[৫] দিকে অগ্রসর হন। উচার রাজা দুর্গে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

৪ মুইজ-উদ-দীন মুহাম্মদ ইতিহাসে মুহাম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত এবং এখন হইতে তাঁহার সেই নামই ব্যবহার করা হইবে।

৫ এই স্থানে প্রাচীরে উঠিবার সময় আলেকজাণ্ডার গুরুতরভাবে আহত হইয়াছিলেন।

কিন্তু মুহাম্মদ ঘুরী বুঝিলেন যুদ্ধ করিয়া এই দুর্গের পতন ঘটানো সহজসাধ্য নয়। সেইজন্য তিনি অন্য পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি গোপনে রাণীর নিকট পত্র লিখিয়া তাঁহাকে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন যে রাজাকে মুহম্মদ ঘুরীর হস্তে সমর্পণ করিলে মুহাম্মদ রাণীকে শাদী করিবেন।

নীচমনা স্ত্রীলোক জানাইলেন যে, তিনি বিগত যৌবনা—নিজের জন্য বিবাহের কথা তিনি ভাবিতেও পারেন না। তবে তাঁহার এক অতি রূপসী তরুণী কন্যা আছে। মুহাম্মদ যদি তাঁহাকে শাদী করিবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন এবং কন্যাকে তাঁহার পিতৃ রাজ্যের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া রাখিয়া যান তাহা হইলে তিনি কয়েক দিনের মধ্যেই রাজাকে গায়েব করিবার ব্যবস্থা করিবেন। মুহাম্মদ ঘুরী এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং রাণী কয়েক দিনের মধ্যেই কোন প্রকারে রাজাকে খুন করাইয়া নগরের তোরণ খুলিয়া দিলেন। মুহাম্মদ আংশিক তাঁহার প্রতিশ্রুতি পালন করিয়াছিলেন। ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিবার পর তিনি রাজকুমারীকে শাদী করেন। কিন্তু কন্যার মাতার সঙ্গে যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহা তিনি অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিলেন। রাণীকে তাঁহার রাজ্য প্রত্যার্পণ করিলেন না। উপরন্তু তাঁহাকে গজনীতে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে দুঃখ ও নিরাশার মধ্যে তাঁহার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। কন্যাও অধিকদিন জীবিত ছিলেন না—দুই বৎসরের মধ্যেই তাহারও দুঃখময় জীবনের অবসান ঘটিয়াছিল।

আলী কির্মানী নামক এক ব্যক্তির উপর মুলতান ও উচার শাসনভার অর্পণ করিয়া মুহাম্মদ ঘুরী গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। ৫৭৪ হিজরীতে (১১৭৮ খ্রীঃ) তিনি মুলতান ও উচায় পুনরাগমন করেন এবং তথা হইতে বালুকাময় মরুপথে গুজরাট গমন করেন। যে ব্রহ্মদেব গুজরাটে মাহমুদকে বাধাদান করিয়াছিলেন সেই ব্রহ্মদেবেরই বংশধর রাজা ভীমদেব এক বিরাট বাহিনী লইয়া মুসলমানদিগকে বাধাদানে অগ্রসর হইলেন এবং তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিয়া দিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদের বহু লোকক্ষয় হইয়াছিল। পলায়নকালে বহু কষ্টভোগ করিয়া মুহাম্মদ কোন প্রকারে গজনী ফিরিয়া আসেন। পর বৎসর (হিজরী ৫৭৫ : ১১৭৯ খ্রীঃ) সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মুহম্মদ ঘুরী পেশোয়ার আসিয়া হাজির হইলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই পেশোয়ার অধিকার করিয়া লইলেন। পর বৎসর (হিঃ ৫৭৬ :

১১৮০ খ্রী:) তিনি লাহোরের দিকে অগ্রসর হন এবং শেষ গজনভী সুলতান খসরু মালিকের রাজ্য আক্রমণ করেন। খসরু মালিক এক সঙ্গে আফগান ও ভারতীয় রাজন্যবর্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিলেন। সমরক্ষেত্রে ঘুরীর মোকাবিলা করিবার মত ক্ষমতা তাহার ছিল না। মুহাম্মদ ঘুরীও দেখিলেন বলপূর্বক লাহোর জয় সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি খসরু মালিকের নিকট সন্ধির প্রস্তাব পাঠাইলেন। খসরু মালিক সানন্দে এই প্রস্তাব গ্রহণ করিলেন এবং সন্ধির শর্ত পালনের জামিনস্বরূপ স্বীয় পুত্র মালিক শাহ্‌কে মুহাম্মদ ঘুরীর হস্তে অর্পণ করিলেন। মুহম্মদ ঘুরী অতঃপর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। কিন্তু পর বৎসরই তিনি সিন্ধু প্রদেশের দিবালের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত সমস্ত দেশ পদদলিত করিয়া বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

৫৮০ হিজরীতে (১১৮৪ খ্রী:) তিনি পুনরায় লাহোর আক্রমণ করেন। খসরু মালিক পূর্বের মতই বহু দিন স্থায়ী অবরোধের জন্য প্রস্তুত হইয়া লাহোর দুর্গের তোরণ বন্ধ করিয়া দেন। মুহাম্মদ ঘুরী শেষ পর্যন্ত অবরোধ উঠাইয়া লইতে বাধ্য হইলেন। এই অভিযান কালে তিনি শিয়ালকোট দুর্গের এবং রাবী ও চেনাবের মধ্যবর্তী এলাকার উপর আধিপত্য অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য এই দুর্গে হোসেন ফারমুলির অধীনে এক দল সৈন্য রাখিয়া তিনি নিজে গজনী প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, পরে খসরু মালিক সাফল্যের সঙ্গে এই দুর্গ অবরোধ ও অধিকার করেন এবং তাহার ফলেই মুহাম্মদ ঘুরী তৃতীয় বার লাহোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন। ৫৮২ হিজরীতে (১১৮৬ খ্রীঃ অঃ) তিনি কৌশলে লাহোর দুর্গ অবরোধ করেন—গজনীর ইতিহাসের উপসংহারে তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। মুহাম্মদ ঘুরী খসরু মালিক ও তাঁহার পরিবার বর্গকে বন্দী অবস্থায় ফিরোজকোহ্‌তে তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস উদ-দীনের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি তাহাদিগকে জুর্জিস্তানের দুর্গে আটক করিয়া রাখেন। কিছুদিন পরে যখন খারিজম শাহের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন সেখানে তাহাদের সকলকে মারিয়া ফেলা হয়। এইরূপে গজনী বংশের শেষ চিহ্নটুকু ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া যায়।

লাহোর প্রদেশের সমস্ত ব্যাপার সুব্যবস্থিত করিয়া মুলতানের শাসনকর্তা আলী কির্মানীর উপর উহার শাসনভার অর্পণ করিয়া মুহাম্মদ ঘুরী গজনী ফিরিয়া যান।

৫৮৭ হিজরীতে (১১৯১ খ্রীঃ) তিনি পুনরায় হিন্দুস্থানে আগমন করেন। এবার তিনি আজমীর অভিমুখে অগ্রসর হইয়া বিতুণ্ডা শহর অধিকার করেন। সেখানে সহস্রাধিক উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক সৈন্যসহ মালিক জিয়া-উদ-দীন তুজুকীকে রাখিয়া মুহাম্মদ ঘুরী স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। দেশে ফিরিবার অব্যবহিত পরেই তিনি সংবাদ পাইলেন যে, আজমীরের রাজা পৃথীরাজ ও তদীয় ভ্রাতা দিল্লীর রাজা চৌয়ান্দ রায় অন্যান্য ভারতীয় রাজাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া দুই লক্ষ অশ্বারোহী ও তিন সহস্র হস্তী লইয়া বিতুণ্ডার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। মুহাম্মদ ঘুরী তাহার সৈন্যবাহিনীর সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ সসৈন্যে রওয়ানা হইলেন এবং শত্রুবাহিনীর মোকাবিলার জন্য বিতুণ্ডা অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেলেন। থানেশ্বর হইতে ১৪ মাইল এবং দিল্লী হইতে ৮০ মাইল দূরে সরস্বতী নদী তীরে নরাইন গ্রামে (বর্তমানে তিরোরী নামে পরিচিত) শত্রুবাহিনীর সাক্ষাৎ লাভ করিলেন। এইখানেই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই মুহাম্মদ ঘুরীর বাম ও দক্ষিণ অংশ পিছু হটিতে আরম্ভ করে এবং শেষ পর্যন্ত উভয় পার্শ্ব পশ্চাতে যাইয়া পরস্পর সংলগ্ন হইয়া পড়ে। ইহাতে মুহম্মদ ঘুরীর বাহিনী বৃত্তাকারে সন্নিবিষ্ট হয়। মুহাম্মদ ঘুরী নিজে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর মধ্যভাগে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার বাহিনীর উভয় পক্ষদেশ পরাভূত হইয়াছে, সেই সংবাদ তাঁহার নিকট আনয়ন করা হইল এবং তাঁহাকে নিজের নিরাপত্তা বিধানের জন্য পরামর্শ দেওয়া হইল। ইহাতে তিনি ক্রোধান্বিত হইয়া পরামর্শদাতাকে তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলিলেন এবং কয়েকজন মাত্র অনুচর লইয়া শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু করিয়া দেন। দূর হইতে মুহম্মদ ঘুরীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই চৌয়ান্দ রায় সেই দিকে হাতী চালাইলেন। তাঁহার মৎলব বুঝিতে পারিয়া মুহাম্মদ ঘুরীও তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া চৌয়ান্দ রায়ের মুখের মধ্যে বর্শা প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ইহাতে তাঁহার অনেকগুলি দাঁত ভাঙ্গিয়া গেল। ইতিমধ্যে দিল্লীরাজও মুহাম্মদের দক্ষিণ বাহুতে তীর বিদ্ধ করিয়া দিলেন। তিনি প্রায় অশ্ব হইতে পড়িয়া যাইতেছিলেন এমন সময় কয়েকজন সেনানায়ক তাঁহাকে সাহায্য করেন এবং মুহম্মদ ঘুরীর এক বিশ্বস্ত ভৃত্য লম্ফ দিয়া তাঁহার পশ্চাতে অশ্বে চাপিয়া বসে। মুহাম্মদ রক্তপাতে সম্বিত হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তবুও তাঁহাকে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে

বাহির করিয়া আনা হইল। তাঁহার সমস্ত বাহিনী তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল। শত্রুরা প্রায় চল্লিশ মাইল পর্যন্ত তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল। এই পরাজয়ের পর লাহোরে তাঁহার ক্ষত সারিলে তাঁহার অধিকারভুক্ত ভারতীয় প্রদেশগুলির জন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া তিনি ঘুরে ফিরিয়া আসেন। যে সমস্ত সেনানায়ক সমরক্ষেত্রে তাঁহাকে ফেলিয়া পলায়ন করিয়াছিল, ঘুরে ফিরিয়া তিনি তাহাদিগকে অপদস্ত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। বালিপূর্ণ ঘোড়ার মুখথলি তাঁহাদের গর্দানে ঝুলাইয়া দেওয়া হইল এবং এই অবস্থায় তাহাদিগকে শহরের চারিদিকে ভ্রমণ করিতে এবং পশুর মত সেই শস্যকণাগুলি খাইতে বাধ্য করা হইল। আমার অধিত সমস্ত কিতাব এক প্রকার বিবরণ প্রদান করিয়াছে। আর হাবিবুস-সিয়ারের লেখক অন্য প্রকার বিবরণ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, মুহাম্মদ ঘুরী আহতাবস্থায় অশ্ব হইতে পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং রাত পর্যন্ত নিহতদের মধ্যেই পড়িয়াছিলেন। তাঁহার কয়েকজন দেহরক্ষী সৈন্য রাত্রির অন্ধকারে তাঁহার মৃতদেহ অনুসন্ধান করিতে যাইয়া তাঁহাকে প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে বহন করিয়া শিবিরে লইয়া আসে।

মুহাম্মদ ঘুরীর পলায়নের পর হিন্দুস্থানের সম্মিলিত বাহিনী বিতুণ্ডার দিকে অগ্রসর হয়। এক বৎসর একমাস বিতুণ্ডা অবরোধ করিয়া রাখিয়াও উহা তাহারা অধিকার করিতে সমর্থ হয় না এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহারা অবরুদ্ধ বাহিনীকে সুবিধাজনক শর্ত প্রদান করিয়া যুদ্ধ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মুহাম্মদ কয়েকমাস তাঁহার ভ্রাতার নিকট ঘুরে বাস করেন। তখন পর্যন্ত তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস-উদ-দীনই সুলতান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। অতঃপর গজনী প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বৎসর আমোদ প্রমোদে কাটাইয়া দেন। তার-পর তুর্কী, তাজিক ও আফগানদের মধ্যে হইতে ১,২০,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কাহারও নিকট উদ্দেশ্য ব্যক্ত না করিয়া গজনী হইতে ভারতাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার সৈন্যদের অনেকের রত্নখচিত শিরস্ত্রাণ এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য খোদিত বর্ম ছিল। তাঁহার বাহিনী পেশোয়ার পর্যন্ত আসিয়া পৌছিলে ঘুরের এক বৃদ্ধ ফকির তাঁহার সম্মুখে ভূমি চুম্বন করিয়া আরম্ভ করিলেন: "হে মহান সুলতান, আপনার চরিত্র ও বিজ্ঞতার উপর আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আপনার উদ্দেশ্য কি, তাহা

এখনও আমাদের নিকট জল্পনা কল্পনার বিষয় হইয়াই রহিল।" উত্তরে মুহাম্মদ ঘুরী বলিলেন: "হে বৃদ্ধ! তবে শোনো, যেদিন হিন্দুস্থানের মাটিতে আমার পরাজয় ঘটিল সেদিন হইতে বাহ্য স্বাভাবিক ভাব প্রদর্শন করিয়া চলিলেও কোন দিন সুখে নিদ্রা যাইতে বা অসহনীয় দুঃখ ও গ্লানিবোধ ব্যতীত জাগিয়া থাকিতে পারি নাই। তাই শপথ গ্রহণ করিয়াছি, আমার এই ফৌজের সাহায্যে পৌত্তলিকদের নিকট হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করিব অথবা সেই প্রচেষ্টায় শাহাদৎ বরণ করিব।" ফকির ইহা শ্রবণে উৎফুল্ল হইয়া পুনরায় ভূমি চুম্বন করিয়া বলিলেন: "বিজয় আপনার সহচর হউক এবং সৌভাগ্য আপনাকে পথ প্রদর্শন করুক। শুধু গোলামের একটি আবেদন মঞ্জুর করুন—যেসব সিপাহ্‌সালারকে ন্যায়সঙ্গতভাবেই লাঞ্ছিত করিয়াছেন, এইবার তাহাদিগকে সেই কলঙ্ক বিমোচনের সুযোগ প্রদান করা হউক।" সুলতান তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন এবং লাঞ্ছিত সেনাপতিদিগকে বন্দীশালা হইতে মুক্তি প্রদানের জন্য গজনীতে সংবাদ প্রেরণ করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার করিতে ইচ্ছুক তাহাদিগকে ফৌজের সঙ্গে যোগদানে অনুমতি প্রদান করিলেন। তদনুযায়ী উঁহারা সকলেই শিবিরে আসিয়া যোগদান করিলেন। ইহাদের প্রত্যেককেই মর্যাদানুযায়ী সম্মানসূচক খেলাৎ প্রদান করা হইল। অতঃপর তিনি লাহোর গমন করেন এবং সেখান হইতে অন্যতম প্রধান আমীর কাওয়ামুল-মুলক-হামজীভীকে আজমীরে দূতরূপে প্রেরণ করেন। তিনি আজমীর-রাজকে সুলতানের পক্ষ হইতে জানাইলেন যে, ভারতবাসীরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণে অসম্মত হইলে মুহাম্মদ ঘুরীর সঙ্গে তাঁহাদের যুদ্ধ অনিবার্য। পৃথিরাজ উত্তরে দাম্ভিকতা-পূর্ণ এক পত্র প্রেরণ করিলেন এবং সেইসঙ্গে প্রতিবেশী রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। মিত্র রাজারা সঙ্গে সঙ্গেই সাড়া দিলেন, ফলে মুহাম্মদ ঘুরীর মোকাবিলার জন্য শীঘ্রই তিন লক্ষ অশ্বারোহী, তিন সহস্র হস্তী এবং বিপুল সংখ্যক পদাতিক সৈন্যসম্বলিত এক বিশাল হিন্দুবাহিনী গঠিত হইল। পূর্ববর্তী সমরক্ষেত্রেই হিন্দুরা মুসলমানদের সাক্ষাৎ লাভের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি শিবির স্থাপন করিল, মাঝখানে রহিল সরস্বতী নদী। বিশাল হিন্দু শিবিরে ৫০ জনের মত রাজপুত রাজা সমবেত হইয়াছিলেন। ইহারা সকলেই গঙ্গা-জল স্পর্শ করিয়া শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, হয় তাঁহারা শত্রুকে ধ্বংস করিবেন

না হয় ধর্মের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করিবেন। তাঁহারা মুহাম্মদকে এই মর্মে পত্র লিখিয়াছিলেন: "আমাদের বীর সেনাদের বীরত্বের পরিচয় আপনি পাইয়াছেন। আমাদের বাহিনীর বিপুল সংখ্যাধিক্য আপনার অগোচর নয় এবং সে সংখ্যা যে প্রতি মুহূর্তে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে সে সম্বন্ধে আপনার চক্ষুই সাক্ষ্য দান করিবে। জীবনের প্রতি আপনার যদি বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইয়াই থাকে, তবুও সৈন্যদের কথা আপনার বিবেচনা করিয়া দেখা উচিৎ এবং তাহাদের জন্য একটু মমতাও থাকা প্রয়োজন—কেননা, তাহারা হয়তো এখনও বাঁচাকেই শ্রেয় মনে করে। সেইজন্য সময় থাকিতে আপনার গোঁয়াড়সুলভ সংকল্পের জন্য অনুতপ্ত হউন এবং এই মারাত্মক সংকল্প ত্যাগ করুন। আমরা আপনাকে নিরাপদে পশ্চাদাপসরণ করিবার সুযোগ প্রদান করিব। আর নিজের দুরদৃষ্টিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য যদি নিতান্তই বদ্ধপরিকর হইয়াই থাকেন, অবহিত হউন, আমরাও দেবতাদের নামে শপথ গ্রহণ করিয়াছি, প্রভাতেই আপনার দুরাকাঙ্ক্ষা কর্তৃক ধ্বংসের মুখে আনীত আপনার সেনাবাহিনীর উপর আমরা আমাদের বূহ্য-বিদীর্ণকারী হস্তী, প্রান্তর পদদলনকারী অশ্ব ও শোনিত পিপাসু যোদ্ধাদের লইয়া ঝাঁপাইয়া পড়িব।"

মুহাম্মদ এইরূপ কূটনৈতিক উত্তর প্রদান করিলেন: "আমি আমার ভ্রাতার আদেশেই ভারতে প্রবেশ করিয়াছি। আমি তাঁহার সেনাপতি মাত্র। তাঁহার কার্যে আপ্রাণ চেষ্টা করিতে আমি ধর্মত: ন্যায়ত: বাধ্য, তাঁহার বিনা অনুমতিতে আমি পশ্চাদপসরণ করিতে অক্ষম। তবে তাহাকে পরিস্থিতি অবগত করাইয়া তাঁহার উত্তর প্রাপ্তি পর্যন্ত যুদ্ধ বিরতি মানিয়া লইতে আমি আগ্রাহান্বিত।" পত্রের উদ্দেশ্য সফল হইল। শত্রুরা ভাবিল মুহাম্মদ ভীত হইয়াছেন। ফলে তিনি যখন তাহাদিগকে অতর্কিতে আক্রমণ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন, তখন তাহারা সারারাত্র মহোল্লাসে কাটাইতে ছিল। সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বেই নদী পার হইয়া চরের উপর মুহাম্মদ তাঁহার সৈন্যদের কাতারবন্দী করিয়া দণ্ডায়মান করিলেন। সংকেত ঘোষিত হইবার পুর্বেই তাঁহার সৈন্যদল শিবিরের কতকাংশে প্রবেশ করিয়া ফেলিল। ইহাতে স্বাভাবিকভাবেই শত্রু-শিবিরে আতঙ্ক ও বিভ্রান্তির সৃষ্টি হইল। কিন্তু হিন্দু শিবির এতো বিশাল ও বিস্তৃত ছিল যে, এক প্রান্তে গোলযোগ সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও অন্যত্র তাহারা তাহাদের অশ্বারোহী

বাহিনীকে সজ্জিত ও সুসংবদ্ধ করিবার যথেষ্ট সময় পাইল। মুসলমানদের অগ্রগতি প্রতিহত হইল এবং পরে হিন্দুরাই চারি সারিতে বিভক্ত হইয়া বিপুলবিক্রমে এবং শৃঙ্খলার সঙ্গে অগ্রসর হইতে লাগিল।

এতদ্দর্শনে মুহাম্মদ ঘুরী তাঁহার সৈন্যদিগকে সুসংহত হইবার নির্দেশ দিলেন এবং চারি দলে বিভক্ত তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে পালাক্রমে অগ্রসর হইয়া শত্রু-বাহিনীর কেন্দ্রে আঘাত হানিতে নির্দেশ দান করিলেন। একজন সম্মুখে যাইয়া তীর বর্ষণ করিয়া পশ্চাতে চলিয়া আসিবে এবং অন্যদল যাইয়া আক্রমণ শুরু করিবে। শত্রু তাহাদের হস্তীবাহিনী লইয়া অতিরিক্ত চাপ প্রয়োগ করিলে তাঁহারা শৃঙ্খলার সহিত ধীরে ধীরে পিছু হটিয়া আসিবে, এইরূপ নির্দেশ রহিল। এই প্রকারেই তিনি সূর্যাস্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করিলেন এবং শৃঙ্খলার সহিত পিছু হটিয়া আসিলেন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে শত্রু যথেষ্ট অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের মনে তিনি জয়লাভের মিথ্যা আশা সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তখন তিনি ইস্পাতের বর্মে আবৃত ১২০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মরণপণ করিয়া শত্রুবাহিনীর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সর্বত্র মৃত্যু ও ধ্বংসের বিভীষিকা সৃষ্টি করিলেন। প্রত্যেক স্থানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইতে লাগিল এবং শেষে সর্বত্র আতঙ্কের সঞ্চার হইল। মুসলমান সৈন্যরা যেন সবেমাত্র তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এইরূপ মনে হইল। ইহারা শত্রুদের মধ্যে এমন প্রলয়কাণ্ড শুরু করিল যে সেই বিশাল অগণিত সৈন্যবাহিনী বিরাট অট্টালিকার ন্যায় একবার মাত্র প্রকম্পিত হইয়াই ধ্বসিয়া পড়িল এবং আপন ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিলীন হইয়া গেল।

দিল্লীর অধিপতি চৌয়ান্দ রায় এবং আরও অনেক হিন্দুরাজা সমর ক্ষেত্রেই নিহত হইলেন। আজমীর-রাজ পৃথীরাজ সরস্বতী নদী তীরে ধৃত হইলেন। পড়ে তাঁহাকে বধ করা হয়। শিবিরের বিপুল সাজসরঞ্জাম এবং কয়েক রাজার ধন-সম্পদ বিজয়ীদের হস্তগত হইল। এই জয়লাভের পরেই সরস্বতী, সামানা, কোরাম ও হান্সীর দুর্গ আত্মসমর্পণ করিল। মুহাম্মদ ঘুরী স্বয়ং আজমীর গমন করিয়া ঐ রাজ্য আপন অধিকারভুক্ত করিলেন। ইহার পূর্বে বাধাদানকারী কয়েক হাজার অধিবাসীকে তলোয়ারের মুখে বিসর্জন দিয়াছিলেন এবং অবশিষ্টকে ক্রীতদাসরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিয়মিত পর্যাপ্ত পরিমাণ কর প্রেরণের

প্রতিশ্রুতিতে পরে তিনি পৃথিরাজের বৈধ সন্তান অর্থাৎ গোলার হস্তে আজমীর প্রত্যার্পণ করেন। অতঃপর তিনি তাঁহার সামরিক শক্তি দিল্লী অভিমুখে পরিচালিত করিলেন। কিন্তু নব-অভিষিক্ত দিল্লীর রাজা তাহাকে প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করিয়া যুদ্ধের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিলেন। এইবার তিনি তাঁহার বিশ্বস্ত গোলাম ও সুহৃদ মালিক কুতুব-উদ-দীন আইবেককে বিরাট বাহিনীসহ কোরাম শহরে অবস্থান করিবার ব্যবস্থা করিয়া নিজে তাঁহার অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া সেবালিক পর্বতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। উহা ভারতের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। গজনী প্রত্যাবর্তনকালে তিনি যেসব দেশের মধ্য দিয়া আসিয়াছিলেন সেসব দেশ লুণ্ঠন ও ছারখার করিয়া আসিয়াছিলেন। মুহাম্মদ ঘুরীর প্রস্থানের পরেই তাঁহার সেনাপতি মালিক কুতুব-উদ-দীন আইবেক মিরাট দুর্গ অধিকার করেন এবং চৌয়ান্দ রায়ের বংশধরদের নিকট হইতে দিল্লী কাড়িয়া লইয়া তাহা নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। এই কারণেই বিদেশীরা বলিয়া থাকে যে, এক ক্রীতদাস কর্তৃক দিল্লী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ৫৮৯ হিজরীতে (১১৯৩ খ্রীঃ) তিনি কোলের দুর্গও অধিকার করেন এবং দিল্লীতে তাহার কার্যালয় স্থাপন করিয়া সেখানে নিজেকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি চতুষ্পার্শ্বস্থ সমস্ত অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করেন।

ইত্যবসরে মুহাম্মদ ঘুরী গজনী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া কনৌজাভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং কনৌজ ও বেনারসের রাজা জয়চাঁদের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। শতাধিক হস্তী ছাড়াও জয়চাঁদের অধীন অসংখ্য অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। জয়চাঁদ চান্দরায় ও এতোয়ারের মধ্যবর্তী প্রান্তরে তাঁহার সৈন্য বাহিনী লইয়া উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে তিনি কুতুব-উদ-দীন আইবেক কর্তৃক পরিচালিত অগ্রগামী মুসলমান বাহিনীর নিকট অবিশ্বাস্যভাবে পরাভূত হইলেন এবং হস্তী ও সরঞ্জামাদি হারাইলেন। মুহাম্মদ ঘুরী অতঃপর অশ্বিনী দুর্গে হানা দিলেন—যেখানে জয়চাঁদ তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন মজুদ রাখিয়াছিলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি এই দুর্গ অধিকার করিলেন এবং সেখানে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান প্রস্তর প্রাপ্ত হইলেন। তিনি এই স্থান হইতে বেনারসের দিকে ধাবিত হইলেন এবং সেখানে সহস্রাধিক মন্দিরের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ও অপসারণ করিয়া সেইসব দেবালয়কে প্রকৃত আল্লার এবাদতের জন্য নির্ধারিত

করিলেন। সেখান হইতে তিনি কোলের দুর্গে প্রত্যাবর্তন করিয়া কুতুব-উদ-দীন আইবেককে তাঁহার ভারতীয় রাজ্যের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিলেন। অতঃপর প্রচুর ধনরত্ন ভারাক্রান্ত সুলতান বাহিনী গজনীর পথে রওয়ানা হইল।

ইতিমধ্যে পৃথীরাজের অন্যতম আত্মীয় হেমরাজ পৃথীরাজের বৈধ সন্তান গোলাকে আজমীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। গোলা সঙ্গে সঙ্গেই কুতুব-উদ-দীন আইবেকের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তিনি ৫৯১ হিজরীতে (১১৯৪ খ্রীঃ) দিল্লী হইতে হেমরাজের বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। হেমরাজ মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া রাজ্য ও প্রাণ দুই-ই হারাইলেন। এই ঘটনার পর কুতুব-উদ-দীন রাজাকে পরিচালিত করিবার জন্য একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া গুজরাটের রাজধানী নেহরওয়ালাভিমুখে সৈন্য চালনা করেন এবং গুজরাটের রাজা ভীমদেবকে পরাভূত করিয়া মালিকের পূর্ব পরাজয়ের উপযুক্ত প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই সমৃদ্ধ দেশে কিছুকাল অবস্থান করিয়া কুতুব-উদ-দীন এই দেশে যথেচ্ছ লুট-তরাজ করেন এবং পরে গজনী হইতে দিল্লী ফিরিবার তাগিদ আসিলে তিনি তৎক্ষণাৎ দিল্লীর পথে রওয়ানা হন।

পর বৎসর মুহাম্মদ ঘূরী হিন্দুস্থানে পুনরাগমন করেন এবং বিয়ানা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া উহা অধিকার করেন। বাহা-উদ-দীন তোগরলের উপর ইহার শাসনভার অর্পণ করেন এবং তাঁহাকে গোয়ালিয়র অবরোধ করিবার হুকুম প্রদান করিয়া কতকগুলি ব্যাপারে সুরাহা করিবার জন্য মুহাম্মদ ঘূরী গজনী ফিরিয়া যান। ইতিমধ্যে দীর্ঘকাল অবরোধের পর মুসলমানদের হস্তে দুর্জয় গোয়ালিয়র দুর্গের পতন ঘটিল। বিজিত রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষায় কুতুব-উদ-দীন আইবেক রাজপুতনা আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সেখানে তিনি ভীষণভাবে পরাস্ত হইয়া আজমীরের দুর্গে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। ৫৯৩ হিজরীতে (১১৯৬ খৃঃ) দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া গুজরাটের নেহরওয়ালা ও উহার আওতাধীন সমস্ত অঞ্চল জয় করেন। সেখান হইতে ফিরিয়া তিনি কালিঞ্জর কাল্পি ও বাদায়ুন দুর্গ অধিকার করেন।

এই সময় মুহাম্মদ ঘূরী পশ্চিমে তুস ও সুরুখ্‌সে যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। সেইখানে তিনি তাঁহার ভ্রাতা গিয়াস-উদ-দীনের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া-

ছিলেন। গিয়াস-উদ-দীন অনেক পূর্বেই সাম্রাজ্যের উপর সমস্ত কর্তৃত্ব হারাইয়া কেবল নামমাত্র সুলতান ছিলেন। সুতরাং মুহাম্মদ ঘুরী এক প্রকার বিনা বাঁধায় তাহার উত্তরাধিকারী হইলেন। তিনি বাখিজের পথে গজনী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং পথে সেলজুকদের হস্ত হইতে খারিজমের কিয়দংশ পুনরুদ্ধার করেন। নব-বিজিত অঞ্চলগুলি তিনি তাঁহার পরিবারের কয়েক ব্যক্তির মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতার জামাতা ও ভাগিনেয় মালিক জিয়া-উদ-দীনকে ফিরোজকোহ্ ও ঘুরের শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন। ভ্রাতুষ্পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদকে প্রদান করেন বুস্ট, ফারাহ্ ও ইস্ফারাহ এবং হিরাট ও তাহার অধীন এলাকার শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন অন্যতম ভাগিনেয় নাসির-উদ-দীনকে।

গজনী প্রত্যাবর্তন করিবার পর তাঁহার পরলোকগত ভ্রাতার অন্তিম ইচ্ছা অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে মুহাম্মদ ঘুরীর মস্তকে তাজ পারাইয়া তাঁহাকে তখ্তে আরোহণ করানো হইল। এই বৎসরই তিনি মার্ভের সুলতান মুহাম্মদ জিরাকের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন এবং আগামী বৎসরের প্রথম দিকেই খারিজম বিজয় সমাপ্ত করিবার জন্য বহির্গত হন। সমরক্ষেত্রে তাঁহার মোকাবিলা করিতে অক্ষম বিধায় খারিজমের সুলতান রাজধানীতে আশ্রয় লইলেন। শহরের পশ্চিম দিকে খনন করা যে বৃহৎ খালটি ছিল মুহাম্মদ ঘুরী তাহারই কিনারায় শিবির স্থাপন করিলেন এবং কালক্ষয় না করিয়া শহরের উপর হাম্লা শুরু করিয়া দিলেন। শহরের প্রাচীরে আরোহণ করিবার সময় তাঁহার বহু সাহসী সেনাপতি ও যোদ্ধা প্রাণ হারাইল।

এই সময় খবর আসিল যে খাট্টার সুলতান গুরখানের সেনাপতি কারাবেগ ও ওছমান খান সমরকন্দী বিরাট বাহিনী লইয়া খারিজম শাহের সাহায্যার্থে ছুটিয়া আসিতেছেন। কিন্তু শহর অধিকারের সংকল্প পরিত্যাগ করিতে মুহাম্মদ ঘুরী রাজী ছিলেন না এবং তিনি অযথা পশ্চাদপসরণ বিলম্বিত করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মিত্রবাহিনী এত নিকটে অসিয়া পৌঁছিল যে শেষ পর্যন্ত মুহাম্মদ ঘুরী সমস্ত সাজসরঞ্জাম ছুড়িয়া ফেলিয়া উর্ধ্বশ্বাসে খোরাসানের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। সেই প্রদেশের সৈন্যরাও তাহাকে তাড়া করিল এবং তাঁহার বাহিনীর অতি নিকটে অসিয়া পড়ায়

তিনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু এই যুদ্ধে তিনি সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হইলেন। তাঁহার সমস্ত হস্তী ও ধনরত্ন শত্রুর হস্তগত হইল। ওদিকে পুর্বোক্ত মিত্র বাহিনী ভিন্ন পথে সম্মুখে আসিয়া তাঁহার গজনী প্রর্ত্যাবর্তনের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল এবং তাহাকে সৈন্ত বেষ্টনীর মধ্যে আটকাইয়া ফেলিল।

এইরূপে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া এবং বিপুল সংখ্যাধিক বাহিনীর মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া তিনি মরিয়া যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার প্রাক্তন সেনাবাহিনীর মাত্র একশত যোদ্ধা অবশিষ্ট রহিল এবং উহারা তখনও তাহাদের সুলতানকে রক্ষা করিয়া যাইতে লাগিল। এমতাবস্থায়ই এই ক্ষুদ্রদল লইয়া শত্রুবাহিনীর মধ্যে দিয়া পথ কাটিয়া তিনি বাহির হইয়া আসিলেন এবং নিরাপদে সমরক্ষেত্রের অনতিদুরে অবস্থিত আন্দখু দুর্গে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এখানেও তিনি অবরুদ্ধ হইলেন এবং ওছমান খান সমরকন্দীকে প্রচুর ক্ষতিপুরণ প্রাদান ও আন্দখু দুর্গ সমর্পণ করিবার পর তিনি নিরাপদে নিজ রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন। মুহাম্মদ ঘুরী যখন পরাস্ত ও পর্যদুস্ত হন সেই সময় তাঁহার অন্যতম সেনাপতি জিরাক যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন এবং প্রভুর মৃত্যু হইয়াছে অনুমান করিয়া সোজা মুলতান চলিয়া আসেন। তিনি মুলতানের শাসনকর্তা আবু দাউদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন এবং বলিলেন, তিনি সুলতানের নিকট হইতে এক অতি গোপনীয় সন্দেশ বহন করিয়া আনিয়াছেন। নিঃসন্দিগ্ধ আমীর দাউদ তাঁহাকে খাস কামরায় লইয়া গেলেন। সেখানে আততায়ী জিরাক তাঁহার কর্ণে অস্ফুটে কিছু বলিবার ভাণ করিয়া তাঁহার দেহ সংলগ্ন হইলেন এবং ক্ষিপ্রহস্তে খঞ্জর বাহির করিয়া আমীর দাউদের হৃদপিণ্ডে প্রবেশ করাইয়া দিলেন। ইহার পর প্রাঙ্গণে ছুটিয়া আসিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিলেন যে, সুলতানের আদেশক্রমেই তিনি বিশ্বাসঘাতক আমীর দাউদকে কতল করিয়াছেন। একটা জাল ফরমান ও সনদ দেখাইয়া শাসনকর্তার পদ হস্তগত করিলেন। সেনবাহিনী ও জনসাধারণ তাঁহাকে নিঃসংশয়ে স্বীকার করিয়া লইল।

সুলতানের মৃত্যুর সংবাদ শ্রবণ ও বিশ্বাস করিয়া গোক্কর নামে পরিচিত পার্বত্য জাতির এক সর্দার স্বাধীনতা অর্জনের নেশায় মাতিয়া উঠিল এবং

বহু সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ঝিলাম ও সোহ্রার মধ্যবর্তী অঞ্চলকে শ্মশানে পরিণত করিয়া লাহোরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মুহাম্মদ ঘূরী এই সময় মিত্রশক্তির অনুমতিক্রমে আন্দ্‌খু দুর্গ ত্যাগ করিয়া গজনী প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার অন্যতম গোলাম পূর্বাহ্নেই শহর দখল করিয়া লইয়াছিলেন এবং মুহাম্মদ ঘূরীকে প্রবেশ কালে বাধাদান করিলেন। ইহাতে বাধ্য হইয়াই সুলতানকে মুলতানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইতে হইল। বলা বাহুল্য, এইখানেও তিনি বিদ্রোহী জিরাক কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হইলেন। এই সময় মুহাম্মদ ঘূরীর অধিকাংশ বন্ধুবান্ধব আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করায় তাঁহার দল বেশ ভারী হইল এবং তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে সুলতানের চূড়ান্তভাবে জয়লাভ ঘটিল এবং বিশ্বাসঘাতক বন্দী হইল। ভারতের সীমান্ত এলাকার সমস্ত ফৌজ তাঁহার সহিত যোগদান করিল। তখন তিনি সেই সৈন্যবাহিনী লইয়া গজনীর দ্বারে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি নির্বিঘ্নে গজনীর অধিকার প্রাপ্ত হইলেন এবং শহরবাসীদের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁহার বিদ্রোহী গোলামকে মার্জনা করিলেন। অতঃপর মুহাম্মদ ঘূরী খারিজমের সুলতানের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সম্পাদন করিয়া গোক্করদিগকে শায়েস্তা করিবার মানসে ভারতের দিকে ধাবিত হইলেন। প্রভুর সাহায্যে কুতুব-উদ-দীন আইবেক দিল্লী হইতে বহির্গত হইলেন এবং তিনি পূর্ব দিক হইতে এবং সুলতান নিজে পশ্চিম দিক হইতে গোক্করদিগকে আক্রমণ করিলেন। গোক্করা পরাস্ত ও ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। তাহাদের হস্ত হইতে লাহোর পুনরাধিকৃত হওয়ার পর কুতুব-উদ-দীন আইবক তাঁহার রাজধানী দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। নিলাব নদীর উভয় পার্শ্বস্থ অঞ্চলে গোক্করা বাস করিত এবং নদী বরাবর ইহাদের বাসভূমি সেবালিক পর্বত শ্রেণীর পাদদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মুহাম্মদ ঘূরীর লাহোর অবস্থান কালে এই গোক্করা মুসলমানদের উপর অশ্রুতপূর্ব অমানুষিক অত্যাচার করে এবং পেশোয়ার ও মুলতান প্রদেশের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। এই গোক্করা ছিল ধর্ম ও নীতিজ্ঞান বিবর্জিত এক অসভ্য বন্য জাতি। তাহাদের মধ্যে এক অতীব নিষ্ঠুর প্রথার প্রচলন ছিল—স্ত্রী সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে উহারা এক হাতে সেই শিশু ও অন্য হাতে এক ছুরিকা লইয়া গৃহদ্বারে আসিয়া উচ্চঃস্বরে ঘোষণা করিত যে, কাহারও স্ত্রীর প্রয়োজন থাকিলে সে উহাকে লইয়া যাইতে পারে।

কেহ গ্রহণ না করিলে তখনই তাহাকে মারিয়া ফেলা হইত[৬]। ফলে তাহাদের মধ্যে পুরুষাপেক্ষা স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল অনেক কম এবং এক-স্ত্রীকে এক সঙ্গে কয়েকজন স্বামী রাখিতে হইত। স্ত্রীর ঘরে যখন তার কোন এক স্বামী প্রবেশ করে তখন স্ত্রী দরজায় একটি চিহ্ন দিয়া রাখিত।[৭] অন্য স্বামীদের কেহ ঐ চিহ্ন দেখিতে পাইলে সরিয়া পড়িত এবং উহা অপসৃত না হওয়া পর্যন্ত দূরে থাকিত। এই অসভ্য সম্প্রদায়ের লোকেরা মুসলমানদের উপর ক্রমাগত চড়াও হইতে থাকে। শেষে এই সুলতানের রাজত্বের শেষের দিকে তাহাদের সর্দার মুসলমানদের হস্তে বন্দী হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। ইসলাম ধর্ম গ্রহণের পর সুলতান তাহাকে মুক্তিদান করেন এবং তাঁহার অনুগামীদিগকে মুসলমান করিবার কার্যে তাহাকে উৎসাহিত করেন। সেই সঙ্গে তিনি তাহাকে মূল্যবান পোশাক ও উপাধিদানে সম্মানিত করেন এবং তাহাকে পার্বত্য জাতির সর্দারের পদে পুনর্বহাল করেন। ধর্ম সম্বন্ধে এই পার্বত্য জাতির কোন ধারণাই ছিল না, ফলে তাহাদের অধিকাংশ লোকই নির্বিবাদে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল। এই সময়েই গজনী ও সিন্ধুর মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে যেসব বিধর্মী বাস করিত তাহাদের কাহাকেও বলপূর্বক, কাহকেও গায়ে হাত বুলাইয়া ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়। বর্তমানে ১০১৮ হিজরী (১৬০৯ খ্রীঃ) পর্যন্ত তাহারা ইসলাম ধর্মই পালন করিয়া আসিয়াছেন।

ভারতের সমস্ত বিষয়ে সুবন্দোবস্ত করিয়া ৬০২ হিজরীতে (১২০৫ খ্রীঃ) মুহাম্মদ ঘুরী লাহোর হইতে বহির্গত হইয়া গজনীর পথ ধরেন। তৎপূর্বে তিনি তাঁহার আত্মীয় বাহা-উদ-দীনকে বামিয়ানের শাসনকর্তার পদ প্রদান এবং তাঁহাকে এইরূপ নির্দেশদান করিয়া যান যে, সুলতান যখন তুর্কীস্তানের দিকে রওয়ানা হইবেন (অতিশীঘ্রই তিনি রওয়ানা হইবেন এইরূপ স্থির করিয়াছিলেন)

৬ ইহাদের মধ্যে এই প্রকার শিশুহত্যা প্রাচীন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছিল। সিথিয়ানরা ভারতে প্রবেশ করিয়া খুব সম্ভব এই প্রথার প্রচলন করিয়াছিল। আমার বিশ্বাস, একাধিক স্বামী এক সঙ্গে রাখিবার প্রথা বর্তমানে শুধু ভারতের পশ্চিমাঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে।

৭ দ্বারে পরিত্যক্ত পাদুকা এশিয়ার সমস্ত দেশে আগন্তুকের উপস্থিতি নির্দেশ করে।

তখন বাহা-উদ-দীনও বামিয়ানের সমস্ত ফৌজ লইয়া জাইহুন নদীর তীরে (আক্সাস নদী) যাইয়া শিবির স্থাপন করিবেন এবং পরবর্তী আদেশের প্রতীক্ষা করিবেন। ঐ নদীর উপর সেতু নির্মাণের আদেশও তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই অভিযান আরম্ভ করা মুহাম্মদ ঘুরীর ভাগ্যে ছিল না।

২রা সাবান (হিঃ ৬০২ : মার্চ ১৪, ১২০৬ খ্রীঃ) মুহাম্মদ ঘুরী সিন্ধু নদের তীরে রোহ্‌টাক্ গ্রামে আসিয়া পৌঁছেন। সেখানে ২০ জন গোক্কর গত যুদ্ধে মুসলমানদের হাতে নিহত হওয়ায় আত্মীয়দের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ-মানসে তাহারা মুহাম্মদ ঘুরীর প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করে এবং ভীষণ ষড়যন্ত্র কার্যকরী করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকে। তখন আবহাওয়া গুমট উষ্ণভাব ধারণ করিয়াছিল। কক্ষে অবাধ বায়ু প্রবেশের জন্য মুহাম্মদ ঘুরী শাহী তাঁবুর চতুর্দিকে চতুর্ভুজাকারে ঝুলানো পর্দা সরাইয়া ফেলিবার হুকুম দেন। ইহাতে আততায়ীদের শয়ন প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত দেখিবার সুযোগ উপস্থিত হইল। রাত্রিকালে তাহারা তাঁবু পর্যন্ত আসিয়া আত্মগোপন করিল এবং একজন তাঁবুর দরজা পর্যন্ত অগ্রসর হইল। তথায় এক শাস্ত্রী তাহাকে বাধাদান এবং ধরিবার চেষ্টা করিলে সে তাহার বক্ষে আমূল ছুরিকা প্রবেশ করাইয়া দেয়। মুমূর্ষু আহত লোকটির চীৎকারে দেহরক্ষীর নিদ্রাভঙ্গ হয় এবং কি ঘটিয়াছে দেখিবার জন্য সে বাহিরে ছুটিয়া আসে। অন্য আততায়ীরা সেই সুযোগে তাঁবু কাটিয়া ভিতরে ঢুকিয়া পড়ে। সুলতান তখন নিদ্রামগ্ন ছিলেন এবং দুইজন গোলাম তাঁহাকে বাতাস করিতেছিল। গোক্করদিগকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া তাহারা ভয়ে প্রস্তরবৎ হইয়া দণ্ডায়মান রহিল। গোক্কররা ইতস্ততঃ না করিয়া সুলতানের দেহে ছুরিকাঘাত করিল। পরে তাঁহার দেহে বাইশটা জখম পাওয়া গিয়াছিল।

এইরূপে ৬০২ হিজরীতে গজনীতে শাসনকর্তা নির্বাচনের সময় হইতে ৩২ বৎসর পরে এবং সিংহাসনারোহণের পর তিন বৎসর রাজ্য শাসনান্তে সুলতান মুইজ-উদ-দীন মুহাম্মদ ঘুরীর জীবনাবসান ঘটে। উজির খাজা-উল-মুল্‌ক্ আততায়ীদের কয়েকজনকে ধরিয়া নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। তারপর তিনি সেনাধ্যক্ষগণকে একত্রিত করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে চারিশত উষ্ট্র বোঝাই সুলতানের ধনরত্ন রক্ষার প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন। ফৌজ ও গোলামদের দ্বারা সুলতানের এই বিপুল ধনরাশি লুণ্ঠনের অভিসন্ধিকে উজির এইরূপে ব্যর্থ করিয়া দেন।

মৃতদেহ বহন করিয়া তাহারা গজনীর পথে রওয়ানা হইল। কিন্তু সেনাবাহিনী পেশোয়ার পৌছিলেই উত্তরাধিকারীত্ব লইয়া বিবাদ বাধিল। ঘুরের সর্দাররা সুলতানের চাচাতো ভাই আইজ-উদ-দীন হোসেনের সপ্ত-পুত্রের অন্যতম বামিয়ানের শাসনকর্তা বাহা-উদ-দীনের জন্য উত্তরাধিকারিত্ব দাবী করিল। অপর-পক্ষে উজির ও সুবিধাবাদী তুর্কী সেনাপতিরা মুহম্মদ ঘুরীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা প্রাক্তন সুলতান গিয়াস-উদ-দীনের পুত্র মাহমুদের পক্ষে রায় দিলেন। উজির কার্মানের পথে যাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কারণ, তিনি জানিতেন কার্মানের তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ মাহমুদের সমর্থক এবং আশা করিলেন তাঁহার সাহায্যে অন্ততঃ কোষাগারটা তাঁহার নিজের দলের জন্য অধিকার করিতে পারিবেন। কিন্তু ঘুরের সর্দাররা বামিয়ানের অতি নিকট দিয়া যে পথ আছে সেই পথে গমন করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। উদ্দেশ্য, ঐ পথে গমনকালে বাহা-উদ-দীন তাহাদের সাহায্যে আসিতে পারিবেন। দুই পক্ষ এই ব্যাপারে প্রকাশ্য বিবাদের সম্মুখীন হয়। শেষ পর্যন্ত উজিরের প্রস্তাবই সকলে মানিয়া লয়।

পথে পার্বত্য অধিবাসীদের হস্তে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া তাহারা শেষ পর্যন্ত কার্মান পৌছিলে তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ উজিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগাইয়া আসেন এবং সুলতানের কাফন দর্শনে শোকাবেগে আত্মহারা হইয়া বর্ম খুলিয়া ফেলেন এবং মস্তকে ধূলি মাখিতে থাকেন। জানাযায় শরীক হইবার জন্য তিনি গজনী চলিয়া আসেন। সেখানে ২২শে সাবান হিজরী ৬০২ (এপ্রিল, ১২০৬ খ্রীঃ) তাঁহার কন্যার জন্য নির্মিত গোরে সুলতানকে দাফন করা হয়। এই সুলতান যে ধন-দৌলৎ রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহা প্রায় অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। তাঁহার দৌলতের নমুনাস্বরূপ আমরা শুধু এইটুকু উল্লেখ করিব যে বিভিন্ন আকারের হীরকই শুধু ছিল ৫০০ শত মান্‌স (চারিশত পাউণ্ড)। হিন্দুস্থানে নয়টি অভিযানের ফল এগুলি। দুইটি ব্যতীত প্রত্যেক অভিযানেই তিনি হিন্দুস্থান হইতে বিপুল ধন-রত্ন ভারাক্রান্ত হইয়া ফিরিয়াছিলেন।

মুহাম্মদ ঘুরী ন্যায়পরায়ণ, আল্লাহ্-ভীরু এবং প্রজাবৎসল নরপতি ছিলেন। প্রজাদের মঙ্গল চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে সদা জাগ্রত থাকিত। বিদ্বান ও খোদাভক্ত লোকদের প্রতি তাঁহার বিশেষ নজর ছিল এবং তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে তিনি কখনও কার্পণ্য করিতেন না।

কুতুব-উদ-দীন আইবেক

[মুহাম্মদ ঘুরীর অন্যতম তুর্কী ক্রীতদাস। তাঁহার পূর্ব জীবনী ও ইতিহাস। ভারতীয় রাজ্যের শাসনকর্তা মনোনীত। হানসীতে হিন্দুগণ কর্তৃক অবরুদ্ধ। হিন্দুদের পরাজয় এবং তথা হইতে বিতাড়িত। পেশোয়ারে আগত মুহাম্মদ ঘুরীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য হান্‌সী হইতে যাত্রা। অভিযান পুনরারম্ভ। মুহাম্মদ ঘুরী কর্তৃক কুতুব-উদ-দীনকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন। শ্বেতহস্তী উপহার প্রাপ্ত। রাজার নিকট হইতে আজমীর কাড়িয়া লইয়া পৃথীরাজের বৈধ সন্তানকে (গোলা) প্রদান। আত্মীয় হেমরাজ কর্তৃক গোলাকে বহিষ্কার। অন্যায়ছলে দখলকারীকে দমন করিবার জন্য কুতুব-উদ-দীনের আগমন। হেমরাজের পরাজয়। আজমীর মুসলমানদের করদরাজ্যে পরিণত। কুতুব-উদ-দীনের গুজরাট আক্রমণ। হিন্দুদিগকে পরাজিত করিয়া হান্‌সীতে প্রত্যাবর্তন। কোহ্‌রাম ও দিল্লী পরিদর্শন। আজমীর পুনরুদ্ধারের জন্য গুজরাট ও নাগোর-রাজের যোগসাজস। তাহাদিগকে বাধাদানে অগ্রসর হইয়া কুতুব-উদ-দীন পরাস্ত ও গুরুতরভাবে আহত। মিত্র-বাহিনীর আজমীর অবরোধ। গজনী হইতে সাহায্যকারী বাহিনীর আগমন। অবরোধ উঠাইয়া শত্রুদের পলায়ন। কুতুব-উদ-দীনের আবুগড় পর্যন্ত হিন্দুদের পশ্চাদ্ধাবন। রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের শুরু: পঞ্চাশ হাজার হিন্দু নিহত। তাঁহার গুজরাট গমন এবং ঐ দেশ অধিকারের জন্য এক সেনাপতিকে নিযুক্তিকরণ। মুসলমানদের কালিঞ্জর অবরোধ ও অধিকার। মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীর উপর বিহার অধিকারের দায়িত্ব অর্পণ। মুহাম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী কর্তৃক কুতুব-উদ-দীনকে রাজকীয় নিদর্শনাদি প্রেরিত। লাহোরে তাঁহার অভিষেক এবং ভারতীয় মুসলমান সাম্রাজ্যের সুলতান উপাধি গ্রহণ। তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজের তাঁহার বিরুদ্ধে আগমন। যুদ্ধে তাজ-উদ-দীনের পরাজয়। কুতুব-উদ-দীন কর্তৃক গজনী পর্যন্ত তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন। গজনীতে পুনরায় তাঁহার অভিষেক। তাঁহার গজনী হইতে বহিষ্কৃতি এবং ভারতে প্রত্যাগমন। কুতুব-উদ-দীনের মৃত্যু ও চরিত্র। তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজের জীবনী।]

কুতুব-উদ-দীন সাহসী ও ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। তিনি বন্ধুদের নিকট ছিলেন উদার ও দিলখোলা এবং অপরিচিতের নিকট ছিলেন সৌজন্য ও শিষ্টাচারপূর্ণ। যুদ্ধবিদ্যায় ও শাসনকার্য পরিচালনায় তিনি কাহারও তুলনায় নিকৃষ্ট ছিলেন না এবং সাহিত্যেও তাঁহার বেশ দখল ছিল। বাল্যকালে এক সওদাগর তাঁহাকে তুর্কীস্তান হইতে নিশাপুর লইয়া আসিয়া ফকর-উদ-দীন-বিন

আবদুল আজিজ কুফীর নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মধ্যে খোদাদত্ত প্রতিভার পরিচয় পাইয়া কুফী তাঁহাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়া দেন। তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় এবং বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। এই সময় তাঁহার মালিক ও অভিভাবক সহসা মারা যান। তখন সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক যাহারা হইল তাহারা সম্পত্তির অংশ হিসাবে তাঁহাকেও বিক্রয় করিলেন। এক ধনী সওদাগর তাঁহাকে উচ্চ মূল্যে ক্রয় করিয়া বিক্রয়ের জন্য মুইজ-উদ-দীন মুহাম্মদ ঘুরীর নিকট আনয়ন করেন।

সুলতান তাঁহাকে ক্রয় করিলেন এবং তাঁহার কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ভগ্ন ছিল বলিয়া তাঁহাকে আইবেক[১] নামে অভিহিত করিলেন। আইবেক তাঁহার আচরণ দ্বারা নূতন মালিকের এমনভাবে তুষ্টিবিধান করিলেন যে তাঁহার উপর মালিকের নজর পড়িল এবং তাঁহার প্রতি মালিকের আস্থা ও অনুগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক রাত্রে মালিক দরবারে এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করেন এবং সেখানে ভৃত্যদের মধ্যে প্রচুর পুরস্কার বিতরণের আদেশ করেন। আইবেকও সেই দান গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু ঘরে ফিরিয়াই তিনি তাঁহার হিস্সা সঙ্গীদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। এই কথা সুলতানের কর্ণগোচর হইলে তিনি আইবেককে ডাকিয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। আইবেক ভূমি চুম্বন করিয়া নিবেদন করেন, "হুজুরের বদান্যতায় আমার সকল অভাব পর্যাপ্তভাবে পূরণ হইয়াছে। বাহুল্য দ্বারা নিজেকে ভারাক্রান্ত কবিবার ইচ্ছা আমার নাই। হুজুরের অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকিলে আমার আর অতিরিক্ত কিছুরই প্রয়োজন নাই।" তাঁহার এই জওয়াবে সুলতান এতদূর প্রীত হইলেন যে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে এমন একটি কর্ম প্রদান করিলেন যাহার ফলে তিনি সর্বদা সুলতানের কাছাকাছি থাকিতে পারেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি তাঁহাকে আমির-ই-আখুর বা অশ্বশালার তত্ত্বাবধায়কের পদ প্রদান করেন।

খারিজম সুলতানকে খোরাসান হইতে বহিষ্কৃত করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে যেসব অভিযান প্রেরিত হইয়াছিল, সেইসবের কোন একটিতে আইবেক ছিলেন এবং তিনি খুরখাব নদী তীরে ঘাস সংগ্রহকারী দলের নেতৃত্ব করিতেছিলেন।

১ বল্‌খ ও ঘোরের পথে—ঐ দুই স্থানের সমদূরবর্তী এক জায়গায় ঐ নামের একটি শহর আছে।

এইখানে তিনি একদল শত্রু কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া পড়েন। তিনি তাঁহার দলকে রক্ষা করিবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং শেষ পর্যন্ত দলের অধিকাংশ লোকের মৃত্যুর পর তিনি শত্রু হস্তে বন্দী হন। তাঁহাকে খারিজম সুলতানের সম্মুখে হাজির করা হইলে তিনি তাহার পায়ে শিকল পরাইবার হুকুম দেন। কিছুদিন পরে খারিজম সুলতানের পরাজয়ের পর আইবেককে মাঠে উটের উপর উপবিষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়। তাঁহাকে প্রাক্তন প্রভুর নিকট আনয়ন করা হয় এবং তিনি তাঁহাকে সদয়ভাবে গ্রহণ করেন।

৫৮৮ হিজরীতে মুহাম্মদ ঘুরী তাঁহার দুশ্‌মন হিন্দুদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার পর বিজিত রাজ্য রক্ষার্থে যে ফৌজ নিয়োজিত রাখিয়া যান, আইবেককে তাঁহার সিপাহসালারের পদ প্রদান করেন। এই সময় তাঁহাকে কুতুব-উদ-দীন (ধর্মের স্তম্ভ) খেতাব প্রদান করা হয়। এই কার্যে নিযুক্ত থাকাকালে তিনি পার্শ্ববর্তী অনেক স্থান দখল করেন এবং মিরাটের দুর্গ জয় করেন। তিনি দিল্লীও অবরোধ করেন। কিন্তু শত্রুরা অবরোধকারীদের অপেক্ষা সংখ্যায় এত অধিক ছিল যে তাহারা নগর হইতে বহির্গত হইয়া অবরোধকারীদিগকে আক্রমণ করাই সমীচীন মনে করে। সংঘর্ষে উভয় পক্ষেই বহু রক্তপাত হইল এবং যমুনার পানি রক্তে লাল হইল। অবশেষে পরাজিত হইয়া রাজপুতরা পুনরায় প্রাচীরের অন্তরালে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিল। দীর্ঘস্থায়ী অবরোধের পর দুর্গাভ্যন্তরস্থ সেনাদল আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল।

৫৮৯ হিজরীতে গুজরাটের নেহরওয়ালার রাজার সেনাপতি জীবন রায় এক সৈন্যবাহিনী লইয়া আসিয়া হান্‌সী অবরোধ করেন। দুর্গ রক্ষার্থ কুতুব-উদ-দীন তাঁহার ফৌজ লইয়া ছুটিয়া আসিলেন এবং জীবন রায়কে অবরোধ উঠাইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করিলেন। কুতুব-উদ-দীনের সেনাদল গুজরাট বাহিনীকে সীমান্ত পর্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। পর বৎসর তিনি যমুনা অতিক্রম করিয়া পরপাড়ে অবস্থিত কোল দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। সেখানে তিনি এক সহস্র উৎকৃষ্ট অশ্ব ও প্রচুর ধন-সম্পদ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর কনৌজাভিযানে আগমনের সংবাদ পাইয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য পেশোয়ার পর্যন্ত আগাইয়া যান এবং তাঁহাকে একশত উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং তদুপরি একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য বোঝাই হস্তী নজরানা দেন। পেশোয়ারে তিনি

সুলতানের সম্মুখে ৫০,০০০ অশ্ব দণ্ডায়মান করাইয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে সম্মানসূচক খেলাৎ প্রদান করিয়া তাঁহাকে অগ্রগামী সুলতানী ফৌজের সিপাহ্সালার নির্বাচিত করেন।

তাঁহার পরিচালনাধীনে এই বাহিনীই বেনারসের রাজাকে পরাভূত করে। রাজা যখন দেখিয়াছিলেন যে তাঁহার সেনাদল পিছু হটিতেছে তখন তিনি মৃত্যুপণ করিয়া তাঁহার হস্তীকে সম্মুখে ছুটাইয়া দিয়াছিলেন। দক্ষ তীরন্দাজ কুতুব-উদ-দীন রাজা জয় চাঁদের নিকটে আসিয়া তীর ছোড়েন এবং উহা রাজার চক্ষে বিদ্ধ হয়।

কুতুব-উদ-দীনের অনুমতি লইয়া রাজার বন্ধুরা যুদ্ধক্ষেত্রে রাজার মৃতদেহ অনুসন্ধান করিতে আসেন। কিন্তু এই দিন নিহতদের সংখ্যা এত বিপুল ছিল যে রাজার মৃতদেহ খুঁজিয়া বাহির করিতে তাহাদের অনেক সময় লাগিয়াছিল। স্বর্ণ তার দ্বারা আবদ্ধ রাজার কৃত্রিম দন্ত তাঁহার দেহ সনাক্তকরণে সাহায্য করিয়াছিল।[২] অতঃপর মুহাম্মদ ঘুরী সসৈন্যে বেনারস নগরে প্রবেশ করেন এবং বাংলাদেশের সীমানা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা বিনাবাধায় স্বাধিকারে আনয়ন করেন। তিনি মন্দিরের সমস্ত প্রতিমা ধ্বংস করেন। যে বিপুল পরিমাণ ধন-সম্পদ লুণ্ঠন করিয়াছিলেন তাহা বহন করিতে চারি সহস্র উষ্ট্র লাগিয়াছিল। এই সময় কুতুব-উদ-দীন বেনারসের রাজার নিকট প্রাপ্ত তিন শতাধিক হস্তী সুলতানকে উপহার স্বরূপ প্রদান করেন। হস্তীগুলিকে সুলতানের সম্মুখে হাজির করানো হইল। হস্তী চালক ইঙ্গিত করিল আর অমনি সকল হস্তী সুলতানের সম্মুখে নতজানু হইল। শুধু এক শ্বেত হস্তী মাহুতের আদেশ লঙ্ঘন করিল। এই শ্বেত হস্তীটি এক বিশেষ কৌতূহলের বস্তু ছিল। অন্য সময় ইহা বিশেষ অনুগত ছিল, কিন্তু এই সময় মাহুত তাঁহাকে নতজানু হইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিলে সে প্রায় মাহুতকে মারিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছিল।

ভারত ত্যাগকালে সুলতান এই শ্বেত হস্তীটি প্রীতি-উপহারস্বরূপ কুতুব-উদ-দীনকে প্রত্যার্পণ করেন এবং এক লিখিত পত্রে তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্বোধন করেন। ইহার পর কুতুব-উদ-দীনকে সর্বদা এই হস্তীটিতেই আরোহণ করিতে

২ সে সময় বিলাসিতার দিক দিয়া ভারতবর্ষ যে অনেক অগ্রসর ছিল, ইহা তাহারই সাক্ষ্য দান করে।

দেখা যাইত এবং কথিত আছে যে, কুতুব-উদ-দীন যখন মারা যান তখন সেই হস্তীকে শোকে মুহ্যমান দেখা গিয়াছিল এবং প্রভুর মৃত্যুর তৃতীয় দিবসে সেও মারা গিয়াছিল। আমি হিন্দুস্থানে এই একটি মাত্র শ্বেত হস্তীর কথা শুনিয়াছি—যদিও শোনা যায়, পেগুর রাজা সর্বদা দুইটি করিয়া শ্বেত হস্তী রাখিতেন এবং একটি মারা গেলে তার স্থান পূরণের জন্য জঙ্গল খুঁজিয়া আর একটি বাহির করিবার আদেশ দেওয়া হইত।

সুলতানের প্রস্থানের পরে কুতুব-উদ-দীন কিছুদিন অস্‌নীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে তিনি রাজার ধনাগার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেস্থান হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি শুনিতে পাইলেন যে, নিহত আজমীর-রাজের খুল্লতাত ভ্রাতা হেমরাজ আলোয়ার পর্বত হইতে নির্গত হইয়া আসিয়া রাজপুত্র গোলা রায়কে আজমীর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া রনথম্বরের দিকে বিতাড়িত করিয়াছেন এবং আরও শুনিলেন যে, হেমরাজের সেনাপতি ছত্র রায় এক সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। তাহাকে বাধাদানের জন্য কুতুব-উদ-দীন দিল্লী হইতে ছুটিলেন এবং ছত্র রায়ের বাহিনীকে আক্রমণ করিবার জন্য বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য বিচ্ছিন্ন করিয়া অগ্রে প্রেরণ করিলেন। ইহাদের সঙ্গে সংঘর্ষে শত্রুবাহিনী পরাস্ত হইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল। কয়েকদিনের পলায়নরত বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে সংঘবদ্ধ করিয়া ছত্র রায় শৃঙ্খলার সঙ্গে আজমীরের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। মুসলমানরা সমস্ত পথ তাহাদের পিছু পিছু গমন করে। সেনাপতির সহিত মিলিত হইবার পর হেম-রাজের সাহস বৃদ্ধি পাইল এবং তিনি যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। এইরূপে আজমীর পুনরায় মুসলমানদের কর্তৃত্বাধীনে আসিল এবং ইহার পর হইতে ইহা মুসলমান আইনে শাসিত হইয়া আসিতেছিল।

৫৯১ হিজরীতে (১১৯৪ খ্রীঃ) কুতুব-উদ-দীন গুজরাটের রাজধানী নেহর-ওয়ালার দিকে সমর যাত্রা করেন। ভীমদেবের সেনাপতি দুর্গ প্রাকারের নিম্নে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু কুতুব-উদ-দীনের বাহিনী আসিয়া পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি পলাইতে আরম্ভ করিলেন। মুসলমান বাহিনী তাহার পশ্চাদ্ধাবন করায় তিনি সৈন্যবাহিনীকে দণ্ডায়মান করিয়া তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং যতক্ষণ দেহে প্রাণ ছিল ততক্ষণ বীরত্বের সঙ্গে

যুদ্ধ করিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে সৈন্যরা পুনরায় ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল। এই পরাজয় বার্তা শ্রবণান্তে ভীমদেব রাজ্য ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। কুতুব-উদ-দীন স্বচ্ছন্দে দেশে লুটপাট করিয়া প্রভূত ধন-সম্পদ লাভ করিলেন। তিনি সেখান হইতে হান্‌সীর দুর্গে চলিয়া আসেন এবং ঐ দুর্গের সংস্কারসাধন করেন। অতঃপর তিনি কোহ্‌রাম হইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

ইতিমধ্যে রনথম্বরের নিকটবর্তী এলাকার শাসনকর্তার নিকট হইতে সংবাদ আসিল যে, পার্বত্যাঞ্চলে বসবাসকারী গোলা রায়ের ভ্রাতা তাঁহার রাজ্য আক্রমণের হুম্‌কী প্রদর্শন করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া কুতুব-উদ-দীন তাঁহার সাহায্যার্থে রওয়ানা হইলেন। ইহাতে শত্রুরা ভীত হইয়া পলায়ন করেন। কুতুব-উদ-দীন গোলা রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। গোলা রায় তাঁহাকে বিশেষ আড়ম্বরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করিলেন এবং প্রস্থানকালে তাহাকে কতকগুলি উৎকৃষ্ট অশ্ব এবং স্বর্ণসূত্র দ্বারা নির্মিত দুইটি তাঁবু উপহার প্রদান করেন। সেখান হইতে শীঘ্রই তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন। কুতুব-উদ-দীনকে উৎসর্গীকৃত 'তাজ-উল-মাসির' নামক গ্রন্থে বর্ণিত আছে যে, তিনি যেসব নূতন স্থান অধিকার করেন তাঁহার বিশেষ বিবরণী লিপিবদ্ধ করিয়া সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। ইহা পাঠে সুলতান অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ কুতুব-উদ-দীনকে গজনীতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। কুতুব-উদ-দীন গজনী আগমন করিলে তাঁহাকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। কিছুকাল সেখানে অবস্থান করিবার পর কুতুব-উদ-দীন ভারতে প্রত্যাবর্তন করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে ফিরিবার পথে পেশোয়ারে তিনি কার্মানের শাসনকর্তা তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজের কন্যাকে শাদী করেন এবং দিল্লী পৌঁছিয়া মহা আড়ম্বরের সঙ্গে বিবাহ উৎসব উৎযাপন করেন। ইহার অনতিকাল পরেই তিনি নিজেকে বিয়ানা দুর্গ অবরোধে নিয়োজিত করেন। কিন্তু তাঁহার প্রভু সুলতানের ভারতাগমনের সংবাদ পাইয়া তাহার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য তিনি হান্‌সীর দুর্গ পর্যন্ত আগাইয়া গেলেন। অতঃপর তাঁহারা উভয়ে বিয়ানা আসিলেন। বিয়ানা অধিকৃত হইল। বাহা-উদ-দীন তোগরল নামক তাঁহার অন্যতম বিশ্বস্ত ক্রীত-দাসের উপর ইহার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া মুহাম্মদ ঘুরী গোয়ালিয়র গমন করেন। গোয়ালিয়রের রাজা করদানে অঙ্গীকার করিলেন এবং প্রচুর অর্থ ও রত্ন প্রদান করিয়া সাময়িকভাবে মুহাম্মদ ঘুরীর "সবর" ক্রয় করিলেন। এই ঘটনার

অব্যবহিত পরেই কুতুব-উদ-দীনকে পূর্বের স্থায় সমস্ত ভারতীয় বিজিত রাজ্যের প্রতিভূ নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া মুহম্মদ ঘুরী গজনী প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময় সংবাদ আসিল যে নাগোরের রাজা এবং আরও অনেক হিন্দু রাজা আজমীরের মিরিস সম্প্রদায়ের সঙ্গে মিত্রতা সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছে এবং এই মিলিত শক্তি ও নেহরওয়ালার রাজা মুসলমানদের হস্ত হইতে আজমীর কাড়িয়া লইবার ষড়যন্ত্র পাকাপাকি করিতেছে। এই সময় কুতুব-উদ-দীনের অধিকাংশ সৈন্য প্রদেশেরগুলির মধ্যে ছড়ানো ছিল। ফলে দিল্লীতে যে সামান্য সংখ্যক সৈন্য ছিল তাহা লইয়াই কুতুব-উদ-দীন স্বয়ং সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর বিরুদ্ধে সমর যাত্রা করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল, সম্ভবপর হইলে নেহরওয়ালার বাহিনীকে অন্য মিত্রবাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপনে বাধাদান করিবেন। কিন্তু যুদ্ধকালে তিনি পুনঃ পুনঃ অশ্বচ্যুত হইয়াছেন এবং দেহের সাত জায়গায় জখম হইয়াছিল। তবুও তিনি তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছিলেন। শেষে তাঁহার অনুচরেরা বলপূর্বক তাঁহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বাহিরে লইয়া আসে এবং একটা পাল্‌কীতে উঠাইয়া তাঁহাকে আজমীর বহন করিয়া আনে।

এই বিজয়বার্তায় উল্লসিত হইয়া মিরিসগণ গুজরাট বাহিনীর সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করিয়া এবং আজমীরের সম্মুখে আসিয়া শিবির স্থাপন করে। এই দুর্ঘটনার সংবাদ সুলতানের কর্ণে পৌঁছিলে তিনি কুতুব-উদ-দীনের সাহায্যার্থে এক শক্তিশালী বাহিনী গজনী হইতে প্রেরণ করেন। সাহায্য পৌঁছিবার পূর্ব পর্যন্ত আজমীর বাহিনী আত্মরক্ষা করিয়া আসিয়াছিল। সাহায্যকারী গজনী ফৌজের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুবাহিনী অবরোধ ত্যাগ করিয়া পলায়নপর হইল। কুতুব-উদ-দীনের জখম এই সময় সারিয়া উঠায় তিনি শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন ও নেহরওয়ালা পর্যন্ত তাহাদের অনুসরণ করিয়াছিলেন। পথে তিনি বালি ও নাদোল দুর্গ জয় করিয়াছিলেন (হিঃ ৫৯৩ : খ্রীঃ ১১৯৬)। এইখানে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, 'ওয়ালিন' 'দারবাবাজ' ৩ নেহরওয়ালার রাজার সঙ্গে মিলিত হইয়া সিরোহী প্রদেশের আবুগড় দুর্গের নিকট শিবির স্থাপন করিয়া

৩ আমি প্রথম ব্যক্তির কোন পরিচয় পাই নাই; শেষোক্ত ব্যক্তি কর্নেল টডের মতে, আবুগড়ের পোয়ার বংশের শেষ নৃপতি ছিলেন।

অপেক্ষা করিতেছে। গুজরাটের প্রবেশ পথগুলি রক্ষা করিবার জন্যই তাহাদের এই ব্যবস্থাবলম্বন। পথের দুর্গমতা ও সমরক্ষেত্রের অসুবিধা উপেক্ষা করিয়া তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এই যুদ্ধে পঞ্চাশ হাজারেরও অধিক শত্রু-সৈন্য ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং বিশ হাজার বন্দী হইয়াছিল। বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য বিজয়ীদের হস্তগত হইল। সৈন্যবাহিনীকে কিছুটা বিশ্রাম দানের পর কুতুব-উদ-দীন গুজরাট প্রবেশ করিলেন এবং নির্বিঘ্নে সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করিলেন। তিনি নেহরওয়ালা শহর অধিকার করিয়া সেখানে এক শক্তিশালী বাহিনীসহ এক সেনাপতিকে মোতায়েন করিলেন। অতঃপর তিনি আজমীরের পথে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন এবং গজনীতে সুলতানের নিকট বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ রত্ন ও বহুসংখ্যক গোলাম প্রেরণ করিলেন। অবশিষ্ট লুণ্ঠিত দ্রব্য তিনি তাঁহার সৈন্যদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন।

৫৯৯ হিজরীতে (১২০২ খ্রীঃ) তিনি সমস্ত সৈন্যদলকে একত্রিত করিয়া কালিঞ্জরের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কালিঞ্জরের রাজা বাধাদান করিয়া পরাভূত হইলেন এবং দুর্গের মধ্যে যাইয়া আশ্রয়গ্রহণ করিলেন। কুতুব-উদ-দীন অতঃপর অশ্বারোহী সৈন্যদিগকে অবতরণ করাইয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার পূর্বপুরুষরা সুলতান মাহমুদকে যেরূপ কর প্রদান করিয়াছেন, কুতুব-উদ-দীনকেও সেই প্রকার কর ও উপঢৌকন প্রেরণের প্রস্তাব পেশ করিলেন। প্রস্তাব গৃহীত হইল। কিন্তু রাজার মন্ত্রী সন্ধির পক্ষপাতি ছিলেন না—তিনি যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার সংকল্প করিলেন এবং রাজা যখন উপঢৌকন সজ্জিত করিতেছিলেন সেই সময় তাঁহাকে হত্যা করাইলেন। দুর্গ শীর্ষে পুনরায় হিন্দু পতাকা উড্ডীয়মান দর্শনে অবরোধ পুনরায় আরম্ভ হইল। পাহাড়ের উপরে একটি প্রস্রবণ ছিল, যাহার পানির উপর দুর্গস্থ সৈন্যদিগকে নির্ভর করিতে হইত। সেই ঝরণার পানি শুকাইয়া যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত দুর্গের পতন ঘটিল। কালিঞ্জর লুণ্ঠন করিয়া বিজয়ীরা বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নাদি প্রাপ্ত হইলেন।

কুতুব-উদ-দীন এইবার কাল্পী রাজ্যের রাজধানী মহোবার দিকে অগ্রসর হইলেন সেই স্থান ও তৎসঙ্গে গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী বাদাউনও অধিকার করিলেন। এই সময় মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী মূল্যবান উপহারাদিসহ কুতুব-উদ-দীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বখ্‌তিয়ার খিল্‌জীকে বিহারের শাসনকর্তা

নিযুক্ত করা হইয়াছিল, কিন্তু কিছুদিন যাবৎ তিনি শাহী-ফরমানের প্রতি কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ করিতেছিলেন না। এই সাক্ষাতের ফলে কুতুব-উদ-দীন ও বখতিয়ারের মধ্যে পুনঃ সম্প্রীতি স্থাপিত হইয়াছিল।

তুর্কীস্থানে পরাজয়ের পর মুহাম্মদ ঘুরী যখন ভারতবর্ষে আগমন করেন তখন কুতুব-উদ-দীন আইবেক ও সুলতানের আর একজন ক্রীতদাস শামস্-উদ-দীন আলতামাস তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। ইহাদের সাহস ও নিষ্ঠার ফলে তিনি কয়েকটি সংঘর্ষে গোক্ষরদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের হস্ত হইতে লাহোর পুনরুদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন। সেখানকার ব্যাপারের এইরূপ সন্তোষজনক নিষ্পত্তির পর কুতুব-উদ-দীন তাঁহার রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। সুলতান গজনী প্রত্যাবর্তন করিতেছিলেন, সেই সময় তিনি গোক্ষর আততায়ীদের হস্তে নিহত হন। সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র মাহমুদ ঘুরে সুলতান উপাধি ধারণ করেন এবং অভিষেকের পরেই তিনি কুতুব-উদ-দীন আইবেককে সুলতান উপাধি প্রদান করিয়া সুলতানের সমস্ত নিদর্শন—তখ্ত, চাঁদোয়া, নিশান ও নাকাড়া প্রেরণ করেন। উদ্দেশ্য—কুতুব-উদ-দীনের সমর্থন লাভ। কারণ, কুতুব-উদ-দীন তাঁহাকে স্বীকৃতিদান না করিলে তাঁহার মোকাবিলা করিবার মত কোন ক্ষমতা মাহমুদের ছিল না। কুতুব-উদ-দীন লাহোরে অবস্থানকালে যথারীতি সম্মানের সঙ্গে এইসব অনুগ্রহ গ্রহণ করেন এবং লাহোরেই ৬০২ হিজরীর, ১৮ই জিলকদ (জুলাই ২৪, ১২০৫ খ্রীঃ) তারিখে তখ্তে আরোহণ করেন। কয়েকদিন পরেই লাহোর হইতে দিল্লী ফিরিয়া আসেন।

ইতিমধ্যে লাহোর অধিকারের উদ্দেশ্যে তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ গজনী হইতে এক বাহিনী লইয়া যাত্রা করেন। শাসনকর্তার বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লাহোর তাঁহার হস্তগত হইল। পরে তিনি সেই শাসনকর্তাকেই বিতাড়িত করিয়া দেন। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া কুতুব-উদ-দীন তাঁহার ন্যায়সঙ্গত অধিকার রক্ষার্থে অগ্রসর হইলেন এবং ৬০৩ হিজরীতে (১২০৬ খ্রীঃ) এই দুই প্রধানের মধ্যে যুদ্ধ বাধিল। শেষ পর্যন্ত তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ শহর হইতে বহিষ্কৃত হইলেন এবং তিনি কার্মান ও শিবুরানের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। কুতুব-উদ-দীন তাহার পশ্চাৎ অনুসরণ করিয়া গজনী পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিলেন। সেই শহরে তাঁহার পুনরাভিষেক হইল এবং গজনী রাজ্যও তিনি নিজ অধিকারভুক্ত করিয়া লইলেন। ইহার পর কুতুব-উদ-দীন আইবেক অতিমাত্রায় আমোদ-প্রমোদ ও

সুরাসক্ত হইয়া পড়েন। তাহার প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া অবশেষে গজনীর অধিবাসীরা গোপনে তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজকে তাঁহার অধপতনের সংবাদ জ্ঞাপন করেন এবং তাঁহাকে ফিরিয়া আসিতে অনুরোধ জানায়। তাজ-উদ-দীন অতি সংগোপনে ও দ্রুততার সঙ্গে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গজনী চলিয়া আসিলেন এবং কুতুব-উদ-দীনকে অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। তাঁহার আগমনের একদিন পূর্ব পর্যন্ত কুতুব-উদ-দীন তাঁহার অভিসন্ধি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন। এত বিলম্বে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা নিরর্থক বিবেচনায় তিনি গজনী ত্যাগ করিয়া লাহোরে সরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। কুতুব-উদ-দীন এইবার তাঁহার নির্বুদ্ধিতা উপলব্ধি করিতে পারিলেন এবং অনুতপ্ত হইলেন। ইহার পর হইতে তিনি সংযম, সুনীতি ও সুবিচারের পথ অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিলেন। তিনি যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহার রাজ্য আইনের সর্বোৎকৃষ্ট বিধানানুযায়ী শাসিত হইয়াছে। ৬০৭ হিজরীতে (১২১০ খ্রীঃ) চৌগান[8] খেলিবার সময় অশ্ব হইতে পতনের ফলে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। সুলতান উপাধি ধারণের পর প্রকৃতপক্ষে তিনি মাত্র চারি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারা দিল্লী অধিকারের সময় হইতে গণনা করিলে তিনি কুড়ি বৎসরেরও অধিককাল রাজকীয় অধিকার ও গৌরব উপভোগ করিয়াছিলেন। দিল্লী অধিকারের সময়ই তিনি ভারতের সুলতান হইয়াছিলেন বলা যায়—যদিও তিনি তাঁহার মালিক মুহাম্মদ ঘুরীর সিপাহসালার উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি প্রকৃতই একজন অসামান্য সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। গজনীর অমিতাচার তাঁর জীবনের মহিমাকে যদি ক্ষুণ্ণ না করিত তবে তাঁহাকে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষদের অন্যতম বলিয়া মনে করা হইত। তাঁহার বদান্যতা সমস্ত প্রাচ্যে সুবিদিত ছিল। এবং এই জন্য তিনি 'লাখ-বক্স' আখ্যা অর্জন করিয়াছিলেন। হিন্দুস্তানে যখন দানশীলতার জন্য কাহাকেও প্রশংসা করা হয় তখন আজও বলা হয় "তিনি কুতুব-উদ-দীনের মত দাতা।"

৪ ফুটবল খেলার মতই চৌগান খেলায় দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দল কোন নির্দিষ্ট সীমারেখার বাইরে বল ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা করে। খেলোয়াড়রা ঘোড় সওয়ার এবং তারা আমাদের ব্যাডমিন্টন খেলার মত ব্যাট দ্বারা বল-এ আঘাত করে। তুর্কীদের দ্বারাই এই খেলা দক্ষিণ এশিয়ায় প্রচলিত হয় বলিয়া অনুমান করা হয়। কিন্তু ইহা ভারতে প্রচলিত নাই এবং আমার মনে হয়, এখন পারস্য দেশেও আর ইহা খেলা হয় না।

তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ

[মুহাম্মদ ঘুরী যেসব ক্রীতদাসকে লেখাপড়া শিখিয়ে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করেন তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ তাহাদের অন্যতম। তাঁর প্রতিভার জন্য সুলতান কর্তৃক উচ্চপদে অধিষ্ঠিত এবং পরে কার্মান ও শিবুরানের শাসনভার অর্পণ। সুলতানের মৃত্যুর পর মাহমুদের সম্রাট উপাধি ধারণ ও তাজ-উদ-দীনকে গজনীর সুলতান ঘোষণা। তাজ-উদ-দীন কর্তৃক পাঞ্জাব আক্রমণ ও লাহোর অধিকার। পরে কুতুব-উদ-দীন আইবেক কর্তৃক পরাজিত এবং রাজ্যচ্যুত। রাজ্য পুনরুদ্ধার। মাহমুদের সহযোগিতায় হিরাট ও সিস্তানের অনেক অংশ জয়। ভারতের উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি এলাকা অধিকার। পরে শামস-উদ-দীন আলতামাসের হস্তে বন্দী ও বন্দী অবস্থায় মৃত্যু।]

একমাত্র কন্যা ব্যতীত আর কোন সন্তান ছিল না বলিয়া মুহাম্মদ ঘুরী তুর্কী ক্রীতদাসদিগকে লেখাপড়া শিখাইতে ভালবাসিতেন এবং পরে তাহাদিগকে পোষ্য-পুত্র রূপে গ্রহণ করিতেন। কুতুব-উদ-দীন ছাড়াও এই ক্রীতদাসদের মধ্যে আরও চারিজন মহান নরপতি হইবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজ তাঁহাদেরই অন্যতম। তরুণ বয়সেই তাঁহার মধ্যে প্রতিভার লক্ষণ পরিস্ফুট দেখিয়া সুলতান তাহাকে ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর পদে উন্নীত করিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে কার্মান ও শিবুরানের শাসনকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করেন। কার্মান ও শিবুরান গজনী ও ভারতের মাঝখানে অবস্থিত ছিল। এই অবস্থান তাজ-উদ-দীনকে পুনঃ পুনঃ সুলতানের মেহমানদারি করিবার সুযোগ প্রদান করিয়াছিল। ভারতাভিযানে গমনকালে ও তথা হইতে প্রত্যাবর্তনকালে তিনি প্রতিবারই মহাজাঁকজমকের সঙ্গে সুলতানের প্রতি আতিথেয়তা প্রদর্শন করিতেন এবং সুলতানের প্রত্যেক পার্শ্বচরকে পুরস্কৃত করিতেন। ভারতে তাঁহার শেষ অভিযানকালে মুহাম্মদ ঘুরী তাজ-উদ-দীনকে গজনীর কৃষ্ণপতাকা বহন করিবার অধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। এই সম্মান সচরাচর সুলতানের উত্তরাধিকারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিত। সেই মহান সুলতানের মৃত্যুর পর তুর্কী সেনাপতিরা গিয়াস-উদ-দীনের পুত্র মাহমুদের দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিলেন। কিন্তু উচ্চাভিলাষহীন ও অলস-স্বভাব মাহমুদ গজনী শাসনের অতিরিক্ত দায়িত্ব গ্রহণ করিতে নারাজ হইলেন এবং তাঁহার পূর্ব-পুরুষদের ঘুর-সিংহাসন লইয়াই

পরিতৃপ্ত রহিলেন। তিনি অবশ্য সম্রাট উপাধি গ্রহণ করিলেন এবং তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজকে গজনীর সুলতান ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহার নিকট আনুগত্য লাভ করিয়াই খুশী রহিলেন।

সিংহাসনারোহণের পর তাজ-উদ-দীন প্রথম কর্তব্য হিসাবে পাঞ্জাব আক্রমণ ও লাহোর অধিকার করিলেন, যাহার বিবরণ আমরা পূর্বে পাঠ করিয়াছি। কুতুব-উদ-দীন আইবেক কর্তৃক পরাজিত হইয়া তিনি রাজ্যচ্যুত হন এবং অনতিকাল পরেই তাহা পুনরুদ্ধার করেন। শেষের দিকে তিনি ঘুরের সুলতান মাহমুদের সঙ্গে মিলিত হইয়া হিরাটে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। হিরাট এবং সিস্তানের অনেকাংশ তিনি জয় করেন। মাহমুদ খারিজম সুলতান মুহাম্মদ শাহের সঙ্গেও যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধে জয়লাভের পরে মুহাম্মদ শাহ গজনী অধিকার করিয়া তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজকে কার্মানে ফিরিয়া যাইতে বাধ্য করেন। ইয়েলদুজ বুঝিয়াছিলেন যে, উত্তরাঞ্চলের সেনাবাহিনীর সঙ্গে জুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার নাই। সেইজন্য তিনি কুতুব-উদ-দীন আইবেকের মৃত্যুর কিছুদিন পরে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া ভারত বিজয়ের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন। উত্তরাঞ্চলের কয়েকটি এলাকা অধিকারের পর তিনি দিল্লীর সন্নিকটে শামস-উদ-দীন আলতামাসের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন এবং পরে বন্দী অবস্থায়ই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাঁহার সম্পূর্ণ রাজত্বকাল ছিল নয় বৎসর।

যেহেতু আমরা ইতিপূর্বে মুহাম্মদ ঘুরীর দুইজন ক্রীতদাস পোষ্য-পুত্রের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছি, যাঁহারা রাজোপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেহেতু বাহা-উদ-দীন তোগরল সম্বন্ধে কিছু বলা অসংগত হইবে না। তিনিও একই প্রকার নিম্নাবস্থা হইতে বড় হইয়াছিলেন। তিনি মুহাম্মদ ঘুরীর অধীনে একজন খ্যাতিসম্পন্ন সিপাহসালার ছিলেন। বিয়ানা দুর্গ অধিকৃত হওয়ার পর বাহা-উদ-দীন তোগরলের উপর ইহার দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া মোহাম্মদ ঘুরী স্বয়ং গোয়ালিয়র গমন করেন—যাহা আমরা পূর্বেই পড়িয়াছি। প্রস্থানকালে মুহাম্মদ ঘুরী বাহা-উদ-দীন তোগরলকে কথা দিয়াছিলেন যে, তোগরল গোয়ালিয়র অধিকার করিতে সক্ষম হইলে, সুলতান তাঁহাকে উহার শাসনকর্তার দায়িত্ব প্রদান করিবেন। সেইজন্য সুলতানের হিন্দুস্থান ত্যাগের পরেই তোগরল গোয়ালিয়রের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলে উপদ্রব শুরু করিয়া দেন।

কিন্তু তোগরল দেখিলেন যে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতেছে। কারণ, দুর্গবাসী সৈন্যরা কোন-না-কোন প্রকারে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রাপ্ত হইতেছে। তিনি গোয়ালিয়র দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে কিছু দূরে দূরে কতকগুলি ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণের হুকুম দিলেন। এইসব দুর্গে তিনি সৈন্য মোতায়েন করিলেন। এই ব্যবস্থা দ্বারা তিনি পর্বতোপরি অবস্থিত গোয়ালিয়র দুর্গকে কার্যকরীভাবে অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন। তথাপি এই দুর্গ প্রায় এক বৎসরকাল আত্মরক্ষা করিয়া রহিল। অতঃপর খাদ্য ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাবে জর্জরিত হইয়া রাজা বাহা-উদ-দীন তোগরলের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করার পরিবর্তে গোপনে কুতুব-উদ-দীন আইবেকের নিকট দুত প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে দুর্গের অধিকার গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। তদনুযায়ী গোয়ালিয়র দখল করিবার জন্য কুতুব-উদ-দীন আইবেক তাঁহার ফৌজ পাঠাইলেন। এই ব্যাপারে দুই প্রধানের মধ্যে প্রায় যুদ্ধ বাধিবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু মাঝখানে মৃত্যু আসিয়া এই আত্মকলহের অবসান ঘটাইল—অর্থাৎ এই সময় তোগরলের আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটিল। অন্য দুই জন সুলতান যাঁহারা পূর্বে মুহাম্মদ ঘূরীর ক্রীতদাস ছিলেন—তাঁহাদের কার্যকলাপের বিবরণ সিন্ধু ও বাঙ্গালার ইতিহাসে পাওয়া যাইবে। কারণ তাঁহাদের বিবরণ সঙ্গতভাবে সিন্ধু ও বাঙ্গালার ইতিহাসেই স্থান পাইবার যোগ্য।

আরাম

[পিতার উত্তরাধিকারী হিসাবে দিল্লীতে সিংহাসনারোহণ। রাজ্য মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি। নাসির-উদ-দীন কুবাচা কর্তৃক মুলতান ও উচা অধিকার। বখতিয়ার খিলজীর বাংলাদেশ কুক্ষিগতকরণ। আরামের নির্বুদ্ধিতা। ওমরাহদের তরফ হইতে কুতুব-উদ-দীনের জামাতা শামস্-উদ-দীন আলতামাসকে সিংহাসনারোহণের আমন্ত্রণ। আরাম আলতামাসকে বাধাদান করিয়া পরাস্ত ও রাজ্যচ্যুত।]

কুতুব-উদ-দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাম সিংহাসনে আরোহণ করেন, যদিও এতবড় সাম্রাজ্য শাসন করিবার মত কোন যোগ্যতা তাঁহার ছিল না। মুহাম্মদ ঘুরীর অন্যতম ক্রীতদাস ও পোষ্যপুত্র নাসির-উদ-দীন কুবাচা এক সেনাবাহিনী লইয়া সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হইলেন এবং সিন্ধু, মুলতান, উচা, শিবুরান ও আরও কয়েকটি এলাকা অধিকার করিয়া লইলেন। মুহাম্মদ ঘুরীর আর একজন ক্রীতদাস মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিয়া সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং এই সময়ে অধীনস্থ আমীররা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে আনুগত্য অস্বীকার করিলেন।

এমতাবস্থায় আমীর আলী ইসমাইল, আমীর দাউদ দেলিমী ও দিল্লীর অন্যান্য ওমরাহগণ আরামের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া কুতুব-উদ-দীনের জামাতা ও পোষ্যপুত্র শামস্-উদ দীন আলতামাসকে (তখন বদায়ুনের শাসনকর্তা) সিংহাসনারোহণের আমন্ত্রণ জানাইয়া তাঁহার নিকট প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। শামস্-উদ-দীন ইতস্তত: না করিয়া দিল্লীর দিকে সৈন্য চালনা করিলেন এবং স্বপক্ষীয় লোকদের নিকট সাদর অভ্যর্থনা প্রাপ্ত হইলেন।

রাজধানীতে বাস করা বিপজ্জনক মনে করিয়া আরাম পূর্বাহ্নেই দেশের অভ্যন্তরে সরিয়া পড়িয়াছিলেন এবং এক উৎকৃষ্ট সেনাদল গঠন করিয়া দিল্লীর সম্মুখে আসিয়া শামস্-উদ-দীনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। যুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইলেন এবং রাজ্য হারাইলেন। এক বৎসরও রাজ্যভোগ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই।

শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাস

[বংশ পরিচয়। কুতুব-উদ-দীনের কন্যার সঙ্গে পরিণয়। সুলতান বাহিনীর প্রধান সেনানায়কের পদ লাভ। শ্যালক আরামকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজের সিংহাসনারোহণ। রাজ্যে দলাদলি। তুর্কী অশ্বারোহীদের তাঁহার দল ত্যাগ এবং কিছুকাল পরে তাহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য দিল্লীতে আসিয়া হানা। তুর্কীরা পরাভূত। খারিজম শাহের সৈন্যদল কর্তৃক গজনী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া তাজ-উদ-দীন ইয়েলদুজের পাঞ্জাব অধিকার এবং পরে থানেশ্বরও তাঁহার করতলগত। পরে আলতামাসের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাস্ত, বন্দী এবং কারাগারে প্রাণত্যাগ। পাঞ্জাবে উপর্যুপরি দুইটি যুদ্ধে আলতামাস মুলতানের নাসির-উদ-দীন কুবাচাকে পরাজিতকরণ। অনন্তর বাঙ্গালায় গমন করিয়া বখতিয়ার খিলজীর পুত্র গিয়াস-উদ দীনকে যুদ্ধে পরাস্ত ও বাঙ্গালা দেশ সম্পূর্ণ অধিকারে আনয়ন। শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাস মুলতান গমন করিয়া নাসির-উদ-দীন কুবাচাকে বহিষ্কৃতকরণ এবং তাঁহার উজির নিজাম-উল-মুল্‌ক জুনাইদীকে মুলতানের দায়িত্ব অর্পণ। শাম্‌স্‌-উদ-দীনের অতঃপর রনথম্বর, মান্দো ও সমস্ত মালব অধিকার। খলিফার নিকট হইতে একদল দূতের দিল্লী আগমন। সুলতানের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ-দীন মাহমুদের বাঙ্গালায় মৃত্যুবরণ। বাঙ্গালার শাসনভার কনিষ্ঠ পুত্রকে অর্পণ। সুলতান কর্তৃক হিন্দুদের হস্ত হইতে গোয়ালিয়র পুনর্দখল। ভিল্‌সা ও উজ্জয়িনী অধিকার করিয়া মুলতানের দিকে অগ্রসর। পথে অসুস্থ হইয়া পড়ায় দিল্লী প্রত্যাবর্তন। তাঁহার মৃত্যু।]

তাব্‌কাতে নাসিরীতে বর্ণিত আছে যে, মাতার দিক দিয়া নাসির-উদ-দীন আলতামাস খাত্রার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের বংশধর এবং তাঁহার পিতা ইলাম খান ছিলেন আল্‌বেরী সম্প্রদায়ের লোক। বাল্যকালে তিনি পিতার অত্যধিক স্নেহের পাত্র ছিলেন। সেইজন্য তাঁহার ভ্রাতারা ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাঁহাকে সরাইয়া ফেলিবার সংকল্প গ্রহণ করে। একদিন শিকারে বাহির হইয়া তাহারা তাঁহার সবকিছু কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে একদল ভ্রাম্যমাণ সওদাগরের নিকট বিক্রয় করে। সওদাগরেরা তাহাকে বোখারায় লইয়া যান এবং বোখারার অধিপতি সদর ই-জাহানের এক আত্মীয়ের নিকট বিক্রয় করেন। তাঁহার অধীনে থাকিয়া তিনি উত্তমরূপে লেখাপড়া শিক্ষা করেন। মালিকের মৃত্যুর পর পুনরায় তাঁহাকে বিক্রয়ের জন্য প্রস্তুত করা হয় এবং এক বণিক তাঁহাকে ক্রয় করিয়া গজনী লইয়া

আসেন। গজনীতে সুলতান মুহাম্মদ ঘুরী তাঁহার রূপ ও গুণের কথা শুনিয়াছিলেন। কিন্তু বণিক যে মূল্য চাহিলেন তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন না। ফলে বণিক তাঁহাকে বোখারায় ফিরাইয়া লইয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। কারণ, সুলতানের অসন্তোষের ভয়ে কেহ তাঁহাকে ক্রয় করিতে সাহসী হইল না। পরে সুলতানের অনুমতি লইয়া কুতুব-উদ-দীন আইবেক দিল্লীতে ৫০,০০০ রৌপ্য মুদ্রার বিনিময়ে তাঁহাকে ক্রয় করেন। কুতুব-উদ-দীনই বণিকদিগকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সময়ই কুতুব-উদ-দীন অন্য আর একজন গোলামকে খরিদ করিয়াছিলেন—তাহাকে তিনি তোগান নামে ডাকিতেন। এই তোগানই পরে সারহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। কুতুব-উদ-দীন আইবেকের তিনটি কন্যা ছিল। ইহার সর্ব জ্যেষ্ঠাকে নাসির-উদ-দীন কুবাচা ও দ্বিতীয়টিকে শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাসের সঙ্গে শাদী দিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠা কন্যার মৃত্যুর পর নাসির-উদ-দীন কুবাচা সুলতানের কনিষ্ঠ কন্যাকে শাদী করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন।

মালিকের জামাতা হিসাবে আলতামাসের দ্রুত পদোন্নতি হইতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত তিনি সেনাবাহিনীর সিপাহ্‌সালার নিযুক্ত হন। আইবেকের পরলোক গমনের পর (আমরা পূর্বেই পড়িয়াছি) তিনি দিল্লীতে আগমন করেন এবং আরামকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাস উপাধি ধারণ পূর্বক নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পর অনেক আমীর ও রাজা তাঁহাকে স্বীকার করিয়া লইলেন। কিন্তু তাঁহার সেনাপতিদের কয়েকজন তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার সেনাবাহিনীর উৎকৃষ্ট অংশ—তুর্কী অশ্বারোহীদের বৃহদাংশ লইয়া ভাগিয়া পড়িল। ইহারা রাজ্যের অন্যান্য বিক্ষুব্ধ লোকদের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইল। কিন্তু ইহারা আলতামাস কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত ও পরাভূত হইল। তাহাদের সর্দার ফারুক সমরক্ষেত্রেই নিহত হইলেন এবং অবশিষ্ট যাহারা রহিল পলায়নকালে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যে তাহারা হয় নিহত না হয় বন্দী হইল। ইহার ফলে তখ্‌তে আলতামাসের আসন সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই ঝালোরের করদ-রাজা উদীসা কর প্রদানে অস্বীকার করায় সুলতানকে তাহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে হইল। রাজা বশ্যতা

স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। তাজ-উদ-দীন ইয়েলতুজ এই সময় গজনীর সুলতান হইয়াছিলেন। তিনি আলতামাসকে ভারতীয় রাজ্যে বহাল করিতেছেন এইরূপ ভাণ করিয়া তাঁহাকে রাজকীয় নিশান প্রেরণ করিলেন। কিন্তু ইহার অল্পকাল পরেই খারিজম শাহের সৈন্যদের হস্তে পরাস্ত হইয়া তিনি যখন কার্মান-শিবুরানে ফিরিয়া আসেন তখন তিনি পূর্বদিকে রাজ্য বিস্তারের সংকল্প গ্রহণ করিলেন। প্রথমে তিনি পাঞ্জাব দখল করেন। পরে ৬১২ হিজরীতে (১১১৫ খ্রী:) থানেশ্বরও তাঁহার করতলগত হয়। সেখান হইতে গুপ্তচর মারফত দিল্লীর দরবারে তাঁহার সমর্থকদল সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করিলেন। শাম্‌স-উদ-দীন আলাতামাস ইতিমধ্যেই সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। তরাইনের ময়দানে যুদ্ধ হইল। তাজ-উদ-দীন ইয়েলতুজের পরাজয় ঘটিল এবং তাহার বহুসংখ্যক সেনাপতির সঙ্গে তিনি বন্দী হইলেন। তাঁহাকে বাদায়ুনে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হয়। কেহ বলেন, সেখানে তিনি স্বাভাবিকভাবেই ইন্তেকাল করেন আবার কেহ বলেন, তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে বধ করা হইয়াছিল।

৬১৪ হিজরীতে (১২১৭ খ্রী:) চেনাব নদী তীরে মুনসুরিয়ায় আলতামাস তাঁহার ভায়রা নাসির-উদ-দীন কুবাচাকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন। গজনীর নিকটবর্তী অঞ্চলে বসবাসকারী খিল্‌জী সম্প্রদায়ের কয়েকজন সর্দার নাসির-উদ-দীন কুবাচার নিকট পরাস্ত হইয়া পালাইয়া আলতামাসের শরণাপন্ন হন। আলতামাস তাহাদের পক্ষাবলম্বন করিয়া নাসির-উদ-দীনের বিরুদ্ধে সমর যাত্রা করেন এবং দ্বিতীয়বার তাঁহাকে পরাস্ত করিয়া খিলজীদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া দেন। অতঃপর তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ৬১৮ হিজরীতে (১২২১ খ্রী:) মহামান্য কিন্তু হতভাগ্য জালাল-উদ-দীন খারিজম শাহ উত্তরাঞ্চলে চেঙ্গিশ খান কর্তৃক পরাস্ত হইয়া লাহোরাভিমুখে পালাইয়া আসেন। আলতামাস সেখানে তাঁহাকে বাধাদান করেন এবং তাঁহাকে সিন্ধু ও সেবুস্তানাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। নিজাম-উদ-দীন ও অন্য আরও কয়েকজন ঐতিহাসিকের মতে নাসির-উদ-দীন কুবাচার মৃত্যুর পরে জালাল-উদ-দীন খারিজম শাহ ভারতাগমন করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁহারা যেসব প্রমাণ খাড়া করিয়াছেন সেসব আমার নিকট গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

৬২২ হিজরীতে (১২২৫ খ্রী:) শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাস বিহার ও লক্ষণাবতীর[১] দিকে সৈন্যবাহিনী চালনা করেন এবং তদানীন্তন বাঙ্গালার সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বখতিয়ার খিলজীকে করদানে বাধ্য করেন। গিয়াস-উদ-দীন বখতিয়ার খিল্‌জীর ইতিহাস আমরা যথাস্থানে বর্ণনা করিব। সুলতান বাঙ্গালাদেশে নিজের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলনের ব্যবস্থা করিয়া এবং পুত্র নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে বিহারের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই নাসির-উদ-দীন মাহমুদ ও বাঙ্গালার গিয়াস-উদ-দীন খিলজীর মধ্যে যুদ্ধ বাধে এবং গিয়াস-উদ-দীন পরাস্ত ও নিহত হন। নাসির-উদ-দীন অতঃপর তাঁহার রাজ্য ও কোষাগার স্বাধিকারে আনয়ন করেন। বাঙ্গালার কোষাগার হইতে দিল্লীর বন্ধুদের নিকট তিনি প্রচুর উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন।

প্রমাণসিদ্ধ ইতিহাসানুযায়ী এই বৎসরই (৬২২ হি:) শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাস, নাসির-উদ-দীন কুবাচার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। নাসির-উদ-দীন কুবাচা সিন্ধুর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করিয়া লইয়াছিলেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সুলতানের মোকাবিলা করিতে অক্ষম বিধায় উচাতে এক শক্তিশালী বাহিনী রাখিয়া কুবাচা বাক্কারে আসিয়া পড়েন। আলতামাস উজীর নিজাম-উল-মুল্‌ক জুনাইদীক[২] অর্ধেক সৈন্যসহ বিচ্ছিন্ন করিয়া নাসির-উদ-দীন কুবাচার পশ্চাদ্ধাবনে প্রেরণ করেন এবং স্বয়ং অপর অর্ধাংশ সৈন্য লইয়া উচা অবরোধ করেন। দুই মাস কুড়ি দিন অবরোধের পর তিনি উচা অধিকার করেন। উচার পতন সংবাদ নাসির-উদ-দীন কুবাচার নিকট পৌঁছিলে তিনি পুত্র আলা-উদ-দীন বৈরামকে শান্তি ভিক্ষার্থ আলতামাসের নিকট প্রেরণ করেন। সন্ধির শর্তাবলী স্থিরীকৃত হইবার পূর্বেই সংবাদ আসিল যে, নিজাম উল মুল্‌ক জুনাইদী কর্তৃক

১ ইহা গৌড়ের অপর নাম রাজমহল-এর নিকটবর্তী জায়গায় অবস্থিত।

২ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইনিই হিন্দুস্থানের প্রথম উজির যাঁহাকে নিজাম-উল মুল্‌ক উপাধি প্রদত্ত হইয়াছিল। পরবর্তীকালে এই উপাধির বহুল প্রচলন দৃষ্ট হয় এবং শেষ নিজাম-উল-মুল্‌কের বংশধরদিগকে আমরা হায়দরাবাদের মসনদে দেখিতে পাই।

ধাবিত হইয়া নদী অতিক্রমকালে নাসির-উদ-দীন কুবাচা ডুবিয়া মরিয়াছে। অতঃপর সমস্ত সাম্রাজ্যের উপর আলতামাসের প্রভুত্ব হইয়াছিল।

৬২৩ হিজরীতে (১২২৬ খ্রীঃ) আলতামাস রনথম্বর দুর্গ অধিকার করেন এবং ৬২৬ হিজরীতে মান্‌দো দুর্গ ও মালব দেশ জয় করেন। এই সময় চেঙ্গিশ খান কর্তৃক বোখারা অধিকৃত হওয়ায় সে যুগের শ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক আমীর রুহানী বোখারা হইতে পালাইয়া আসিয়া দিল্লীতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দিল্লী অবস্থানকালে তিনি অনেক মূল্যবান কবিতা রচনা করেন।

৬২৬ হিজরীতে (১২২৯ খ্রীঃ) আরবদেশের খলিফার নিকট হইতে সুলতানী খেলাৎসহ একদল প্রতিনিধি দিল্লী আগমন করেন। সুলতান সানন্দে এই উপহার গ্রহণ করেন এবং এই উপলক্ষে এক বিরাট ভোজের ব্যবস্থা করিয়া বহু লোকের মধ্যে উপহারাদি বিতরণ করেন। এই বৎসরই তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বাঙ্গালার শাসনকর্তা নাসির-উদ-দীন মাহমুদের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। আলতামাস নাসির-উদ-দীনের অনুজকে সেই আসনের জন্য নির্ধারিত করেন এবং তাহাকে সঙ্গে করিয়া বাঙ্গালায় গমন করেন এবং ৬২৭ হিজরীতে (১২৩০ খ্রীঃ) তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। প্রাক্তন শাহজাদার মৃত্যুর পরে শাসনকার্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। তথাকার শাসন ব্যবস্থার সম্পূর্ণ স্থিরতা আনয়নের পর তিনি আইজুল মুল্‌ক আলা-উদ-দীন খানীর উপর তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া সপুত্রক দিল্লী প্রত্যাগমন করেন।

৬২৯ হিজরীতে (১২৩১ খ্রীঃ) শামস্‌-উদ-দীন আলতামাস গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারে উদ্যোগী হন। তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতান আরামের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বের সময় এই দুর্গ পুনরায় হিন্দুদের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। তিনি এক বৎসরকাল এই দুর্গ অবরোধ করিয়া রাখেন এবং দুর্গবাসী সৈন্যদের দুরাবস্থা চরমে উঠিবার পর, রাজা দেবল রাত্রিকালে পলায়ন করেন এবং তাঁহার সৈন্যরা আত্মসমর্পণ করে। এই সৈন্যদের প্রায় তিন শতাধিককে হত্যা করা হইয়াছিল। দুর্গের পতনকালে মালিক তাজ-উদ-দীন জুরেরী তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি চারি লাইনের এক কবিতা রচনা করিয়া এই দিনটিকে স্মরণীয় করিয়াছেন। ঐ কবিতাটি দুর্গতোরণের এক প্রস্তরে খোদিত করা হইয়াছে।[৩]

৩ এই প্রস্তর ও কবিতা এখনও বিদ্যমান আছে।

গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারান্তে সুলতান মালবাভিমুখে সৈন্য চালনা করেন এবং ভিল্‌সা দুর্গ ও উজ্জয়িনী নগর অধিকার করেন। সেখানে সোমনাথের

ছাঁচে নির্মাণ করা মহাকালির এক মন্দির ছিল। সুলতান মন্দিরটি ধ্বংস করেন। কথিত আছে যে, এই মন্দির নির্মাণ করিতে তিন শত বৎসর লাগিয়াছিল এবং একশত হাত উচ্চ প্রাচীর দ্বারা এই দেয়ালটি বেষ্টিত ছিল। এই রাজ্যের প্রাচীন রাজা বিক্রমাদিত্য এত বিখ্যাত ছিলেন যে তাহার মৃত্যুর দিন হইতে হিন্দুরা এক সাল গণনা করিয়া আসিতেছে। সেই বিক্রমাদিত্য ও মাহাকালির প্রস্তর মূর্তি এবং আরও অনেক তাম্র-মূর্তি সেই মন্দিরে পাওয়া গিয়াছিল। সুলতান এই মূর্তিগুলি দিল্লীতে আনিয়া বড় মস্‌জিদের দরজার সম্মুখে ভাঙ্গিবার ব্যবস্থা করেন।

এই অভিযান হইতে ফিরিয়া আলতামাস মুলতানাভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। কিন্তু সহসা অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি দিল্লী ফিরিতে বাধ্য হন। ৬৩৩ হিজরী, ২০ শাবান তিনি দিল্লীতে ইন্তেকাল করেন। রাজত্বের শেষার্ধে তাঁহার উজির ছিলেন ফক্রুল-মুল্‌ক আসামী। ইহার পূর্বে ৩০ বৎসরকাল তিনি বাগদাদের খলিফার উজির ছিলেন। জ্ঞান ও বিদ্যার জন্য তিনি বাগ্‌দাদে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। কোন অপরাধের দরুন তাঁহাকে বাগদাদ ত্যাগ করিয়া দিল্লী আসিতে হয়। দিল্লীতে তিনি প্রধান উজিরের পদ প্রাপ্ত হন। জমিউল-হিকায়েতের (ঐতিহাসিক গল্পগুচ্ছ)[৪] রচয়িতা নূর-উদ-দীন মাহমুদ উফী এই সময় দিল্লীর দরবারে অবস্থান করিতেছিলেন। শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাসের রাজত্বকাল ছাব্বিশ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। তিনি একজন উদ্যমশীল, দক্ষ ও দয়ালু নরপতি ছিলেন।

৪ এইঁ গ্রন্থটি মানুষের পাপ-পুর্ণ ও বিপদের আলেখ্য সম্বলিত কতকগুলি সংগৃহীত গল্পে পুর্ণ। এসব গল্পের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

রুকুন-উদ-দীন ফিরোজ

[সিংহাসনারোহণ। তাঁহার লাম্পট্যময় অমিতাচার। মাতাকে চরম নিষ্ঠুরাচারণের সুযোগদান। ভূতপূর্ব সুলতানের বিধবা পত্নী ও এক পুত্রকে হত্যা। দরবারে বিশৃঙ্খল ও বিভ্রান্তিকর অবস্থার সৃষ্টি। তখ্‌তের নূতন দাবীদারদের আবির্ভাব। সুলতানের বিরুদ্ধে রাজ্যের প্রধান আমীরদের ষড়যন্ত্র। তাঁহাদের লাহোরে সৈন্য সমাবেশ। তাঁহাদের বিরুদ্ধে সুলতানের অভিযান। মুনসুরপুর পৌঁছিলে সাতজন সেনাপতির দলত্যাগ। তাঁহাদের দ্বারা সুলতানের ভগ্নী রাজিয়া বেগমের তখ্‌তে উপবেশন। সুলতানের রাজধানীতে প্রত্যাগমন এবং তাঁহার সেনাদল কর্তৃক বন্দী। তাঁহাদের দ্বারা সুলতানকে নূতন সুলতানের নিকট সমর্পণ।]

সমসাময়িক ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে ৬২৫ হিজরীতে শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাস তাঁহার পুত্র রুকুন-উদ-দীন ফিরোজকে বাদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন এবং গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারের পরে তাঁহাকে পাঞ্জাবে সুলতানের সহকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে ঘটনাক্রমে এই শাহজাদা দিল্লী ছিলেন। ফলে ৬৩৩ হিজরী (১২৩৬ খ্রীঃ) ২১শে সাবান নির্বিঘ্নে সিংহাসনে আরোহণ করিতে সমর্থ হন, অভিষেক অনুষ্ঠানে ওমরাহগণ নজরানা দিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কবিদের মধ্যে স্তুতিব্যঞ্জক কবিতা রচনা করিবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হইয়াছিল। কিন্তু অভিষেকের পরেই তিনি ইন্দ্রিয় সুখে নিমজ্জিত হইয়া রাজকার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করেন।

পিতার সঞ্চিত ধনরত্ন তিনি অকাতরে নর্তকী রমণী, গায়ক-গায়িকা ও অভিনেতাদের মধ্যে বিতরণ করিতে থাকেন—সরকারী কার্য পরিচালনার দায়িত্ব মাতা শাহ্‌তুর খানের উপর সম্পূর্ণরূপে ছাড়িয়া দেন। এই মহিলা প্রথমে একজন তুর্কী ক্রীতদাসী ছিলেন—তাঁহাকে নিষ্ঠুরতার প্রতীক বলিলেই চলে। ঈর্ষাবশে তিনি আলতামাসের হারেমের সমস্ত ললনাকে হত্যা করাইলেন এবং তাহাতে ক্ষান্ত না হইয়া সুলতানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র কুতুব-উদ-দীনকেও বধ করাইলেন। এই সব দৃশ্য দেখিয়া মানুষের মনে বিদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা অযোধ্যার শাসনকর্তা গিয়াস-উদ-দীন

মুহাম্মদ বাঙ্গালাদেশ হইতে প্রেরিত রাজস্ব পথে আটকাইয়া ফেলিলেন এবং নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এই সময়েই বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক আইজ-উদ-দীন সালার, লাহোরের শাসনকর্তা মালিক আলা-উদ-দীন খানী, মুলতানের শাসনকর্তা মালিক কবির খান এবং হান্‌সীর শাসনকর্তা মালিক সাইফ-উদ-দীন কুচীর মধ্যে ষড়যন্ত্রমূলক মিত্রতা স্থাপিত হয় এবং শীঘ্র ইহা প্রকাশ্য বিদ্রোহের রূপ ধারণ করে। রুকুন-উদ-দীন তাঁহার সৈন্যদলকে সংঘবদ্ধ করিয়া কেলুকারী গমন করেন। সেখানে উজির নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক জুনাইদী ও সেনাবাহিনীর একাংশ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। উজির কোল অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখানে বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক আইজ-উদ-দীন সালারের সঙ্গে মিলিত হন। অতঃপর তাঁহারা একত্রে লাহোরাভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশের শাসনকর্তারা আসিয়া তাহাদের সঙ্গে মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে সুলতান এই মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে রওয়ানা হইয়া পড়েন। কিন্তু তিনি মুনসুরপুর পৌঁছিলে তাঁহার প্রধান সেনাপতিদের মধ্যে সাতজন—তাজ-উদ-দীন জুরাইদি, মালিম মুহাম্মদ দবির, বাহা-উদ-দীন হুসেন, মালিক করিম-উদ-দীন জিয়া-উল্‌-মুল্‌ক, শেরখান, খাজা রশিদ ও আমীর ফকর-উদ-দীন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া সদলবলে দিল্লী ফিরিয়া আসেন। দিল্লী ফিরিয়াই তাঁহারা শাম্‌স-উদ-দীন আলতামাসের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজিয়া বেগমকে তখ্‌তে বসাইলেন এবং সুলতানের মাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এই সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি দ্রুতগতিতে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তিনি কেলুকারী পৌঁছিয়াছেন, এই সময় ৬৩৪ হিজরী ১৮ই রবি-উল-আউয়াল সুলতানা রাজিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইলেন। রুকুন-উক-দীনকে সুলতানার হস্তে সমর্পণ করা হইল এবং কারাগারে তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। তিনি মাত্র ছয় মাস আঠাইশ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

সুলতানা রাজিয়া বেগম

[সুলতানার চরিত্র। রাজকার্য পরিচলনায় ভ্রাতাদের অপেক্ষা অধিকতরযোগ্য প্রতিপন্ন। লাহোরের মিত্র-বাহিনীর সুলতানার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা। এই সময় সুলতানার কর্মতৎপরতা। তাঁহার মিত্রদের মধ্যে বীজবপন। তাঁহাদের পরস্পরকে সন্দেহ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাদের বিচ্ছিন্নতা। সুলতানার বাহিনীর তাঁহাদিগকে আক্রমণ। আমীরদের অনেকেই ধৃত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত। খাজা মেহ্দীকে নিজাম-উল মুল্‌ক উপাধি প্রদান করতঃ প্রধান উজির পদে নিযুক্তি। রাজ্যের পরিসীমা পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাঙ্গালা পর্যন্ত বিস্তৃত। জামাল-উদ-দীন ইয়াকুত নামক এক হাব্‌সী ক্রীতদাসকে সুলতানা কর্তৃক আমীর উল-ওমরাহ বা প্রধান আমীরের মর্যাদাদান। সুলতানার সঙ্গে ইয়াকুতের ঘনিষ্ঠতায় ওম্‌রাহদের ঈর্ষার উদ্রেক। লাহোরের শাসনকর্তার বিদ্রোহের প্রস্তুতি। সুলতানা তাঁহাকে বাধাদানে অগ্রসর। তাঁহার আত্মসমর্পণ এবং তাঁহাকে ক্ষমা প্রদর্শন। বিতুণ্ডার শাসনকর্তা মালিক আল্‌তুনীয়ার বিদ্রোহ। সুলতানার বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর। তুর্কী সেনাপতিদের বিদ্রোহ এবং সুলতানার অনুগ্রহভাজন ইয়াকুতকে হত্যা। অতঃপর সুলতানাকে তাঁহার সৈন্যবাহিনীর হস্তে সমর্পণ। তুর্কী সেনাপতিগণ কর্তৃক তাহাদের বাহিনী লইয়া দিল্লী প্রত্যাগমন এবং সুলতানার ভ্রাতা বৈরামকে সিংহাসনে উপবেশন। সুলতানা কর্তৃক আল্‌তুনিয়াকে শাদী এবং স্বীয় অধিকার পুনরুদ্ধারের প্রয়াস। তাঁহাদের দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা কিন্তু নূতন সুলতানের বাহিনীর নিকট পরাজয়বরণ। সুলতানা ও মালিক আলতুনিয়া পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ। কাইতুনে মালিক আইজ-উদ-দীন বুলবন কর্তৃক তাঁহারা পরাস্ত। দেশের অধিবাসীদের হস্তে উভয়েই বন্দী ও নিহত। সুলতানা রাজিয়া বেগমের ভাগ্যের উপর লেখকের মন্তব্য]।

রাজিয়া বেগম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নরপতিদের সমস্ত গুণাবলীর অধিকারিনী ছিলেন। তাঁহার কঠোর সমালোকেরাও—"তিনি স্ত্রীলোক"—ইহা ব্যতীত তাঁহার আর কোন ত্রুটি আবিষ্কার করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি শুদ্ধ উচ্চারণ করিয়া কোরান পাঠ করিতেন এবং পিতার জীবদ্দশায় নিজেকে পুনঃ পুনঃ রাজ কার্যে নিযুক্ত করিয়াছেন। পিতা বরং তাঁহার কর্ম প্রবণতাকে উৎসাহিত করেন। গোয়ালিয়র অধিকার-কালে সুলতান আলতামাসতাঁহার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য পরিচালনার দায়িত্ব রাজিয়ার উপরই ন্যস্ত করিয়া গিয়াছিলেন। সেনাপতিরা যখন জিজ্ঞাসা করিলেন

যে, তিনি পুত্রদিগকে বাদ দিয়া রাজিয়াকে কেন প্রতিনিধি নিযুক্ত করিলেন? তখন সুলতান এইরূপ উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন: "আমি দেখিতে পাইতেছি যে আমার পুত্ররা সকলেই সুরাপান ও সর্ববিধ অমিতাচারে মত্ত, আমার মনে হয় রাজ-কার্যের বোঝা তাহাদের স্কন্ধের পক্ষে অনেক বেশী ভারী। কিন্তু রাজিয়া স্ত্রীলোক হইলে কি হইবে—সে পুরুষের মস্তিষ্ক ও অন্তঃকরণ পাইয়াছে। অমন বিশজন পুত্র অপেক্ষা সে যোগ্যতর। অভিষেকান্তে রাজিয়া তাঁহার সাধারণ পরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া রাজকীয় পোশাক পরিধান করেন এবং প্রতিদিন সিংহাসনে উপবেশন করিয়া জনসাধারণকে সাক্ষাৎ দান করিতে আরম্ভ করেন। ভূতপূর্ব সুলতানের স্বল্পকাল স্থায়ী রাজত্বে তাঁহার পিতার যেসব আইন-কানুন বাতিল হইয়াছিল তিনি সেসবকে সংশোধিত ও পুনরুজ্জীবিত করিতে আরম্ভ করেন এবং নিরপেক্ষভাবে সকলের প্রতি সুবিচার প্রদর্শন করিয়া যাইতে থাকেন।

উজির নিজাম-উল্-মুল্‌ক জুনাইদী, মালিক আলা-উদ-দীন খানী, মালিক সাইফ-উদ-দীন কুচী, মালিক আইজ উদ-দীন সালার ও মালিক কবির খান প্রমুখ আমীরগণ যে ষড়যন্ত্রকারী দল গঠন করিয়া লাহোরে সৈন্যবাহিনী সম্মিলিত করিয়াছিলেন, তাঁহারা এইবার দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং শহরের বাহিরে শিবির স্থাপন করিয়া শত্রুতা শুরু করিলেন। সেই সঙ্গে তাঁহারা সমস্ত কর্মচারীদিগকে তাঁহাদের দলে যোগদানের আমন্ত্রণ জানাইয়া পত্র লিখিলেন। এইসব সংবাদ পাইয়া অযোধ্যার জায়গীরদার মালিক নাসির সৈন্য সংগ্রহ করিয়া সুলতানার সাহায্যে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তিনি গঙ্গা অতিক্রম করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মিত্রবাহিনী কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া পরাস্ত ও বন্দী হইলেন। বার্ধক্য ও দুর্বলতা নিবন্ধন এই বন্দী দশাতেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে। ইতিমধ্যে সুলতানা নিষ্ক্রিয় ছিলেন না—তিনি অতি তৎপরতার সঙ্গে বিদ্রোহী সর্দারদের মধ্যে বিভেদের বীজ বপন করিতে থাকেন এবং এমন সাফল্যের সঙ্গে তিনি এই কার্য সম্পাদন করেন যে শীঘ্রই তাঁহারা পরস্পরের প্রতি সন্দিহান হইয়া তাঁবু উঠাইয়া যে যাঁর শাসিত প্রদেশাভিমুখে প্রস্থান করেন। এই সুযোগে সুলতানার সৈন্যরা তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। মালিক সাইফ-উদ-দীন কুচী ও তাঁহার ভ্রাতা ধৃত হইয়া প্রাণ হারাইলেন। বাবুলের নিকট মালিক আলা-উদ-দীন খানীও নিহত হইলেন এবং তাঁহার মস্তক দিল্লীতে আনীত হইল।

কিন্তু উজির নিজাম-উল্-মুল্‌ক জুনাইদী কোন প্রকারে মারমর পর্বতে পালাইয়া গেলেন। সেখানেই পরে তিনি মারা যান।

সুলতানা এইবার তাঁহার প্রাক্তন উজিরের সহকারী খাজা মেহদী গজনভীকে নিজাম-উল্‌-মুল্‌ক উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে ওজারতের আসন প্রদান করিলেন এবং মালিক সাইফ-উদ-দীন আইবেককে প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। তাঁহার উপাধি হইল তুগলগ খান। কবির খান আত্ম-সমর্পণ ও নতি স্বীকার করায় তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্তার পদে পুনর্বহাল করা হইল। ওদিকে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পূর্বভাগে লক্ষণাবতী ও দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে সিন্ধু ও দেবল প্রদেশের শাসনভার তথাকার সহ-শাসক যাহারা ছিলেন—তাঁহাদের স্কন্ধে ন্যস্ত করা হইল। তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্য ভবিষ্যৎ আনুগত্যের শপথ আদায় করা হইল।

অল্প কয়েকদিন পরেই সুলতানার বাহিনীর প্রধান সেনাপতি তুগলগ খান ইন্তেকাল করেন। কুতুব হাসানকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করিয়া একদল সৈন্যসহ তাঁহাকে রনথম্বর রক্ষার্থে প্রেরণ করা হইল। কয়েকজন স্বাধীন ভারতীয় রাজা এই সময় রনথম্বর দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। সুলতানী ফৌজের আগমন সংবাদে অবরোধ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা পলায়ন করিল। কুতুব-উদ-দীন হাসানের রনথম্বর ত্যাগ করিবার পর সুলতানা মালিক ইখ্‌-তিয়ার উদ-দীন আলগুনীনকে আমীর হাজিব মনোনিত করেন এবং সুলতানার অতি প্রিয়পাত্র আবিসিনিয়াবাসী জামাল-উদ-দীন ইয়াকুতকে অশ্বশালার তত্ত্বা-বধায়কের পদ হইতে আমীর-উল-ওম্‌রাহের[১] পদে উন্নীত করেন। এই ব্যবস্থায় আমীররা নিরতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া অতি সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিতে এই অপরিমিত অনুগ্রহের কারণ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাঁহারা সুলতানা ও সেই কাফ্রীর মধ্যে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতা লক্ষ্য করিলেন। সুলতানার অশ্বারোহণকালে সে প্রায়শঃই সুলতানার বাহুর নিম্নে হাত দিয়া তাঁহাকে উত্তোলন করিয়া অশ্বপৃষ্ঠে উপ-বেশন করাইয়া দিতেন। এতাদৃশ ঘনিষ্ঠতা, সহসা এতোটা প্রিয়পাত্র হওয়া এবং এত দ্রুত রাজ্যের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনলাভ স্বাভাবিকভাবেই সকলেরই মনে ঈর্ষার সঞ্চার করিত—অন্য কেহ হইলেও এইরূপ হইত। কিন্তু এই অনুগৃহীত

১ আমীরদের প্রধান। ইহা শাহী বংশীদের নিম্নস্তরের সর্বোচ্চ মর্যদা।

ব্যক্তি একজন আবিসিনীয় ক্রীতদাস হওয়ায় ইহা আরও বেশী বেদনাদায়ক হইয়াছিল। লাহোরের সুবাদার মালিক কবির খান সর্বপ্রথম এইরূপ অনুভূতি প্রকাশ্যে ব্যক্ত করা আরম্ভ করেন। তিনি ৬৩৭ হিজরীতে (১২৩৯ খ্রীঃ) অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেন। সৈন্যবাহিনী সজ্জিত করিয়া সুলতানা তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সুবাদারের কয়েকজন সহকর্মী তাঁহাকে পরিত্যাগ করায় তিনি নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং এই প্রকারে ক্ষমতা লাভ করিলেন। এই সময় কবির খান এমন ভাল মানুষের অভিনয় করেন যে তাঁহার আন্তরিকতায় বিশ্বাসী হইয়াই হউক বা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যেই হউক, প্রস্থানকালে সুলতানা তাঁহাকে লাহোরের শাসনকর্তার পদে পুনর্বহাল তো করিলেনই, তদুপরি মুলতানকেও তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দিলেন—কারণ সেই সময় মুলতানের শাসনকর্তার পদ শূন্য হইয়াছিল।

এই বৎসরই বিতুণ্ডার শাসনকর্তা মালিক আল্‌তুনিয়া (চেলগানীর তুর্কী বংশোদ্ভূত) কাফ্রীর প্রতি সুলতানার পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই সংবাদ পাইয়া সুলতানা বিতুণ্ডাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। কিন্তু প্রায় অর্ধপথ গমনের পর তাঁহার সেনাবাহিনীর সমস্ত তুর্কী সেনাপতিরা বিদ্রোহ করিল। ফলে এক ভীষণ বিভ্রান্তিকর দাঙ্গা শুরু হইল এবং সেই দাঙ্গায় সুলতানার প্রিয়পাত্র কাফ্রী ইয়াকুত নিহত হইল। সুলতানাকে বন্দী অবস্থায় বিতুণ্ডায় আল্‌তুনিয়ার নিকট প্রেরণ করা হইল।

অতঃপর সেনাবাহিনী দিল্লী ফিরিয়া আসে এবং তুর্কী সেনাপতিরা মরহুম শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাসের অন্যতম পুত্র—সুলতানার ভ্রাতা শাহজাদা বৈরামকে সিংহাসনে বসাইলেন। ইত্যবসরে মালিক আল্‌তুনিয়া সম্রাজ্ঞীকে শাদী করিয়া ফেলেন এবং তাঁহার সহযোগিতায় অতি অল্পকাল মধ্যে গোক্কর, জাট ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অন্যান্য অধিবাসীদের মধ্য হইতে এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন। এই সেনাবাহিনীতে অনেক বিখ্যাত সেনাপতিও যোগদান করিল। এই বাহিনী লইয়া তাঁহারা দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। নূতন সুলতান বৈরাম সুলতানাকে বাধাদান করিবার জন্য শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাসের জামাতা মালিক আইজ-উদ-দীন বুলবনকে (পরে আলুফ খান নামে পরিচিত) দিল্লী বাহিনীর সেনাপতিরূপে প্রেরণ করিলেন। দিল্লীর অনতিদূরে দুই বাহিনী

পরস্পরের সম্মুখীন হইলে। এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ হইল। তাহাতে পরাজিত হইয়া সুলতানা বিতুণ্ডায় পালাইয়া গেলেন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার বিক্ষিপ্ত সেনাদলকে পুনঃ সম্মিলিত করিলেন এবং রাজমুকুটের জন্য আর এক দফা চেষ্টা করিবার মত অবস্থা হওয়ায় তিনি পুনরায় দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তাহাকে বাধাদানের জন্য পুনরায় মালিক আইজ-উদ-দীন বুলবনকে প্রেরণ করা হইল। একই বৎসরে ৪ঠা রবি-উল-আউয়াল কাইতুন নামক স্থানে তিনি সুলতানার বাহিনীকে দ্বিতীয়বার পরাস্ত করিলেন (৬৩৭ হিঃ, ১২৩৯ খ্রীঃ ২৪শে অক্টোবর)।

পলায়নকালে সুলতানা ও তাঁহার স্বামী জমিদারগণ কর্তৃক ধৃত হন এবং সেই মাসেরই ২৫ তারিখে তাঁহাদের উভয়কে বধ করা হয়। একজন ঐতিহাসিক বলিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের বাঁধিয়া বৈরামের নিকট হাজির করা হইয়াছিল এবং বৈরাম তাঁহাদিগকে কারাগারে হত্যা করিবার হুকুম দিয়াছিলেন। সুলতানা রাজিয়া বেগমের রাজত্বকাল তিন বৎসর ছয়মাস ও ছয়দিন স্থায়ী হইয়াছিল।

যাঁহারা এই হতভাগিনী সুলতানার ভাগ্যবিড়ম্বনার কথা চিন্তা করেন, তাঁহারা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন—কোথা হইতে সেই দম্‌কা হাওয়া আসিয়া তাঁহার জীবনের সমস্ত সম্ভাবনাকে নির্বাপিত করিয়া দিল। কোথায় দিল্লীর আমীরুল ওম্‌রাহের পদ আর কোথায় এক জন হাব্‌সী ক্রীতদাস—এ দুয়ের মধ্যে যোগসূত্র কি? আর এক বিশাল সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী এমন এক অপাত্রে তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করিলেন, তাহারই বা সদুত্তর কি?

মুইজ-উদ-দীন বৈরাম

[সিংহাসনারোহণ। ইখতিয়ার-উদ-দীন আলপ্তগীন ও খাজা মেহ্দীর অপরিমিত ক্ষমতালাভ। সুলতান কর্তৃক প্রকাশ্য দরবারে তাহাদিগকে খুন করাইবার চেষ্টা। আলপ্তগীন নিহত এবং খাজা মেহ্দীর আহতাবস্থায় পালাইয়া প্রাণ রক্ষা। সুলতানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র এবং সুলতান কর্তৃক সেই ষড়যন্ত্র আবিষ্কৃত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ক্রমান্বয়ে দরবার হইতে অপসারণ এবং সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত গুপ্তঘাতকের হস্তে তাঁহারা নিজ নিজ এলাকায় নিহত। চেঙ্গিশ খানের মোঙ্গল বাহিনীর পাঞ্জাব আক্রমণ ও লাহোর অবরোধ। আক্রমণকারীদিগকে বাধাদান নিমিত্ত সুলতানের এক সৈন্যবাহিনীসহ উজিরকে প্রেরণ। উজির কর্তৃক সৈন্যদলকে সুলতানের আনুগত্য অস্বীকার করিতে প্ররোচিতকরণ। উজিরের পরিচালনাধীনে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য সেনাবাহিনীর দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা। শহরবাসীদের দ্বারা সুলতানকে শত্রুহস্তে সমর্পণ। সুলতান প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত।]

সুলতানা রাজিয়া বেগমকে যখন বিতুণ্ডায় কয়েদ করা হয় তখন তাঁহার ভ্রাতা শাম্‌স-উদ-দীন আলতামাসের অন্যতম পুত্র বৈরাম ৬৩৭ হিজরীর (১২৪০ খ্রীঃ ২১শে এপ্রিল) ২৭শে রমজান সোমবার তখ্‌তে আরোহণ করেন। ইখতিয়ার আলপ্তগীন খাজা মেহ্দী গজনভীর সাহায্যে সুলতানের ভগ্নী—ভূতপূর্ব কাজী ইখতার উদ-দীনের বিধবা পত্নীকে শাদী করিয়া ক্রমান্বয়ে সমস্ত রাজকার্য নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে আনয়ন করেন। তিনি তাহার তোরণে হাতী[১] রাখিতে লাগিলেন, যে মর্যাদা শুধু সুলতানের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ইহাতে সুলতানের মনে ভীষণ ঈর্ষার সঞ্চার হইল। উজির ও আলপ্তগীণকে হত্যা করিবার জন্য সুলতান দুইজন তুর্কী ক্রীতদাস নিযুক্ত করিলেন। পানোন্মত্ততার ভাণ করিয়া তাহারা হত্যাকার্য সমাধা করিবে তাহাদিগকে এইরূপ পরামর্শ দেওয়া হইল। এই ষড়যন্ত্রানুযায়ী একদিন সুলতান যখন জনসাধারণকে দর্শনদান করিতেছিলেন, তখনই এই দুই তুর্কী গোলাম ভীড় ঠেলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া মাত্‌লামী শুরু

১ আমার মনে হয় এই সময় হাতীকে রাজ পশু মনে করা হইত। প্রদেশের শাসকদিগকে হাতী রাখিতে দেওয়া হইত। কিন্তু রাজধানীতে সব হাতী সুলতানের নিকট প্রেরণ করা হইত। রাজাদের একচেটিয়াভাবে হস্তী ব্যবহারের প্রথা এখনও শ্যামদেশে প্রচলিত আছে।

করিয়া দেয়। আলপ্তগীন ওম্‌রাহদের প্রথম সারিতে ছিলেন। ইহাদিগকে বাহির করিয়া দিবার জন্য তিনি যেই আগাইয়া উহাদের নিকটে আসিলেন আর অমনি উহারা তাহার বক্ষে খঞ্জর বসাইয়া দিয়া উজিরের দিকে ছুটিল এবং উজিরের দেহে দুইটি গুরুতর আঘাত করিল।

কিন্তু মারাত্মকভাবে আহত হইবার পূর্বেই তিনি কোনপ্রকারে জনতার মধ্য দিয়া পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করেন। ক্রীতদাসদ্বয়কে অবশ্য তৎক্ষণাৎ ধরিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হইল। কিন্তু অল্পকাল পরেই তাহাদিগকে বেকসুর খালাশ দেওয়া হইল।

আঘাতের দরুন উজিরকে কিছুদিন শয্যাশায়ী থাকিতে হইল। কিন্তু আরোগ্যলাভের পরেই তিনি দরবারে হাজির হইলেন—যেন কিছুই ঘটে নাই। সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য বদর-উদ-দীন মকর রুমী এক ষড়যন্ত্র করিলেন এবং এতদুদ্দেশ্যে নিজেকে দরবারের এক শক্তিশালী দলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিলেন। ১৭ই সফর সোমবার ৬৩৮ (৮ই সেপ্টেম্বর, ১২৪০) ষড়যন্ত্রকারীরা তাজ-উদ-দীন কোতোয়ালের গৃহে সমবেত হইল। তাজ-উদ-দীন অবশ্য ভীত হইয়া সুলতান ও উজির উভয়কে সমস্ত ব্যাপার অবগত করাইলেন। সুলতান তাঁহার এক বিশ্বস্ত ভৃত্যকে পাগল সাজিয়া সেই সভায় কি কথাবার্তা হয় তাহা শুনিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। উজির গোপনে এই ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কিন্তু কোন অজুহাতে সেই দিনের পরামর্শ সভায় যোগদানের দায়িত্ব এড়াইয়া গিয়াছিলেন।

সুলতান গোপনে যে ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্রকারীদের আলোচনা শ্রবণ করিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাঁহার ও কোতোয়ালের বিবরণ এক হইল। সুলতান তৎক্ষণাৎ বাড়ী ঘেরাও করিয়া উহাদিগকে গ্রেফতার করিবার জন্য একদল অশ্বারোহী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা পূর্বাহ্নেই ইহার আভাস পাইয়া ঘোড় সৈন্যদের আগমনের পূর্বেই ভাগিয়া পড়িলেন। পরদিনই অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা বদর-উদ-দীন সফরকে বাদায়ুনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল এবং অপর ব্যক্তি—কাজী জালাল-উদ-দীন কাসানীকে চাকুরী হইতে অপসারিত করা হইল। কয়েক মাসের মধ্যে বদর-উদ-দীন ও তাজ-উদ-দীন সুলতান কর্তৃক নিয়োজিত আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলেন এবং কাজী শাম্‌স্‌-উদ-দীন হস্তী পদতলে নিষ্পিষ্ট হইলেন। কারণ তিনিও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বিনা বিচারে এবং বিনা

অভিযোগে এইসব কাণ্ড সংঘটিত হইতে থাকায় সকলের মনে স্বভাবতঃই আতঙ্কের সঞ্চার হইল। বিক্ষুব্ধদল এই আতঙ্কের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিয়া সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ ঘটানোর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উজির খাজা মেহ্দী গোপনে ইহার ইন্ধন যোগাইতে লাগিলেন। কেননা সুলতান যে তাঁর প্রাণ-নাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে কথা তিনি বিস্মৃত হইতে পারেন নাই।

ইত্যবসরে সংবাদ আসিল: ১৬ই জমাদিউল আখের সোমবার[২] (৬৩৯ হিঃ, ১২৪১ খ্রীঃ ২২শে নভেম্বর) চেঙ্গিশ খানের মোগল বাহিনী লাহোর পরিবেষ্টন করিয়াছে, মালিক কারাগুজ সৈন্যদিগকে বিদ্রোহভাবাপন্ন লক্ষ্য করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছে এবং দিল্লীর পথেই তিনি রওয়ানা হইয়াছেন। আর শত্রুরা লাহোর লুণ্ঠন করিয়াছে এবং বহু সংখ্যক অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছে।

এই জরুরী অবস্থায় সুলতান শ্বেতপ্রাসাদে এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিলেন। সেই সভায় স্থির হইল যে মোগলদিগকে বাধাদানের জন্য উজির ও মালিক কুতুব-উদ-দীন হাসান ঘুরীকে (ভকিলুস-সুলতানাত্) অন্যান্য সেনা-পতিদের সঙ্গে লাহোরাভিমুখে পাঠানো হইবে। সেনাবাহিনী বিয়াস নদী পর্যন্ত (যেখানে বর্তমানে সুলতানপুর শহর অবস্থিত) আসিয়া পৌঁছিলে উজির সেনাপতিদের মনে বিদ্রোহের বীজ বপন করিতে আরম্ভ করিলেন—কারণ, সুলতানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হইবার তাঁহার যথেষ্ট কারণ ছিল। এই অভিসন্ধি সুষ্ঠুরূপে হাসিল করিবার উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজন আমীরের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ করিয়া সুলতানের নিকটে গোপনে এক পত্র প্রেরণ করিলেন। সেই পত্রে তিনি সুলতানকে এইমর্মে আবেদন জানাইলেন যে, "হয় তিনি স্বয়ং আসিয়া সেনাবাহিনীতে যোগদান করিবেন না হয় ঐসব বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহভাবাপন্ন সেনা-পতিদিগকে নিপাত করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়া তাঁহাকে এবং তাঁহার সহকর্মী কুতুব-উদ-দীন হাসানকে লিখিত আদেশ পাঠাইবেন।" বিগত ষড়যন্ত্রে উজিরের লিপ্ত থাকার কথা সুলতানের মনে ছিল। তবুও তিনি এই কপট-স্বভাব আমীরকে এমনভাবে তাঁর বিশ্বাস অর্জনের সুযোগ দান করিয়াছিলেন যে, এই ক্ষেত্রে সুলতান উজিরের কথা সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিলেন। বৈরাম উত্তরে

২ বিখ্যাত তুর্কী সেনাপতি তুর্মুস্নিন খানের নেতৃত্বে এই আক্রমণ সংঘটিত হইয়াছিল।

জানাইলেন যে, "মৃত্যুদণ্ডই ঐসব সেনাপতিদের যোগ্য শাস্তি। তবে যতদিন তাহাদিগকে অভিযুক্ত করিয়া নির্বিবাদে শাস্তিদান করিতে না পারিতেছেন ততদিন উজির যেন তাহাদিগকে শান্ত রাখেন।" উজির ঠিক ইহাই চাহিয়াছিলেন। তিনি সুলতানের পত্র দেখাইয়া সেনাপতিদের মনে আগুন ধরাইয়া দিলেন এবং কে অভিযোগ করিয়াছিল সে সম্বন্ধে ভুল সংবাদ দিলেন। তিনি নিজেও যেন বিপদগ্রস্ত—এইরূপ ভাব প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। তাহাদের সকলের নিরাপত্তার জন্য তাহাদের মধ্যে আলোচনা হইল এবং সকলে সুলতানের বিরুদ্ধে উজিরকে সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল।

এই ষড়যন্ত্রের সংবাদে সুলতানের চক্ষু খুলিয়া গেল কিন্তু তখন অনেক দেরী হইয়া গিয়াছে। তিনি তখন অত্যন্ত বিচলিত হইয়া দিল্লীর অন্যতম সম্মানিত ও বিদ্বান ব্যক্তি—খাজা কুতুব-উদ-দীন বখ্‌তিয়ার উসীর (শেখ-উল-ইসলাম) বাসভবনে ছুটিলেন এবং তাহাকে শিবিরে যাইয়া বিদ্রোহী সেনাপতিদিগকে বিদ্রোহের পথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে অনুরোধ জানাইলেন। তাঁহার কথা মত শেখ-উল-ইসলাম শিবিরে চলিয়া গেলেন। কিন্তু আপোষ নিষ্পত্তি করিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ইত্যবসরে মুখোস খুলিয়া ফেলিয়া উজির সসৈন্যে রাজধানী অভিমুখে ধাবিত হইলেন। বিদ্রোহী বাহিনী সাড়ে তিন মাসকাল দিল্লী অবরোধ করিয়া রহিল। শেষে দিল্লীর নাগরিকদের মধ্যেও অসন্তোষ ছড়াইয়া পড়িল। ৬৩৯ হিজরী, ৮ই জিলকদ সোমবার (মে ১০, ১২৪১ খ্রীঃ) দিল্লীর পতন ঘটিল এবং বৈরাম কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দুই বৎসর একমাস পনর দিন রাজত্বের পর কারাগারেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

আলা-উদ-দীন মসউদ

[জ্যেষ্ঠ মালিক আইজ-উদ-দীন বুলবন কর্তৃক রাজ-ক্ষমতা হস্তগত করিবার প্রচেষ্টা। ঐ দিনই তাঁর সিংহাসনচ্যুতি এবং রুকুন-উদ-দীন ফিরোজের পুত্র আলা-উদ-দীন মসউদের সিংহাসনে উপবেশন। নিজাম-উল-মুল্‌ক উপাধিসহ খাজা মেহদী উজিরের পদে বহাল কিন্তু অল্পকাল মধ্যেই গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে তাঁহার জীবনাবসান। তিব্বতের পথে বাঙ্গালাদেশে মোগল আক্রমণ। দিল্লী হইতে প্রেরিত সেনাপতি কারাবেগ তাইমুর কর্তৃক তাহাদিগকে বিতাড়িত। মোগলদের পশ্চিম দিকে উচা আক্রমণ। সুলতানের বাধাদানে অগ্রসর। সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তন ও ইন্দ্রিয়সুখে নিমজ্জমান এবং অত্যন্ত হৃদয়হীন আচরণ আরম্ভ। ওমরাহদের সুলতানের চাচা নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে বাইরাখে হইতে আসিয়া সিংহাসনারোহণের জন্য আমন্ত্রণ। আলা-উদ-দীন মসউদ সিংহাসনচ্যুত ও কারারুদ্ধ এবং কারাগারেই তাঁহার জীবন প্রদীপ নির্বাপিত।]

বৈরাম মৃত্যু পেয়ালায় চুমুক-দিবার পর বয়োজ্যেষ্ঠ আইজ-উদ-দীন বুলবন একটা দল গঠন করিয়া জোরপূর্বক শাহীমহলে প্রবেশ করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিলেন এবং শহরময় ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, তিনিই এখন সুলতান। ওমরাহদের বৃহত্তর অংশ তাঁহার এইরূপ জবরদস্তি সিংহাসনাধিকারে অসন্তুষ্ট হইয়া শাম্‌স্‌-দীন-দীন আলতামসের পুত্র শাহজাদা নাসির-উদ-দীন ও জালাল-উদ-দীন এবং রুকুন-উদ-দীন ফিরোজের পুত্র শাহজাদা আলা-উদ-দীন মসউদকে কারামুক্ত করিয়া দিলেন। অতঃপর আলা-উদ-দীন মসউদকে সেই দিনই সিংহাসনে বসাইলেন—যেদিন আইজ-উদ-দীন বুলবন উহা দখল করিয়াছিলেন। খাজা মেহদীর নিজাম-উল-মুল্‌ক উপাধি ও ওজারত বহাল থাকিল এবং তাঁহার সহকারী হইলেন কুতুব-উদ-দীন হাসান ঘুরী। লাহোরের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা মালিক কারাগুজ, আমীর হাজিব নিযুক্ত হইলেন।

এবারেও উজিরের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইল। কিন্তু তাঁহার উদ্ধত ও অহমিকা-পূর্ণ আচরণে ওমরাহগণ অত্যন্ত বিরক্তিবোধ করিতে লাগিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়া উঠিল। ৬৪০ হিজরীর ২রা জমাদিউল আউয়াল রোজ বুধবার (অক্টো ১২৪২ খ্রীঃ) হাউজ-ই-রাণীর ময়দানে শিকার

করিবার কালে তাহারা কোন প্রকারে আততায়ীর দ্বারা উজিরকে খুন করাইলেন। নজম-উদ-দীন আবুবকরকে ওজারতের পদ প্রদান করা হইল। কনিষ্ঠ গিয়াস-উদ-দীন বুলবন আমীর নিযুক্ত হইলেন এবং জ্যেষ্ঠ আইজ-উদ-দীন বুলবনকে নাগোর, সিন্ধু ও আজমীরের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল। এই সময় মালিক তাজ-উদ-দীন তুর্কীকে বাদায়ুন পরগনা প্রদান করা হইল। অন্য প্রদেশগুলি বিভিন্ন আমীরদের মধ্যে তাঁহাদের মর্যাদা ও পছন্দ অনুযায়ী বণ্টন করিয়া দেওয়া হইল। এইসব ব্যবস্থার ফলে মনে হইল ওমরাহদের মধ্যে পূর্ণ শান্তি ও সন্তোষ বিরাজ করিতেছিল। এই সময় আইজ-উদ-দীন তোগান খান—যিনি সসৈন্যে কারা হইতে লক্ষণাবতী গমন করিয়াছিলেন—তিনি শরিফ-উল-মুল্‌ক সাংকিরীকে দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহাকে সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা হয় এবং প্রস্থানকালে অযোধ্যার শাসনকর্তা কাজী জালাল-উদ-দীন মারফত তাঁহাকে একটা লোহিত বর্ণ ছত্র[১] এবং তাঁহার মালিকের জন্য তাঁহাকে একটা চমৎকার পোশাক প্রদান করা হয়। সুলতান এই সময় তাঁহার পিতৃব্য শাহজাদা নাসির-উদ-দীন মাহমুদকে বাইরাকের শাসনকর্তা এবং অন্য পিতৃব্য শাহজাদা জালাল-উদ-দীনকে কনৌজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। ইহারা উভয়েই তাহাদের ভ্রাতা বৈরাম কর্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন।

৬৪২ হিজরীতে (১২৪৪ খ্রীঃ) মোগল তাতারদের এক বাহিনী খাত্রী ও তিব্বতের[২] দিক হইতে বাঙ্গালাদেশে প্রবেশ করে। যে পথে বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী[৩] বাঙ্গালা হইতে তিব্বত ও খাত্রী জয় করিতে গিয়াছিলেন। এই তাতাররা সেই পথেই আসিয়াছিলেন বলিয়া মনে করা হয়। মসউদ বাঙ্গালার সুবাদার তোগান খানের সাহায্যার্থে মালিক কারাবেগ তাইমুরকে প্রেরণ করেন। মোগলরা সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। কিন্তু শীঘ্রই মালিক কারাবেগ ও তোগান খানের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি

---

১ ছত্র একমাত্র নরপতি এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রাদেশিক শাসনকর্তারা ব্যবহার করিতে পারিতেন। ইহা এখনও এতই সম্মানীয় চিহ্নরূপে গণিত হয় যে, রাজার আদেশ ভিন্ন ব্যবহার করা যায় না।

২ এই বিবরণ সত্য হইলে ইহা অত্যন্ত কৌতূহলজনক।

৩ মালিক মুহাম্মদ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী হয় নেপাল না হয় আসামের মধ্য দিয়া চীন-তাতার অঞ্চলে অভিযান করিয়াছিলেন। নেপাল না আসাম তাহা নির্ণয় করা কঠিন—তবে সম্ভবতঃ আসাম।

হইল এবং তাহারা শেষ পর্যন্ত প্রকাশ্যে সংঘর্ষে প্রবৃত্ত হইলেন। সুলতান মালিক কারাবেগকে শাসনভার ছাড়িয়া দিয়া তোগান খানকে দিল্লী ফিরিবার নির্দেশ দান করিলেন। পর বৎসর সংবাদ আসিল যে, কান্দাহার ও তালিখান হইতে আর এক মোগলবাহিনী মঙ্গু খানের পরিচালনাধীনে সিন্ধু নদ পর্যন্ত আগাইয়া আসিয়া উচা পরিবেষ্টন করিয়াছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ তাঁহার সেনাবাহিনীকে ময়দানে সমবেত হইবার হুকুম জারি করিলেন এবং নিজে এই বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া শত্রুর বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। তিনি বিয়াস নদীর তীরে আসিয়া উপনীত হইলে মোগলরা অবরোধ ত্যাগ করিয়া পশ্চাদাপসরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা দেশের সম্পূর্ণ বাহিরে চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিলেন।

এই ঘটনার অনতিকাল পরেই সুলতান সুরা ও কামিনীতে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলাইয়া দিলেন এবং তাঁহার উজির ও বন্ধুদের সদুপদেশে কর্ণপাত না করিয়া নানাবিধ নৃশংস কার্য, অবিচার ও অত্যাচার চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার তরলমতিত্ব ও স্বৈরাচারের নিকট নতিস্বীকার করিতে অনিচ্ছুক শাহজাদা ওমরাহ্-গণ সুলতানের চাচা নাসির-উদ্দীনকে বাহরাখ হইতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি আজ্ঞাধীন সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়া রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং আসিয়া দেখিলেন যে, নির্বোধ মসউদ ইতিপূর্বেই, ৬৪৪ হিজরীর ২০শে মহর্‌রম (জুন, ১০, ১২৪৬ খ্রীঃ) সিংহাসনচ্যুত হইয়াছেন এবং ওমরাহগণ তাঁহাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড প্রদান করিয়াছেন। মসউদ চারি বৎসর এক মাস এক দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন।

নাসির-উদ-দীন মাহমুদ

[সুলতানের অভিষেক। পূর্ব ইতিহাস। তাঁহার সাহিত্যানুরাগ। চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যতা। সুলতানের ভগ্নীপতি গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের উজির নিযুক্তি। মোগল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য বুলবনের ভ্রাতুষ্পুত্রকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্তা মনোনীত। সুলতান কর্তৃক উজিরের স্কন্ধে সমস্ত শাসনভার অর্পিত। সুলতানের মুলতান গমন। অনুপ্রবেশকারী মোগলদের সঙ্গে সহযোগিতা করার দায়ে উজির কর্তৃক গোক্করদিগকে আক্রমণ ও পরাভূত করণ এবং তাহাদের কয়েক সহস্র লোককে ক্রীতদাসকরণ। কতিপয় ওমরাহের পাঞ্জাবে সামন্ততান্ত্রিক ভিত্তিতে জমিদারী রাখা। সেইসব ওম্‌রাহকে দরবারে আসিয়া বাস করিতে আদেশ দান এবং তাঁহাদের পুত্রদিগকে জমিদারীতে রাখা। সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তন এবং পরে যমুনা ও গঙ্গার মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলে গমন। কয়েকজন হিন্দু রাজাকে দমন। তাঁহার রনথম্বর গমন। সুলতান কর্তৃক তাঁহার ভ্রাতা জালালকে কনৌজ হইতে আসিতে নির্দেশ দান। জালালের চিতোরে পলায়ন। সুলতান কর্তৃক উজির বুলবনের কন্যাকে শাদী। সেই সম্প্রদায়ের অন্য প্রধান ব্যক্তি আইজ-উদ-দীন বুলবনকে নাগোর ও উচার শাসনকর্তা নিযুক্তি। তাঁর বিদ্রোহ। তাঁহাকে ক্ষমা। সুলতানের নারোয়ার অবরোধ ও অধিকার। চান্দেরী এবং মালবের কতকাংশ সুলতানের সৈন্য কর্তৃক বিজিত ও অধিকৃত। উজিরের ভ্রাতুষ্পুত্র পাঞ্জাবের শাসনকর্তা শের খানের সসৈন্যে গজনী গমন ও মোগলদিগকে বিতাড়িতকরণ। উচা ও নাগোর শের খানের শাসানাধীন করিয়া দেওয়া। ইমাদ-উদ-দীন জুনজানি উজির গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বুলবনের জমিদারী হান্‌সীতে গমন। তাঁহার নিকট হইতে হান্‌সী কাড়িয়া লওয়া। প্রাক্তন উজিরের বিদ্রোহ ঘোষণা। দরবারের আমীর ওমরাহগণের তাঁহাকে সমর্থন। তাঁহাকে পুনরায় পূর্বপদে বহাল। প্রাক্তন উজির ইমাদ-উদ-দীন জুনজানীর বিদ্রোহ। তাঁহার পরাজবরণ এবং মৃত্যুদণ্ড ভোগ। কুতলুগ খানের বিদ্রোহ। সিন্ধুর শাসনকর্তার তাঁহার সঙ্গে যোগদান। তাঁহার উজির বুলবনের হস্তে পরাস্ত। সিন্ধুর সুবাদারের নিজ এলাকায় প্রত্যাবর্তন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু। কুত্‌লুগ খান নিখোঁজ। মেওয়াটের রাজপুতদের বিদ্রোহ। উজির কর্তৃক তাহাদিগকে আক্রমণ। প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়া বহু ক্ষতির সঙ্গে মেওয়াটিদিগের পরাজয়বরণ। ইহাদের দুইশত বন্দী সেনানায়ককে হত্যা। পারস্যাধিপতি হালাকুর দূতকে সাদর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন। নাসির উদ-দীনের চরিত্র। তাঁহার মৃত্যু।]

আমরা পূর্বেই বলিয়াছি যে, সুলতান আলতামাসের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাঙ্গালায় ইন্তেকাল করিবার পর তিনি তাহার কনিষ্ঠ পুত্র মাহমুদকে সেই প্রদেশের শাসনকর্তা মনোনীত করেন এবং তাঁহাকেও নাসির-উদ-দীন উপাধি প্রদান করেন। শুধু কাগজ কলমেই তাঁহাকে শাসনকর্তা নির্বাচন করা হয়। কারণ, দায়িত্বভার গ্রহণ করার মত বয়স তখনও মাহমুদের ছিল না। তাঁহার পিতার হৃদয়হীন বেগম শাহ্-তুর্খান তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং সাবেক সুলতান মসউদ কর্তৃক মুক্তি প্রদানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কারাগারেই ছিলেন। মসউদ তাঁহার উপর বাহ্‌রাথের শাসনকর্তার দায়িত্ব অর্পণ করেন। শাসনকর্তারূপে তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে কাফেরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাইয়া ছিলেন এবং স্বীয় প্রদেশকে সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায়বিচার ও সুশাসনের খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল এবং বিগত বিপ্লবকালে আমীরগণ উত্তরাধিকার নির্বাচনের সময় সঙ্গতভাবেই তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে তিনি তাঁহার পিতা শামস্-উদ-দীন আলতামাসের সিংহাসন প্রাপ্ত হন। কিন্তু জন্মগত অধিকার ছাড়াও জ্ঞান, সাহস, বিদ্যা ও অন্যান্য গুণে তিনি এমন গুণান্বিত ছিলেন যে সিংহাসন যেন তাহার উপবেশনে অলঙ্কৃত হইয়াছিল। কারাজীবনে সরকারী ভাতার পরিবর্তে নিজের লেখা দ্বারা উপার্জিত অর্থে নিজের ভরণপোষণ করাই তিনি শ্রেয় মনে করিতেন এবং তিনি প্রায়ই বলিতেন, যে ব্যক্তি রুটির জন্য মেহনত করে না সে রুটি পাইবার যোগ্য নয়। সিংহাসনারোহণ করিয়া তিনি বিদ্যার পৃষ্ঠপোষক, প্রজাদের রক্ষক ও দরিদ্রের বন্ধুতে পরিণত হইলেন। তাঁহার অভিষেককালে ইনামের জন্য কবিদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল এবং যিনি পরে 'তাব্‌কাত-এ-নাসিরী' প্রণয়ন করিয়া সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন—সেই মিনহাজ-উস-সিরাজ জুরজানী ইনামপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মালিক-গিয়াস-উদ-দীন বুলবন (কনিষ্ঠ) উজারতের আসন প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমে শামস্-উদ-দীন আলতামাসের ক্রীতদাস ছিলেন এবং পরে প্রভুকন্যার পানি গ্রহণ করেন। বুলবন এইবার আলঘ খান খেতাব প্রাপ্ত হন এবং রাজ্য পরিচালনার সমস্ত ক্ষমতা তাঁহার উপর অর্পিত হয়। গিয়াস-উদ-দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র শের খানকে মা-আজিম খেতাব সহ পাঞ্জাব, মুলতান, ভাটনিয়ার ও সারহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হইল।

মোগলদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাঁহাকে স্থায়ী সেনাবাহিনী রাখিবার নির্দেশ দান করা হয়। মোগলরা এই সময় গজনী, কাবুল, কান্দাহার বল্খ্ প্রভৃতি অঞ্চল সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। এইরূপ বর্ণিত আছে যে, গিয়াস-উদ-দীন বুলবনকে (কনিষ্ঠ) উজিরের পদ প্রদানকালে নাসির-উদ-দীন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনার বিশ্বস্ততা ও সদাচারের উপর আমার সম্মানকে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল করিয়া রাখিলাম, আশা করি আপনি এমন কিছু করিবেন না যাহার জন্য আমি আল্লার নিকট জবাবদিহি করিতে অপরাগ হইব"। উজির প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন যে তিনি সুলতানের বিশ্বাসের মর্যাদা রক্ষা করিবেন। তিনি অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা রাজকার্য এমন-ভাবে সুনিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিলেন যে কোন কিছুই তাঁহার চক্ষু এড়াইতে পারিত না এবং তাহার দৃষ্টির অন্তরালে কোন কিছুই সংঘটিত হইতে পারিত না।

রজব মাসে সুলতান মুলতানাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। সেনাবাহিনী সোদ্রা নদী তীরে কিছুকাল শিবির স্থাপন করিয়া রহিল। সেখান হইতে উজির যুদ্ পর্বতশ্রেণী এবং সিন্ধুর পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির দিকে রওয়ানা হইলেন। এইসব অঞ্চল অধিকৃত হইল এবং রাজ্যে পুনঃ পুনঃ অনুপ্রবেশ করা ও তাহাদের দেশের মধ্য দিয়া মোগলদিগকে পথ দেখাইয়া হিন্দুস্থানে লইয়া আসার অপরাধে, সুলতান গোক্ষরদের উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। এইসব অপরাধীকে ক্ষমার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া সুলতান সকল বয়সের এবং স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে কয়েক সহস্র গোক্ষরকে বন্দী করিয়া লইয়া আসেন।

এইরূপ বর্ণিত আছে যে, সিন্ধুনদের নিকটবর্তী এলাকায় কয়েকজন বৃদ্ধ সেনানায়ক শামস্-উদ-দীন আলতামাস ও কুতুব-উদ-দীন আইবেকের সময় হইতে জায়গীর ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন এবং কিছুদিন যাবৎ তাঁহারা সেনাবাহিনীতে বরাদ্দকৃত সৈন্য প্রেরণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন—যদিও সেই শর্তেই তাঁহারা জমিদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উজিরের পরামর্শানুযায়ী তাহাদিগকে বন্দী করিয়া দিল্লী আনা হইল। কিন্তু সুলতান তাহাদের পুত্র বা আত্মীয়স্বজনকে ঐসব জমিদারী পূর্ববৎ সামরিক শর্তে পুনঃ প্রদান করেন। এইরূপে পাঞ্জাব ও মুলতানাঞ্চলের দেশগুলি সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইল এবং তথায় পুনরায় সুলতানের প্রভুত্ব দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। এই ব্যাপারে

সুলতান যে ব্যবস্থাবলম্বন করেন তাহা আমাকে একটা গল্পের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়—কোথায় পড়েছি ঠিক মনে নাই। মহাবীর "আলেকজাণ্ডার যখন ভারতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন তখন তাঁহার কতিপয় প্রবীণ সেনা-পতি—আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘটাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে কি প্রকারে আয়ত্তাধীনে আনয়ন করা যায়, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া আলেকজাণ্ডার মহা দুশ্চিন্তায় পতিত হন। এই সঙ্কটাবস্থায় বৃদ্ধ শিক্ষা-গুরু অ্যারিস্টটলের পরামর্শ গ্রহণের জন্য তিনি পত্রসহ গ্রীসে এক দূত প্রেরণ করেন। বার্ধক্যজনিত ও শারীরিক দুর্বল-তার জন্য অ্যারিস্টটল আলেকজাণ্ডারের অভিযানে শরীক হইতে পারেন নাই। মহামনীষী অ্যারিস্টটল পত্র পাঠ করিবামাত্র দূতকে সঙ্গে করিয়া উদ্যানে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে যাইয়া মালিকে আদেশ করিলেন, "সব পুরাতন চারাগাছগুলি উঠাইয়া ফেলিয়া তৎস্থানে নূতন নূতন চারাগাছ রোপন কর"। অতঃপর তিনি দূতকে তাঁহার প্রভুর নিকট ফিরিয়া যাইতে বলিলেন—কোন মৌখিক বা লিখিত উত্তর দিলেন না। দূত ফিরিয়া আসিয়া সম্রাটের সম্মুখে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া নিবেদন করিলেন যে সে কোন প্রকার উত্তর প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে কিছুটা বিস্মিত হইয়া আলেকজাণ্ডার গুরুর সঙ্গে পত্রবাহকের সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন এবং পূর্বোক্ত ঘটনার কথা শুনিয়া মৃদু হাসিয়া দূতকে বলিলেন, 'তুমি আমাকে অতি চমৎকার উত্তর আনিয়া দিয়াছ।' ওস্তাদের উপদেশানুযায়ী তিনি বিদ্রোহীভাবাপন্ন কয়েকজন প্রবীণ সেনাপতিকে অপসারণ করিলেন, কয়েক-জনের পদাবনতি ঘটাইলেন এবং তাহাদের স্থানে তরুণ বয়স্ক লোকদিগকে নিয়োগ করিলেন। তাঁহারা অধিকতর বাধ্য ও আজ্ঞানুবর্তী হইল। এই-রূপে তিনি সেনাবাহিনীতে তাঁহার আধিপত্য পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" ৬৪৫ হিজরীর সাবান মাসে (খ্রীঃ ডিসেম্বর, ১২৪৭) নাসির-উদ-দীন মাহমুদ, গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী এলাকার উপর দিয়া সসৈন্যে অগ্র-সর হইয়া বিতুণ্ডা[1] আক্রমণ করেন এবং দৃঢ়তার সঙ্গে অবরোধ চালাইয়া উহাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। অতঃপর তিনি কারার দিকে

১ এই স্থান এখন বুলন্দ শহর নামে পরিচিত।

যুদ্ধযাত্রা করিলেন। গিয়াস-উদ-দীন বুলবন ও যানের অগ্রগামী দলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করেন। কারায় রাজা দু রাজা মুল্কী[২] তাঁহার মোকাবেলায় অগ্রসর হইলেন। বুলবন তাঁ পরাস্ত করিয়া তাঁহাদের সর্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন এবং তাঁহাদের পি অনেককে বন্দী করিয়া লইলেন। এই দুই রাজা যমুনার দক্ষিণের দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন এবং মালব হইতে কারা পর্যন্ত এ মস্ত সুলতানের এলাকার সেনানিবাস ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহারা র বাস করিতেন। এই অভিযানের পর নাসির-উদ-দীন দিল্লী ফিরিয়া ২

৬৪৬ হিজরীর ৬ই সাবান (১২৪৭ খ্রীঃ) াসৈন্যে রনথম্বর ও মেও-য়াটের পার্বত্যাঞ্চল অভিমুখে অগ্রসর হন দেশগুলির অবাধ্য অধি-বাসীদিগকে শায়েস্তা করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন উজিরের অনুজ আইবেক কিস্‌লী খান এই সময় মীর হাজিবের ত হন এবং আইয়াজ রাইহানী ভকিল-উস-সুলতানাত্‌ মনোনীত এই বৎসরই সুলতানের ভ্রাতা জালাল-উদ-দীনকে তাহার সুবা কনৌ ত দিল্লী আসিবার জন্য তলব করা হয়। কিন্তু জালাল-উদ-দীন ই াহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র আশঙ্কা করিয়া সানুচর চিতোরের পার্বত্য ালাইয়া যান। সুলতান স্বয়ং তাহার অনুসরণে গমন করেন। কিন্তু মাস ব্যাপী চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে গ্রেফতার করিতে অসমর্থ হইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। নাসির-উদ-দীন ৬৪৭ হিজরীতে (১২৪৮ খ্রী:) গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের কন্যাকে শাদী করেন। পর বৎসর হিজরী ১২৪৯ খ্রী:) তিনি মুল-তানাভিমুখে সৈন্য চালনা করেন। সুলতা নদীর তীরে আসিয়া উপস্থিত হইলে উজিরের ভ্রাতুষ্পুত্র উওরাক সনকর্তা শের খান, বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাঁহার যোগদান করেন। তিনি মুলতান যাইয়া পৌঁছিলেন এবং সেখানে দিন অবস্থান করিলেন। অতঃপর মালিক আইজ-উদ-দীন বুলবনকে নাগোর ও উচার শাসন-কর্তা নিযুক্ত করিয়া এবং আরও কতকগুলি র মিমাংসা করিয়া তিনি রাজধানী দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন।

২ যে মুসলমান লেখকের লেখা হইতে ফি কল করিয়াছেন—সেখানে নাম ভুল করিয়া লেখা ছিল।

৬৪৯ হিজরীতে (১২৫০ খ্রীঃ) আইজ-উদ-দীন বুলবন আনুগত্য অস্বীকার করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। অগত্যা সুলতানকে নাগোরাভিমুখে সৈন্য চালনা করিতে হইল। বিদ্রোহী পলায়ন করিলেন। কিন্তু পরে সুলতানের করুণার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। উপরন্তু তাঁহাকে পূর্বপদে বহাল করা হয়। এই অভিযান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সুলতান মাত্র কয়েকদিন দিল্লীতে অবস্থান করিবার অবকাশ পাইয়াছিলেন। তারপরই তাঁহাকে নারোর অবরোধে গমন করিতে হয়। রাজা জাহির দেব অল্পকাল পূর্বে পর্বত-শীর্ষে এক দুর্গ নির্মাণ করিয়া উহার রক্ষণ ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। তিনি পাঁচ হাজার অশ্বারোহী এবং দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য লইয়া সুলতান-ফৌজকে বাধাদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। এই বিশাল বাহিনী বিপুল সংখ্যক লোকের প্রাণহানির মধ্য দিয়া পরাজয়বরণ করিল। অতঃপর দুর্গ অবরোধ করা হইল এবং কয়েক মাস অবরোধের পর ইহার পতন ঘটিল। সুলতান সেখান হইতে চান্দেরী ও মালাবাভিমুখে সমরযাত্রা করিলেন। এই রাজ্যগুলি পদানত করিয়া এবং সেখানকার জন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া সুলতান দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। এই অভিযানে অসাধারণ কর্মতৎপতা ও বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া উজির বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

ইত্যবসরে লাহোর ও মুলতানের শাসনকর্তা শের খান এক অশ্বারোহী বাহিনী গঠন ও সুশিক্ষিত করিয়া তাহার সাহায্যে গজনী হইতে মোগল-দিগকে বিতাড়িত করিয়া পুনরায় গজনীকে দিল্লী সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বীরত্ব ও প্রত্যেক রাজকীয় গুণে শের খান নিঃসন্দেহে সে যুগের একজন সেরা লোক ছিলেন। তিনি গজনীতে নাসির-উদ-দীনের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করেন এবং সেই অঞ্চলের সমস্ত প্রদেশের উপর সুলতানের প্রভুত্ব কায়েম করেন। এইসব কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ উচা প্রদেশও তাঁহার শাসনাধীন করা হইল। আইজ-উদ-দীন বুলবন অপ্রত্যাশিতভাবে নীরবে তাঁহার এলাকা ছাড়িয়া দিয়া দিল্লী চলিয়া আসেন। তাঁহাকে বাদায়ুনের জায়গীর প্রদান করা হয়। ৬৫০ হিজরীতে (১২৫২ খ্রীঃ) নাসির-উদ-দীন লাহোরের পথে মুলতান গমন করেন। খিওয়ানের সেনাবাহিনী লইয়া বাদায়ুনের শাসনকর্তা ও কুতলুগ খান তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। ৬৫১ হিজরীর প্রথম ভাগে ইমাদ-উদ-দীন জুনজানী উজিরের প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সুলতানের কর্ণে তাঁহার কুৎসা

পেঁছাইবার সকল সুযোগের সদ্ব্যবহার করিতে ান। অথচ এই উজিরের দৌলতেই তিনি বর্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ইহাতে উজিরের প্রতি সুলতানের শ্রদ্ধা স্পষ্টভাবে হ্রাস পাইতে লা ং তাঁহার কারসাজিতে শেষ পর্যন্ত সুলতান তাহাকে উজিরের পদ হই ান্ত করিয়া অন্নসংস্থানের জন্য তাঁহাকে হান্সীতে এক ক্ষুদ্র জমিদারী প্রদা ন। সেখানেও তাঁহার শত্রু তাঁহার প্রাণনাশের সুযোগ খুঁজিতে থাকেন

উজিরের উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী ইমাদ-উদ-দীন র সুলতানের অনুগ্রহের পূর্ণ অধিকারী হইলেন। তিনি সাবেক উজি গ্রহে যাঁহারা চাকুরী পাইয়াছিলেন, নবলব্ধ ক্ষমতাবলে তাঁহাদিগকে পদ হইতে অপসারণ করিতে লাগিলেন। আইবুক কিশ্‌লী খানকে মানিকপুর প্রেরণ করা হইল এবং ভূতপূর্ব নিজাম-উল-মুল্ক জুনাইদী াইনুল্ মুল্ক মুহাম্মদকে সুলতানের দিল্লী আগমনের পূর্ব পর্যন্ত সম য় উজির-কুল বা রাজ প্রতিভূ মনোনীত করা হইল। ইমাদ-উদ-দীন ীন হইয়া দেশের শান্তি বিপন্ন করিলেন এবং রাজ্যের সমস্ত পুরাতন বাতিল করিয়া দিলেন। ইতিমধ্যে সুলতানকে বিয়াস অভিমুখে সমর যা ত হইল। কারণ, সম্প্রতি শের খান সিন্ধুর একদল বিদ্রোহী বাহিনীর রাজিত হইয়া মুলতানে কয়েকটি দুর্গ হারাইয়াছিলেন। সুলতানের ি এইবার সুলতানের চক্ষে শের খানকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার এক সু ভ করিলেন। সুলতান তাঁহাকে শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারণ করিলে তাহার স্থানে আরসালান খানকে নিয়োগ করিলেন। এই সময় কাইতু কোহ্‌রামের শাসনকর্তা জমিদারদের হস্তে নিহত হন। এজন্য সুলতা সেখানে সসৈন্যে গমন করিতে হইল।

ইমাদ-উদ-দীন জুন্‌জানীর শাসন এমন অস হইয়া উঠিল যে কারা, মানিকপুর, অযোধ্যা, বাদায়ুন, সারহিন্দ, সামান রাম, লাহোর, সেবালিক ও নাগোরের শাসনকর্তারা মিলিত হইয়া প্রাক্তন গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের নিকট এক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে : অনুরোধ জানাইলেন যে, "দেশের মঙ্গল বিপন্ন। ইমাদ-উদ-দীন জুন্‌জ ম ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ সহ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছে। সেইজন্য আম কান্ত অনুরোধ, আপনি দিল্লী আসিয়া পূর্বের মত কার্যের লাগাম স্বহস্তে ন।" গিয়াস উদ-দীন

বুলবন ইহাতে সম্মতিজ্ঞাপন করিলে আমীরগণ তাঁহাদের স্ব স্ব ফৌজ লইয়া একই দিনে কোহরাম আসিয়া সম্মিলিত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়া নাসির-উদ-দীন ও তাঁহার উজির ইমাদ-উদ-দীন বিদ্রোহীদিগকে বিতাড়িত করিবার জন্য আগাইয়া আসিলেন। সুলতানী ফৌজ হান্‌সী পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলে গিয়াস-উদ-দীন বুলবন ও আমীরগণ একত্রে এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন: "তাহারা সুলতানের অনুগত প্রজা। সুলতান যদি ইমাদ-উদ-দীনকে দূরে সরাইয়া দিতে সম্মত হন তবে তাহারা হৃষ্টচিত্তে সুলতানের তখ্‌তের পায়া চুম্বন করিবেন।" সুলতান দেখিলেন হয় তাঁহাকে এই প্রস্তাবে সম্মত হইতে হইবে না হয় রাজ্য হারাইতে হইবে। সুতরাং সেই কুখ্যাত 'প্রিয়পাত্রকে' সরাইয়া বাদায়ুন প্রেরণ করিতে হইল। আমীররা আসিয়া সুলতানকে নজরানা দিলেন এবং সুলতানের পক্ষ হইতে তাহাদিগকে সম্মানসূচক খেলাত প্রদান করা হইল। খাজাতাস নামক স্থানের, তুর্কী সম্প্রদায়ের লোক মালিক জালাল-উদ-দীন খানীকে লাহোরের কর্তৃত্ব প্রদান করা হইল এবং শের খানকে তাঁহার প্রাক্তন সুবায় পুনর্বহাল করা হইল। অতঃপর নাসির-উদ-দীন হৃষ্টচিত্তে দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। যে উজির তাঁহার শাসন দ্বারা প্রজাদের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করিয়াছিলেন, সেই উজিরের পুনঃ দর্শনলাভকালে সুলতান তাঁহার আনন্দাবেগ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই।

৬৫৩ হিজরীতে (১২৫৬ খ্রীঃ) মাতা মালিকা জাহানের সঙ্গে সুলতানের বিরোধ বাঁধিল। শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাসের মৃত্যুর পর মালিকা বেগম সাইফ-উদ-দীন কুতলুগ খান নামক এক ওমরাহকে শাদী করেন। নাসির-উদ দীন মাতাকে দিল্লী হইতে সরাইবার উদ্দেশ্যে তাহার স্বামীকে অযোধ্যার শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন এবং ইহার অল্পকাল পরেই তাঁহাকে বাইরাখে সরাইয়া দেন। এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া কুত্‌লুগ খান বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন এবং প্রাক্তন উজির ইমাদ-উদ-দীন জুনজানী ও কিস্‌লী খানের সহিত মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। উজির গিয়াস-উদ-দীন বুলবন তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধে বিদ্রোহীদের পরাজয় ঘটিল এবং ইমাদ উদ-দীন জুনজানী বন্দী হইলেন। তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হইল। কিন্তু কুতলুগ খান কোন প্রকারে পলাইয়া নিষ্কৃতি পাইলেন। তিনি চিতোরে পলায়ন করিলেন। সেখানে যে দুর্গে কুতলুগ খান আত্মরক্ষার জন্য আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছিলেন, উজির সেই দুর্গ ধ্বংস ক লিলেন। কিন্তু কুতলুগ-
খান ধরা পড়িল না। অতঃপর উজির দিল্লী । আসেন। সাতনুরের*
রাজা ৬৫৫ হিজরীতে (১২৫৭ খ্রীঃ) কুতলুগ সাহায্যার্থে এক সৈন্য-
বাহিনী গঠন করিলেন। সিন্ধের সৈন্যরা আসি সঙ্গে যোগদান করিল।
সিন্ধুর শাসনকর্তাও এই ষড়যন্ত্রে সংশ্লিষ্ট ছিলে লিত বাহিনী কোহ্রামে
একত্রিত হইলে এক বিশাল সেনাবাহিনীর ধারণ করিল। উজির
পুনরায় ময়দানে নামিলেন। কিন্তু এই সময় তাহার শিবিরে এক রাজ-
দ্রোহমূলক ষড়যন্ত্রের সূত্র আবিষ্কার করিলেন। গল যে, তাঁহার কয়েকজন
সেনানায়ক দিল্লীর কয়েকজন লোকের সঙ্গে ণ এক পরিকল্পনা গ্রহণ
করিয়াছেন যে, উজিরের অনুপস্থিতকালে তঁ বিদ্রোহীদের হস্তে দিল্লী
তুলিয়া দিলেন। উক্ত মর্মে শিবির হইতে f এক পত্র উজিরের হস্তে
পতিত হওয়ায় তিনি সুলতানকে তৎক্ষণাৎ নাইলেন এবং সুলতান
ষড়যন্ত্রকারীদের সকলকে বন্দী করিলেন।

ইতিমধ্যে পূর্ব-পরিকল্পনা অনুযায়ী একদল অশ্বারোহী সৈন্য দুইদিনে
দুইশত মাইল পথ অতিক্রম করিয়া দিল্লীর আসিয়া হাজির হইল।
কিন্তু তাঁহাদের বন্ধুদের সাক্ষাৎ মিলিল ন ংকে সুলতানদের বাহিনী
তাহাদের উপর চড়াও করিলে তাঁহারা স ভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিল।
সিন্ধুর শাসনকর্তা তাঁহার সুবায় ফিরিয়া গে কিন্তু কুতলুগ খানের কোন
খবর পাওয়া গেল না। এই বৎসরের শেষাংশে গল বাহিনী সিন্ধু অতিক্রম
করিয়াছে শুনিয়া নাসির-উদ-দীন তাহাদিগ দানে অগ্রসর হইলেন।
তাঁহার আগমনে মোগলরা ভাগিয়া গেল। f রের ভ্রাতুষ্পুত্র শের খানের
উপর পাঞ্জাবের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া রাজ ফিরিয়া আসিলেন। এই
সময় মালিক জালাল-উদ-দীন খানীকে বাঙ্গাল করা হইয়াছিল।

৬৫৬ হিজরীতে (১২৫৮ খ্রীঃ) আরসাল ও কুলিচ খানকে শায়েস্তা
করিবার জন্য নাসির-উদ-দীন কারামানিকপু রওয়ানা হইলেন। কারণ,

---

৩ এই স্থানটি কোথায় তাহা আমি নির্ণয় সক্ষম হই নাই। শব্দটা
হয়তো শান্তপুর। আবুর নিকটে এই একটি শহর আছে। ইহা
সিন্ধু প্রদেশের নিকট অবস্থিত। এজন্য হায্যকারী বাহিনীর এখানে
আগমন করা সহজ ছিল।

গত বৎসর সুলতান যখন পাঞ্জাবে যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছেলেন তখন ইহারা সুলতানের আদেশানুযায়ী তাঁহাদের ফৌজ লইয়া সুলতানের সঙ্গে যোগদান করিতে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। এই আমীরদ্বয় কৌশলে সুলতানের ক্রোধানল নির্বাপিত করিলেন এবং আরসালান সুলতানের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিলেন যে, তিনি বাঙ্গালার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন—যাহা মাত্র সেদিন মালিক জালাল-উদ-দীন খানীকে প্রদত্ত হইয়াছিল। জালাল-উদ-দীন তৎপরিবর্তে পর্বতের পাদদেশে কয়েকটি ক্ষুদ্র অঞ্চল প্রাপ্ত হইলেন।

উজিরের ভ্রাতা আইবেক কিশ্‌লী খান ৬৫৭ হিজরীতে (১২৫৯ খ্রীস্টাব্দে) কোল, জালেশ্বর, গোয়ালিয়র ও বিয়ানার শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন। সিন্ধুর বিদ্রোহী শাসনকর্তার মৃত্যু ব্যতীত এ বৎসরের আর কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা নাই। সুলতানের আদেশক্রমে পর বৎসর উজির সেবালিকের পার্বত্যাঞ্চলে ও রনথম্বরের দিকে যুদ্ধ যাত্রা করেন। এইসব অঞ্চলের রাজারা এবং মেওয়াটের রাজপুত অধিবাসীরা উৎপাত শুরু করিয়া দিয়াছিল। অসংখ্য অশ্ব ও পদাতিক সৈন্য লইয়া ইহারা এইসব অঞ্চলে লুটপাট ও অগ্নিকাণ্ড শুরু করিয়া দিয়াছিল। উজিরের আগমনে তাহারা পর্বতের মধ্যে সুরক্ষিত অবস্থানে সরিয়া পড়িল। উজির সেখানেই তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পর্যুদস্ত করিলেন। অতঃপর তিনি চারিমাস যাবৎ তাহাদের দেশে হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড অব্যাহত রাখিলেন। ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া রাজপুতগণ তাঁহাদের সৈন্যদলকে একত্রিত করিল এবং মৃত্যুপণ করিয়া মুসলমানদের উপর নামিয়া আসিতে লাগিল। উজির লক্ষ্য করিলেন যেন এক তুফান নামিয়া আসিতেছে। আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য উজির তাঁহার সৈন্যদলকে সজ্জিত করিবার অবসর পাইলেন না। শত্রুরা এমন প্রচণ্ড ও ভীষণভাবে ঝাঁপাইয়া পড়িল যে উজির অতি কষ্টে তাঁহার সৈন্যদিগকে কোনক্রমে একত্রিত রাখিলেন। কিন্তু দিবসের মধ্যভাগে শত্রুর আক্রমণের প্রচণ্ডতা কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইল। মুসলমানরা এই পর্যন্ত আত্মরক্ষামূলক সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছিল। এইবার উজির শত্রুকে পাল্টা আক্রমণ করিবার জন্য সৈন্যদিগকে নির্দেশদান করিলেন এবং সন্ধ্যার পূর্বেই তাঁহার সৈন্যরা শত্রুকে বিপুল হত্যাকাণ্ডের মধ্য দিয়া পর্বতের গভীরে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। এই যুদ্ধে মুসলমানদেরও বিপুল ক্ষতি হইয়াছিল। বহু সাহসী

সেনাপতি নিহত হইয়াছিল। দশ সহস্রের অধিক হিন্দু ধরাশায়ী হইয়াছিল এবং বিপুল সংখ্যক সাধারণ সৈন্য ছাড়াও দুইশত দলপতি বন্দী হইয়াছিলেন। এই যুদ্ধের ফলে রনথম্বর দুর্গ শত্রুমুক্ত হইল—যাহা গত কয়েক মাস যাবৎ অবরুদ্ধ ছিল। ইহার পর উজির বিজয় গৌরবে দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। বন্দী দলপতিদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করা হইল এবং তাহাদের অনুচর-দিগের ললাটে চিরদাসত্বের কালিমা লেপন করা হইল।

এই বৎসরই রবি-উল-আউয়াল মাসে পারস্যাধিপতি হালাকু খানের (চেঙ্গিস খানের পৌত্র) এক দূত দিল্লী আগমন করেন। উজির মহাসমারোহে, দিল্লীর সরকারের অধীনে চাকুরীরত ৫০,০০০ হাজার বিদেশী অশ্বারোহী সেনা, দুই সহস্র হস্তী সেনা এবং তিন সহস্র আগ্নেয়াস্ত্রবাহী শকটের[৪] মিছিল লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিতে আগাইয়া আসেন। দূতের সম্মুখে এক যুদ্ধের মহড়া দিয়া তাঁহাকে অশ্ব চালনা ও যুদ্ধের অন্যান্য কৌশল দর্শন করানো হইল। অতঃপর শহরের রাস্তা দিয়া সমারোহ সহকারে তাঁহাকে সরাসরি শাহী মহলে লইয়া যাওয়া হইল। সেখানে বিপুল শানশওকতের সঙ্গে দরবারের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা হইল। সমস্ত ওমরাহ, রাজকর্মচারী, কাজী, মোল্লা ও শহরের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা সেই দরবারে হাজির ছিলেন। তদুপরি ইরাক আজম, খোরাসান এবং মা-উরা-উন্নাহারের পঁচিশজন রাজা তাঁহাদের অনুচরবর্গসহ এই দরবারে যোগ-দান করিয়াছিলেন। কিছুদিন পূর্বে চেঙ্গিশ খানের মোগল বাহিনী যখন এশিয়ার অধিকাংশ রাজ্য পদদলিত করিয়াছিল তখন তাঁহার ভয়ে ভীত এইসব রাজা দিল্লীতে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। অনেক ভারতীয় করদ-রাজাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারা তখ্‌তের পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন।

অন্যান্য সুলতানদের ন্যায় নাসির-উদ-দীনের কোন উপপত্নী ছিল না। তাঁহার একজন মাত্র স্ত্রী ছিলেন—যাঁহাকে স্বহস্তে গৃহকর্ম করিতে হইত। একদিন রুটি সেঁকিবার কালে তাঁহার আঙ্গুল পুড়িয়া যায় এবং তিনি সুলতানকে অনুরোধ করিলেন—তিনি যেন তাঁহার সাহায্যের জন্য একটা পরিচারিকার ব্যবস্থা করিরা দেন। সুলতান তাঁহার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন,

---

৪ আমি বুঝিতে পারিতেছি না কি প্রকারের আগ্নেয়াস্ত্রের কথা এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে। মুহাম্মদ কাসিম সিন্ধু ও গজনীর মাহমুদ যে গ্রীক ফায়ার ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ছাড়া আর কি হইবে?

"আমি রাজ্যের রক্ষক মাত্র এবং অনাবশ্যক ব্যয়বৃদ্ধি দ্বারা রাজ্যের ব্যয়ভার বৃদ্ধি না করিতে আমি কৃতসঙ্কল্প"। তিনি বেগমকে ধৈর্যসহকারে তাঁহার কর্তব্য সাধন করিয়া যাইতে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, আল্লাহ তাঁহাকে বিচারের দিন পুরস্কৃত করিবেন। ভারতীয় সম্রাটরা কখনও প্রকাশ্যে আহার করিতেন না। নাসির-উদ-দীনের দস্তরখানা কোন রাজার দস্তরখানার মত ছিল না—একটা ফকিরের দস্তরখানা যেমন সাদাসিদা হয় তেমনি ছিল। পুস্তক নকল করিয়া সেই অর্থে খাদ্য ক্রয় করিবার একগুঁয়েমি স্বভাব সিংহাসনারোহণের পরও তিনি বজায় রাখিয়াছিলেন।

একদা এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সুলতানের সম্মুখে বসিয়া তাঁহার হস্ত লিখিত কোরান শরীফ পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছিলেন। তিনি 'ফি' শব্দটির প্রতি সুলতানের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, ইহা দুইবার লেখা হইয়াছে। সুলতান উহা দেখিয়া একটু মৃদু হাসিলেন এবং তারপর ঐ শব্দটির চারিদিকে একটা বৃত্ত আঁকিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সমালোচকটির প্রস্থানের পরই তিনি ঐ বৃত্তটি উঠাইয়া ফেলিয়া শব্দটিকে পূর্বাবস্থায় স্থাপন করিলেন। এক বৃদ্ধ পার্শ্বচর উহা লক্ষ্য করিয়া বিনীত-ভাবে সুলতানকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, সুলতান বলিলেন, "শব্দটি প্রথমে নির্ভুলভাবেই লেখা ছিল। তাঁহাকে লজ্জা দেওয়া অপেক্ষা শব্দটি কিছুক্ষণের জন্য বাতিল করাই আমি সঙ্গত মনে করিলাম।"

৬৬৩ হিজরীতে (১২৬৪ খ্রীঃ) সুলতান পীড়াগ্রস্ত হন এবং কয়েক মাস রোগে ভুগিবার পর ৬৬৪ হিজরীর ১১ই জমাদি-উল-আউয়াল (ফেব্রুয়ারী ১২৬৬ খ্রীঃ) তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কুড়ি বৎসরের কিছু অধিককাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গিয়াস-উদ-দীন বুলবন

[তাঁহার প্রথম জীবন ও চরিত্র। নীচ বংশের লোকদিগকে সরকারী কর্মে নিয়োগে আপত্তি। তাঁহার দরবারে চেঙ্গিশ খান ও মোগল কর্তৃক বিতাড়িত বহু রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির আশ্রয়। বিদ্বান লোকদের পৃষ্ঠপোষকতা। তাঁহার দরবার ও সাজ সরঞ্জামের বিবরণ। কঠোর ন্যায়বিচারের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। মেওয়াটিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। একলক্ষ মেওয়াটিকে হত্যা। মেওয়াটের জঙ্গল কাটিবার জন্য সৈন্যদিগকে নিয়োগ এবং উহা উত্তম কৃষি-যোগ্য ভূমিতে পরিণত করা। সুলতানের সসৈন্যে লাহোর গমন ও শহরের প্রাকার মেরামত। বৃদ্ধ শিপাহ্সালারদের জন্য অবসর ভাতা ধার্য। সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র শের খানের ইন্তেকাল। ভাটনিয়ারে এক জমকালো সমাধি-সৌধে তাঁহাকে কবরস্তকরণ। মোগলদের পাঞ্জাব আক্রমণ। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহাম্মদ কর্তৃক তাহাদিগকে বাধাদান ও পরাস্তকরণ। তাঁহাকে মুলতানের শাসনকর্তা নিয়োগ। বাঙ্গালার শাসনকর্তা তোগরল খানের বিদ্রোহ। তাঁহার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী প্রেরণ। তাহাদের পরাজয় এবং সেনাপতি নিহত। সুলতানের স্বয়ং বিদ্রোহ দমনে গমন। তোগরলের উড়িষ্যায় পলায়ন। সুলতানের ফৌজ কর্তৃক তাঁহাকে অনুসরণ এবং হত্যা। তিন বৎসর অনুপস্থিত থাকিবার পর সুলতানের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন। শাহজাদা মুহাম্মদের রাজধানীতে আগমন। তাঁহার প্রতি পিতার উপদেশ। মোগলদের পাঞ্জাব আক্রমণ। তাহাদের বিরুদ্ধে শাহজাদার অগ্রগমন এবং শত্রুবাহিনী পরাস্ত। কিন্তু তিনি নিজে এই যুদ্ধে শহীদ। তাঁহার অতুলনীয় বীরত্ব ও তাঁহার চরিত্র। পুত্র বিয়োগে সুলতানের শোক। শাহজাদার পুত্র কায়খসরুকে মুলতানে পিতার স্থলাভিষিক্তকরণ। সুলতানের স্বাস্থ্যের ক্রমশঃ অবনতি। তাঁহার পুত্র কর্তৃক বাঙ্গালার শাসনকর্তা কারা খানকে তলব। তাঁহার পুনরায় রাজধানী ত্যাগ করিয়া বাঙ্গালায় প্রত্যাগমন। সুলতান কর্তৃক তাঁহার পৌত্র ও মুলতানের শাসনকর্তা কায়খসরুকে উত্তরাধিকারী মনোনীত। গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের মৃত্যু। মালিক ফখর-উদ-দীন কোতোয়াল কর্তৃক কায়খসরুর উত্তরাধিকারীত্বের বিরোধিতা এবং কারা খানের পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে উপবেশন।]

এই সুলতানকে বেশীরভাগ ইউরোপীয় লেখক 'বালিন' নামে অখ্যাত করিয়াছেন। এরস্‌ কাইন তাঁহার বাবুর নামায় ইঁহাকে বুলবন বলিয়াছেন। এবং আমি দেখিতেছি যে, হিন্দু লেখকরাও এই নাম দিয়াছেন। শিক্ষিত ভারতীয়েরা সকলেই এই নামে এই সুলতানকে অভিহিত করিয়া থাকেন।

গিয়াস-উদ-দীন বুলবন একজন ন্যায়ানুগ নরপতি ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে বহু মহৎ ও মহান গুণের সমাবেশ ছিল। তিনি ছিলেন জাতিতে তুর্কী। কারা খাত্রার আলবেরী সম্প্রদায়ে তাঁহার জন্ম। তিনি যখন বালক সেই সময় মোগলরা তাহার দেশ অধিকার করে এবং তিনি মোগলদের হাতে ধরা পড়েন। মোগলরা তাঁহাকে এক সওদাগরের নিকট বিক্রী করে। সেই সওদাগর তাঁহাকে বাগদাদ লইয়া যান। তাঁহার পিতা একজন ক্ষমতাশালী সর্দার ছিলেন। যে যুদ্ধে আমাদের এই বালকবীর শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন—সেই যুদ্ধে তাঁহার পিতা ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। বাগদাদে ৬৩০ হিজরীতে বসোরা নিবাসী খাজা জামাল-উদ-দীন তাহাকে ক্রয় করিয়াছিলেন। বিদ্বান ও ধার্মিক বলিয়া খাজা জামাল-উদ-দীনের খ্যাতি ছিল। বুলবনের মালিক যখন বুঝিলেন যে তিনি (বুলবন) আলতামাসের সম্প্রদায়ের লোক, তখন তিনি তাহাকে দিল্লীতে লইয়া আসিলেন। তাঁহাকে সুলতানের নিকট অর্পণ করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ পাইলেন এবং একজন ধনীব্যক্তি হিসাবে বাগদাদ ফিরিলেন। শাম্‌স্‌-উদ-দীন প্রথমতঃ তাহাকে বাজপক্ষীদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেন। এই কার্যে তিনি বেশ দক্ষতার পরিচয় দান করেন। তাঁহার ভ্রাতা কিস্‌লী খানের সহায়তায় সেই সামান্য অবস্থা হইতে তিনি ক্রমশঃ উপরে উঠিতে লাগিলেন এবং শেষ পর্যন্ত ওমরাহের মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন (দিল্লীর দরবারে তখন তাঁহার ভ্রাতার খুব প্রভাব ছিল)। রুকুন-উদ-দীনের রাজত্বকালে তিনি পাঞ্জাবে সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব করিতেছিলেন। সেই সময় তিনি খবর পান যে তাঁহার শত্রুরা সুলতানকে তাঁহার বিরুদ্ধে কুপিত করিয়াছেন। সেহেতু দিল্লী ফিরিবার জন্য যে সুলতানী ফরমান আসে তাহা তিনি অগ্রাহ্য করেন। বহু-দিন যাবৎ তিনি স্বাধীনভাবে সেই প্রদেশ ভোগ করেন। পরে সুলতানা রাজিয়াকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য যে মিত্রবাহিনী দিল্লী গমন করিয়া-ছিলেন তিনিও তাহাতে শরীক হইয়াছিলেন। বন্দী হইয়া কিছুদিন তাঁহাকে কারাজীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু কোন প্রকারে মুক্তি লাভ করিয়া তিনি সুলতানার বিপক্ষে বৈরামের দলে যোগদান করেন। বৈরামের রাজত্বকালে আমীর হাজিব বদর-উদ-দীনের সঙ্গে তাঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব জন্মে এবং তাঁহার প্রভাবেই তিনি হান্‌সী ও রিওয়ারীর শাসনভার প্রাপ্ত হন। এই পদে নিযুক্ত

থাকিবার কালে মেওয়াটিদের বিরুদ্ধে কয়েকটি যুদ্ধ করিয়া তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন।

আলা-উদ-দীন মসউদের রাজত্বকালে ৬৪২ হিজরীতে তিনি আমীর হাজিবের পদে উন্নীত হন এবং সাবেক সুলতান নাসির-উদ-দীন মাহমুদের রাজত্বকালে তিনি ওজারতের পদ লাভ করেন। এই উচ্চ পদের দায়িত্ব তিনি এমনভাবে পালন করিয়াছিলেন যে, সুলতান সমস্ত উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তা হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছিলেন। সুলতানের (যাঁহার ভগ্নীপতি ছিলেন তিনি) ইন্তেকালের পর তিনি শুধু বিনা বাধায় নয় বরং ওমরাহ ও সমস্ত জনসাধারণের অনুমোদন ক্রমেই সিংহাসনে আরোহণ করেন।

শাম্‌স্‌-উদ-দীন আলতামাসের রাজত্বকালে তাঁহার অতি প্রিয় চল্লিশ জন গোলাম পরস্পরকে সাহায্য করিবার শপথ গ্রহণ করিয়াছিল এবং স্থির করিয়াছিল যে, সুলতানের মৃত্যুর পর তাঁহারা নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্য বণ্টন করিয়া লইবে। পরে তাহাদের মধ্যে বিভেদ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ায় তাঁহারা এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে সমর্থ হয় নাই। এই চল্লিশ জনের মধ্যে গিয়াস-উদ-দীন বুলবনও ছিলেন। যেহেতু তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন রাজ্যে উচ্চ ক্ষমতালাভে সক্ষম হইয়াছেন, এইজন্য তাঁহার রাজত্বের প্রাথমিক কর্তব্য হইল, ইহাদের মধ্যে যাহারা জীবিত আছেন তাঁহাদের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা। তাঁহার স্বনামধন্য ভ্রাতুষ্পুত্র শের খানও ছিলেন তাঁহাদের অন্যতম।

এইসব প্রধানদের মৃত্যুতে তাঁহার মন শঙ্কামুক্ত হইল এবং পরে তিনি সুবিচার ও সুশাসনের জন্য এমন প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন যে, পারস্য ও তুর্কী সুলতানরা তাঁহার সহিত মিত্রতা স্থাপনের জন্য উদগ্রীব হইলেন।

সুবংশজাত ও যোগ্যতাসম্পন্ন লোক ব্যতীত অন্য কেহ যাহাতে সরকারী পদে নিযুক্ত হইতে না পারে, সেদিকে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেন। এজন্য তিনি দরবারের আশেপাশের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতিভা ও বংশপরিচয় জানিবার চেষ্টা করিতেন। সৎকর্মের পুরস্কারদানে একদিকে তিনি যেমন দরাজ ছিলেন— অন্যদিকে পাপকর্মের শাস্তি বিধানেও তিনি ছিলেন অনমনীয়। সরকারী কর্মে যে কেহই ক্ষমতার অপব্যবহার করিত, তাহাকে লাঞ্ছনা ভোগ করিতেই তিনি আইন করিয়াছিলেন যে, কোন হিন্দুকে কোন দায়িত্বপূর্ণ বা উচ্চ সরকারী

পদে নিযুক্ত করা হইবে না। কারণ, তিনি আশঙ্কা করিতেন যে, হিন্দু কর্মচারী তাহাদের সেই ক্ষমতা মুসলমানদের অনিষ্ট সাধনে প্রয়োগ করিবে।

তাঁহার ২২ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালে তিনি নীচ বংশজাত লোকদিগকে সযত্নে দরবারের বাহিরে রাখিয়াছিলেন। ফকরুখ নামে রাজ্যের পুরাতন এক ভৃত্য বাজারে একচেটিয়া ব্যবসা ও সুদের কারবার করিয়া অগাধ সম্পদের অধিকারী হইয়াছিল। একবার সুলতানকে কেহ বলিলেন যে, সুলতান সিংহাসনে বসিয়া ফকরুখের সঙ্গে একটা কথা বলিয়া তাহাকে সম্মানিত করিলে ফকরুখ সুলতানকে কয়েক লক্ষ টাকা নজরানা দিবেন। সুলতান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, "যে সুলতান এইরূপ একজন তুচ্ছ ব্যক্তির সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে রাজী হইবেন—প্রজারা তাঁহার সম্বন্ধে কি ধারণা পোষণ করিবে?"

আইন-উদ-দীন বিজাপুরীর ইতিহাস ছাড়াও, 'তাবকাতে নাসিরী' ও সে যুগের অন্যান্য ইতিহাসে লেখা আছে যে, গিয়াস উদ-দীন বুলবন প্রায়শঃই দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতেন যে, তাঁহার রাজত্বকালের সর্বোচ্চ গৌরবময় ব্যাপার এই যে, তুর্কীস্তান, মা-উরা-উন্নাহার, খোরাসান, ইরাক-আজম, আজারবাইজান, ইরান ও রোম প্রভৃতি দেশের পঞ্চদশাধিক হতভাগ্য সুলতান (যাহারা চেঙ্গিশ খানের বাহুবলে দেশত্যাগী হইয়াছেন) দিল্লীর দরবারে সম্মানজনক আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাদের প্রত্যেকের জন্য রাজকীয় ভাতা ও প্রাসাদ নির্ধারিত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। দরবারের অধিবেশনকালে তাহাদের সকলকে মর্যাদানুযায়ী সিংহাসনের সন্নিকট বামে ও দক্ষিণে কাতারবন্দী হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে দেওয়া হইত। কেবলমাত্র খলীফার বংশীয় সুলতানদিগকে তখ্‌তের উভয় পার্শ্বে উপবেশন করিবার অনুমতি প্রদান করা হইত। এইসব বাহিরাগত রাজারা শহরের যে যে এলাকায় বাস করিতেন—সেইসব এলাকা বা মহল্লা তাঁহাদের নামে পরিচিত হইয়াছিল। যেমন:

১। আব্বাসী মহল্লা	৬। আতাবুকী মহল্লা	১১। ইয়েমেনী মহল্লা
২। সানজারী ,,	৭। ঘুরী ,,	১২। মুগুরী ,,
৩। খারিজম শাহী,,	৮। চেঙ্গিশ ,,	১৩। সমরকন্দী ,,
৪। দেলিমী ,,	৯। রুমী ,,	১৪। কাসগড়ী ,,
৫। আলূনী ,,	১০। সানকারী ,,	১৫। কাওতাই ,,

ঐ সব সুলতানদের অনুচরবর্গের মধ্যে সে যুগের মধ্য এশিয়ার কয়েকজন বিখ্যাত মনীষী ছিলেন। এইজন্য গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের সময় দিল্লীর দরবার সৌষ্ঠব ও সভ্যতায় জগতের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় বলিয়া গণ্য হইত। খানশাহীদ নামে পরিচিত শাহজাদার বাসভবনে একদল বিদ্বান ব্যক্তি প্রায়ই সমবেত হইতেন। কবি আমীর খসরু এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করিতেন। সুলতানের দ্বিতীয় পুত্র কারা খান বাগেরার বাসভবনে গায়ক, নর্তক, অভিনেতা ও গল্পবেত্তাদের আর এক মজলিস হইত। কারা খান এইসব আমোদ-প্রমোদ খুব উপভোগ করিতেন। ওমরাহরাও তাঁহাদের উপরওয়ালাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন—ফলে শহরের প্রত্যেক এলাকায় এইরূপ সাংস্কৃতিক সমাজ গঠিত হইয়াছিল। সুলতান স্বীয় প্রাসাদে যেরূপ শানশওকত আসবাবপত্র উর্দি-পরিহিত দাস-দাসীর পক্ষপাতী ছিলেন—সভাসদরাও তাহাদের বাসভবনে তদ্রূপ অনুকরণ করিবার চেষ্টা করিতেন।

সুলতানের সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠান এমন এক গাম্ভীর্যপূর্ণ ছিল যে সিংহাসনের নিকটবর্তী হইবার সময় প্রত্যেকের মনে যুগপৎ ভীতি ও শ্রদ্ধার সঞ্চার হইত। শোভাযাত্রা করিয়া বাহিরে চলিবার কালেও সুলতান কম জাঁকজমক প্রদর্শন করিতেন না। রাজকীয় হস্তীগুলি গোলাপী রং-এর সুবর্ণ আচ্ছাদনে আবৃত থাকিত। তাঁহার সহস্র তাতার অশ্বারোহী দেহরক্ষীরা চাক্‌চিক্যময় বর্ম পরিধান করিয়া রৌপ্য-বল্গা ও মূল্যবান ঝালরযুক্ত জিন শোভিত সুদৃশ্য আরবীয় ও পারস্য দেশীয় অশ্বে আরোহণ করিয়া চলিত। মূল্যবান উর্দি পরিহিত পাঁচশত বাছাই করা পদাতিক সৈন্য উন্মুক্ত তলোয়ার হস্তে পথ পরিষ্কার করিয়া এবং সুলতানের আগমন ঘোষণা করিয়া অগ্রে গমন করিত। তাঁহার পরিষদবৃন্দ তাঁহাদের বিবিধ সাজসজ্জা ও দেহরক্ষী পরিবৃত হইয়া স্ব স্ব মর্যাদানুযায়ী পশ্চাতে চলিতেন। নওরোজ ও অন্যান্য উৎসব এবং তাঁহার নিজের জন্ম-বার্ষিকী মহাসমারোহে পালন করা হইত।

তাঁহার কঠোর ন্যায়বিচার সম্বন্ধে একটা ঘটনার উল্লেখ আছে। শাহী তোষাখানার রক্ষকের পুত্র মালিক ফয়েজ আহমদ শিরওয়ানী একজন উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি এক হাজার অশ্বারোহী দেহরক্ষী রাখিতেন এবং বাদায়ুনের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। একদিন পানোন্মত্ত অবস্থায় তিনি স্বহস্তে তাহার এক ভৃত্যকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কোন

কারণবশতঃ গিয়াস-উদ-দীন বুলবনকে বাদায়ুনে গমন করিতে হইয়াছিল। এই সময় সেই নিহত ব্যক্তির বিধবা স্ত্রী জুলুমের বিরুদ্ধে সুলতানের নিকট ফরিয়াদ জানায়। সুবাদার মালিক ফয়েজকে তলব করা হইল। তাঁহার বিচার হইল। প্রকাশ্য দরবারে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিতে করিতে মারিয়া ফেলা হইল এবং তারপর তার দেহ শহরের তোরণে ঝুলাইয়া রাখা হইল। গৃহ-রক্ষীদলের সেনানায়ক হায়বত খান সম্বন্ধেও অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। তিনি অযোধ্যার শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। মাতাল অবস্থায় তিনিও এক ব্যক্তিকে মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। অভিযোগ আসিল। অপরাধ প্রমাণিত হইল। সুবাদারকে সর্বসমক্ষে ৫০০ শত বেত্রাঘাত গ্রহণ করিতে হইল। অতঃপর তাঁহাকে মৃত-ব্যক্তির বিধবা পত্নীর গোলাম করিয়া দেওয়া হইল। বিশ হাজার রৌপ্য-মুদ্রা ক্ষতিপূরণ দান করিয়া তবে তিনি মুক্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইহার পর আর তিনি বাহিরে মুখ দেখান নাই এবং অল্প কয়েকদিন পরেই মারা গিয়াছিলেন। গিয়াস-উদ-দীন বুলবন প্রায়ই তাঁহার সন্তানদিগকে বলিতেন যে, শামস্-উদ-দীন আলতামাস তাঁহাকে বলিয়াছেন, "আমি সৈয়দ মুবারিক গজনীকে দুইবার মুহাম্মদ ঘুরীকে এই কথা বলিতে শুনিয়াছি যে, ধর্ম ও রসূলের বিধি-নিষেধ লঙ্ঘন করিয়া সুলতানরা প্রায়শঃই এরূপ আচরণ করিয়া থাকেন, যাহাতে মনে হয় তাঁহারাই যেন পৃথিবীর মালিক। সেই দরবেশ বলিয়াছিলেন, চতুর্বিধ সুনীতি যথাযথ অনুসরণ করিলে, তবেই সুলতানরা দোজখের শাস্তি হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে এবং ইহাদের মধ্যে যে কোন একটা পালনে অবহেলা প্রদর্শন করিলে, হাসরের দিন সুলতানদের বিচার যে-কোন মানুষের বিচারাপেক্ষা কঠোরতর ও নির্মম হইবে। নীতিগুলি এই: প্রথম নীতি—সুলতানরা উপযুক্ত ক্ষেত্রে ও সময়ে তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। কোন কিছুই যেন তাঁহাদের হৃদয় হইতে আল্লার মহিমাবোধ ও প্রজার মঙ্গল চিন্তা দূর করিতে না পারে। দ্বিতীয় নীতি - রাজার রাজ্যে তিনি কখনও প্রকাশ্যে অসদাচরণ ও কুরুচিপূর্ণ কর্ম সংঘটিত হইতে দিবেন না এবং এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সর্বদাই প্রচুর অর্থদণ্ড ও অন্যবিধ দণ্ড প্রদান করিবেন। তৃতীয় নীতি—সরকারী কর্মে নিয়োগের জন্য তিনি চরিত্রবান লোক নির্বাচিত করিবেন, এবং কুখ্যাত ও পাপাচারী লোকদিগকে কখনও রাজ্যে স্থান দিবেন না। চতুর্থ নীতি—বিচারকালে তাঁহাকে ধৈর্যশীল ও ন্যায়নিষ্ঠ হইতে হইবে।"

সুলতান বলিতেন. "এই নীতিগুলি আমি অনুসরণ করিয়া আসিতেছি এবং আমি আশা করি আমার উত্তরাধিকারীরাও অনুসরণ করিবে। আমি তোমাদিগকে সর্তক করিয়া দিতেছি- রাজ্যের কানুন লঙ্ঘন করিলে তোমরা পুত্র হইয়াও রেহাই পাইবে না।"

যৌবনে গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের পানাভ্যাস ছিল কিন্তু সিংহাসনারোহণের পর তিনি সুরা পানের ঘোর শত্রু হইয়া পড়েন এবং কঠোর দণ্ডাজ্ঞা জারি করিয়া রাজ্যে সুরা পান ও সুরা তৈরী নিষিদ্ধ করিয়া দেন। তাঁহার প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিতে তিনি এতোটা অনমনীয় ছিলেন যে রাজ্যের দূরতম অংশে কোন ব্যক্তি বেআদবী করিলে তাহাকে শাস্তি দানের জন্য প্রয়োজন হইলে তিনি এক ফৌজ পর্যন্ত পাঠাইতেন। কোথাও বিদ্রোহ হইলে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বিদ্রোহের নেতাদিগকে শাস্তি দান করিয়াই তিনি নিরস্ত হইতেন না, তাহাদের নগণ্য অনুচর ও অনুসারীদিগকেও তিনি চরম শাস্তি প্রদান করিতেন। এই কঠোরতার দরুন সুবাদাররা সুলতানের অনুমতি না লইয়া কাহারও সঙ্গে কোন প্রকার যুদ্ধ বা সংঘর্ষে লিপ্ত হইতেন না।

সেনাদলের কর্মক্ষমতা অক্ষুন্ন রাখিবার নিমিত্ত তিনি সপ্তাহে দুইবার তাহাদিগকে লইয়া শহরের চতুর্দিগন্ত ৪০—৫০ মাইল এলাকায় শিকারে বহির্গত হইতেন। শিকারী জন্তু সংরক্ষণের জন্য তিনি আইন প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

৬৬৪ হিজরীতে (১২৬৫ খ্রীঃ) তাঁহার পরামর্শ সভা তাঁহাকে গুজরাট ও মালব অধিকারের জন্য সমরাভিযান প্রেরণের সুপারিশ করেন। কুতুব-উদ-দীন আইবেক কর্তৃক এই দুইটি রাজ্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল—কিন্তু পরে তাহারা মুসলমান প্রভুত্ব অস্বীকার করে। সুলতান তাদের এই প্রস্তাবে রাজী হন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন, উত্তর দেশীয় সমস্ত মুসলমান সুলতান-দিগকে পরাভূত করিয়া তাতার মোগলরা দুর্বার শক্তির অধিকারী হইয়াছে, এমতাবস্থায় বিদেশী আক্রমণের মুখে দেশকে অরক্ষিত রাখিয়া অন্যত্র অভি-যানে গমন করা অপেক্ষা নিজের দখলে যাহা আছে তাহা রক্ষা করাই সমীচীন মনে করেন। এই বৎসরই আরসালান খানের পুত্র মুহম্মদ তাতার খান যিনি ভূতপূর্ব সুলতানের রাজত্বকালে বাৎসরিক রাজস্ব প্রেরণে অবহেলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন—তাঁহার লক্ষণাবতর সুর হইতে শাস্তির নিদর্শনস্বরূপ

৬৩টি হস্তী ও অন্যান্য উপহারাদি প্রেরণ করেন। এইসব উপহার সাদরে গৃহীত হয়। সেই দিন হইতে বাঙ্গালার উপর দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বৎসরই এক মেওয়াটি দস্যুদলকে নির্মূল করিবার জন্য এক সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দান করা হইল। এই দস্যুরা দিল্লী হইতে প্রায় ৮০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে পর্বতের দিকে বিস্তৃত এলাকা অধিকার করিয়া লইয়াছিল এবং ভূতপূর্ব সুলতানের রাজত্বকালে তাঁহারা ঐ স্থান হইতে নির্গত হইয়া পুনঃ পুনঃ দিল্লীর তোরণ পর্যন্ত আসিয়া হানা দিত। কথিত আছে যে, এই অভিযানকালে প্রায় এক লক্ষ মেওয়াটিকে তলোয়ারের মুখে জলাঞ্জলি দেওয়া হইয়াছিল। অতঃপর জঙ্গল পরিষ্কার করিবার জন্য সেনাবাহিনীকে কুঠার ও অন্যান্য যন্ত্রাদি সরবরাহ করা হয় এবং সৈন্যরা একশত মাইল পরিধিযুক্ত এলাকা সম্পূর্ণ জঙ্গল মুক্ত করে। এইরূপে জঙ্গল মুক্ত হওয়ায় সেই এলাকা পরে উত্তম কৃষিযোগ্য ভূমিতে পরিণত হয় এবং সেখানে নিয়মিত চাষাবাদ হইতে থাকে।

৬৬৫ হিজরীতে (১২৬৬ খ্রীঃ) গিয়াস-উদ-দীন দোয়াবে (গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী অঞ্চল) কয়েকটি বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। পরে সুলতান স্বয়ং কাম্পিলা, পাতিখালী ও ভোজপুর অভিমুখে যাত্রা করেন। কারণ, এইসব এলাকার অধিবাসীরা জৌনপুর ও বেনারসের পথে বাঙ্গালার সঙ্গে দিল্লীর যে যোগাযোগ পথ ছিল, তাহা বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। তিনি তাঁহাদের কয়েক সহস্র লোককে হত্যা করেন এবং ভবিষ্যতে এইরূপ উৎপাত যাহাতে না হয়, তজ্জন্য সেইখানে একটি দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তাহাতে মুসলমান ফৌজ মোতায়েন করেন। এই যাত্রাতেই তিনি জালালী দুর্গ মেরামত করেন এবং তারপর দিল্লী ফিরিয়া আসেন। দিল্লী ফিরিবার অনতিকাল পরেই তিনি বাদায়ুন ও কাটিহারের বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়া ৫০০ শত বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তথায় গমন করিলেন এবং স্ত্রীলোক ও শিশু ব্যতীত বিদ্রোহীদের সকল লোককে হত্যা করিলেন। এই সময় তিনি সেই অঞ্চলের লুণ্ঠনকারী দলের এমনভাবে মূলোৎপাটন করেন যে, জালাল-উদ-দীন ফিরোজের সময় পর্যন্ত সেখানে আর কোন নরহত্যা কিংবা ডাকাতি সংঘটিত হয় নাই। এইসব কর্ম সুসম্পন্ন করিবার পর গিয়াস-উদ-দীন

বুলবন জুদ পর্বতমালার দিকে সৈন্য চালনা করেন। সেখানে দুর্গ নির্মাণ ও অধিবাসীদিগকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিতে দুই বৎসর কাল সেনাবাহিনী নিযুক্ত রাখিতে হইয়াছিল। এই দেশ উৎকৃষ্ট অশ্বের জন্য বিখ্যাত ছিল সেজন্য এখান হইতে কয়েক সহস্র অশ্ব সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আনয়ন করা হয়। সুলতান যেখানেই গমন করিতেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা, জমিদার, ফৌজদার ও কোতোয়ালরা নজরানা হস্তে তাঁহাদের এলাকার সীমান্তে আসিয়া সুলতানের সঙ্গে মোলাকাত করিতেন। এইসব উপহার সুলতান পরে গরীবদের মধ্যে বিতরণ করিয়া দিতেন। ইহার কিছুকাল পরে সুলতান লাহোর ভ্রমণে গমন করেন। মোগলরা ঐ শহরের বিশেষ ক্ষতিসাধন করিয়াছিল। তিনি উহার রক্ষণব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়া এবং কতকগুলি সরকারী ইমারত নির্মাণ করাইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

এই সময় গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের অন্যতম সভাসদ তাঁহাকে জানান যে সাবেক সুলতানের সময়ে নিযুক্ত কতিপয় প্রবীণ রাজকর্মচারী এখন এতই অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছেন যে, তাঁহাদের নিকট হইতে আর কোন কাজই পাওয়া যায় না। সুলতান এইরূপ কর্মচারীদের একটা তালিকা প্রস্তুত করিবার হুকুম দিলেন এবং ঐসব কর্মচারীদের অর্ধেক বেতন ধার্য করিয়া তাহাদিগকে অবশিষ্ট জীবনের জন্য সক্রিয় কর্ম হইতে অব্যাহতি দান করিলেন। বৃদ্ধ কর্মচারীরা এই ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহারা কিছু উপহারসহ তাঁহাদের কয়েক ব্যক্তিকে দিল্লীর কোতোয়াল ফখর-উদ-দিনের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহারা ফখর-উদ-দীনকে সুলতানের নিকট যাইয়া তাঁহাদের পক্ষে ওকালতি করিতে অনুরোধ করেন। এই প্রবীণ রাজ-কর্মচারী সুলতানের অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি উপহার গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দান করেন যে, তাঁহারা যাহাতে পূর্ণ বেতন পাইতে পারেন সেইজন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। পরদিন তিনি দরবারে হাজির হইয়া বিষণ্ণবদনে সুলতানের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিলেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া সুলতান তাঁহার বিষণ্ণতার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। বৃদ্ধ লোকটি উত্তরে বলিলেন, "আমি এইমাত্র চিন্তা করিতেছিলাম যে, যদি সমস্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট প্রত্যাখ্যাত হয় তবে আমি কোথায় দাঁড়াইবো?" এই প্রচ্ছন্ন তিরস্কারে সুলতান স্তম্ভিত হইলেন

এবং কিছুক্ষণ চিন্তামগ্ন থাকিবার পর হুকুম দিলেন যে, প্রবীণ কর্মচারী পূর্ববৎ পূর্ণ বেতন পাইতে থাকিবে।

এই সুলতানের রাজত্বকালের চতুর্থ বৎসরে শের খান—যিনি লাহোর, মুলতান, ভাক্কার, সারহিন্দ, দিপালপুর, বিতুণ্ডাসহ মোগল আক্রমণের সম্মুখে উন্মুক্ত সমস্ত এলাকা শাসন করিতেন—তিনি মারা যান। কেহ কেহ বলেন, তাঁহাকে সুলতানের আদেশে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইয়াছিল। তাঁহাকে ভাটনিয়ারে এক বিরাট সমাধি-সৌধে গোর দেওয়া হয়। শের খান নিজে তাঁহার জন্য এই সমাধি-সৌধ নির্মাণ করাইয়া রাখিয়াছিলেন। শের খানের ইন্তেকালের পর আমীর তাইমুর খানকে সামানা ও সুনাম মঞ্জুর করা হয় এবং শের-খানের শাসনাধিন অন্যান্য প্রদেশ দরবারের অন্যান্য প্রধানদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেওয়া হয়। শের খানের মৃত্যুতে উৎসাহিত হইয়া মোগলরা এইসব অঞ্চলে পুনরায় দৌরাত্ম্য শুরু করিয়া দেয়। নবনিযুক্ত শাসনকর্তাদের পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা ও বিদ্বেষ মোগলদের এই প্রকার অনুপ্রবেশের বিশেষ সহায়ক হইল। সুলতান বাধ্য হইয়া তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র শাহজাদা মুহাম্মদকে (এই সময়ে তাঁহার উপাধি ছিল তাজ-উল-ইসলাম এবং পরে তিনি 'সহিদ' আখ্যা প্রাপ্ত হন) সীমান্ত এলাকার প্রদেশগুলির সহ-সুলতান নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করেন। এই সময়েই তাঁহাকে সুলতানের উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হয়।

এই ব্যবস্থানুযায়ী শাহজাদা কয়েকজন সুদক্ষ সেনাপতিসহ এক উৎকৃষ্ট বাহিনী লইয়া সেখানে গমন করেন। এই যুবকের চেহারায় দীপ্ত পরিস্ফুট ছিল। সাহিত্যের প্রতি তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগের পরিচয় পূর্বেই পাওয়া গিয়াছিল। তিনি অধিকাংশ প্রখ্যাত কবিদের কাব্যগ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট কবিতাগুলি নির্বাচন করিয়া স্বহস্তে এক কাব্যচয়ন প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই পুস্তকে বিশ হাজার কবিতা স্থান পাইয়াছিল এবং ইহা সে যুগের সর্বোৎকৃষ্ট সুরুচিসম্পন্ন কাব্য-সংকলন বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। শাহজাদার দরবারে যেসব বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আমীর খসরু[1] ও খাজা হাসানও ছিলেন। অনেক সাহিত্যিক সঙ্গীদের সঙ্গে ইহারাও শাহজাদার সঙ্গে লাহোর গমন করিয়াছিলেন।

---

১ দিল্লীর আমীর খসরু এই বিদ্বান শাহজাদার শিক্ষক ছিলেন।

সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষী শেখ ওছমান তিরমিজি লাহোরে শাহজাদার সঙ্গে মোলাকাত করিয়াছিলেন। অল্পকাল পরেই তিনি তাঁহার দেশ তুরানে ফিরিয়া যান। কোন প্রকার অনুরোধ ও পুরস্কারের প্রলোভনে তিনি স্বদেশের বাহিরে অবস্থান করিতে সমর্থ হইলেন না। শুনিতে পাওয়া যায় যে, তিনি একদা আরবীতে লিখিত তাঁহার এক কবিতা শাহজাদার সম্মুখে আবৃত্তি করিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া উপস্থিত সমস্ত কবিরা বিমোহিত হইয়াছিলেন এবং শাহজাদার চক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়াছিল। সিরাজের বিখ্যাত শেখ সাদীর খ্যাতি শাহজাদা মুহাম্মদের কর্ণে পৌছিয়াছিল। তিনি দুইবার তাঁহাকে মুলতানে তাঁহার দরবারে দাওয়াত করিয়া পাঠইয়াছিলেন—কিন্তু বার্ধক্যের দরুন তিনি সে দাওয়াত কাবুল করিতে পারেন নাই এবং অনেক অনুনয়ের পর তিনি শাহজাদার প্রেরিত উপহার গ্রহণে রাজী হইয়াছিলেন। প্রতিদানে সাদী শাহজাদাকে তাঁহার গ্রন্থাবলীর একটা নকল পাঠাইয়াছিলেন। সাদী সেই সময় সুলতানের প্রিয় পাত্র—তাঁহার বিদ্বানসভার সভাপতি আমীর খসরুর প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন। শাহজাদা প্রতি বৎসর একবার পিতৃদর্শনে দিল্লী আগমন করিতেন। পিতার প্রতি শাহজাদার ব্যবহারে অনাবিল পিতৃ-ভক্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

সুলতান তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কারা খানকে—যিনি নাসির-উদ-দীন খেতাবে ভূষিত হন, জায়গীরস্বরূপ সুমানা ও সুনাম প্রদান করেন। সেখানে প্রস্থানকালে সুলতান শাহজাদাকে মোগলদের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য সৈন্য-দল গঠন করিয়া তাহাদিগকে সুশিক্ষিত করিবার উপদেশ দান করেন। সুলতান শাহজাদাকে আরও সতর্ক করিয়া দেন যে, তিনি যদি কখনও শুনিতে পান যে শাহজাদা পূর্বের মত সুরাপানে ও ইন্দ্রিয়সুখে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তবে সুলতান নিশ্চিতই তাঁহার জায়গীর কাড়িয়া লইবেন এবং কোন দিন আর তাঁহাকে বিশ্বাস করিবেন না। পিতার উপদেশানুযায়ী শাহজাদা তাঁহার স্বভাবের আমূল পরিবর্তন করিয়া ফেলিলেন এবং প্রমাণ করিয়া দিলেন যে, যৌবনে যদিও তাঁহার মন বিপথগামী হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার চরিত্রবলের অভাব ছিল না। লাহোরের সন্নিকটে বিয়াস নদীর তীরে একটা সাক্ষাতের স্থান নির্দিষ্ট হইল—উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে কোন আক্রমণ আসিলে দুই শাহজাদার

ফৌজ এইখানে দিল্লীর ফৌজের সঙ্গে মিলিত হইবে। এই সময় সমগ্র সাম্রাজ্যে যখন পূর্ণ শান্তি বিরাজ করিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে তোগরল খান বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন—তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া বাঙ্গালার শাসনভার অর্পণ করা হইয়াছিল।

৬৭৮ হিজরীতে (১২৭৯ খ্রীঃ) এই নির্ভীক কর্মবীর শাসনকর্তা জাজ নগর[২] ও তাহার নিকটবর্তী অঞ্চলের রাজাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন এবং তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া কয়েকশত হস্তী ও বহু ধনসম্পদ লুণ্ঠন করিয়া লইয়া আসেন। তিনি সুলতানের নিকট এইসব লুণ্ঠিত দ্রব্যের সংবাদ গোপন রাখিলেন। এই সময় সুলতান এক রোগে সংগাহীন ছিলেন—ফলে দূরবর্তী অঞ্চলে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ রটিয়া গেল। এই সংবাদ তোগরলের কর্ণে পৌঁছিবা মাত্র তিনি অন্যান্য শাহী নিদর্শনের সঙ্গে লোহিত বর্ণের চন্দ্রাতপ মস্তকোপরিধান পূর্বক নিজেকে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ইহা শুনিয়া গিয়াস-উদ-দীন তাহাকে অবিলম্বে আনুগত্য স্বীকার করিবার আদেশ করিয়া পত্র লিখিলেন। ইহাতে কোনো ফলোদয় হইল না। সুলতান অযোধ্যার শাসনকর্তা আলপ্তগীন আমীর খানকে (ডাকনাম 'চুলো') বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে তোগরলের বিরুদ্ধে সাহায্য করিবার জন্য তাইমুর খান শামসী, মালিক তাজ-উদ-দীন, জামাল-উদ-দীন কান্দাহারী ও অন্যান্য সেনাপতিদিগকে প্রেরণ করিলেন। এই বাহিনীর সঙ্গে মিলিত হইয়া আলপ্তগীন সরযূ নদী (বর্তমানে ঘাগ্‌রা নামে পরিচিত) পার হইয়া বাঙ্গালার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তোগরল খান টাকা ছড়াইয়া তোগরলের সেনাবাহিনীর অনেক তুর্কী সিপাহ্‌ সালারকে হাত করিয়া ফেলিলেন। তারপর সুলতানী বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করিলেন। এই দুঃসংবাদ শ্রবণ করিয়া সুলতান ক্রোধে নিজের হস্তপদ কামড়াইতে লাগিলেন। তিনি আলপ্তগীনকে অযোধ্যার তোরণে ফাঁসিদানের আদেশ করিলেন এবং মালিক তির্মানী তুর্কীকে আর এক বাহিনী লইয়া বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। পূর্ববর্তীদের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, তির্মানীর ভাগ্যেও তাহাই ঘটিল। তিনিও পরাস্ত হইলেন এবং তাঁহার সাজসরঞ্জাম ও কোষাগার শত্রুহস্তে পতিত

২ এই স্থানটি মহানন্দ নদীর উপরিস্থিত এবং উড়িষ্যার রাজধানী ছিল।

হইল। এইবার সুলতান স্বয়ং যুদ্ধে গমন করিবেন স্থির করিলেন। নদীপথে সরঞ্জামাদি বহন করিবার জন্য তিনি শীঘ্র এক নৌ-বহর প্রস্তুত করিবার আদেশ দিলেন। ইত্যবসরে শিকারে বহির্গত হওয়ার ভান করিয়া সুলতান তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের এলাকা সুনাম ও সামানায় গমন করিলেন এবং পুত্রকে তাঁহার সেনাবাহিনীসহ দিল্লীতে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। তাঁহার অনুপস্থিত কালের জন্য মালিক ফখর-উদ-দীন কোতোয়ালের হস্তে দিল্লীর শাসনকার্যের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। শুষ্ক ঋতুর অপেক্ষা না করিয়া তিনি গঙ্গা পার হইয়া বাঙ্গালার দিকে ধাবিত হইলেন। দুর্গম পথে বহু নদী অতিক্রম করিয়া তাঁহাকে অগ্রসর হইতে হইল। ফলে তোগরল খান বিশাল সেনাবাহিনী গঠন করিবার প্রচুর সময় পাইলেন। তোগরল খান তাঁহার সমস্ত হস্তী ধনরত্ন ও আসবাবাদি লইয়া বাঙ্গালা ত্যাগ করিয়া জাজ নগরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল সুলতানের রাজধানী প্রত্যাবর্তনের পরে তিনি সেখান হইতে ফিরিবেন।

লক্ষণাবতী পৌঁছিয়া গিয়াস-উদ-দীন বুলবন কয়েকদিন মাত্র সেখানে অবস্থান করিলেন। তিনি হিশাম-উদ-দীন ভকিলকে (ফিরোজ শাহের ইতিহাস রচয়িতার পিতামহ) প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া রাখিয়া সুলতান নিজে সেনাবাহিনী লইয়া জাজনগরের দিকে ধাবিত হইলেন। তিনি সোনার গাঁ পৌঁছিলে সেখানকার জমিদার আসিয়া তাঁহার সহিত যোগদান করিলেন। তিনি সুলতানকে প্রতিশ্রুতিদান করিলেন যে, তিনি নদী পাহারা দিবেন—যাহাতে তোগরল খান সে পথে পলায়ন করিতে না পারেন। গিয়াস-উদ দীন দ্রুত-গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু শত্রুর কোন সংবাদ পাইলেন না। সংবাদ সংগ্রহের জন্য সুলতান মালিক ইয়ারবেগ বারলামকে ১০০০ বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া প্রধান বাহিনীর বিশ মাইল অগ্রে গমন করিবার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু প্রাণপণ অনুসন্ধান করিয়াও কয়েকদিন যাবৎ তাহারা শত্রু সম্বন্ধে কোন সন্তোষজনক তথ্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইল না। একদিন মালিক ইয়ারবেগের ভ্রাতা কোলের শাসনকর্তা মালিক মুকুদ্দর (তিনি পরে তোগরল-কুস আখ্যাপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন) ৪০ জন অশ্বারোহী সৈন্যের একটি দল লইয়া অনুসন্ধানে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, কয়েকজন লোক কয়েকটি বলদের পৃষ্ঠে মালান লাগাইয়া কোথায় যাইতেছে। অনুসন্ধান-

কারীরালোকদিগকে ধরিয়া শত্রুর অবস্থান জিজ্ঞাসা করিল। তাহারা দৃঢ়তার সঙ্গে অজ্ঞতার ভান করিল। কিন্তু তাহাদের একজনের মস্তক যখন উড়াইয়া দেওয়া হইল, তখন তাহারা সকলে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া স্বীকার করিল যে সেই স্থান হইতে চারি ক্রোশ দূরে শত্রুশিবির অবস্থিত এবং তাহারা এই মাত্র সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে। মালিক মুকুদ্দ্‌র লোকদিগকে মালিক ইয়ারবেগের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। উদ্দেশ্য—ইয়ারবেগ তাহাদিগকে জেরা করিয়া শত্রুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য নিজে অগ্রসর হইবেন। মালিক মুকুদ্দ্‌র এক উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া অদূরে এক সমতল ক্ষেত্রে শত্রুশিবির দেখিতে পাইলেন—তাহাদের হাতী ও ঘোড়াগুলি খুঁটিতে বাধা রহিয়াছে এবং তাহারা দিব্যি নিশ্চিন্তে আছে বলিয়া মনে হইল। শত্রুশিবিরের কেন্দ্রস্থলে তোগরলের তাঁবু দৃষ্টিগোচর হইল। সেই তাঁবুর উপর দৃষ্টি রাখিয়া মালিক মুকুদ্দ্‌র এমন এক দুঃসাহসিক কার্য সাধনে কৃত সঙ্কল্প হইলেন যাহার নজীর ইতিহাসে আর নাই। মাত্র চল্লিশজন সঙ্গী লইয়া তিনি পূর্ণবেগে অশ্ব ছুটাইয়া শিবিরে প্রবেশ করিলেন, স্বপক্ষীয় লোক বিবেচনায় কেহ বাধাদান করিল না। তিনি সোজা সদর তাঁবুতে আসিয়া পড়িলেন। তিনি এইখানে তাঁহার লোকদিগকে অসি নিস্কোষিত করিতে হুকুম দিলেন। তারপর "সুলতান বুলবনের জয়" এই ধ্বনি সহকারে সম্মুখস্থ দরবার শিবিরে প্রবেশ করিলেন—ঐ শিবির তখন উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। যাহারা বাধাদানের চেষ্টা করিল তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ কাটিয়া ফেলা হইল।

তোগরল খান ভাবিলেন, তিনি সুলতানী ফৌজ কর্তৃক অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়াছেন। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া তাঁবু কাটিয়া পশ্চাদদিক হইতে বহির্গত হইলেন এবং জিনশূন্য এক অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া বসিলেন। ইতিমধ্যে সমস্ত শিবিরে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে। ইহাতে তাঁহার আশঙ্কা আরও বদ্ধমূল হইল। তিনি নদীর দিকে অশ্ব ছুটাইলেন। উদ্দেশ্য নদী পার হইয়া জাজ নগর পালাইয়া যাইবেন। পলায়নকালে মালিক মুকুদ্দ্‌র তাঁহাকে দেখিয়া ফেলিলেন। তিনি তাঁহার পিছু ছুটিলেন এবং নদী সন্তরণকালে তোগরলকে তীর বিদ্ধ করিলেন। তোগরল অশ্বপৃষ্ঠ হইতে পানিতে পড়িয়া গেলেন। মুকুদ্দ্‌র পানিতে নামিয়া পড়িলেন এবং কেশ আকর্ষণ পূর্বক তাঁহাকে তীরে টানিয়া আনিয়া তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলেন। ঠিক সেই সময় শত্রুপক্ষীয় কয়েকজন লোককে সেদিকে আসিতে দেখিয়া তিনি মুণ্ডটি বালুকার মধ্যে লুকাইয়া

ফেলিলেন এবং ধড়টিকে ভাসাইয়া দিলেন। তারপর গোসল করিতে আরম্ভ করিলেন। লোকগুলি আসিয়া তাহাদের মালিকের কথা জিজ্ঞাসা করিল এবং কোন প্রকার সন্দেহ না করিয়া চলিয়া গেল। ইত্যবসরে মুকুদ্দুরের দল শাহী তাঁবুতে যাহাকেই সম্মুখে পাইল কাটিয়া ফেলিল এবং পরে বিক্ষিপ্ত হইয়া অগণিত শত্রুর মধ্যে মিশিয়া গেল। ভীড়ের মধ্যে পড়িয়া তাহাদের অধিকাংশই রক্ষা পাইল। শত্রুশিবিরে তখন তুমুল হট্টগোল পড়িয়া গিয়াছে। তোগরল খানকে কোথায়ও পাওয়া না যাওয়ায় এবং সমস্ত শিবিরে আতঙ্ক পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় ব্যাপকভাবে পলায়ন শুরু হইল। প্রত্যেকে নিজের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করিতে লাগিল। শত্রু ময়দান হইতে অনেক দূর চলিয়া গেল, চল্লিশ জনের মধ্যে যাহারা জীবিত ছিল তাহারা পিছনে পড়িয়া একত্রিত হইল। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া মুকুদ্দুরের দেখা পাইল এবং তাঁহার সঙ্গে ইয়ারবেগের শিবিরে ফিরিয়া আসিল। ইয়ারবেগ তৎক্ষণাৎ তোগরলের মস্তক সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সুলতান পর দিন প্রধান বাহিনীসহ আসিয়া পড়িলেন। তিনি বীরভ্রাতৃদ্বয়কে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং কনিষ্ঠকে তাঁহার দুঃসাহসিক কার্যের বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিতে বলিলেন। সুলতান বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সব শুনিলেন। মুকুদ্দুর আশা করিয়াছিলেন, সুলতান তাঁহাকে খুব বাহবা দিবেন। সুলতান বাহবা তো দিলেনই না বরং তাঁহাকে অনেক নসিহত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, তাঁর এই গোঁয়ার্তুমী মোটেই বিজ্ঞজনোচিত হয় নাই। কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি অবশ্য উভয় ভ্রাতাকে উচ্চ খেতাব ও পদমর্যাদা প্রদান করিলেন। শত্রুবাহিনী সম্পূর্ণভাবে ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছে দেখিয়া গিয়াস-উদ-দীন বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি বিদ্রোহী তোগরলের পরিবারের প্রত্যেককে হত্যা করিবার আদেশ দিলেন—নির্দোষ শিশু ও স্ত্রীলোকদিগকে পর্যন্ত রেহাই দিলেন না। সুলতানের প্রতিহিংসার আওতাভুক্ত হইয়া কালিন্দর নামক এক সাধু তাঁহার একশত জন শিষ্যসহ নিহত হইলেন। অপরাধ এই সাধু ব্যক্তি বিদ্রোহী তোগরলের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন। তাঁহার পবিত্র ভ্রাতৃ-সঙ্ঘের সাহায্যার্থে তিনি কিছুদিন পূর্বে তিন মণ স্বর্ণ দান করিয়াছিলেন। গিয়াস-উদ-দীন বুলবন তাঁহার পুত্র কারা খানকে বাঙ্গালার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে রাজকীয় নিদর্শন এবং হস্তী ও কোষাগার ব্যতীত তোগরলের সমস্ত সম্পদ প্রদান করিলেন। অতঃপর হস্তী ও কোষাগার লইয়া সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন।

এই অভিযানে সুলতানকে তিন বৎসর যাবৎ দিল্লীর বাহিরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। তাঁহার অনুপস্থিতিকালে ফখর-উদ-দীন কোতোয়াল বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে দিল্লীর শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ফিরিয়া আসিয়া সুলতান তাঁহার মর্যাদা বৃদ্ধি করিলেন। তারপর তিনি বিদ্বান লোকদের সঙ্গে তাহাদের বাড়ী যাইয়া সাক্ষাৎ করেন এবং তাহাদিগকে মূল্যবান উপহারাদি প্রদান করেন। তাঁহাদের সুপারিশক্রমে যেসব অসচ্ছল প্রজাকে রাজস্ব অনাদায়ে কারারুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছিল—তিনি তাহাদের বকেয়া রাজস্ব মওকুফ করিয়া তাহাদিগকে মুক্তিদান করিবার ফরমান জারি করিলেন। যিনি একদিকে এমন করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তিনিই আবার প্রয়োজনবোধেই হউক বা নিষ্ঠুর স্বভাবের জন্যই হউক বিদ্রোহীদের প্রতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর ছিলেন। গত অভিযানে যাহারা বন্দী হইয়াছিল, তাহাদিগকে ফাঁসি দিবার জন্য তিনি বাজারে খুঁটি পুতিবার হুকুম দিয়াছিলেন। কাজী, মুফতি ও আলেমরা দলবদ্ধভাবে তাঁহার নিকট আবেদন জানাইয়া ইহাদের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন। পিতার প্রত্যাবর্তনের সংবাদ পাইয়া শাহজাদা মুহাম্মদ মুলতান হইতে তাঁহার সাক্ষাৎ-লাভের জন্য দিল্লী আগমন করেন। পিতা তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মাত্র তিন মাস কাল দিল্লীতে পিতার নিরবচ্ছিন্ন সান্নিধ্য ভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। ইহারই মধ্যে সংবাদ আসিল যে মোগলরা মুলতান আক্রমণ করিয়াছে। উহাদিগকে বাধাদানের জন্য শাহজাদা প্রস্তুত হইলেন। যাত্রার প্রাক্কালে সুলতান তাঁহাকে খাসকামরায় ডাকিয়া লইয়া এই মর্মে কতকগুলি উপদেশ দান করিয়াছিলেন :

"আমি দীর্ঘজীবন শাসনকার্য ও রাজ্য পরিচালনা করিয়া এবং উপরন্তু অধ্যয়ন ও চোখে দেখিয়া কিছু জ্ঞান অর্জন করিয়াছি। আমি মনে করি আমার মৃত্যুর পরে আমার এই অভিজ্ঞতা তোমরা কাজে লাগাইতে পারিবে এবং আমার মৃত্যু যে আসন্ন তাহা আমি উপলব্ধি করিতে পারিতেছি।

"সিংহাসনারোহণের পর তুমি নিজেকে আল্লাহ্‌র প্রতিনিধি বিবেচনা করিবে। তোমার দায়িত্বের গুরুত্ব সম্বন্ধে তোমাকে সর্বদা সচেতন থাকিতে হইবে। কোন হীন আচরণ দ্বারা তোমার আসনের মহিমা কখনও ক্ষুণ্ন করিবে না

এবং লোভী ও নীচাশয় ব্যক্তিদিগকে কখনও তোমার সম্মানের অংশীদার হইতে বা তোমার শাসনকার্যে কোন অংশ গ্রহণ করিতে দিবে না। তোমার আবেগকে সর্বদা তোমার বিবেক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং কখনও ক্রোধের দাস হইবে না। ক্রোধ প্রত্যেক মানুষের জন্য বিপদ ডাকিয়া আনে। এবং সুলতানের জন্য ডাকিয়া আনে মৃত্যু।

"প্রজ্ঞা-প্রসূত মিতাচার অথচ দাতা জনোচিত উদারতার সঙ্গে রাষ্ট্রীয় কার্যে সরকারী অর্থব্যয় করিবে—অবশ্য তোমার বিবেকই তোমার সদা কল্যাণোন্মুখ অন্তরকে এ বিষয়ে পথনির্দেশ দিবে।

"তোমাকে দেখিয়া লোকে আল্লাহর ইবাদত করিতে শিখিবে এবং তুমি পাপ ও কুফরীকে কখনও ক্ষমা করিবে না।

"সর্বদা রাজকার্যে মনোযোগ রাখিবে—তাহা হইলে কুটিল স্বভাব মন্ত্রীরা তোমাকে প্রতারণা করিতে পারিবে না। মন্ত্রীরা তোমার আদেশ কার্যকরী করিতে যাহাতে কণামাত্র ব্যতিক্রম বা গড়িমসি না করে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা কর্তব্য মনে করিবে। কারণ, তাঁহাদের মাধ্যমেই তুমি জনগণকে শাসন করিবে।

"তোমার কাজী ও ফৌজদাররা যেন যোগ্য, ধার্মিক ও সাধু ব্যক্তি হয়—তাহা হইলে তোমার রাজ্য সুবিচারের আলোকে উদ্ভাসিত থাকিবে।

"জনসমক্ষে অথবা তোমার খাস কামরায় এমন কোন চপলতা প্রদর্শন করিবে না, যাহাতে তোমার রাজ-মহিমা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে। তোমার চতুর্দিকে সবকিছু সুবিন্যস্ত রাখিবে, তাহা হইলে লোকে আপনা হইতেই তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবনত হইবে এবং তোমার প্রতিটি আদেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করিবে।

"সাহসী বিদ্বান ও প্রতিভাবান লোকদিগকে সর্বপ্রযত্নে খুঁজিয়া বাহির করিবে এবং তোমার দান ও করুণা দ্বারা তাহাদিগকে পোষণ করিবে। দেখিবে তাঁহারা তোমার অকৃত্রিম উপদেষ্টা এবং তোমার শাসনকার্যের স্তম্ভস্বরূপ হইবে।

"সামান্য অপরাধে কোন পদস্থ ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত করিবে না। আবার অন্য দিকে তাঁহাদের অপরাধে চক্ষু বুঁজিয়াও থাকিবে না। কোন নিম্নপদস্থ ব্যক্তিকে অতি দ্রুত উচ্চ আসনে উঠাইবে না—তাহাতে এক দিকে সে নিজে বেসামাল হইয়া পড়িবে, অন্যদিকে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন লোকদের চক্ষুশূল হইবে।

"যাহা নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন করিতে পারিবে, তাহাতেই হাত দিবে। বাধ্য না হইলে ইহার বাহিরে আর কিছু করিবার উদ্যোগ করিবে না। কোন কার্য করিবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার পর কখনও সে কার্যে চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ত্রুটি রাখিবে না এবং সেই লক্ষ্য হইতে মনকে অন্যদিকে ফিরাইবে না। একজন সুলতানের পক্ষে বরং গোঁয়াড় হওয়া ভাল, কিন্তু কোনক্রমেই ভীরু বা দ্বিধাযুক্ত হওয়া উচিৎ নয়। গোঁয়ার্তুমী করিয়াও বরং তাঁহার সফলকাম হইবার সম্ভাবনা থাকে, কিন্তু ভীরু ও দ্বিধাযুক্ত হইলে তাঁহাকে সর্বদাই বিফল মনোরথ হইতে হইবে। রাজা দোদুল্যমনা হইলে তাঁহার দুর্বলতা যতটা প্রকট হইয়া প্রকাশ পায় অন্য কিছুতে ততটা প্রকাশ পায় না।"

এই নসিহতগুলি শেষ করিয়া সুলতান নিবিড় স্নেহে পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া চোখের পানির মধ্য দিয়া তাঁহাকে বিদায় দান করিলেন। শাহজাদা তৎক্ষণাৎ শত্রুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। তিনি আক্রমণকারী মোগলদিগের বহু লোককে হত্যা করিয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার অনুপস্থিতিকালে তাহারা যেসব এলাকা দখল করিয়া লইয়াছিল সেগুলি সব পুনরুদ্ধার করিলেন। এই সময় হালাকু খানের পৌত্র এবং আইবুক খানের পুত্র আরঘুন খান পারস্যের সিংহাসনে সমাসীন ছিলেন। হালাকু খান আনুমানিক ৬৫৬ হিজরীতে পারস্য দেশ জয় করিয়াছিলেন। চেঙ্গিশ খানেরই অন্যতম বংশধর তাইমুর খান* খোরাসান হইতে সিন্ধু নদ পর্যন্ত বিস্তৃত পারস্য সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশগুলির শাসনকর্তা ছিলেন। এই বিখ্যাত রাজপুত্র পূর্ববর্তী বৎসরে ভারতে মোগল নিধনের প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত বিশ হাজার বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আসিলেন। দিপালপুর ও লাহোরের চতুষ্পার্শ্বস্থ অঞ্চলগুলি ছারখার করিয়া তিনি সুলতানের দিকে ধাবিত হইলেন। শাহজাদা মুহাম্মদ তখন মুলতানে ছিলেন। তাঁহার মতলব বুঝিতে পারিয়া তিনি বাধাদানের জন্য সত্বর নদী তীরে আসিয়া সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এই নদী লাহোর হইতে আসিয়া মুলতান প্রদেশের একাংশ দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। নদী তীরে আসিয়া তাইমুর খান পরপারে হিন্দুস্থানী

* ইনি গজনীর শাসনকর্তা ছিলেন—তাঁহাকে বিখ্যাত আমীর তৈমুর খান (তৈমুর লঙ্গ) মনে করা চলিবে না।

সৈন্য সমাবেশ দেখিতে পাইলেন। সমান সুবিধাজনক অবস্থায় তাইমুরের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মুহাম্মদ তাঁহাকে বিনা বাধায় নদী অতিক্রম করিতে দিলেন। উভয় বাহিনী যুদ্ধের জন্য কাতার বন্দী হইয়া মহা বিক্রমে পরস্পরকে আক্রমণ করিল। তিন ঘণ্টাব্যাপী যুদ্ধ হইল—এই সময় দুই সেনা-নায়কেরই অসাধারণ কৃতিত্ব প্রতিভাত হইল। শেষ পর্যন্ত মোগলরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিল এবং ভারতীয় ফৌজ সোৎসাহে তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল। পিছু ছুটিতে ছুটিতে ক্লান্ত হইয়া শাহজাদা মুহাম্মদ তৃষ্ণা নিবারণের জন্য ৫০০ শত অনুচরসহ এক নদী তীরে থামিলেন এবং তৃষ্ণা নিবারণের পর জয়লাভের জন্য আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনার্থে সেজদায় বসিলেন।

দুই হাজার সৈন্যসহ এক মোগল সেনাপতি নিকটবর্তী জঙ্গলে লুকায়িত ছিলেন। তিনি সহসা বহির্গত হইয়া এই ক্ষুদ্র দলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শাহজাদা কোন প্রকারে অশ্বে আরোহণের সময়টুকু পাইলেন। তিনি এই ক্ষুদ্র দলকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন এবং নিজে অতুলনীয় বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া সৈন্যদিগকে অনুপ্রাণিত করিতে লাগিলেন। তিনি তিনবার মোগলদিগকে হটিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত সংখ্যাধিক্যের নিকট তাঁহাদের সমস্ত বীরত্ব ব্যর্থ হইল। শাহজাদা কয়েকটি জখম দেহে ধারণ করিয়া অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন এবং মুহূর্তের মধ্যে তাঁহার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইল। এই সময় এক দল ভারতীয় সৈন্যকে এইদিকে আসিতে দেখিয়া মোগলরা পলায়ন করিল। এই দুর্ভাগ্যজনক সংগ্রামে শাহজাদার দলের মাত্র কয়েকজন সৈনিক রক্ষা পাইয়াছিল। মোগলদের হস্তে যাহারা বন্দী হইয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে ছিলেন, শাহজাদার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক আমীর খসরু। তিনি কি প্রকারে পরে মুক্তিলাভ করেন, সে বিষয়ে তাঁহার এক গ্রন্থে উল্লেখ আছে।

তাইমুর খানের পশ্চাদ্ধাবন ত্যাগ করিয়া সৈন্যরা ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন তাহাদের শাহজাদা শোণিত শয্যায় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। তৎক্ষণাৎ তাহাদের বিজয়োল্লাস মর্মভেদী শোকক্রন্দনে পরিণত হইল। নিম্নতম সৈনিক হইতে উচ্চতম সেনানায়ক পর্যন্ত কাহারও চক্ষু শুষ্ক রহিল না। এই মর্মান্তিক সংবাদ অশীতিপর বৃদ্ধ সুলতানের নিকট পৌঁছিলে তিনি দুঃখে একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। অতঃপর জীবন তাঁহার নিকট দুর্বিষহ হইয়া উঠিল।

দুর্ভাগ্যের এই প্রচণ্ড আঘাত কোন প্রকারে সামলাইয়া তিনি পৌত্র (মৃত শাহজাদার পুত্র) কায়খসরুকে পিতার স্থান পুরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। মুলতান পৌঁছিয়া এই শাহজাদা সেনাবাহিনীর পরিচালকের ভার গ্রহণ করেন এবং সীমান্তের রক্ষাব্যবস্থা সুদৃঢ় করিতে মনোনিবেশ করেন।

সুলতান অনুভব করিলেন যে, তিনি দুঃখের ভারে দ্রুত ভাঙ্গিয়া পড়িতেছেন। এই জন্য তিনি বাঙ্গালাদেশ হইতে পুত্র কারা বেগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করা হইল এবং পিতার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহাকে দিল্লী অবস্থান করিতে পীড়াপীড়ি করা হইল। বাঙ্গালার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য একজন সহ-শাসক প্রেরণের সিদ্ধান্ত করা হইল। কারা খান ইহাতে সম্মত হইলেন। কিন্তু কিছুদিন পর তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, পিতার পীড়া শীঘ্রই মারাত্মক হইবার কোন সম্ভাবনা নাই (যাহা তিনি ভাবিয়াছিলেন) তখন তিনি পিতাকে কিছু না বলিয়া বাঙ্গালাদেশে ফিরিয়া আসিলেন। পুত্রের এবম্বিধ দায়িত্বহীন আচরণে মর্মাহত হইয়া বৃদ্ধ সুলতান মুলতান হইতে পৌত্র কায়খসরুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। শাহজাদা সত্বর চলিয়া আসিলেন। ওমরাহদের এক পরামর্শ সভা আহ্বান করিয়া এই শাহজাদার অনুকূলে উত্তরাধিকারিত্ব পরিবর্তিত হইল। গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের অন্তিম ইচ্ছানুযায়ী সেনাপতিরা এই বালক শাহজাদাকে সমর্থন করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। ইহার অল্প কয়েকদিন পরেই ৬৮৫ হিজরীতে (১২৮৬ খ্রীঃ) ২১ বৎসর রাজত্বের পর সুলতান বুলবন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। সম্রাটের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর প্রধান ফৌজদার মালিক ফখর-উদ-দীন কোতোয়াল—যাঁহার সঙ্গে কায়খসরুর পিতার সর্বদাই মতবিরোধ ছিল—তিনি সভাসদদিগকে ডাকিয়া উত্তরাধিকারিত্বের প্রশ্ন পুনরুত্থাপন করিলেন। তিনি বলিলেন, কায়খসরু একজন দুর্দান্ত ও দুর্বিনীত প্রকৃতির যুবক, সুলতান হওয়ার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। তিনি আরও বলিলেন, কারা খান যথেষ্ট শক্তিশালী—উত্তরাধিকারিত্ব তাঁহার পরিবারে হস্তান্তরিত না হইলে গৃহযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। এমতাবস্থায় কারা খানের অনুপস্থিতিতে তাঁহার পুত্র কায়কোবাদের হস্তে সুলতানাতের লাগাম তুলিয়া দেওয়াই তাঁহার মতে সভাসদের পক্ষে বিজ্ঞজনোচিত কর্ম হইবে। এই সময় দরবারে এই ওমরাহের প্রভাব এতো অধিক ছিল যে, তিনি কায়কোবাদের জন্য সিংহাসন আদায়

করিয়া ছাড়িলেন। কায়খসরু প্রাণ লইয়া পালাইতে পারিয়া আল্লাহুকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন। তিনি তাঁহার সাবেক সুবা লাহোর ফিরিয়া আসিলেন।

পূর্বে যেসব মহাপুরুষের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাঁহারা ছাড়াও আরও কতিপয় খ্যাতনামা মনীষী ও সাধক গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের রাজত্বকালে দিল্লীতে অবস্থান করিতেন। যেমন—বিখ্যাত মনীষী শেখ ফরিদ-উদ-দীন মসউদ (শুকুর গন্জ খেতাবে ভূষিত), শেখ বাহা-উদ-দীন জাকারিয়া ও তাঁহার পুত্র, গজনীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক শেখ বদর-উদ-দীন আরিফ, আলেম ও সিদ্ধ পুরুষ কুতুব-উদ-দীন বখ্‌তিয়ার কাকী, সিদি মাওলা। ইহাছাড়াও সাহিত্য ও বিজ্ঞানের শাখায় পারদর্শী বহুলোক তৎকালে দিল্লীতে ছিলেন।

কায়কোবাদ

[তাঁহার দৈহিক বর্ণনা। উজির-জামাতা নিজাম-উদ-দীনের সিংহাসন অধিকারের অভিসন্ধি। সুলতানের চাচাতো ভাই কায়খসরুকে খুন করাইবার নিমিত্ত ডাকা। নিজাম-উদ-দীনের শক্তিবৃদ্ধি। সেনাদলের কয়েকজন মোগল সর্দারকে হত্যা করাইয়া তাঁহাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণ। উজিরের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ শ্রবণ করিতে সুলতানের অসম্মতি। পিতা কারা খানের সিংহাসনের দাবী জ্ঞাপন করিবার জন্য বাঙ্গালা হইতে যাত্রা। সিংহাসনের প্রতি তাঁহার দাবী ত্যাগ করিয়া শুধু পুত্রের দর্শনলাভ কামনা। সাক্ষাৎকারের বিবরণ। কারা খান কর্তৃক পুত্রকে নিজাম-উদ-দীনকে সরাইবার পরামর্শ দান। নিজাম-উদ-দীনকে মুলতানের শাসকর্তা নিযুক্তি। মন্ত্রীর প্রস্থান করিতে গড়িমসি। সুলতান কর্তৃক তাঁহাকে বিষপান করাইবার ব্যবস্থা। নূতন শাসন ব্যবস্থা। সুলতান পীড়িত। দরবারে দুই দলের সৃষ্টি। একদিকে মোগলরা এবং অপর দিকে খিলজী সম্প্রদায়ের লোকেরা। মোগলদের খিলজী নেতাকে ধরিবার চেষ্টা। তাঁহাদের দ্বারা সুলতানের একমাত্র পুত্র দুগ্ধপোষ্য শিশু কাইমুরকে হস্তগত। খিলজী দ্বারা শিশুকে উদ্ধার এবং মোগলদিগকে বিতাড়িতকরণ। তাহাদের নেতা নিহত। নেতা জালাল-উদ-দীন খিলজী কর্তৃক সুলতানকে রোগশয্যায় হত্যা। ঘুরের তুর্কী বংশের রাজত্বের অবসান।]

সাবেক সুলতান মৃতদের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার অষ্টাদশ বর্ষীয় পৌত্র, নাসির-উদ-দীন কারা খানের পুত্র কায়কোবাদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি মুইজ-উদ-দীন উপাধি গ্রহণ করেন। এই শাহজাদা দেখিতে যেমন সুশ্রী ছিলেন, তাঁহার স্বভাবও ছিল তেমনি শান্ত ও অমায়িক। সাহিত্যে তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার পুঁথিগত বিদ্যাও ছিল অসাধারণ। তাঁহার মাতা শামস্-উদ-দীন আলতামাসের কন্যা অসামান্যা সুন্দরী ছিলেন। যদি শোণিতের নিষ্কলুষতার কোন মূল্য থাকে, তবে পুরুষানুক্রমিক পবিত্র শোণিতের ধারক হিসাবে কায়কোবাদ গর্ববোধ করিতে পারিতেন।

পিতা তাহাকে অতিশয় কঠোরতার মধ্যে লালনপালন করিয়াছিলেন। সেইজন্য নিজে কর্তা হইবার পরই অসংযতভাবে আমোদপ্রিয় হইতে আরম্ভ করিলেন। সুলতানের কার্যকলাপ সভাসদদের অনুকরণের বিষয় হইয়া দাঁড়াইল

এবং লাম্পট্য ও পাপাচার এতাদৃশ প্রসারলাভ করিল যে প্রত্যেক ছায়াযুক্ত কুঞ্জবন রমণী ও প্রমোদ-বিহারীদের দ্বারা পরিপূর্ণ থাকিতে লাগিল এবং প্রত্যেক রাস্তায় রাস্তায় হাঙ্গামা ও সোরগোল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইল। এমনকি কোতোয়ালদিগকেও সুরাপানোন্মত্ত অবস্থায় রাস্তায় দেখা যাইতে লাগিল এবং প্রতি গৃহ হইতেই সঙ্গীতধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল।

নিরঙ্কুশভাবে আমোদ-প্রমোদে নিমগ্ন থাকিবার জন্য যমুনার কূলে কেলো-কোরীতে এক প্রাসাদ নির্মাণ করাইয়া সুলতান সেখানে চলিয়া গেলেন। সেখানে গায়ক-গায়িকা, নর্তক-নর্তকী, অভিনেতা, সঙ্গীতজ্ঞ ও ভাঁড় ব্যতীত অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। আমীর-উল-ওমরাহের (মালিক ফখর-উদ-দীন কোতোয়াল) ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা মালিক নিজাম-উদ-দীন প্রধান কর্মসচীবের পদ প্রাপ্ত হইলেন এবং রাজকার্যের লাগাম তাঁহারই করতলগত হইল। মালিক কাওয়াম-উদ-দীন তাঁহার সহকারী নিযুক্ত হইলেন। তিনি রাজনীতিজ্ঞ অপেক্ষা বিদ্বান হিসাবেই সমধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন। সুলতানকে সম্পূর্ণ প্রমোদাসক্ত দেখিয়া নিজাম-উদ-দীন সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার পরিকল্পনা প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। তাঁহার প্রথম লক্ষ্য ছিল কায়খসরু। শাহজাদা গজনী যাইয়া কায়কোবাদকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্য গজনীর মোগল শাসনকর্তা তাইমুর খানের নিকট সৈন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নাই এবং তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, গজনীতে তাঁহার কোন বন্ধু নাই। অগত্যা মুলতান ও পশ্চিমাঞ্চলের প্রদেশগুলি স্বীয় অধিকারে রাখিবার অনুমতি প্রার্থনা করিয়া সুলতানের নিকট এক আবেদন পেশ করিয়াছিলেন।

ইতিমধ্যে নিজাম-উদ-দীন কায়খসরুকে সুলতানের নিকট যথাসম্ভব ঘৃণিত করিয়া তুলিয়াছেন। তিনি কায়খসরুকে কোন প্রকারে দিল্লী পরিদর্শন করিতে আসিতে রাজী করাইলেন। তাঁহার নিযুক্ত আততায়ী দিল্লীর পথে রুহটাক নামক গ্রামে শাহজাদাকে খুন করিয়া ফেলিল। উজির খাজা খাতির্‌য়ারের সঙ্গে কায়খসরুর পত্র বিনিময় হইয়াছে—এইরূপ এক মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করিয়া তাহার স্বপক্ষে এক জাল পত্র প্রদর্শন করিলেন। ইহার ফলে উজিরকে লাঞ্ছনা ভোগ ও নির্বাসন দণ্ডলাভ করিতে লইল। নিজাম-উদ-দীন এইখানেই ক্ষান্ত হইলেন না। তিনি সাবেক সুলতানের আমলের সমস্ত পুরাতন কর্মচারীকে

একাদিক্রমে গোপনে খুন করাইয়া চলিলেন। সমস্ত শহরে আতঙ্ক সৃষ্টি হইল। কিন্তু কেহ ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারিল না যে এইসব হত্যাকাণ্ডের গুরু স্বয়ং নিজাম-উদ-দীন।

এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে সংবাদ আসিল যে মোগলরা পুনরায় লাহোর আক্রমণ করিতে আসিয়াছে। মালিক ইয়ারবেগ বারলাম ও খান জাহানের পরিচালনাধীনে এক সেনাবাহিনী মোগলদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল এবং অনেক মোগল সৈন্যকে বন্দী অবস্থায় দিল্লী আনয়ন করা হইল। এই সময়েই মন্ত্রী সুলতানকে তাঁহার মোগল সৈন্যদের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন করিয়া তুলিলেন। ভাগ্যান্বেষী বিপুল সংখ্যক মোগল সুলতানের সেনাবাহিনীতে চাকুরী গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিজাম-উদ-দীন সুলতানকে বুঝাইলেন যে, মোগল আক্রমণ-কালে এইসব মোগল সৈন্য নির্ঘাত তাহাদের স্বজাতীয় মোগলদের পক্ষে যোগদান করিবে। তিনি ইহাও ইঙ্গিতে বলিলেন যে, এরূপ একটা গোপন বোঝাপড়া ইতিপূর্বেই তাহাদের মধ্যে হইয়া রহিয়াছে।

কায়কোবাদ সব কথা বিশ্বাস করিলেন এবং একদিন মোগল সর্দারদিগকে ডাকিয়া আনিয়া চরম বিশ্বাস-ঘাতকতার সঙ্গে রক্ষীদের দ্বারা হত্যা করাইলেন। তাহাদের সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। মোগলদের সঙ্গে যে-সব ওমরাহদের কোন প্রকার সম্পর্ক ছিল তাহাদের সকলকেই বন্দী করিয়া দূরতম দুর্গগুলিতে প্রেরণ করা হইল। নিজের সম্বন্ধে কায়কোবাদ এমন নিশ্চিন্ত ছিলেন এবং মন্ত্রী কর্তৃক এরূপভাবে সম্মোহিত হইয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতার কোন বন্ধু মন্ত্রীর দুরভিসন্ধির প্রতি অঙ্গুলি নিদেশ করিয়া তাঁহাকে সতর্ক করিলে, তিনি সে কথা খোদ নিজাম-উদ-দীনকেই বলিয়া দিতেন।

তাঁহার অভিসন্ধি কার্যকরী করিবার নিমিত্ত নিজাম-উদ-দীন বাহিরে সুলতান সমীপে যেরূপ ব্যস্তভাবে কাজ করিয়া যাইতেছিলেন, সেই সময় তাঁহার স্ত্রীও হেরেমে অনুরূপ তৎপরতা দেখাইতে ছিলেন। হেরেমের সমস্ত মহিলা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিত এবং তাহার প্রভাব এতো অধিক ছিল যে তাঁহাকে রাণীমাতা বলিয়া ডাকা হইত। নিজাম-উদ-দীনের শ্বশুর মালিক ফখর-উদ-দীন তখন নব্বই বৎসরের বৃদ্ধ। জামাতার দুরভিসন্ধি তাঁহার দৃষ্টি এড়াইতে পারে নাই। তিনি একদিন জামাতাকে গৃহে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে

সংযতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য অনেক নসিহত করিলেন। মন্ত্রী তাঁহার যুক্তির যথার্থতা স্বীকার করিলেন এবং তাঁহাকে বলিলেন যে, সুলতানের অনুগ্রহ লাভ ব্যতীত তাঁহার আর কোন উদ্দেশ্য নাই। তিনি আরও বলিলেন যে, দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি এতো লোককে অসন্তুষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন যে, সেই অবস্থায় প্রভাব শিথিল হইতে দেওয়াকে তিনি বিপজ্জনক মনে করেন।

সুলতানের পিতা কারা খান এতদিন বাঙ্গালা লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি দিল্লীর সংবাদাদি অবগত হইয়া পুত্রকে নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া এবং তাঁহাকে কি করিতে হইবে, সে সম্পর্কে উপদেশ দান করিয়া এক পত্র লিখিলেন। কিন্তু তাঁহার উপদেশে কোনো ফলোদয় হইল না। কারা খান তখন অনন্যোপায় হইয়া সসৈন্যে দিল্লীর পথে রওয়ানা হইলেন—কারণ তিনি দেখিলেন তাঁহার কথায় পুত্রের চৈতন্যোদয় হইতেছে না, ওদিকে তাঁহার বিপদ ঘনাইয়া আসিতেছে। পিতা বুলবনের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে কারা খান দিল্লীর পথে পা বাড়াইলেন। পিতা বিহার পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছিলে কায়কোবাদ তাঁহাকে বাধাদানের জন্য আগাইয়া আসিয়া, ঘাগরা নদী তীরে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। কারা খান সরযু নদীর তীরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। উভয় বাহিনী কয়েক দিন যাবৎ প্রতি ঘন্টায় সংঘর্ষ আশঙ্কা করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কারা খান দেখিলেন যে পুত্রের সৈন্যবল অনেক বেশী এবং যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে আয়ত্তে আনিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং যুদ্ধের পথ পরিহার পূর্বক তিনি পুত্রের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করিলেন।

তরুণ সুলতান উদ্ধত ভাষায় পিতার পত্রের উত্তরদান করিতে লাগিলেন এবং মন্ত্রীর প্ররোচনায় আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় পিতার স্বহস্তে লিখিত অতি করুণ ও স্নেহার্দ্রসিক্ত এক পত্র আসিয়া সুলতানের হাতে পড়িল। পরিস্থিতি চরমে পৌঁছিবার পূর্বে পিতা একবার মাত্র পুত্রের দর্শন লাভ করিয়া নয়ন তৃপ্ত করিতে চান—এই আবেদন ছিল সেই পত্রে। পত্র পাঠে তাঁহার স্বাভাবিক সুপ্ত অনুভূতি জাগ্রত হইয়া উঠিল এবং তিনি পিতৃদর্শনে যাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ অনুচরবর্গকে প্রস্তুত হইবার আদেশ দিলেন। অনুগ্রহভাজন মন্ত্রী এই সাক্ষাৎকার নিবারণের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইলেন। তখন তিনি অনমনীয় শাহজাদাকে এইটুকু উপলব্ধি করাইতে সমর্থ হইলেন যে, তিনি দিল্লীর সম্রাট, তিনি কেন যাইবেন?

সাক্ষাতের জন্য কারা খানকেই তাঁহার নিকট আসিতে হইবে। মন্ত্রীর এই কারসাজিও অবশ্য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। কারণ, কারা খান এই অভিসন্ধির নিকট পরাজয় স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না—তিনিই পুত্রের সঙ্গে মোলাকাত করিতে আসিবেন, জানাইলেন। তিনি জ্যোতিষীদিগকে একটা শুভ মুহূর্ত নির্ণয় করিতে বলিলেন। তারপর নদী পার হইয়া পুত্রের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিতাকে মহা আড়ম্বর ও আনুষ্ঠানিকভাবে অভ্যর্থনা করিবার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করিয়া কায়কোবাদ সিংহাসনে যাইয়া উপবেশন করিলেন। নির্দেশ রহিল যে পিতা সিংহাসনের সমীপবর্তী হইয়া যথারীতি তিনবার ভূমি চুম্বন করিবেন। বৃদ্ধ পিতা বহিঃশিবিরে আসিয়া পৌঁছিলে এই নির্দেশানুযায়ী তাঁহাকে অশ্বাবতরণ করিতে বলা হইল। সিংহাসনের দৃষ্টিসীমার ভিতর আসিবার পর সম্মুখে চলিবার কালে তাঁহাকে তিন স্থানে তিন বার শির নত করিয়া কুর্নিশ করিতে হইল এবং সেই সঙ্গে স্বর্ণ দণ্ডধারী সুলতানের নির্দিষ্ট কর্মচারীরা উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতে লাগিল, "কারা খান শাহান্‌শার নিকট নতিস্বীকার করিতে আসিতেছেন।" এইরূপে পদে পদে অপদস্থ হইয়া অপমান ও লজ্জায় কারা খান কাঁদিয়া ফেলিলেন। পুত্র ইহা দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি লম্ফ দিয়া সিংহাসন হইতে নামিয়া পিতার পদপ্রান্তে ভূমি চুম্বন করিয়া মার্জনা ও দোয়া ভিক্ষা করিলেন। কারা খান তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বক্ষে ধারণ করিলেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাঁহার কণ্ঠসংলগ্ন থাকিয়া উচ্চঃস্বরে ক্রন্দন করিতে থাকিলেন। এমন এক মর্মস্পর্শী দৃশ্যের অবতারণা হইল যে ওমরাহগণ সকলে তাঁহাদের অশ্রু মুছিতে লাগিলেন।

আনন্দের প্রথম আবেগ কাটিয়া গেলে তরুণ সুলতান পিতাকে সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন এবং নিজে সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন। অতঃপর সুলতানের আদেশে স্বর্ণ মুদ্রাপূর্ণ এক রেকাবী পিতার মস্তকোপরি তিনবার দোলাইবার পর তাহার অনুচরবর্গের মধ্যে বিতরণ করা হইল। ইহার পর পরিষদবর্গের মধ্যে পারিতোষিক বিতরণ করা হইল, সাক্ষাদান্তে কারা খান স্বশিবিরে ফিরিয়া গেলেন। বিশ দিন ব্যাপী পিতা-পুত্র পরস্পরের সান্নিধ্য ভোগ করিলেন। এই সময় তাঁহারা পালাক্রমে একে অন্যের শিবির পরিদর্শন করিয়াছেন এবং আনন্দোৎসবে সময় কাটাইয়াছেন। পিতা-পুত্রের মধ্যে একমাত্র

চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল এই যে, প্রত্যেকে তার সাবেক রাজ্যে রাজত্ব করিবেন এবং তাঁহারা স্ব স্ব এলাকায় চলিয়া যাইবেন। বিদায়ের প্রাক্কালে কারা খান পুত্র, তাঁর মন্ত্রী ও সহকারী মন্ত্রীদিগকে এক খাসকামরায় ডাকিয়া ভবিষ্যতে তাঁহারা কি প্রকারে রাজ্য শাসন করিবেন, সে সম্পর্কে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন। তারপর কায়কোবাদকে আলিঙ্গন করিয়া তার কর্ণে চুপি চুপি বলিলেন, "যত শীঘ্র পার নিজাম-উদ-দীনের সংশ্রব ত্যাগ কর"। অতঃপর চোখের জলের মধ্যে পৃথক হইয়া তাঁহারা স্ব স্ব রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। কারা খান, অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছিলেন এবং স্বশিবিরে আসিয়া তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন যে, তিনি পুত্রের নিকট হইতে চিরদিনের জন্য বিচ্ছিন্ন হইয়া আসিলেন। কারণ, মন্ত্রীর দিক হইতে পুত্রের অনিষ্টের আশঙ্কা তখনও তাঁহার মনে বদ্ধমূল ছিল এবং পুত্র যথেচ্ছাচার ত্যাগ করিবেন এরূপ আশা তিনি করিতে পারিতেছিলেন না।

দিল্লী ফিরিবার পর কয়েক দিন মাত্র পিতার উপদেশ তাঁহার উপর কার্যকরী ছিল বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ভাল মানুষ হইবেন ইহা নিজাম-উদ-দীনের কাম্য ছিল না। মন্ত্রী তাঁহাকে দ্রুত ভোগবিলাসের পথে ফিরিয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি রাজ্যের নানাস্থান হইতে কতকগুলি সুন্দরী ললনা, সুদর্শনা নর্তকী ও উৎকৃষ্ট গায়ক-গায়িকা সংগ্রহ করিলেন। ইহাদিগকে তিনি একে একে সুলতানের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিবার ব্যবস্থা করিলেন। একদিন সুলতান অশ্বারোহণে বাহিরে যাইতেছিলেন। এমন সময় পথে সুদৃশ্য আরবীয় অশ্বে আরূঢ়া,—শিরে সুবর্ণ তাজ শোভিতা এক অপূর্ব সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তরুণী সুলতানকে অভিবাদন করিল। সুবর্ণ পুষ্পখচিত একটা সূক্ষ্ম শ্বেতবস্ত্র তাঁহার সুডৌল স্কন্ধদেশ হইতে শ্লথভাবে ঝুলানো ছিল এবং তাঁহার ক্ষীণ কটিদেশ উজ্জ্বল রত্নরাজি সম্বলিত কটিবন্ধ দ্বারা বেষ্টিত ছিল। ব্যবস্থা এমন করা হইয়াছিল যে, মনে হইল সেই রমণীয় বস্ত্রটি যেন আকস্মিকভাবেই সুলতানের সম্মুখে পতিত হইয়াছে। সে সুলতানের উপর সহস্র ভঙ্গিতে তার মোহিনী শক্তি প্রয়োগ করিতে লাগিল এবং একটা প্রেম-গীতি পর্যন্ত গাহিতে শুরু করিল এবং মাঝখানে হঠাৎ থামিয়া এই অশোভন আচরণের জন্য মার্জনা ভিক্ষা করিল। অনেক অনুরোধের পর পুনঃ গান ধরিল। সুলতান তাঁহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ অশ্বাবতরণ করিয়া সেইখানেই শিবির সন্নিবেশ করিবার হুকুম

দিলেন এবং সেই সন্ধ্যা তাঁহার সাহচর্যে কাটাইলেন। এই রমণীর যেমন ছিল রূপ তেমনই ছিল তীক্ষ্ণ বুদ্ধি। সে যখন নৃত্যরতা হইল তখন সুলতান পুনঃ পুনঃ হর্ষধ্বনি করিয়া উঠিতে লাগিলেন এবং তাঁহার মোহিনী শক্তির প্রশস্তি জ্ঞাপক কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিলেন। আর সেই লাস্যময়ী রমণী সঙ্গে সঙ্গে স্বরচিত কবিতায় তার উত্তর প্রদান করিতে লাগিল। সেই উপস্থিত রচিত কবিতাগুলিও এমন বুদ্ধিদীপ্ত ও সুরুচিসম্পন্ন ছিল যে পরিষদবর্গ বিস্ময়াবিশিষ্ট হইলেন।

সুলতান পূর্বের মতই লাম্পট্য, সুরাপান ও অমিতাচারে গা ভাসাইয়া দিলেন। ফলে তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তখন পিতার নসিহতগুলি তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বুঝিতে পারিলেন, নিজাম-উদ-দীনই তাঁহার বর্তমান অধঃপতনের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী এবং তাঁহার প্রভাব হইতে নিজেকে মুক্ত করিতেই হইবে। প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তিনি নিজাম-উদ-দীনকে মুলতানের শাসনভার অর্পণ করিলেন। কিন্তু সুলতানের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিয়া নিজাম-উদ-দীন নানা অজুহাত দর্শাইয়া নূতন কর্মস্থানে যাত্রার বিলম্ব করিতে লাগিলেন এবং সেই সঙ্গে সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার সুযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সুলতানের সতর্কদৃষ্টির নিকট তাঁহার সমস্ত পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। সুলতান যখন দেখিলেন যে তাঁহাকে কিছুতেই দূরে সরানো যাইতেছে না, তখন তিনি তাঁহাকে বিষপ্রয়োগের কার্যে মন্ত্রীর শত্রুভাবাপন্ন কয়েকজন সভাসদকে নিযুক্ত করিলেন। এই উদ্দেশ্যে মালিক জুগরিশ খিলজীর পুত্র মালিক জালাল-উদ-দীন ফিরোজ খিলজী সুলতানের আদেশপ্রাপ্ত হইয়া দরবারে আসিয়া হাজির হইলেন। তিনি ছিলেন সামানার সহ-শাসনকর্তা। তাহাকে শায়েস্তা খান খেতাবসহ আরিজুল মুমালিক[১] পদে নিযুক্ত করা হইল এবং ভরণ-পোষণের জন্য তাঁহাকে বার্ন জেলা প্রদান করা হইল। মালিক আমীর কুচনকে "বার-বিকের"[২] পদে উন্নীত করা হইল এবং মালিক আতমীর সুরখাকে ভকিলই-দুর[৩]

---

১ এই কর্মচারীর মধ্যস্থতায় সমস্ত দরখাস্ত গ্রহণ করা হয়।

২ ইহা এক প্রকার তুর্কী খেতাব। ইউরোপীয় কোর্টের "gentlemen usher"—ভদ্র অভ্যর্থনাকারী পদবীরূপে গ্রহণ করা যায়।

৩ এই কর্মচারী সুলতানের সাক্ষাৎকার ব্যাপারের তত্ত্বাবধায়ক। সাক্ষাৎপ্রার্থী পদস্থ ব্যক্তিদিগকে তাঁহার কামরায় বসাইয়া রাখা হয়—যতক্ষণ না সুলতান তাঁহাদিগকে দর্শনদানের জন্য প্রস্তুত হন।

করা হইল। এই সময় সুলতান পক্ষাঘাতগ্রস্ত হওয়ায় এই তিনজন কর্মচারী সরকারের সমস্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইলেন। এই অবস্থায় প্রত্যেক ওমরাহ ক্ষমতা দখলের জন্য ষড়যন্ত্র করিতে লাগিয়া গেলেন। মোগল ওমরাহগণ সুলতানের পরিবারের প্রতি আনুগত্যশীল বলিয়া নিজদিগকে জাহির করিতেন। তাঁহারা সুলতানের এক মাত্র পুত্র তিন বৎসর বয়স্ক শাহাজাদা কাইমুরকে সিংহাসনে বসাইবার জন্য হারেম হইতে নিজেদের দখলে লইয়া আসিলেন। ইহাতে দুইটি দলের সৃষ্টি হইল। এই দুই বিবাদমান দল শহরের দুই পার্শ্বে শিবির স্থাপন করিল। মোগলরা শিশু সুলতানের জন্য এবং খিলজীরা জালাল-উদ-দীন খিলজীর জন্য সিংহাসন দাবী করিল। বিপক্ষ দলের ভয়ে জালাল-উদ-দীন খিলজী তাঁহার দলবলসহ বাহাদুরপুর চলিয়া গেলেন—কারণ, মালিক আতমীর কুচুন ও মালিক আতমীর সুরখার নেতৃত্বে বিপক্ষ দল সমস্ত খিলজী সর্দারদিগকে "অবাঞ্ছিত ব্যক্তি" ঘোষণা করিয়া এক ফরমান জারি করাইয়াছিলেন। খিলজীদের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ইহারা ঈর্ষান্বিত হইয়াছিল। এই তালিকায় প্রথম নাম ছিল জালাল-উদ-দীন ফিরোজের। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আত্মরক্ষার জন্য তিনি প্রস্তুত হইলেন। জালাল-উদ-দীন ফিরোজকে রুগ্ন সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য আত্‌মীর কুচুনের মাধ্যমে এক আমন্ত্রণ জানানো হয়। মোগলগণই আত্‌মীর কুচুনের উপর এই কার্যের ভার দিয়াছিলেন এবং স্থির হইয়াছিল সেই সাক্ষাৎকার সভায় তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। তিনি ষড়যন্ত্রের কথা পূর্বেই অবগত হইয়াছিলেন এবং যে ব্যক্তি সেই নিমন্ত্রণপত্র লইয়া তাঁহার নিকট আসিয়াছিল তাঁহাকে তিনি স্বহস্তে দরজাতেই কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। জালাল-উদ-দীন খিলজীর পুত্ররা সাহসের জন্য বিখ্যাত ছিল। তাঁহারা অবিলম্বে পাঁচশত বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মোগল শিবিরে হানা দিলেন এবং পথ কাটিয়া সেনা বাহিনীর কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত শাহী শিবিরে যাইয়া পৌঁছিলেন। প্রবল বাধা সত্ত্বেও তাঁহারা ফখর-উদ-দীন কোতোয়ালের পুত্রদের সঙ্গে শিশু সুলতানকে হরণ করিয়া সাফল্যের সঙ্গে বাহির হইয়া আসিলেন। পলায়ন-কালে মালিক আত্‌মীর সুরখা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং এই প্রচেষ্টায় বহু নামকরা মোগল সেনাপতির সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেন। এই দুঃসাহসিক

অভিযানের কথা শহরময় রাষ্ট্র হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত লোক অস্ত্রধারণ করিল। তাঁহারা হাজারে হাজারে বাহির হইয়া আসিয়া বাদায়ুন তোরণে সমবেত হইল এবং শিশু সুলতানকে উদ্ধার করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ জালাল-উদ-দীন ফিরোজের শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিবার জন্য প্রস্তুত হইল। কারণ, খিলজীদের অভ্যুত্থানকে তাহারা সকলেই ভয় করিত। কিন্তু বৃদ্ধ মন্ত্রী মালিক ফখর-উদ-দীন কোতোয়াল --যাহার নাম পূর্ববর্তী সুলতানের রাজত্বকালে পুনঃ পুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে—তাঁহার ভয় হইল যে এইরূপ সংঘর্ষের ফলে খিলজীদের হস্তে পতিত শিশু সুলতান ও তাঁহার পুত্রদের মৃত্যু ঘটিতে পারে। এইজন্য তিনি তাঁহার অপরিসীম প্রভাব ও প্রতিপত্তি দ্বারা অতি কষ্টে জনগণকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দিলেন। ইত্যবসরে মালিক জালাল-উদ-দীন ফিরোজ আততায়ী পাঠাইয়া কেলোকারীতে রোগশয্যায় শায়িত কায়কোবাদের হত্যা কার্য সমাধা করিলেন। দুর্বৃত্তরা সুলতানকে মুমূর্ষাবস্থায় একা পাইয়াছিল—রক্ষীরা সকলেই তাঁহাকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছিল। পাষণ্ডরা লগুড় দ্বারা পিটাইয়া সুলতানের মগজ বাহির করিয়া ফেলিয়াছিল এবং তারপর তাঁহাকে বিছানার কাপড়ে মুড়িয়া জানালা দিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিয়াছিল। প্রধান আততায়ী কোন এক তাতার সম্প্রদায়ের লোক ছিলেন। উঁহার পিতা কায়কোবাদ কর্তৃক অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিল। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সে স্বেচ্ছায় এই কার্য গ্রহণ করিয়াছিল। এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের পর মালিক জালাল-উদ-দীন ফিরোজ জালাল-উদ-দীন উপাধি ধারণপূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করেন। এইরূপে ঘুরী রাজবংশের অবসান ও খিলজী রাজবংশের গোড়াপত্তন হয়। গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের ভ্রাতুষ্পুত্র জুজু অতঃপর আইনসঙ্গত উত্তরাধিকারী বলিয়া পরিগণিত হইলেন। ভরণপোষণের জন্য জালাল-উদ-দীন তাঁহাকে কারা জেলা প্রদান করেন। জালাল-উদ-দীন ফিরোজ অতঃপর রাজপ্রাসাদ দখল করিলেন এবং মহা আড়ম্বরের সঙ্গে তাঁহাকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। এই ব্যবস্থা সুসম্পন্ন করিতে যাইয়া তিনি শেষ পর্যন্ত শিশু সুলতানকেও পৃথিবী হইতে বিদায় করিয়া দিলেন।

৬৮৭ হিজরীতে (১২৮৮ খ্রীঃ) এই বিপ্লব সংঘটিত হয়। কায়কোবাদের রাজত্বকাল তিন বৎসরের কিছু বেশী স্থায়ী হইয়াছিল। সমস্ত জাহানের অধিপতি কেবল আল্লাহ্‌ই চিরস্থায়ী।

জালাল-উদ-দীন ফিরোজ খিলজী

[খিলজী সম্প্রদায়ের উৎপত্তির ইতিহাস। জালাল-উদ-দীন কর্তৃক শাহজাদা কাইমুরকে হত্যা। নূতন মন্ত্রীসভা গঠন। কৃতকর্মের জন্য সুলতানের অনুশোচনা ও সাবেক রাজবংশের প্রতি শ্রদ্ধাশীলতার অভিনয়। দরবারের আদব-কায়দা। বিদ্বানদের উৎসাহ দান। সাবেক সুলতানের এক আত্মীয়ের সিংহাসন দাবী করিয়া পরাভূত। তাঁহাকে ক্ষমা করিবার পর জায়গীর প্রদান। সুলতানের লোকদের তাঁহার সদয় নীতির অসমর্থন। ইহার কুফল। সিদি মাওলা নামক এক গোঁড়া ধর্মীয় নেতার আগমন। সুলতানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে তাঁহার যোগদান। তাঁহার বিচার ও প্রাণদণ্ড। এই সময় জনসাধারণের মধ্যে ও সুলতানের পরিবারে কতকগুলি দুর্ঘটনা সংঘটিত। জনগণের মন্তব্য—সিদি মাওলার মৃত্যুই এইসবের কারণ। রনথম্বরে বিদ্রোহ। সুলতানের বিদ্রোহ দমনে যাত্রা। অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রীগণ কর্তৃক তাঁহাকে তিরস্কার। এক লক্ষ মোগলের হিন্দুস্থান আক্রমণ। সুলতান কর্তৃক তাহাদিগকে পরাস্তকরণ। মোগলদিগকে নির্বিঘ্নে পশ্চাদপসরণ করিবার সুযোগ প্রদান। ওগলু খান ও তিন সহস্র মোগলের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া সুলতানের অধীনে কর্মগ্রহণ। দিল্লী নগরীতে তাহাদের বসবাসের জন্য এলাকা নির্দিষ্টকরণ। মোগলপুরা নির্মিত। সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ-দীন কর্তৃক মালবের অন্তর্গত ভিলসা নামক স্থান অধিকার। তিনি বিপুলভাবে সম্মানিত এবং তাঁহার জায়গীরের আয়তন বৃদ্ধি। আলা-উদ-দীনের পরিচালনাধীনে দাক্ষিণাত্যে প্রথম মুসলমান ফৌজ প্রবেশ। তাঁহার দেওগর (দেবগিরি) অবরোধ এবং রাজাকে কর দানে বাধ্যকরণ। প্রত্যাবর্তনকালে সেনাবাহিনীর অসমসাহসিকতার পরিচয়। আলা-উদ-দীন সিংহাসন অধিকারের অভিসন্ধি পোষণ করিতেছেন বলিয়া সুলতানের সন্দেহ। বেগম ও মন্ত্রীগণ কর্তৃক সুলতানকে আলা-উদ-দীনের বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ। ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য এবং তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য নিরূপণ করিবার জন্য সুলতানের গোয়ালিয়র গমন এবং আলা-উদ-দীন কর্তৃক প্রতারিত হইয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন। আলা-উদ-দীনের সৈন্যবাহিনী লইয়া স্বীয় জায়গীর কারায় গমন। সুলতানের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটাইবার কাজে আলা-উদ-দীন কর্তৃক ভ্রাতা আলমাস বেগ নিয়োজিত। আলমাস বেগ সুলতানকে প্রতারিত করিয়া সুলতানসহ কারায় প্রত্যাবর্তন। ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাইয়া জালাল-উদ-দীনের প্রাণহানি।]

নিজাম-উদ-দীন আহমদ বলিয়াছেন, তিনি কতকগুলি প্রামাণ্য গ্রন্থ পাঠে অবগত হইয়াছেন যে, কুলিচ বা খিলজী বংশ চেঙ্গিশ খানের অন্যতম জামাতা কুলিচ খান হইতে উদ্ভূত। এই বংশের উৎপত্তির ইতিহাস এইরূপ—কুলিচ খান ও তাঁহার স্ত্রীর মধ্যে সর্বদা বিরোধ ও মনোমালিন্য লাগিয়াইছিল। কিন্তু শ্বশুরের ভয়ে তিনি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। অবশেষে চেঙ্গিশ খান যখন খারিজম শাহকে সিন্ধু তীর পর্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া ইরান ও তুরানের দিকে ফিরিতেছিলেন, সেই সময় কুলিচ খান তাঁহার সম্প্রদায়ের ৩০,০০০ পরিবারসহ ঘুর ও জুর্জিস্তানের পার্বত্যাঞ্চলে থাকিয়া যান। এই পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে কুলিচ খানের পরিচয় ছিল এবং এইখানে বসবাস করিয়া তিনি চেঙ্গিশ খানের প্রভাবমুক্ত হইতে পারিবেন মনে করিলেন। চেঙ্গিশ খানের বংশধররা কুলিচ খানকে বশীভূত করিবার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নাই। ফলে তিনি ঐ অঞ্চলেই নিরাপদে রহিয়া গেলেন। ঘুর বংশীয়দের দ্বারা দিল্লীর সিংহাসন অধিকৃত হওয়ার পর প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের লোক হিসাবে খিলজীরা দলে দলে দিল্লী আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করে। দিল্লীর জালাল-উদ-দীন খিলজী ও মান্দুর সুলতান মাহমুদ খিলজী উভয়েই কুলিচ খান অপভ্রংশে খিলিজ-খানের বংশধর এবং তাঁহার নামানুসারেই এই বংশ খিলজী বংশ নামে পরিচিত। কিন্তু সেলজুক নামাতুর্কের লেখকের মতে তাহা নয়। তিনি বলেন নূহের পুত্র এয়াফে এগারজন সন্তানের মধ্যে এক জনের নাম ছিল খালিচ—খিল্‌চী বা খিলজীরা তাঁহারই বংশধর। উপরোক্ত বিবরণদ্বয়ের মধ্যে দ্বিতীয়টি আমার নিকট বেশী সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। কারণ, গজনীর সুলতানদের ইতিহাসে, বিশেষভাবে সবুক্তগীন ও সুলতান মাহমুদের ইতিহাসে বার বার খিলজীদের নামোল্লেখ করা হইয়াছে এবং চেঙ্গিশ খানের পূর্বেই যে খিলজী সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। হইতে পারে কুচিল খান খিলজী বংশেরই লোক ছিলেন এবং জালাল-উদ-দীনের পিতা ও মালবের সুলতান মাহমুদ খিলজীর পূর্ব-পুরুষরা সরাসরি কুচিল খানের বংশধর।

রাজ্য আত্মসাতের আচ্ছাদন হিসাবে জালাল-উদ-দীন খিল্‌জী শাহজাদা কাইমুরকে কয়েক মাস জীবিত রাখেন। কিন্তু নিজকে সিংহাসনে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর তিনি আর শাহজাদাকে বাঁচিতে দিলেন না। সত্তর

বৎসর বয়সে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজছত্রের রং লাল হইতে সাদায় পরিবর্তিত করেন। শিশু সুলতানের হত্যা সাধনের পর তাঁহার আর কোন নিষ্ঠুর কার্য দ্বারা তিনি তাঁহার হস্ত কলুষিত করেন নাই। তিনি অতপর দয়া ও বদান্যতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। দিল্লীর বাসিন্দাদের আনুগত্যের উপর তাঁহার বেশী আস্থা ছিল না। এইজন্য তিনি কেলোকারীতে তাহার বাসস্থান নির্দিষ্ট করেন এবং সেখানে দুর্গ নির্মাণ করিয়া কেলোকারীর রক্ষণব্যবস্থা মজবুত করেন। নদীর তীর পর্যন্ত ছাদযুক্ত রাস্তা নির্মাণ ও অনেক সুন্দর সুন্দর উদ্যান তৈরী করিয়া তিনি কেলোকারীর শোভা বর্ধন করেন। সুলতানের দেখাদেখি ওমরাহগণও সেখানে প্রাসাদাদি নির্মাণ করেন। ফলে শীঘ্রই কেলোকারী একটা নূতন শহরে পরিণত হইল। সুলতান তাঁহার ভ্রাতা জুগরিশ খানকে আরিজুল মুমালিক নিযুক্ত করেন। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইখ্‌তিয়ার-উদ-দীন, 'খান খানান' এবং দ্বিতীয় পুত্র 'আরকালী খান' খেতাব প্রাপ্ত হন। তাঁহাদের প্রত্যেককেই জায়গীর প্রদান করা হয় এবং তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে বাস করিতে থাকেন। সুলতান ঠিক এইভাবেই তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ-দীন ও আলমাস বেগকে নিজের বিশেষ অনুগ্রহের ছায়াতলে আশ্রয়দান করেন। ইহারা ছিলেন তাঁহার ভ্রাতা শাহাব-উদ-দীনের পুত্র। প্রথমোক্তকে তিনি সেনাবাহিনী প্রধানের পদ দান করেন এবং দ্বিতীয় জন—যিনি আলুখ খান নামে অভিহিত হইয়াছিলেন—তাঁহাকে অশ্বাদির প্রধান তত্ত্বাবধায়ক (আখুর বেগ) নিযুক্ত করেন। তাঁহার ভাগীনের মালিক আহমদ হাবিবকে বারবিকের পদ প্রদান করেন। মালিক খুররমকে আমীর-ই-তুর এবং খাজা খাত্তিরকে প্রধান উজির মনোনীত করা হইল। ফখর-উদ-দীন মালিক উল-ওমরাহকে কোতোয়ালের পদেই বহাল রাখা হইল।

দিল্লীর আমীর ওমরাহ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিবর্গ—যাহারা গত ৬০ বৎসর যাবৎ তুর্কী সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন এবং খিলজী প্রভুত্বের নামে সর্বদাই আঁৎকিয়া উঠিয়াছেন—তাঁহারা সাময়িকভাবে খিলজী সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহাদের চিরাচরিত বৈরীভাব বিস্মৃত হইলেন এবং ফিরোজ খিলজীর রাজত্বের প্রথম দিকে তাঁহারা এতদূর প্রসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, সকলে নূতন শহরে আসিয়া সিংহাসনের চতুষ্পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিলেন।

সকল শ্রেণীর লোকের আনুগত্য সম্বন্ধে স্থির নিশ্চিত হইবার পর সুলতান সুসজ্জিত অনুচরবর্গ পরিবৃত হইয়া বিপুল শান-শওকতের সঙ্গে পুরাতন দিল্লীতে পুনঃপ্রবেশ করিলেন। শাহীমহলে প্রবেশকালে চৌকাঠের সম্মুখে দুইবার সেজদায় গেলেন। অতঃপর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং উর্ধ্বমুখী হইয়া হস্ত উত্তোলন পূর্বক উচ্চস্বরে সর্বসমক্ষে বলিয়া উঠিলেন, "আমার প্রতি আল্লাহ্র এই অপার অনুগ্রহের ঋণ আমি কি প্রকারে পরিশোধ করিব? যে সিংহাসনের প্রতি মস্তক অবনত করিতে আমি চিরাভ্যস্ত ছিলাম খোদা আমাকে আজ সেই সিংহাসনেই বসাইয়াছেন। আমার সহকর্মীবৃন্দ—যাঁহারা চতুষ্পার্শ্বে করজোড়ে ভক্তিভরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন—ইহাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাঁহারা এই মর্যাদার জন্য আমার সমপোযুক্ত, এমনকি আমাপেক্ষা অধিকতর যোগ্য আছেন।" সেখান হইতে তিনি "রুবী মহলে" গমন করিলেন এবং উহার বহিঃদ্বারে যথারীতি অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন। ইহাতে তাঁহার ভাগীনেয় আহমদ হাবিব মন্তব্য করেন, "হুজরত যখন এখন শাহীমহলের মালিক, তখন ইহার বহিঃদ্বারে অশ্ব হইতে অবতরণ করিবার আপনার কি প্রয়োজন ছিল?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "সমস্ত সম্মান আমার সাবেক সুলতান ও মালিক, গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের প্রাপ্য—যিনি পূর্বে এই প্রাসাদে বাস করিয়াছেন।" অতঃপর আহমদ হাবিব পুনরায় বলেন, "সে যাহাই হউক, হুজরত নিশ্চয়ই এখন এই প্রাসাদকে নিজের বাসগৃহ করিয়া লইবেন।" উত্তরে সুলতান বলিলেন, "সুলতান গিয়াস-উদ-দীন যখন ওমরাহ ছিলেন, তখনই তিনি এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিলেন। সুতরাং ইহা তাঁহার পরিবারের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ইহা দখল করিবার কোন অধিকার আমার নাই।" তাঁহার ভাগীনেয় পুনরায় মন্তব্য করেন, "এতোটা সূক্ষ্ম বিচার সুলতানের বৃহত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হইতে বাধ্য"। উত্তরে সুলতান বলিলেন, "আমি আর কয়দিনই বাঁচিব। এই কয়দিনের জিন্দেগীতে কাহারো সম্পত্তির উপর হস্তক্ষেপ করিয়া বিবেকের দংশন জ্বালা আর বৃদ্ধি করিতে চাই না।" অতঃপর পদব্রজে কয়েকটি প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিয়া তিনি দরবার গৃহে আসিয়া প্রবেশ করিলেন। সুলতান হইবার পূর্বে তিনি যেখানে দণ্ডায়মান থাকিতেন সেখানেই আসন গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি বলিলেন, "আত্‌মির কুচুন ও আত্‌মির সুরখান বংশের উপর আল্লার লানৎ বর্ষিত হউক. উহারাই আমার প্রাণনাশের চেষ্টা করিয়া আমাকে

আত্মরক্ষার্থ এইরূপ ব্যবস্থাবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। নতুবা আমি এখনও যেখানে ছিলাম সেখানেই থাকিতাম—আল্লাহ্ জানেন, সেস্থান দিল্লীর তখ্‌ত হইতে কত দূরে ছিল। মালিক অথবা খান উপাধি লইয়া জীবন অতিবাহিত করিতেই আমি প্রস্তুত ছিলাম। এখন এই উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়া আমি ভাবিয়া কুল কিনারা পাই না—কেমন করিয়া আমি এই আসনের মর্যাদা রক্ষা করিব। গিয়াস-উদ-দীন বুলবন ও তাঁহার বংশধরদের বদান্যতা ও বিচক্ষণতা সুবিদিত। তাহাদের পক্ষে যে সাম্রাজ্যের লাগাম স্বহস্তে রাখা সম্ভব হয় নাই আমার পক্ষে তাহা কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? শুধু আল্লাহ্ই জানেন এই নবলব্ধ সাম্রাজ্য কি প্রকারে আমার ও আমার বংশধরদের জন্য কল্যাণকর হইবে।"

সুলতানের এই ভাষণ শুনিয়া কয়েকজন প্রবীণ ও সুবিজ্ঞ সভাসদ মাথা নীচু করিয়া চিন্তা মগ্ন রহিলেন—আর কিছু সংখ্যক সাহসী পারিষদ নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "একি অদ্ভুত সুলতান—সিংহাসনে আরোহণ করিবার পূর্বেই তিনি উহা হারাইবার চিন্তা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে কাহাকেও শাস্তি প্রদান করিতে বা কাহাকেও দণ্ডদান করিতে সুলতানরা কুণ্ঠাবোধ করেন না। কিন্তু এই সুলতানের পক্ষে সেরূপ নীতি অবলম্বন করা বোধহয় কখনও সম্ভবপর হইবে না।" সেই দিনই সন্ধ্যায় তিনি নূতন শহরে ফিরিয়া গেলেন এবং সাময়িকভাবে সেখানেই বাস করিবেন স্থির করিলেন। ইহার অল্পকাল পরেই তিনি তাঁহার দুই সুন্দরী কন্যাকে তাঁহার দুই ভ্রাতুষ্পুত্র আলা-উদ-দীন ও আলমাস বেগের (আলুখ খান উপাধি ভূষিত) সঙ্গে শাদী দিলেন। সুলতান হইবার পর জালাল-উদ-দীন খিলজী বহু সদগুণাবলীর—বিশেষ করিয়া দয়া ও বদান্যতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। কোন অধীনস্থ ব্যক্তিকেই তাহার অপরাধের জন্য দণ্ডদান করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই এবং কোন সম্পদশালী প্রজার সম্পত্তির উপর তিনি হস্তক্ষেপ করিয়াছেন এরূপ কোন নজীর নাই—সেকালের স্বেচ্ছাচারী সুলতানেরা যাহা প্রায়ই করিতেন। সিংহাসনারোহণের পরেও তিনি তাঁহার পুরাতন পরিচিত লোকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করিতেন। তিনি পূর্ববৎ তাঁহাদের জল্‌সায় যোগদান করিয়া তাহাদের সঙ্গে অল্প মাত্রায় মদ্যপান করিতেন।

নিম্নোল্লিখিত ব্যক্তিগণ তাহার ব্যক্তিগত বন্ধুত্বলাভে ধন্য হইয়াছিলেন এবং সুলতানের প্রধান সহচরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন: মালিক তাজ-উদ-দীন কুচী,

মালিক ফখর-উদ-দীন কুচী, মালিক আইজ-উদ-দীন ঘুরী, মালিক কারা বেগ, মালিক নস্‌রত সুব্বা, মালিক আহমদ হাবিব, মালিক কামাল-উদ-দীন আবুল মা-আলী, মালিক নাসির-উদ-দীন কোহ্‌রামী এবং মালিক সা-মাদ-উদ-দীন মুনতাকী। এই লোকগুলি একদিকে যেমন সাহসী ও বিজ্ঞ ছিলেন অন্যদিকে তেমনি ছিলেন বিচক্ষণ ও রসালাপী।

নিম্নোক্ত মনীষীগণ প্রায়শঃই সুলতানের গোপন পরামর্শ সভায় প্রবেশাধিকার পাইতেন : তাজ-উদ-দীন ইরাকী, আমীর খসরু, খাজা হাসান, মুভিদ দিওয়ানা, আমীর আরসালান কুলামী, ইখ্‌তিয়ার-উদ-দীন ইরাগী এবং বাকী খাট্টির। ইঁহারা সকলেই তাঁহাদের বিদ্বাবত্তার জন্য খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন এবং কাব্য, ইতিহাস ও বিজ্ঞানের গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন।

এই সমস্ত জল্‌সা প্রায়শঃই আমীর খাসা ও হামিদ রাজার মত উৎকৃষ্ট গায়ক এবং মুহাম্মদ শাহ্‌ হাত্‌কি, ফতেহ্‌ শাহ, নাসির খান ও বেহ্‌রোজের মত বাদ্য-কারদের দ্বারা অলঙ্কৃত হইত। প্রত্যেক জলসাতেই আমীর খসরু নূতন নূতন গান অথবা কবিতা রচনা করিয়া দিতেন এবং এজন্য তিনি ঘটনাস্থলেই পুরস্কৃত হইতেন। সাবেক সুলতান কায়কোবাদের রাজত্বকালে আরিজুল মুমালিকের পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে জালাল-উদ-দীন খিলজী আমীর খসরুর জন্য একটা ভাতা বরাদ্দ করিয়া দিয়াছিলেন। এইবার তিনি তাঁহাকে সরকারী গ্রন্থাগারের প্রধান কর্মকর্তা নিযুক্ত করিলেন এবং তাঁহাকে শুভ্র বহির্বাস পরিধান করিবার অধিকার প্রদান করা হইল—যে মর্যাদা শাহী বংশের লোক ও দরবারের ওমরাহদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই সুলতানের রাজত্বকালের দ্বিতীয় বর্ষে, গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের ভাগীনেয় মালিক জুজু—'লেবাসের তত্ত্বাবধায়ক' আমীর আলীর প্ররোচনায় স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশ কারায় স্বাধীন সুলতানের ন্যায় নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন, শ্বেতবর্ণ ছত্রধারণ করেন এবং সুলতান মুখিস্‌-উদ-দীন উপাধি ধারণপূর্বক নিজকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। আমীর আলী হাতিম খান উপাধি-সহ অযোধ্যার শাসনকর্তা নির্বাচিত হইলেন। বুলবন পরিবারের অধিকাংশ ব্যক্তিরাই তাঁহার দলে আসিয়া যোগদান করিলেন। সেই অঞ্চলের কয়েক-জন হিন্দু রাজাও তাঁহার পক্ষাবলম্বন করেন। এই সম্মিলিত শক্তি লইয়া তিনি সাহসিকতার সঙ্গে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সংবাদ পাইয়া

জালাল-উদ-দীন খিলজী তাঁহার পুত্র শাহজাদা আরকুলী খানকে একদল বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্যসহ অগ্রে প্রেরণ করিলেন এবং প্রধান বাহিনী লইয়া পশ্চাদে স্বয়ং বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। শহরের পঁচিশ মাইল দূরে আরকুলী খানের সঙ্গে শত্রুদের সাক্ষাৎকার হইল এবং এক তুমুল সংঘর্ষের পর শত্রুরা পরাজিত হইয়া পলায়নপর হইল। পলায়নকালে পশ্চাদ্ধাবনকারীদের হস্তে কয়েকজন ওমরাহ ধৃত হইলেন—যাঁহাদের মধ্যে অযোধ্যার শাসনকর্তা আমীর আলীও ছিলেন। তাঁহাদের গলায় গাছের ডাল বাঁধিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে উষ্ট্রে আরোহণ করানো হইল এবং তদাবস্থায় সুলতানের নিকট প্রেরণ করা হইল। দর্শনমাত্র জালাল-উদ-দীন তাঁহাদের বন্ধন মোচনের হুকুম দিলেন এবং পরিচ্ছদ বদলাইয়া তাঁহাদের খানাপিনার ব্যবস্থা করিতে নির্দেশ দান করিলেন। আহারান্তে সুলতানের সম্মুখে হাজির করা হইলে সুলতান এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন, "অনিষ্টের প্রত্যুত্তরে অনিষ্ট সাধন করা অতি সহজ কাজ, ইহাতে কোন বাহাদুরী নাই। কিন্তু যে মহৎ সে অনিষ্টের জওয়াব দেন উপকার দ্বারা।" সম্পূর্ণ অভয়দান করিয়া তিনি তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে আদেশ করিলেন। ইহার কয়েকদিন পরে জুঝুও স্থানীয় জমিদারগণ কর্তৃক বন্দী অবস্থায় সুলতানের নিকট প্রেরিত হন। সকলেই ভাবিয়াছিলেন, সুলতান তাঁহার প্রাণদণ্ডের হুকুম দিবেন। কিন্তু প্রাণদণ্ড দূরের কথা, সুলতান তাহাকে বিনা শর্তে মুক্তি দান করিয়া মুলতান প্রেরণ করিলেন এবং সেখানে তাঁহার জীবনভর গ্রাসাচ্ছাদনের উত্তম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

খিলজী প্রধানরা সকলেই এক বাক্যে সুলতানের এইসব করুণা ও উদারতার নিন্দা করিতে লাগিলেন। তাহারা সকলে সুপারিশ করিলেন যে, সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের ন্যায় তাঁহাকেও বিদ্রোহী ও বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে ক্ষমাহীন কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহারা বলিলেন, বিদ্রোহীদের অন্ততঃ দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করিয়া দিতে হইবে যাহাতে ভবিষ্যতে তাহাদের পক্ষে বিদ্রোহ করা সম্ভব না হয় এবং অন্যেরাও তাহাদের দশা দেখিয়া সতর্ক হয়। তাঁহারা তীব্রভাবে সাবধান বাণী উচ্চারণ করিলেন যে, সুলতান এইসব ব্যাপারে কঠোর না হইলে শীঘ্রই সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিবে এবং সেই সুযোগে মোগলরা হিন্দুস্থান হইতে খিলজীদের নাম নিশানা মুছিয়া ফেলিবে। উত্তরে সুলতান বলিলেন, "আপনারা

যাহা বলিতেছেন তাঁহার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না—জাগতিক নিয়মে তাহাই করণীয়। কিন্তু এই পরিণত বয়সে আর কোন রক্তপাত না করিয়াই আমি কবরে প্রবেশ করিতে চাই"।

সর্দারদের অনুমানানুযায়ী সুলতানের ভ্রান্ত উদারনীতির কুফল শীঘ্রই ফলিতে আরম্ভ করিল। করুণা খোদাদত্ত পরম গুণ। কিন্তু সে যুগের অধঃপতিত ভারত-বাসীরা ইহার সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিল। সুলতানের দয়ার্দ্র-চিত্ততার কথা সর্বত্র রাষ্ট্র হইবার পর আর কোথাও শাসন-শৃঙ্খলা ঠিক রহিল না। রাজপথেই দস্যু-তস্করের ভীড় জমিল—সিঁধকাটা, ডাকাতি, নরহত্যা ও আরও নানাবিধ পাপকার্য দেশের সর্বত্র অবাধে চলিতে লাগিল। পাপকার্য দ্বারা জীবিকার্জনকেই অনেকে সহজ পন্থা হিসাবে গ্রহণ করিল। প্রত্যেক প্রদেশে বিদ্রোহের লক্ষণ পরিস্ফুট হইয়া উঠিল এবং দস্যুদের উপদ্রবে সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হইতে লাগিল। এমনকি ছোট খাট ব্যবসাও অসম্ভব হইয়া পড়িল। এদিকে সুলতানের অধীনস্ত প্রদেশের শাসনকর্তারাও রাজস্ব প্রদানে ও তাহাদের কার্যের কৈফিয়ত প্রদানে গড়িমসি করিতে লাগিলেন।

খিলজী প্রধানরা এইসব অরাজকতার জন্য সুলতানকে প্রকাশ্যভাবে দায়ী করিতে লাগিলেন। এমনকি সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মালিক তাজ-উদ-দীন কুচীকে সিংহাসন প্রদানের কথাও তাঁহারা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। মালিক তাজ-উদ-দীন একজন প্রভাবশালী আমীর ছিলেন—প্রখর বুদ্ধিমত্তা, কর্তব্য-পরায়ণতা এবং কঠোর দৃঢ়তার জন্য তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাজ-উদ-দীনের গৃহে সমবেত হইয়া এইসব আমীরগণ একদিন সুরাপানকালে খোলাখুলিভাবে সুলতানকে হত্যা করিবার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহারা এতদুর অগ্রসর হইলেন যে, সুলতানকে হত্যা করিবার গৌরবের জন্য তাঁহাদের মধ্যে একরূপ কাড়াকাড়ি শুরু হইল। ইতিমধ্যে তাঁহাদেরই এক সঙ্গি অলক্ষ্যে সভা ত্যাগ করিয়া সুলতানের নিকট ছুটিয়া আসিলেন এবং সমস্ত ঘটনা তাঁহার নিকট পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিলেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ একদল দেহরক্ষীকে তাজ-উদ-দীনের গৃহ অবরোধ করিতে পাঠাইলেন। উহারা ষড়যন্ত্রকারীদিগকে বাঁধিয়া সুলতানের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিল। সুলতান রাজদ্রোহিতার জন্য তাঁহাদিগকে তিরস্কার করিলেন। অতঃপর কোষ হইতে

স্বীয় তলোয়ার বাহির করিয়া তাঁহাদের সম্মুখে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "তোমাদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা সাহসী সেই এই তলোয়ার ধারণ করিয়া আমাকে আঘাত কর"। তাঁহারা লজ্জায় সঙ্কুচিত হইয়া ভূমি চুম্বনপূর্বক নির্বাক হইয়া রহিলেন। উহাদের মধ্যে মালিক নসরত ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্বপ্রতিভ ও উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি সুলতানকে বলিলেন, "হজরত, পানোন্মত্ত অবস্থায় মানুষ যাহা বলে তাহা ধূয়ার মতই শূন্যগর্ভ। জাঁহাপনার মত মহান হৃদয়বান নরপতি আমরা কোথায় পাইব? আর সামান্য প্রলাপের জন্য আমাদের বিনাশ সাধন করিলে জাঁহাপনাই বা এমন সব বিশ্বস্ত ভৃত্য কোথায় পাইবেন?" তাঁর বলার ভঙ্গিতে এবং ব্যাপারটাকে এই প্রকারে লঘু করার জন্য সুলতান তাঁহার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ শরাব আনাইয়া স্বহস্তে তাহাকে এক পেয়ালা প্রদান করিলেন। অনন্তর সকলকে বেকসুর খালাস দিলেন—অবশ্য তীব্র তিরস্কারের পর।[১]

দরবেশ সিদি মাওলার প্রাণদণ্ড, তাঁহার রাজত্বের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। গুজরাটের জিয়া বারনী ও সদর জাহানের ইতিহাসে এই ঘটনা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই এখানে বলা হইতেছে।

এই সময় দিল্লীর বিখ্যাত ব্যক্তি মালিক ফখর-উদ-দীন কোতোয়াল ইন্তেকাল করেন। তাঁহার মৃত্যুতে গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের আমলের অনেক পুরাতন পরিবার একেবারে নিঃস্ব হইয়া পড়িল। তিনি এতকাল ইহাদিগকে স্বোপার্জিত অর্থে সাহায্য করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহাদের বাহিরেও ছিল ১২,০০০ কোরান তেলাওয়াতকারী ও কয়েক সহস্র প্রহাশ্রিত ব্যক্তি। জীবনধারণের জন্য ইহারা সকলকেই সিদি মাওলার শরণাপন্ন হইল। বিজাপুরের শেখ আইন-উদ-দীনের কেতাবে বর্ণিত আছে যে, এই অলিআল্লাহ্ পারস্যের জুর্জানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখান হইতে ধর্মীয় ফকিরের বেশে তিনি পশ্চিমে গমন করেন এবং বহু ধার্মিক ও বিদ্বান ব্যক্তিদের সংস্পর্শে আসেন। অতঃপর দেশে ফিরিয়া আসিয়া ফরিদ-উদ-দীন শুকুর গঞ্জের সঙ্গে মোলাকাতের জন্য হিন্দুস্থান আগমন করেন। তিনি কিছুকাল শেখ ফরিদ-উদ-দীনের নিকট অবস্থান করেন এবং পরে

---

১ হিন্দুস্থানে মুসলমানরা প্রবেশ করিয়া আফগানরা যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে কি প্রকার সাম্যভাব রক্ষা করিয়া চলিতেন—তাহা যাহাদের জানিবার সুযোগ হইয়াছে, তাঁহারা এই ঘটনার সত্যতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের রাজত্বকালে বন্ধুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া দিল্লী দর্শনে আগমন করেন। বিদায়কালে বন্ধু তাঁহাকে রাজদরবারে আমীর ওমরাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা স্থাপন করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন এবং এই মর্মে সতর্কও করিয়া দিয়াছিলেন যে, এইরূপ ঘনিষ্ঠতা তাহার পক্ষে মারাত্মক হইবে। দিল্লী আসিয়া সিদি মাওলা একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং ফকির মুসাফির ও সর্ব প্রকারের গরীব নিরাশ্রয়ের অভ্যর্থনার জন্য একটা মুসাফিরখানা নির্মাণ করিলেন। তাঁহার দরজা হইতে কেহ কখনও নিরাশ হইয়া ফিরিত না। ধর্মের প্রতি অগাধ ভক্তি এবং ধর্মশাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও তিনি জামাতে নামাজ পড়িতে অবহেলা প্রদর্শন করিতেন এবং এইরূপ আরও কতকগুলি ব্যাপারে নিজের খেয়ালমত চলিতেন। তিনি কোন দাসদাসী রাখিতেন না এবং কেবলমাত্র ভাত খাইয়া জীবনধারণ করিতেন। তিনি প্রচুর অর্থ দান-খয়রাত করিতেন—অন্যদিকে কাহারও নিকট হইতে কিছু গ্রহণ করিতেন না। লোকে ভাবিয়া পাইত না কোথা হইতে এইসব দান-খয়রাত করিবার টাকা আসে। লোকে সন্দেহ করিতে লাগিল যে তিনি আল্‌কেমী জানিতেন। শুধু যে দান-খয়রাতেই অর্থ ব্যয় করিতেন তাহা নয়—অতিথি সৎকারে তাঁহার আরও অনেক বেশী অর্থব্যয় হইত। তাঁহার ভোজসভায় মাঝে মাঝে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরাও শরীক হইতেন। কোন সম্ভ্রান্ত পরিবার অভাবগ্রস্ত হইলে তিনি অকাতরে সেই পরিবারকে দুই তিন হাজার স্বর্ণ মুদ্রা দান করিতেন। তাঁহার আয়োজিত ভোজসভা শাহী ভোজসভার মতই আড়ম্বরপূর্ণ হইত। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের মৃত্যুর পর তিনি আরও বেশী অমিতব্যয়ী হইয়া পড়েন। এই হিসাব হইতে তাঁহার বদান্যতা সম্বন্ধে আমরা কিছুটা আঁচ করিতে পারি। তিনি প্রতিদিন গরীবদের জন্য হাজার মন আটা, পাঁচ শত মন গোশত্‌ ও দুইশত মন গুড় ব্যয় করিতেন। ইহার উপরও ছিল চাউল, তৈল, ঘি ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক দ্রব্য। তাঁহার দুয়ারে এত লোক ভীড় করিত যে তাঁহাতে লোকের পথ চলা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িত। সুলতানের পুত্ররা ও দরবারে ওমরাহরাও তাহাদের অনুচরবর্গ লইয়া তাঁহার আস্তানায় গমন করিতেন এবং দিনরাত আনন্দোৎসব অথবা দার্শনিক তত্ত্বালোচনায় কাটাইতেন। তাঁহার এইসব ব্যয়ের সঙ্গে যোগ হইল ফখর-উদ-দীনের পরিবারের ভরণপোষণের ব্যয়ভার। এই সময় কুচক্রী কাজী জালাল-উদ-দীন কাসানী সিদি মাওলার অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন ও

ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়েন। তিনি এই দরবেশের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সঞ্চার করিতে আরম্ভ করেন। কাসানী মাওলাকে বলিতে লাগিলেন, লোকে মনে করে খিলজীদের জুলুম হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য এবং হিন্দুস্থানে সত্য ও ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ্ আপনাকে প্রেরণ করিয়াছেন। সিদি মাওলা এই প্রতারণার ফাঁদে আটকাইয়া পড়িলেন। তিনি গোপনে তাঁহাদের শিষ্যদের মধ্যে খেতাব ও পদ বিতরণ করিতে লাগিলেন। তাঁহার কথা ও আচরণে সিংহাসনের প্রতি তাঁহার দুরভিসন্ধি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। মীর মহসীন কোতোয়াল ও নাতী পিহ্লোয়ান নামক তাঁহার দুইজন অনুগামীকে তিনি সুলতানকে হত্যা করিবার জন্য নির্দিষ্ট করিলেন। স্থির হইল শুক্রবার দিন মসজিদে গমনকালে ইহারা সুলতানদের দলে মিশিয়া পড়িবে এবং তাঁহাকে হত্যা করিবে। ঠিক সেই সময় ক্ষমতা দখল করিবার জন্য সিদি মাওলা তাঁহার ১০,০০০ সাগ্রেদকে প্রস্তুত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার একজন শিষ্য পরিকল্পিত রাষ্ট্রবিপ্লবে যে পদের প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া সে গোপনে সুলতানের নিকট এই ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করিয়া দেয়।

সিদি মাওলা ও জালাল-উদ-দীন কাসানীকে গ্রেফতার করিয়া সুলতানের সম্মুখে আনিয়া হাজির করা হইল। উহারা সজোরে তাঁহাদের অপরাধ অস্বীকার করিলেন। তাহাদের বিরুদ্ধে কেহ সাক্ষ্যদান করিতেও অগ্রসর হইল না। তখন ইহাদের অপরাধ সম্বন্ধে সুলতান নিজেই সন্দিহান হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অপরাধী কি না, তাহা প্রমাণ করিবার জন্য সুলতান তাঁহাদের জন্য অগ্নিপরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি বাহাদুরপুর প্রান্তরে এক অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করাইলেন। অগ্নিকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে এক গোলাকার পরিবেষ্টনী তৈরী করা হইল। সুলতান রাজধানী ত্যাগ করিয়া নিজে আসিলেন এই কাণ্ড দর্শন করিবার জন্য। সিদি মাওলা ও অপর অভিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সেখানে আনা হইল। নির্দোষিতা প্রমাণের জন্য সুলতান তাঁহাদিগকে ঐ অগ্নিকুণ্ডের মধ্য দিয়া হাটিয়া যাইতে হুকুম করিলেন। নামাজান্তে তাঁহারা আগুনে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। এমন সময় সুলতান তাহাদিগকে থামাইয়া উজিরদের জিজ্ঞাসা করিলেন—শরিয়তানুযায়ী কোন মুসলমানকে অগ্নিদ্বারা পরীক্ষা করা জায়েজ কি না। তাঁহারা এক বাক্যে বলিয়া উঠিলেন "আগুনের কাজ পুড়িয়া ফেলা, নেককারকে

গোনাহ্গার অপেক্ষা একটুও বেশী খাতির করিবে না—উপরন্তু এইরূপ অনুষ্ঠান পৌত্তলিকতারই নামান্তর—সম্পূর্ণ যুক্তি ও শরিয়ত বিরুদ্ধ।''

সুলতান তখন কাজী জালাল-উদ-দীনকে কয়েদী হিসাবে বাদায়ুন দুর্গে প্রেরণ করিলেন এবং সিদি মাওলাকে প্রাসাদের নিম্নে এক গহ্বরে আবদ্ধ করিবার আদেশ করিলেন। সুলতানের হত্যার জন্য যে দুই ব্যক্তি নিযুক্ত হইয়াছিল তাহাদিগকে প্রকাশ্যে ফাঁসি দেওয়ার হুকুম হইল। এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আরও কতিপয় ব্যক্তিকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করা হইল।

পুলিশ যখন সিদি মাওলাকে দরবারের মধ্যে দিয়া কয়েদ খানার দিকে লইয়া যাইতেছিল, তখন সুলতান নিকটে দণ্ডায়মান কয়েকজন কলন্দরের উদ্দেশ্যে বলেন, ''আমার বিরুদ্ধে যে জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, তাহাকে দেখিয়া লও। উহার সমুচিত বিচারের ভার তোমাদের উপর ছাড়িয়া দিলাম।'' এই কথা শুনিবামাত্র সানজারী নামক এক কলন্দর তৎক্ষণাৎ কয়েদীর নিকট ছুটিয়া যাইয়া ক্ষুর দ্বারা তাঁহার দেহ কাটিতে লাগিল। সিদি মাওলা একটুও বাধা দিলেন না বরং তাহাকে দ্রুত কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন—যাহাতে তিনি শীঘ্র আল্লাহ্র নিকট পৌঁছিতে পারেন। অতঃপর তিনি বাতায়ন হইতে দর্শনরত সুলতানের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, ''আমি অত্যন্ত খুশী যে তুমি আমার জীবনাবসানে কোন বিলম্ব ঘটাইলে না। তবে মনে রাখিও পর-হেজগার ও বেগুনাহ্ ব্যক্তিকে নির্যাতন করার মত বড় পাপ আর নাই। তুমি ও তোমার অভিশপ্ত বংশধরদের উপর আমার বদ্-দোওয়া শীঘ্রই নির্মমভাবে পতিত হইবে''। কথাগুলি শুনিয়া সুলতান বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত ও হতবাক হইয়া রহিলেন। শাহজাদা আরকুলী খান সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সিদি মাওলার প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কারণ, সিদি মাওলার সঙ্গে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খান খানানের সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। সুলতানের দুর্বলতার লক্ষণ দেখিয়া আরকুলী খান তৎক্ষণাৎ হস্তীপৃষ্ঠে উপবিষ্ট এক মাহুতকে অগ্রসর হইয়া সিদি মাওলাকে নিষ্পিষ্ট করিবার ইঙ্গিত করিলেন।

জালাল-উদ-দীন ফিরোজের রাজত্বের ইতিহাস লেখক জিয়া বারনী তখন দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, সিদি মাওলার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এক কৃষ্ণবর্ণ ঘূর্ণিবাত্যা আবির্ভূত হইয়া চতুর্দিক অন্ধকার করিয়া

ফেলিয়াছিল। দুই ঘণ্টাকাল এই অন্ধকার স্থায়ী হইয়াছিল। পথের লোকেরা হুড়মুড় করিয়া একে অন্যের উপর পড়িয়াছিল। পথ চলিয়া গৃহে পৌছিবার সাধ্য কাহারও ছিল না। লেখক আরও বলিয়াছেন যে সেই বৎসর (৬৯০ হিঃ) রাজ্যে বৃষ্টিপাত হয় নাই। ফলে দেশে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল। প্রতিদিন পথে ঘাটে হাজার হাজার হিন্দুস্থানী প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। অনেকেই জঠরজ্বালা হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য সপরিবারে নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছিল।

সুলতানের ভাগ্যাকাশ সত্যই মেঘাচ্ছন্ন হইতে লাগিল। প্রতিদিন নব নব বিরোধ মাথা তুলিতে লাগিল। ফলে শাসনকার্য নানাভাবে বিঘ্নিত হইতে লাগিল। ইহার সঙ্গে পারিবারিক বিপর্যয়ও যোগ দিল। জ্যেষ্ঠ পুত্র খান খানান গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইল। ঔষধপত্রে কোন ফল দর্শিল না—অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাইতে লাগিল এবং অল্প দিনের মধ্যেই শাহজাদা ব্যাধির নিকট আত্মসমর্পণ করিল।

পুত্রের মৃত্যুর পরেই বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতানকে রনথম্বর রওয়ানা হইতে হইল। অনুপস্থিতকালে কার্য চালাইবার জন্য পুত্র আরকুলী খানকে দিল্লী রাখিয়া গেলেন। শত্রুসৈন্য রনথম্বর দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুলতান পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, দুর্গটি জয় করা সম্ভবপর হইবে না। তখন তিনি উজ্জয়িনীর পথে রওয়ানা হইলেন। উজ্জয়িনী লুণ্ঠন করা হইল এবং মালবের বহু মন্দিরও ধ্বংস করা হইল। সেই মন্দিরে প্রাপ্ত প্রচুর ধনরত্ন লইয়া সুলতান পুনরায় রনথম্বর ফিরিয়া আসিলেন। দুর্গ অবরোধ করা হইল। হিন্দু রাজা কিছুতেই ভীত হইলেন না দেখিয়া সুলতান দুর্গের প্রাচীরের নীচে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া প্রাচীর ধ্বসিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। কিন্তু দৃঢ়চিত্ততার অভাবে তিনি পুনরায় অবরোধ উঠাইয়া লইলেন। বলিলেন, "এই দুর্গ জয় করিতে বহু লোকক্ষয় হইবে। সেইজন্য তিনি এই সংকল্প পরিত্যাগ করাই সমীচীন বিবেচনা করেন।" তাঁহার উজির এবং ভাগীনের মালিক আহমদ হাবিব তীব্র প্রতিবাদ জানাইয়া বলিলেন যে, "সুলতানদের পক্ষে লড়াইয়ের সময় এসব কথা চিন্তা করা অনুচিত—বিশেষভাবে সুলতানকে যখন তাঁহার প্রভুত্ব অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য ন্যায়সঙ্গতভাবেই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে হয়—এক্ষেত্রে যাহা হইয়াছে।" সুলতান রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তুমি ইহাকে আমার চিত্তের দুর্বলতা বলিতে পার। কিন্তু আমি তোমাকে কতবার বলিয়াছি যে কবরের তীরে আসিয়া আর বিধবা

ও এতিমের অভিশাপ মাথায় লইয়া আমি মরিতে চাই না।[২] এই বলিয়া তিনি দিল্লী রওয়ানা হইবার হুকুম জারি করিলেন।

৬৯১ হিজরীতে (১২৯২ খ্রীঃ) বিশ্বত্রাস চেঙ্গিশ খানের পৌত্র হালাকু খানের জ্ঞাতি একলক্ষ মোগল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আসেন। শত্রুর আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া জালাল-উদ-দীন ফিরোজ তাঁহার সমস্ত সৈন্য একত্র করিয়া শত্রু বাহিনীকে বাধাদানে অগ্রসর হইলেন। তিনি বৈরাম[২] সীমান্তে পৌঁছিয়া এক ক্ষুদ্র নদীর অপর পাড়ে শত্রু বাহিনীকে দেখিতে পাইলেন। পাঁচ দিন যাবৎ উভয় বাহিনী নদীর দুই পাড়ে শিবির স্থাপন করিয়া রহিল। কিছু ছোটখাট সংঘর্ষ হইল। তাহাতে উভয় পক্ষেই হতাহত হইল। অবশেষে উভয় বাহিনী এক বিশাল প্রান্তরে যুদ্ধের জন্য কাতার-বন্দী হইল এবং এক প্রচণ্ড সংগ্রাম আরম্ভ হইল। মোগল বাহিনীর পরাজয় ঘটিল। তাহাদের বহু সেনানায়ক নিহত হইল এবং সহস্রাধিক সৈন্য বন্দী হইল। বন্দীদের মধ্যে দুইজন ওমরাহ ও কয়েকজন বিখ্যাত সেনাপতিও ছিলেন। সুলতান কিন্তু এই বিজয়ের সুযোগ গ্রহণ করিলেন না। তিনি আক্রমণকারীদের সঙ্গে আপোস করিলেন এবং তাহাদিগকে নিরাপদে দেশে ফিরিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। মোগলরা সানন্দে সুলতানের শর্ত গ্রহণ করিল এবং বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ উভয়পক্ষে উপহার বিনিময় হইল। মোগলরা যখন পশ্চাদপসরণ করে তখন চেঙ্গিশ খানের অন্যতম পৌত্র আগ্‌লু খান তাঁহার তিন সহস্র মোগল সেনাসহ জালাল-উদ-দীনের সেনাবাহিনীতে যোগদান করেন। আগ্‌লু খান বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার অগণিত আত্মীয়ের মধ্যে থাকিয়া প্রাধান্য লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। এই জন্যই তিনি জালাল-উদ-দীনের দলে যোগদান করেন। ফিরোজ তাঁহার কন্যাকে আগ্‌লু খানের নিকট শাদী দেন।

এই মোগলরা সকলেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। সুলতান, শাহজাদা আরকুলী খানকে লাহোর, মুলতান ও সিন্ধু প্রদেশের শাসনকর্তা মনোনীত করেন এবং এক শক্তিশালী সেনাবাহিনীসহ তাঁহাকে মুলতান রাখিয়া তিনি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করেন। আগ্‌লু খান ও তাঁহার মোগল অনুচরদিগের বসবাসের জন্য গাইসাপুরে শেখ নিজাম-উদ-দীন আউলিয়ার মাজারের নিকট

---

২ খুবসম্ভব পাণ্ডুলিপিতে স্থানের নামটি ভুল লেখা হইয়াছে।

একটা স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দেন। তাহারা সেখানে বসতি স্থাপন করে এবং অদ্যাবধি উহা মোগলপুরা নামে পরিচিত।

৬৯২ হিজরীতে (১২৯৩ খ্রীঃ) সুলতান মান্দুর নিকটবর্তী এলাকার হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন এবং সেই অঞ্চল ছারখার করিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এই সময় কারার শাসনকর্তা—সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র মালিক আলা-উদ-দীনকে ভিলশার হিন্দুদের উপর হামলা করিবার অনুমতি প্রদান করেন। ঐ অঞ্চলের হিন্দুরা তাঁহার এলাকায় প্রবেশ করিয়া নানা উপদ্রব করিত। প্রার্থনা মঞ্জুর হইল এবং আলা-উদ-দীন সেই বৎসরই উক্ত অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া উহা অধিকার করেন এবং লুটতরাজ করিয়া বহু লুন্ঠিত দ্রব্যসহ ফিরিয়া আসেন এবং লুন্ঠিত দ্রব্যের এক অংশ সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। লুন্ঠিত দ্রব্যের মধ্যে দুইটি পিতল মূর্তিও ছিল, পদদলিত করিবার জন্য মূর্তি দুইটিকে দিল্লীর বাদায়ুন তোরণে ফেলিয়া রাখা হয়।

এই অভিযানের সাফল্য ও কৃতিত্বের জন্য জালাল-উদ-দীনের অন্তরে ভ্রাতুষ্পুত্রের জন্য স্নেহ উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাকে শাহজাদার মর্যাদা-সূচক উপহার প্রদান করিলেন এবং অযোধ্যা প্রদেশকেও তাঁহার শাসনাধীন করিয়া দিলেন। এই পদোন্নতি লাভের পর আলা-উদ-দীন সুলতানকে জানাইলেন যে, চান্দেরীর নিকটে কয়েকজন বিত্তশালী হিন্দু রাজা আছেন—তাহাদিগকে তিনি বশীভূত করিতে ইচ্ছুক। রাজাদের ঐশ্বর্যের লোভেই সুলতান এই অভিযানে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু আলা-উদ-দীনের উদ্দেশ্য ছিল নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য সুলতানের প্রিয়তমা পত্নী মালিকা জাহান আলা-উদ-দীনের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিয়া আসিতেছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন আলা-উদ-দীন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী এবং এজন্যই তিনি তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন এবং সুলতানকে হুঁশিয়ার করিয়া দিলেন যে, আলা-উদ-দীন কোন দূরবর্তী অঞ্চলে নিজেকে স্বাধীন সুলতানরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছেন।

এইরূপ পরিস্থিতির মধ্যে ৬৯৩ হিজরীতে (১২৯৪ খ্রীঃ) আলা-উদ-দীন সুলতানের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া কারায় গমন করেন। সেখানে বুলবন পরিবারের অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে স্বীয় দলে

টানিয়া লইলেন। তারপর আট হাজার বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া—যে পথে দূরত্ব ন্যূনতম সে পথে দাক্ষিণাত্যের* রাজা রাম দেবের রাজ্যাভিমুখে যাত্রা করেন। রাম দেব এক অতি প্রাচীন দীর্ঘস্থায়ী রাজবংশের বহুকালের সঞ্চিত ঐশ্বর্যের মালিক ছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে উপনীত হইয়াই তিনি রাজধানীর দিকে ধাবিত হইলেন। প্রথমে যে প্রসিদ্ধ স্থানে তিনি পদার্পণ করেন, তাঁহা ছিল এলিচপুর। সৈন্যদের শ্রান্তি দূরীকরণের জন্য সেখানে স্বল্পকাল অপেক্ষা করিবার পর তিনি রাজধানী দেবগিরির পথে দ্রুত রওয়ানা হইলেন। দেবগিরির নিম্নাংশের নগরটি সুরক্ষিত ছিল না—কারণ উহার বহিঃপ্রাচীরের নির্মাণ কার্য তখনও অসম্পূর্ণ ছিল। আলা-উদ-দীনের আগমন সংবাদ রাজার নিকট পৌঁছিল—তখন তিনি রাজ্যের এক দূরবর্তী অঞ্চলে পুত্র সঙ্কুল দেবের সঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। রাজা কালক্ষয় না করিয়া দ্রুতগতিতে রাজধানীর দিকে রওয়ানা হইলেন এবং তাঁহার বিশাল বাহিনী লইয়া শত্রুর গতিরোধ করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি নগর ও আলা-উদ-দীনের ফৌজের মাঝখানে আসিয়া পড়িলেন এবং বিপুল বিক্রমে শত্রুকে বাধাদান করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বহু সৈন্য হারাইয়া তাঁহাকে পরাজয়বরণ করিতে হইল।

এই ঘটনা সমসাময়িক লেখকদের ইতিহাসে—যথা, মুলহিকাত ও তাবকাতে নাসিরীতে অন্য প্রকারে বর্ণিত আছে। এই লেখকদের মতে, আলা-উদ-দীন মৃগয়া যাত্রার ভাণ করিয়া কারামানিকপুর ত্যাগ করেন এবং নির্বিঘ্নে বহু হিন্দু রাজার রাজ্য অতিক্রম করিয়া চলিয়া আসেন। তিনি ইচ্ছা করিয়াই সমস্ত সংঘর্ষ এড়াইয়া যান। সকলকে বুঝিতে দেন যে, পিতৃব্য সুলতান জালাল-উদ-দীনের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া তিনি রাজমুন্দ্রীর রাজার অধীনে কর্ম গ্রহণের জন্য রওয়ানা হইয়াছেন। রাজমুন্দ্রীর রাজা তেলিঙ্গানার অন্যতম রাজা ছিলেন।

দুইমাস ক্রমাগত পথ চলিয়া, সংঘর্ষ এড়াইয়া অবশেষে তিনি এলিচপুর আসিয়া পৌঁছেন। সেখান হইতে তিনি আকস্মিকভাবে রাম দেবের রাজধানী দেবগিরি অভিমুখে অগ্রসর হন। তিনি যখন দেবগিরি পৌঁছেন তখন রাজা

৩ ফিরিশ্‌তা সেই যুগের ধারণানুযায়ী দেবগিরির (এখন দৌলতাবাদ) রাম দেবকে দাক্ষিণাত্যের রাজা বলিয়াছেন। তিনি সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্রের রাজা ছিলেন। তাঁহার দেশের সর্বত্র মারাঠি ভাষার প্রচলন ছিল।

দেবগিরিতেই ছিলেন—তবে তাঁহার স্ত্রী, জ্যেষ্ঠ পুত্র কিছু দূরে এক মন্দিরে পূজা করিতে গিয়াছিলেন।

আলা-উদ-দীনের আকস্মিক আবির্ভাবে রাজা অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক, তিনি চারি সহস্র নাগরিক ও পারিবারিক লোক একত্র করিয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন এবং দুই ক্রোশ দূরে আসিয়া মুসলমানদিগকে বাধা প্রদান করিলেন। কিন্তু তিনি মুসলমানদের সম্মুখে টিকিতে পারিলেন না—পলাইয়া আসিয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে কোনরূপ পরিখা ছিল না। এই সময় এক কৌতুকজনক কাণ্ড ঘটিয়াছিল। রাম দেবের কতিপয় প্রজা কঙ্কন হইতে প্রচুর লবণ আনিয়াছিল শহরে বিক্রয়ের জন্য। শত্রুর আগমন সংবাদ পাইয়া বস্তাগুলি প্রাচীরের ধারে ফেলিয়া তাহারা পলায়ন করে। খাদ্যের বস্তা ভ্রমে দুর্গবাসী সৈন্যরা বস্তাগুলি দুর্গের অভ্যন্তরে লইয়া যায়—অবরোধকালে কাজে লাগিবে মনে করিয়া। আলা-উদ-দীন শহরটি এমনভাবে অবরোধ করিয়া ফেলিলেন যে শহরবাসীদের নিষ্ক্রমণের কোনই পথ রহিল না। এই সুযোগে আলা-উদ-দীন বণিকদের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করিলেন। রামদেবের চল্লিশটি হস্তী ও কয়েক সহস্র অশ্বও আলা-উদ-দীনের হস্তগত হইল।

এই সময় আলা-উদ-দীন ঘোষণা করিলেন যে, তাঁহার সৈন্যদল দিল্লীর সুলতানের প্রধান সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দল মাত্র। সুলতানের বিশ সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য অচিরেই আসিয়া পড়িবে। এই সংবাদে সারা দাক্ষিণাত্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হইল এবং হিন্দু রাজারা তাহাদের সকলের নিরাপত্তার জন্য সংঘবদ্ধ না হইয়া স্ব স্ব নিরাপত্তার জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত হইতে লাগিল। আলা-উদ-দীন নগর লুণ্ঠন করিলেন এবং বণিক ও অন্যান্য বিত্তশালী নাগরিকদের নিকট হইতে ধনরত্ন বাহির করিবার জন্য তাহাদের উপর নির্যাতন শুরু করিয়া দিলেন। দুর্গের অবরোধ অব্যাহত রহিল।

রাম দেবের স্থির প্রতীতি জন্মিল যে দিল্লীর সুলতান নিশ্চয়ই সমগ্র দাক্ষিণাত্য অধিকারের সংকল্প লইয়া আসিয়াছেন। সুতরাং তিনি বুঝিলেন, নতি স্বীকার করা ছাড়া তাহার গত্যন্তর নাই এবং প্রধান বাহিনী পৌঁছিবার পূর্বেই তাঁহাকে শান্তি স্থাপন করিতেই হইবে। তিনি আলা-উদ-দীনকে এই মর্মে পত্র লিখিলেন : এই দেশ আক্রমণ করিয়া তুমি নির্বুদ্ধিতা ও হটকারিতার পরিচয় দিয়াছ। কিন্তু তোমার ভাগ্য ভাল যে তুমি নগরকে সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় পাইয়াছ

এবং নিরাপদে এতদূর অগ্রসর হইতে সক্ষম হইয়াছ। দাক্ষিণাত্যের রাজন্য-বর্গের অধীনে বিপুল সংখ্যক সৈন্য আছে। তাঁহাদের সম্মিলিত বাহিনী কর্তৃক তোমার পরিবেষ্টিত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে এবং সে অবস্থায় পতিত হইলে তোমার দলের একজন লোকও প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিতে পারিবে না। অথবা যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে এখানে তোমার কোনও বিপদ ঘটিল না তুমি নিরাপদে এদেশ ত্যাগ করিতে পারিলে; কিন্তু মালব, খান্দেশ ও গণ্ডোয়ানার মধ্য দিয়া কি তোমাকে ফিরিতে হইবে না? এইসব দেশের রাজাদের প্রত্যেকের চল্লিশ হইতে পঞ্চাশ সহস্র সৈন্য আছে। তুমি কি প্রকারে আশা কর যে তাঁহারা তোমাকে স্বচ্ছন্দে তাহাদের রাজ্য অতিক্রম করিতে দিবে? সেইজন্য তোমার উচিৎ সময় থাকিতে সামান্য কিছু অর্থ লইয়া সরিয়া পড়া। তুমি ইতিমধ্যে "যাহা লুণ্ঠন করিয়াছ তাহার সঙ্গে এই প্রস্তাবিত অর্থ যুক্ত হইলে তোমার অভিযানের ব্যয় নিশ্চয়ই পূরণ হইবে।"

প্রস্তাবানুযায়ী আলা-উদ-দীন ৫০ মণ স্বর্ণ[৪] প্রচুর মুক্তা ও রত্ন প্রাপ্ত হইলেন এবং চুক্তি অনুযায়ী ধৃত হস্তীগুলি রাজার হস্তীশালায় প্রেরণ করিলেন। তিনি বন্দীদিগকে ছাড়িয়া দিলেন এবং আগমনের পঞ্চম দিবসের প্রভাতে শহর ত্যাগ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু তিনি যখন পশ্চাদপসরণের উদ্যোগ করিতেছিলেন সেই সময় রাম দেবের পুত্র সঙ্কুল দেব তাঁহার বিরাট সেনাবাহিনী লইয়া শহরের কয়েক মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মুসলমান সৈন্যের আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়াই মায়ের সঙ্গে সরিয়া গিয়া তিনি সৈন্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। যাহা হউক, রাম দেব পুত্রকে দূত মারফত সন্ধির সংবাদ জ্ঞাত করাইলেন এবং সন্ধির শর্ত যথাযথ পালনের জন্য পুত্রকে উপদেশ দান করেন এবং মুসলমানদিগকে কোন প্রকারে ত্যক্ত করিতে নিষেধ করেন। তিনি পুত্রকে বুঝাইয়া দেন যে মুসলমানরা রণপ্রিয় দুর্ধর্ষ জাতি—তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধাপেক্ষা শান্তির সম্পর্ক স্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। কিন্তু রাজপুত্রের সৈন্য সংখ্যা শত্রুসৈন্যের সংখ্যা অপেক্ষা তিনগুণ অধিক ছিল এবং অনেক হিন্দুরাজা সসৈন্যে অচিরেই তাঁহার সহিত যোগদান করিবার সম্ভাবনা ছিল। এইসব

৪ দাক্ষিণাত্যের সুরাটে ৩০ পাউণ্ডে এবং গোয়ায় ২৪ পাউণ্ডে 'মণ' হয়। সুতরাং ঐ স্বর্ণের ওজন ১২০০ পাউণ্ড হইতে ১৫০০ পাউণ্ডের মধ্যে হইবে।

কথা বিবেচনা করিয়া রাজপুত্র পিতার আদেশ প্রত্যাখ্যান করিলেন এবং আলা-উদ-দীনকে এই মর্মে এক পত্র লিখিলেন, "জীবনের প্রতি যদি তোমার বিন্দু মাত্র মমতা থাকে এবং যদি বাঁচিতে চাও তবে যা কিছু লুণ্ঠন করিয়াছ তাহা অনতিবিলম্বে প্রত্যার্পণ কর এবং প্রাণটা যে হারাইতে হইল না, সেই জন্য আনন্দে দেশে ফিরিয়া যাও"। পত্রের মর্ম অবগত হইয়া আলা-উদ-দীন ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মুখে কালিমা লেপন করিয়া দূতদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিতে হুকুম দিলেন। দুর্গের ভিতর দিক হইতে আক্রমণ ঠেকাইবার জন্য তিনি মালিক নসরতকে এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ দুর্গের অবরোধ অব্যাহত রাখিতে নিযুক্ত রাখিলেন এবং অবশিষ্ট সৈন্য লইয়া তিনি রাজপুত্রের মোকাবিলায় চলিলেন। হিন্দু সৈন্যরা বিপুল উৎসাহে যুদ্ধে অগ্রসর হইল। প্রচণ্ড সংগ্রাম শুরু হইল। সংখ্যাধিক্যের চাপে মুসলমানরা সকল স্থানে পিছু হটিতে আরম্ভ করিল। রণক্ষেত্রে মুসলমান সৈন্যের সঙ্কটাপন্ন অবস্থার কথা অবগত হইয়া আলা-উদ-দীনের আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই মালিক নসরত তাঁহার সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ময়দানে ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহার যোগদানে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়া গেল। চারিদিক ধূলিতে অন্ধকার হইয়া গিয়াছিল। এজন্য শত্রুরা নসরত খানের সৈন্যের সংখ্যা সঠিক অনুমান করিতে পারে নাই তাহারা ভাবিল পূর্ব-ঘোষিত সুলতানী ফৌজ নিশ্চয়ই আসিয়া পড়িয়াছে। মুহূর্তে সমস্ত সৈন্যবাহিনীতে আতঙ্ক সঞ্চারিত হইল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া পলায়ন শুরু করিল। উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করা আলা-উদ-দীন সমীচীন মনে করিলেন না এবং কালবিলম্ব না করিয়া দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে আসিয়া পুনরায় সমবেত হইলেন। যুদ্ধে ধৃত রাজার কয়েকজন আত্মীয়কে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দুর্গবাসী সৈন্যদিগকে প্রদর্শন করাইলেন।

হতবুদ্ধি হইয়া রাম দেব কুলবর্গা, তেলিঙ্গানা, মালব ও খান্দেশের রাজাদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন। কিন্তু তাহার সমস্ত আশা ভরসা তখনই বিলীন হইল যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন দুর্গে আর রসদ নাই। খাদ্যশস্য ভ্রমে যে বস্তাগুলি দুর্গের ভিতর আনা হইয়াছিল এবং যেগুলির উপর এতদিন ভরসা করিয়াছিলেন, এইবার প্রথম আবিষ্কৃত হইল যে সেগুলি সব লবণের বস্তা। কিন্তু রাম দেব বুদ্ধি হারাইলেন না, সৈন্য বাহিনীর নিকট এই

সংবাদ গোপন রাখিবার আদেশ দিলেন এবং আলা-উদ-দীনের সঙ্গে দ্বিতীয় দফা আলোচনা শুরু করিলেন। তিনি আলা-উদ-দীনকে লিখিলেন যে, "আপনি নিশ্চয়ই জানেন গত বিবাদে আমার কোন হাত ছিল না। আমার পুত্র তাঁহার যৌবনসুলভ নির্বুদ্ধিতা ও প্রগলভতার বশবর্তী হইয়া আমাদের মধ্যে স্থাপিত সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করিয়াছে। তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতার জন্য আমাকে দায়ী করা সঙ্গত হইবে না"। ইহা ছাড়াও রাম দেব গোপনে দূতকে যে কোন শর্তে সম্মত হইয়া অবরোধের আশু অবসান ঘটাইবার জন্য নির্দেশ দান করিলেন।

রাম দেবের উদ্বেগের প্রকৃত কারণ অনুধাবন করিতে আলা-উদ-দীনের বিলম্ব হইল না। এজন্য তিনি সন্ধি বিলম্বিত করিবার জন্য প্রতিদিন নূতন নূতন অজুহাত সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্গবাসী সৈন্যদের দুর্দশা চরমে উঠিল। রাজা বাধ্য হইয়া নিম্নরূপ শর্তে দ্বিতীয় দফা সন্ধি চুক্তি সম্পাদন করিলেন 'দেশ ছাড়িবার প্রাক্কালে আলা-উদ-দীনকে আরও ৬০০ মণ মুক্তা[৫], হীরা, চুনি, পান্না ও নীলকান্ত মণি একত্রে দুই মণ এবং ১০০ মণ রৌপ্য ও ৪,০০০ খণ্ড রেশমী বস্ত্র প্রদান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া আরও মূল্যবান দ্রব্যের এক দীর্ঘ তালিকা ছিল—যাহা বিশ্বাস করিতে মন সায় দেয় না। এই বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ দিয়াই রাম দেব রেহাই পাইলেন না। অধিকন্তু এলিচপুর ও তাঁহার আওতাভুক্ত এলাকা ছাড়িয়া দিতে হইল – যেখানে আলা-উদ-দীন এক সৈন্যবাহিনী রাখিয়া আসিলেন। এই সৈন্যবাহিনীকে কোন প্রকারে উত্যক্ত করা চলিবে না। তাহারা উক্ত এলাকার রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া কারামানিকপুর প্রেরণ করিবে—এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে হইল।

বন্দীদিগকে খালাস করিয়া বিজয়নিনাদে চারিদিক প্রকম্পিত করিয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ আলা-উদ-দীন শহর হইতে নির্গত হইলেন। দেবগিরি পৌঁছিবার পঞ্চবিংশতি দিবসে তিনি স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি এমন দক্ষতার সঙ্গে সৈন্য পরিচালনা করেন যে মালব, গণ্ডোয়ানার মত বিশাল ও শক্তিশালী রাজ্যগুলি নির্বিঘ্নে অতিক্রম করিয়া যান। তাঁহার সৈন্যরা এমন সাহস ও শৃঙ্খলার সঙ্গে বীরপদক্ষেপে চলিতেছিল যে চারিদিকে শত্রুরা

৫ মূল্যবান প্রস্তরের এই পরিমাণ বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে হয় না।

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া তাঁহাদের দিকে তাকাইয়াছিল—আক্রমণ করা তো দূরের কথা, পথে সংঘর্ষ যাহা হইয়াছিল তাহাতে আলা-উদ-দীনের গৌরব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। এইখানে আমরা সঙ্গতভাবেই মন্তব্য করিতে পারি যে, সমগ্র জগতের ইতিহাসে এমন আর একটিও দৃষ্টান্ত নাই যাহাকে এই দুঃসাহসিক অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। সংকল্পের দৃঢ়তা, সংকল্প কার্যকরী করিবার দুর্দমনীয় স্পৃহা এবং ভাগ্যের জোর—যেদিক দিয়াই বিচার করা যাক, এই ঘটনা অতুলনীয়।

দেবগিরির পথে রওয়ানা হইবার পর কারার সঙ্গে আলা-উদ-দীনের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। কয়েক মাস তাঁহার কোন সংবাদই ছিল না। প্রতিনিধি হিসাবে যে ব্যক্তিকে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার উপর নির্দেশ ছিল যে তিনি শাহী দরবারে লিখিবেন যে, আলা-উদ-দীন চান্দেরী বিজয়ে বহির্গত হইয়াছেন। কিন্তু ছয় মাসের মধ্যে তাঁহার কোন পত্র না পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই সুলতানের মনে সন্দেহ জাগিতে লাগিল যে আলা-উদ-দীন রাজদ্রোহিতার পথে পা বাড়াইয়াছেন। ৬৯৫ হিজরীতে (১২৯৫ খ্রীঃ) সুলতান শিকারে বাহির হইবার ভান করিলেন এবং তদনুযায়ী আয়োজন করিতে হুকুম দিলেন। তিনি গোয়ালিয়র পর্যন্ত আসিয়া সেখানে শিবির স্থাপন করিলেন। এইখানে তিনি একটা সুউচ্চ গম্বুজযুক্ত বিরাট ইমারত নির্মাণ করাইলেন। উহার দরজায় এই কবিতাটি খোদাই করাইলেন: "সাম্রাজ্যের তখ্‌তে পা রাখিয়া এই অমসৃণ অট্টালিকা নির্মাণ দ্বারা আমি কি যশ করিতে পারি? না যশের জন্য নয়, এই ভগ্ন প্রস্তরখণ্ডগুলিকে আমি এইজন্য একত্রিত করিয়াছি যে শ্রান্ত পথিক ও ভগ্নোদ্যম তীর্থযাত্রীরা ইহার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া শান্তি লাভ করিতে পারে এবং আমাকে দোওয়া করিতে পারে"। ইতিমধ্যে গুপ্তচর কর্তৃক এই সংবাদ আনীত হইল যে, দেবগিরি জয় করিয়া আলা-উদ-দীন এতো ঐশ্বর্য লাভ করিয়াছেন যে, কোন দিল্লীর সুলতানই অত ধনরত্ন চোখে দেখেন নাই। এবং এই ধনরত্ন লইয়া তিনি কারাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছেন। এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান আনন্দে একরূপ আত্মহারা হইলেন যে তাঁহার মনে হইল যেন সেই বিপুল পরিমাণ লুণ্ঠিত দ্রব্য ইতিমধ্যেই তাঁহার কোষাগারে মজুদ হইয়াছে। কিন্তু বিজ্ঞলোকেরা ভিন্নরূপ ধারণা করিলেন।

তাঁহারা সঙ্গতভাবেই এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিলেন যে, সুলতানের খাজাঞ্চিখানা ভর্তি করিবার জন্য আলা-উদ-দীন নিশ্চয়ই সুলতানের বিনানুমতিতে এই বিপদ-সঙ্কুল দুঃসাহসিক অভিযানে বহির্গত হন নাই। তাঁহারা অবশ্য তাঁহাদের সন্দেহ প্রকাশ করিলেন না—বরঞ্চ কি ঘটে তাহা দেখিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

একদিন সুলতান পরিষদবর্গকে সমবেত করাইয়া বলিলেন, "আলা-উদ-দীন বিপুল পরিমাণ লুন্ঠিত দ্রব্যসহ কারায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। এমতাবস্থায় আমি এখানেই অবস্থান করিয়া আলা-উদ-দীনকে হাজির হইতে বলিব, না তাহাকে অভ্যর্থনার জন্য আগাইয়া যাইব কিংবা দিল্লী ফিরিয়া যাইব—এ বিষয়ে আপনাদের সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করুন।" সুলতানকে অকপটে সত্য কথা বলার এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধির জন্য মালিক আহমদ হাবিবের নাম ছিল। সুলতানের ভাই-পোর কার্যকলাপ যে সন্দেহাতীত নয় সে কথা তিনি নিঃসঙ্কোচে ব্যক্ত করিলেন। তিনি সুলতানকে সসৈন্যে চান্দেরী অভিমুখে গমন করিয়া আলা উদ-দীনের কারা প্রত্যাবর্তনের পথে শিবির স্থাপন করিতে উপদেশ দিলেন। তিনি মনে করিলেন এই ব্যবস্থাবলম্বন করিয়া সুলতান আলা-উদ-দীনের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দিতে পারিবেন। আলা-উদ-দীন সৈন্য-সংখ্যা বৃদ্ধির সুযোগ পাইবে না। সুলতানী ফৌজের সম্মুখীন হইলে আলা-উদ-দীনের সৈন্যরা নিশ্চয়ই যুদ্ধে লিপ্ত হইতে চাহিবে না। কেননা, ইহাতে তাহাদের লুন্ঠিত দ্রব্যাদি হারাইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। তাহারা এমতাবস্থায় বরং তাহাদের লুন্ঠিতদ্রব্য লইয়া যে যাহার মত জঙ্গলে পালাইয়া যাইবে। তাঁহার ক্ষুদ্র বাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য এই প্রকারে দল ত্যাগ করিলে, আলা-উদ-দীনের বিদ্রোহের স্বপ্ন শূন্যে মিলিয়া যাইবে এবং স্বাধীনতার মতলব পরিত্যাগ করিয়া তখন আলা-উদ-দীনকে স্বেচ্ছায় তাঁহার লুন্ঠিত ধনরত্ন সিংহাসনের নিম্নে জমা দিতে হইবে। তখন স্বর্ণ রত্ন ও হস্তী—যাহা সুলতানের প্রাপ্য তাহা তিনি গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য আলা-উদ-দীনকে প্রদান করিবেন। তারপর সুলতানকে অবশ্য ভাবিয়া দেখিতে হইবে তাঁহাকে কারার শাসনকর্তার পদে বহাল রাখা হইবে—না তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দিল্লী ফিরিতে হইবে। এই পর্যন্ত বলিয়া মালিক আহমদ হাবিব থামিলেন। দিল্লীর কোতোয়াল মালিক ফখর-উদ-দীন কুচী, আহমদ হাবিবের নির্দেশগুলির যুক্তিযুক্ততা সম্যক উপলব্ধি করিলেন—কিন্তু

সুলতানের দিকে তাকাইয়া তিনি যখন বুঝিলেন যে এসব কথা সুলতানের মনঃপুত হয় নাই, তখন তিনি সুলতান যাহাতে খুশী হইবেন তাহাই বলিলেন, "আলা-উদ-দীনের প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ, লুণ্ঠিত দ্রব্যের পরিমাণ ও তাঁহার বিজয়ের সংবাদ এখনও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয় নাই। আমরা উড়ো সংবাদের উপর ভিত্তি করিয়া এসব জল্পনা করিতে আরম্ভ করিয়াছি। এইরূপ সংবাদ চিরকালই বিকৃত ও অতিরঞ্জিত হইয়া পৌছে। আমরা যাহা শুনিয়াছি তাহা যদি সত্য হয়—তবে ইহাই স্বাভাবিক যে সুলতানী ফৌজের আগমন বার্তা পাইয়া মিথ্যা দোষারোপ ও সম্ভাব্য চক্রান্তের হাত হইতে নিষ্কৃতির জন্য আলা-উদ-দীন পর্বতাঞ্চলে গা ঢাকা দিবেন। বর্ষাকালে সেখান হইতে তাঁহাকে কিছুতেই বাহির করা যাইবে না। সুতরাং নদীর তীরে পৌছিবার পুর্বেই জুতা খুলিবার প্রয়োজন কি? আলা-উদ-দীনের কারা পৌছা পর্যন্ত অপেক্ষা করিয়া দেখা যাউক না? যদি দেখা যায় তিনি রাজদ্রোহিতার অভিসন্ধি পোষণ করিতেছেন—তখন উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিলেই চলিবে। সুলতানী ফৌজের এক ধাক্কাতেই তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রাসাদ ধুলিস্মাৎ হইবে।"

ইহা শুনিয়া আহমদ হাবিব সক্রোধে বলিয়া ফেলিলেন, "সময় চলিয়া গেলে সজাগ হইয়া কোন ফলই দর্শিবে না। আমাদের হাত হইতে ফসকাইয়া গেলে আলা-উদ-দীন কি অযোধ্যার পথে বাংলায় চলিয়া যাইতে পারেন না? সেখানে ধনরত্ন হেফাজতে রাখিয়া বিপুল সংখ্যক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যখন তিনি আমাদের বিরুদ্ধে আগমন করিবেন, তখন তাঁহাকে রুখিবার শক্তি তোমার বা আমার কাহারও থাকিবে না। কি লজ্জার কথা। সবকিছু বুঝিয়াও সৎসাহসের অভাবে প্রয়োজনবোধে সৎ পরামর্শ দিতে লোকে কুণ্ঠাবোধ করে।"

তাঁহার কথাগুলি সুলতানের খুব খারাপ লাগিল। তিনি নিকটে দণ্ডায়মান সেনাপতিদিগকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, "আহমদ আলা-উদ-দীনের প্রতি বিষোদগার করিতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করে না। আলা-উদ-দীনের প্রতি আমার সন্দেহ সৃষ্টি করিতে ও তাহার বিরুদ্ধে আমার ক্রোধানল প্রজ্বলিত করিতে কখনও পশ্চাদপদ হয় না। কিন্তু তাঁহার এইসব বিদ্বেষমূলক উক্তির উপর আমি কি প্রকারে গুরুত্ব আরোপ করিতে পারি? আলা-উদ-দীনের আনুগত্য সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দিগ্ধ। তাহাকে আশৈশব বুকে পিঠে করিয়া মানুষ করিয়াছি।

আমার পুত্রেরা রাজদ্রোহী হইতে পারে—এ কথা বরং আমি বিশ্বাস করিতে পারি। কিন্তু আমার আলা-উদ-দীন রাজদ্রোহী হইবে এ কথা আমি মনে কিছুতেই স্থান দিতে পারি না।" সুলতানের কথাগুলি শুনিয়া আহমদ হাবিব মনে অত্যন্ত আঘাত পাইলেন। তিনি দণ্ডায়মান হইলেন এবং এক হাত দ্বারা অন্যহাতে সজোরে আঘাত করিয়া এই কবিতাটি আবৃত্তি করিলেন :

"যার সৌভাগ্য রাহুগ্রস্ত হইয়াছে কোন
সতর্কবাণীতেই তার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে না।"

মালিক ফখর-উদ-দীনের উপদেশ মোতাবেক সুলতান সসৈন্যে দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। রাজধানী পৌঁছিবার অনতিকাল পরেই সুলতান আলা-উদ-দীনের পত্র পাইলেন। পত্রে আলা-উদ-দীন নিজেকে সুলতানের গোলাম বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অর্জিত সমস্ত ধনরত্ন সুলতানের প্রাপ্য। দীর্ঘপথ অতিক্রমের শ্রান্তি দূর করিবার জন্য তিনি কারায় কিছুকাল বিশ্রাম করিতে ইচ্ছুক। তিনি আরও লিখিয়াছিলেন যে, তখ্‌তের পায়া চুম্বনের জন্য তিনি উদগ্রীব। কিন্তু তিনি আসিতে পারিতেছেন না—কারণ, দরবারে তাঁহার শত্রুর অভাব নাই। তিনি জানেন, শত্রুরা তাঁহার অনুপস্থিতকালে তাঁহার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্তধারণার সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তাঁহাকে চিরকালের জন্য হযরতের স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন। তিনি যে বিনানুমতিতে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযানে বহির্গত হইয়াছিলেন সে অপরাধ সম্বন্ধে তিনি সচেতন। যাহারা সেই অভিযানে শরীক হইয়াছিল তাহারা সকলেই এখন শাস্তির ভয়ে সন্ত্রস্ত। এ-জন্য তিনি সুলতান সমীপে আকুলভাবে আরজ করিতেছেন যে, সুলতান যেন তাঁহাকে এবং তাঁহার সঙ্গীদিগকে অভয় দান করিয়া পত্র লেখেন।

সুলতান সহজেই এই প্রতারণার শিকার হইলেন। তিনি ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতিটি কথা বিশ্বাস করিলেন। ওদিকে আলা-উদ-দীন লক্ষণাবতীতে সরিয়া পড়িবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। জাফর খানকে আলা-উদ-দীন অযোধ্যা পাঠাইলেন। সেখানে সরযু নদীতে অসংখ্য নৌকা প্রস্তুত রাখিতে হুকুম দিলেন—যাহাতে সুলতান কারামানিকপুর আসিলে তিনি নদী পার হইয়া বাঙ্গালার পথে রওয়ানা হইতে পারেন। বাঙ্গালায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তখন তিনি কৃত সংকল্প। তাঁহার দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে সুলতানের মনে সন্দেহের ক্ষীণতম

রেখাও পতিত হইল না। সুলতান অতি সদয় ও স্নেহার্দ্র ভাষায় আলা-উদ-দীনকে পত্র লিখিলেন এবং দুইজন অতি বিশ্বস্ত লোক মারফত সেই পত্র প্রেরণ করিলেন। কারায় পৌঁছিয়াই দুতদ্বয় সমস্ত ব্যাপার আঁচ করিয়া ফেলিল এবং তাঁহারা রাজধানীতে ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইল। কিন্তু আলা-উদ-দীন তাহাদিগকে নজরবন্দী করিলেন। ফলে প্রকৃত ব্যাপার সম্বন্ধে দরবারে লিখিবার কোন সুযোগই তাহাদের রহিল না। সুলতান বুঝিলেন, আলা-উদ-দীনের ভয় দুর হয় নাই। তিনি আলা-উদ-দীনের ভ্রাতা আলমাস বেগের মধ্যস্থতায় আলা-উদ-দীনের অমূলক ভীতি দুরীকরণে প্রয়াস পাইলেন। ইতিমধ্যে আলা-উদ-দীন আলমাস বেগকে লিখিলেন : "কারায় একথা রাষ্ট্র হইয়া পড়িয়াছে যে বিনানুমতিতে দেবগিরি যাত্রার জন্য সুলতান আমার প্রাণনাশ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ঝোঁকের মাথায় যাহা করিয়াছি এখন শতবার তওবা করিলেও বোধ হয় সে অপরাধের দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। হযরত আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন শুনিয়া আমার আর বাঁচিবার স্বাদ নাই—কেননা হযরতের অসন্তোষ আমার নিকট মৃত্যু যন্ত্রণা অপেক্ষাও অধিক পীড়াদায়ক। আমার সম্বন্ধে সুলতানের মতলব কি তাহা সঠিক জানাইবা যাহাতে পুর্বাহ্নেই আমি বিষ পান করিতে অথবা কোন নিরাপদ স্থানে পালাইয়া যাইতে সক্ষম হই।" প্রতিদিন আলমাস বেগের নিকট এইরূপ সুরে লেখা পত্র আসিতে লাগিল। বলাবাহুল্য, সুলতানকে প্রতারিত করিবার ষড়যন্ত্রে আলমাস বেগ নিজেও সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি সুলতানকে পত্রগুলি সঙ্গে সঙ্গে দেখাইতেন এবং মন্তব্য করিতেন, তাঁহার ভাই খুব সম্ভব আত্মহত্যা করিবে অথবা দেশত্যাগী হইবে। সুলতানকে ফুসলাইয়া কারায় লইয়া যাইবার জন্য আলমাস বেগ নানাভাবে অভিনয় করিয়া চলিলেন। সেই প্রতারণা জালে বৃদ্ধ সুলতান শেষ পর্যন্ত ধরা পড়িলেন। তিনি বুঝিলেন, ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রাণ রক্ষা না করিলে লুণ্ঠিত ধনরত্ন প্রাপ্তির কোনই সম্ভাবনা নাই। বৃদ্ধ লোকটি শেষ পর্যন্ত এক হাজার ঘোড় সৈন্য এবং সামান্য কিছু সংখ্যক দেহরক্ষী অনুচর লইয়া গঙ্গায় নৌকায় উঠিলেন এবং আহমদ হাবিবকে বলিয়া গেলেন তিনি যেন পরে স্থলপথে ফৌজ লইয়া তাঁহার অনুসরণ করেন।

সুলতানের দিল্লী ত্যাগের সংবাদ পাইয়া আলা-উদ-দীন গঙ্গার অপর পাড়ে, কারামানিকপুরের নিকটে যাইয়া শিবির স্থাপন করিলেন। ১৭ই রমজান (হিজরী

৬৯৫ খ্রীঃ ১২ই জুলাই ১২৯৫) দূরে সুলতানী চাঁদোয়া দৃষ্টিগোচর হইল। সুলতানকে সম্মান প্রদর্শনের ভান করিয়া আলা-উদ-দীন তাঁহার সৈন্যদিগকে কাতারবন্দী করিয়া দণ্ডায়মান করাইলেন এবং সুলতানকে আনিবার জন্য আলমাস বেগ পুর্বেই আসিয়া পড়িয়াছিল। এই কপট বিশ্বাসঘাতক সুলতানের নিকট আসিয়া বলিল, এক হাজার অশ্বারোহী সৈন্যের এই অনুচর বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলে আলা-উদ-দীন ভয়ে পালাইয়া যাইবে—কারণ কতগুলি দুষ্টলোক তাঁহার মনে এমন ভীতির সঞ্চার করিয়াছে যে, শত চেষ্টা করিয়াও আমি তাঁহার মন হইতে সেই অমূলক সন্দেহ দূর করিতে পারি নাই।" এমন আপন জনের নিকট হইতে কোন বিশ্বাসঘাতকার কথা সুলতান কল্পনাও করিতে পারেন নাই—বিশেষ করিয়া যাহাকে তিনি আশৈশব বুকে করিয়া লালন পালন করিয়াছেন। তিনি আলমাস বেগের প্রস্তাব মানিয়া লইলেন। নৌ-বহরকে পশ্চাতে রাখিয়া কয়েকজন মাত্র বিশ্বস্ত অনুচর লইয়া বজরায় রওয়ানা হইলেন।

শাহীবহর যখন শিবিরের প্রায় কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে, তখন আলমাস পুনরায় আসিয়া সুলতানের নিকট নিবেদন করিলেন যে, "এতগুলি সশস্ত্র বর্মাবৃত লোক সঙ্গে দেখিলে আলা-উদ-দীন ভয় পাইবে—কেননা লোকে তাঁহার মনে এমন আতঙ্কের সৃষ্টি করিয়াছে যে সে কিছুতেই আশ্বস্ত হইতে পারিতেছে না। সুতরাং কোন প্রকার আড়ম্বর প্রদর্শন করিয়া না যাওয়াই উচিত।" তাঁহার কথামত সুলতান তাঁহার অনুচরদিগকে বর্ম খুলিয়া ফেলিতে এবং অস্ত্র বর্জন করিতে হুকুম দিলেন। মালিক খুররাম ইহার প্রতিবাদ করিলেন। কারণ এতক্ষণে তিনি বিশ্বাসঘাতকতা আঁচ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু বিশ্বাস-ঘাতক আলমাস বেগ এমনভাবে কথা বলেন যে, লোকের বিশ্বাস উৎপাদন না হইয়াই পারে না। শেষ পর্যন্ত খুররামও কতকটা নিঃসন্ধিগ্ধ হইলেন।

সুলতানের বজরা ঘাটে ভিড়িল। একদল অনুচরসহ আলা-উদ-দীন তীরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। সৈন্যদিগকে পিছনে রাখিয়া আলা-উদ-দীন কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া পিতৃব্যের সম্মুখীন হইলেন এবং তাঁহার পদপ্রান্তে লুটিয়া পড়িলেন। বৃদ্ধ সস্নেহে তাহার গণ্ডদেশ স্পর্শ করিলেন এবং তাঁহাকে উঠাইয়া নিবিড়ভাবে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া বলিলেন: "তুমি কি প্রকারে আমার প্রতি সন্দিহান হইতে পারিলে? শৈশবকাল হইতে আমি তোমাকে পুত্রবৎ স্নেহে

লালন পালন করিয়াছি। বোধ হয় নিজের সন্তানদিগকেও আমি এতো অধিক স্নেহ করি না। এই বলিয়া যেই আলা-উদ-দীনের হাত ধরিয়া শাহী বজরায় উঠিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময় আলা-উদ-দীনের ইঙ্গিতে পশ্চাতে দণ্ডায়মান দেহরক্ষীদের মধ্য হইতে মাহমুদ-বিন-সেলিম ছুটিয়া আসিয়া সুলতানের স্কন্ধে তলোয়ার দ্বারা আঘাত করিল। হতভাগ্য সুলতান চিৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে শয়তান! তোর মনে এই ছিল। এই বলিতে বলিতে সুলতান বজরার দিকে ছুটিলেন। কিন্তু বজরা পর্যন্ত পৌঁছিবার পূর্বেই ইখতিয়ার-উদ-দীন নামক অন্য একজন দেহরক্ষী আসিয়া দুর্বল বৃদ্ধ লোকটিকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহাকে মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিল। দুর্বৃত্তরা অতঃপর এই মহানুভব সুলতানের মস্তক বর্শায় বিদ্ধ করিয়া সারা শিবির ও শহরময় প্রদর্শন করিল।

কথিত আছে, এই ঘটনার পূর্বদিন আলা-উদ-দীন শেখ কারিক নামক এক কামেল দরবেশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সেই দরবেশের কবর কারায় আছে এবং এখনও লোকে সেই মাজারকে অতি পবিত্র স্থান বলিয়া গণ্য করে। আলা-উদ-দীনকে দেখিয়া সেই দরবেশ আসন হইতে উঠিয়া এক স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়াছিলেন। যাহার অর্থ ছিল এই :

"তোমার বিরুদ্ধে যদি কেহ আসে তবে তার মস্তক
নৌকায় ঝরিয়া পড়িবে এবং তার ধড় গঙ্গায় নিমজ্জিত হইবে।

লোকে বলে, কয়েক ঘণ্টা পরে সংঘটিত হতভাগ্য সুলতানের শোচনীয় মৃত্যুতে সেই উক্তির মর্ম উদ্‌ঘাটিত হইয়াছিল। খুনীদের একজন মাহমুদ-বিন-সেলিম এক বৎসর পর ভয়াবহ কুষ্ঠরোগে ভুগিয়া মারা গিয়াছিল। জীবদ্দশায়ই তাহার শরীরের মাংশ অস্থি হইতে খসিয়া পড়িয়াছিল। অন্য খুনী ইখতিয়ার-উদ-দীনের পরিণামও কম বিষময় হয় নাই। তাঁহার মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং সে অনবরত চিৎকার করিয়া বলিতে থাকে যে, জালাল-উদ-দীন ফিরোজ তাঁহার মাথা কাটিতেছে। এই প্রকারে মৃত্যুর পূর্বেই সেই পাপিষ্ঠ সহস্রবার মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিল।

আলা-উদ-দীনের ভ্রাতা আলমাস বেগ এবং আরও যেসব লোক এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত ছিল, তাহাদের সকলের উপরই আল্লাহ্‌র গজব

নানাভাবে পতিত হইয়াছিল এবং চারি বৎসরের মধ্যে তাহাদের সকলের নিশানা ধরাপৃষ্ঠ হইতে মুছিয়া গিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের দুষ্কর্মের স্মৃতি মানুষের মন হইতে সহজে মুছিয়া যায় নাই। এমনকি স্বয়ং আলা-উদ-দীনও রেহাই পায় নাই। প্রথম দিকে কিছুদিন ভাগ্য তাঁহার প্রতি চাহিয়া হাসিয়াছিল। কিন্তু শেষ জীবনে তাঁহাকে চরম মানসিক যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল। নিজের পুত্রদিগকে কারারুদ্ধ করিতে তিনি বাধ্য হইয়াছিলেন এবং তাঁহার অতি প্রিয় বন্ধুদিগকে একের পর এক হত্যা করিতে হইয়াছিল।

জালাল-উদ-দীন খিলজী সাত বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

আলা-উদ-দীন-খিলজী

[দিল্লীতে আতঙ্ক। বিধবা রাজপত্নী কর্ত্তৃক তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন। আলা-উদ-দীনের দল বৃদ্ধিকরণ। সর্বশ্রেণীর লোকদের প্রতি প্রচুর বদান্যতা প্রদর্শন। মালেকা জাহান কর্ত্তৃক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মুলতানের শাসনকর্ত্তাকে দিল্লী আসিবার জন্য তাগিদ। কিন্তু আলা-উদ-দীনের মোকাবিলা করিতে তাঁহার অস্বীকৃতি। আলা-উদ-দীনের দিল্লীতে আসিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা। জনসাধারণকে ভোজদানে সন্তুষ্টকরণ এবং তাঁহার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি। রাজ্যের যোগ্যতম ব্যক্তিদিগকে লইয়া সরকার গঠন। প্রত্যেক সৈন্যকে ছয় মাসের বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দান। মুলতানে শাহজাদাগণকে আক্রমণ করিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতাকে প্রেরণ। সদয় ব্যবহার ও পবিত্র প্রতিশ্রুতি দানে তাহাদিগকে আত্মসমর্পণ করিতে সম্মতকরণ। তাঁহাদের দিল্লীতে আনয়ন। বন্দী প্রত্যেক পুরুষকে সুলতানের আদেশে দৃষ্টিহীনকরণ এবং পরে হত্যা। মালেকা জাহান ও অন্যান্য মহিলাকে দিল্লীতে বন্দী। মোগলদের ভারত আক্রমণ। সুলতানের ভ্রাতার নিকট তাহাদের পরাজয় এবং ১২,০০০ সৈন্য নিহত। গুজরাট আক্রমণ ও আংশিকভাবে দখল। গুজরাটের সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ। মুহাম্মদ শাহের মোগলর বাহিনীর দল ত্যাগ ও রনথম্বরের রাজার আশ্রয় গ্রহণ। জাফর খান কর্ত্তৃক মোগল আক্রমণ প্রতিহত। দুই লক্ষ মোগলের আর একটি বাহিনীর আগমন। তাহাদের দিল্লী উপস্থিতি। সুলতানের অসামান্য কর্মতৎপরতা। মোগলদের পরাজয়। জাফর খান যুদ্ধে নিহত। সুলতানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র। তিনি গুরুতররূপে আহত। মৃত্যু হইয়াছে মনে করিয়া তাঁহাকে ফেলিয়া গমন। সুলতানের অসাধারণ উপস্থিত বুদ্ধি ও বিজ্ঞজনোচিত আচরণ। গুপ্তঘাতকের প্রাণদণ্ড। দিল্লীতে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক সিংহাসনারোহণের ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত এবং সেই বিদ্রোহ দমন। সুলতানের স্থিরতা। শাসনযন্ত্রের প্রত্যেক শাখায় নূতন নিয়ম প্রবর্তন। পশ্চিমে চিতোর ও দক্ষিণে তেলিঙ্গানায় সৈন্য প্রেরণ। দেড় লক্ষ মোগল কর্ত্তৃক ভারত আক্রমণ। তাহাদের নির্বিঘ্নে দিল্লী আগমন। তারপর মোগলদের আকস্মিকভাবে আক্রমণ প্রত্যাহার করিয়া প্রস্থান। সুলতানের এক নূতন অর্থনৈতিক কাঠামো প্রস্তুতকরণ। সমস্ত দ্রব্যমূল্য নির্ধারিতকরণ। আর এক দফা মোগলাক্রমণ। পলায়নকালে মোগলদিগকে হত্যা। সুলতান কর্ত্তৃক গুজরাট, মালব ও দাক্ষিণাত্যে সৈন্য প্রেরণ। দাক্ষিণাত্যে তাহার সেনাপতিদের বিশেষভাবে মালিক কাফুরের অপূর্ব সাফল্য। কমলা দেবী ও তাঁহার কন্যা দেবলা

দেবী ধৃত। জা-লোর অবরোধ। সুলতানের আদেশে দিল্লীতে মোগলদিগকে ব্যাপকভাবে হত্যা। আলা-উদ-দীনের সাম্রাজ্যের সমৃদ্ধি। সন্দেহবশে সুলতান কর্তৃক পুত্রদিগকে কয়েদ। সাম্রাজ্যের সর্বত্র জনগণের দুঃখ-দুর্দশা। প্রদেশগুলিতে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভ্যুত্থান। সুলতানের জীবনাবসান।]

আহমদ হাবিব সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। সুলতানের হত্যার সংবাদ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন। অপরিণামদর্শী বেগম মালেকা জাহান ওমরাহদের সঙ্গে পরামর্শ না করিয়াই তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র শাহজাদা কুদ্দর খান ওরফে রুকুন-উদ-দীনের মস্তকে তাজ পরাইলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শাহজাদা আরকুলী খান তখন মুলতান ছিলেন। মালেকা জাহান কেলোকারী হইতে দিল্লী আসিয়া সবুজ মহলে শাহজাদার অভিষেক কার্য সম্পন্ন করিলেন - যদিও তখন তিনি শিশু মাত্র এবং রাজকার্য পরিচালনার সম্পূর্ণ অযোগ্য। মালেকা জাহান প্রদেশগুলির শাসনকর্তার পদ তাঁহার দলের লোকের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। প্রকৃত উত্তরাধিকারী আরকুলী খান সমস্ত রাজকীয় গুণে ভূষিত ছিলেন। কিন্তু এইসব ঘটনার আবর্তে পড়িয়া তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন এবং মুলতানে অবস্থান করাই যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন।

আলা-উদ-দীন যখন জানিতে পারিলেন যে তাঁহার শত্রু রানী মালেকা জাহান ও তাঁহার শিশু পুত্র দিল্লীর সিংহাসন দখল করিয়াছেন তখন তিনি আর লক্ষণাবতীতে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার মধ্যে তাঁর আকাঙ্ক্ষা সীমাবদ্ধ রাখিলেন না। তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের সঙ্কল্পে মাতিয়া উঠিলেন এবং বর্ষা উপেক্ষা করিয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। তিনি নিজ এলাকায় সৈন্য সংগ্রহ করিলেন এবং প্রাথমিক কর্তব্য হিসাবে তাঁহার অনুগামীদের খেতাব বিতরণ করিলেন। আলমাস বেগকে আলফ খান এবং মালিক নসরত জালেসরীকে নসরত খান উপাধি প্রদান করিলেন। মালিক জিহাবুর-উদ-দীন জাফর খান এবং মালিক সানজার রুকুন-উদ-দীন খান উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। আলা-উদ-দীন মালিক সানজারের ভগ্নিকে শাদী করিয়াছিলেন। এইসব উপাধির সঙ্গে তাঁহাদিগকে জায়গীরও প্রদান করা হইল।

নসরত খানের উপদেশ মোতাবেক দিল্লী যাত্রার পথে যেখানেই শিবির স্থাপন করিলেন সেখানেই সৈন্যদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করিলেন। জিন্সার

সাহায্যে লোকদের মধ্যে স্বর্ণপিণ্ড নিক্ষেপ করিয়া তিনি আমোদ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে এই প্রকারে দরাজহস্ত দেখিয়া দলে দলে লোক আসিয়া তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল। আলা-উদ-দীনের জনপ্রিয়তার সংবাদ প্রতিদিন মালেকা জাহানের কর্ণে পৌঁছিতে লাগিল। তিনি কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া জ্যেষ্ঠপুত্র আরকুলী খানকে মুলতান ত্যাগ করিয়া সত্বর দিল্লী আসিবার তাগিদ জানাইলেন। কিন্তু তিনি লিখিলেন যে, এখন যাইয়া কোন লাভ নাই। তিনি পৌঁছিবার পূর্বেই রাজধানীর সৈন্যদল শত্রুপক্ষে যোগদান করিবে। সুতরাং তাঁহার আগমনে কোন ফলোদয় হইবে না। তিনি মন্তব্য করিলেন যে, "উৎপত্তিস্থলে জলস্রোতের গতি সহজেই পরিবর্তিত করা যায়। কিন্তু ঐ জলস্রোত নদীতে পরিণত হইলে উহার পথে মজবুত বাঁধও টিকিতে পারে না।"

আলা-উদ-দীন পথে কালক্ষয় না করিয়া দিল্লীর সন্নিকট আসিয়া পৌঁছিলেন। দিল্লীর নিম্নেই যমুনা অতিক্রম করিয়া শহরের উত্তর-পূর্ব তোরণের সম্মুখে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। বালক শাহজাদা সঙ্গীহীন পাখীর মত ছটফট করিয়া তাঁহার সৈন্যদিগকে সজ্ঘবদ্ধ করিলেন এবং শত্রু বাহিনীর সম্মুখে আসিয়া ব্যূহ রচনা করিলেন। কিন্তু শত্রু সৈন্যদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে দেখিয়া তিনি শহরের মধ্যে সরিয়া আসিলেন। রাত্রে কয়েকজন ওমরাহ তাঁহাদের লোকজন লইয়া শত্রুপক্ষে চলিয়া গেলেন। শাহজাদা বুঝিলেন, পলায়ন ব্যতীত প্রাণ-রক্ষার আর কোন পথ নাই। সুতরাং মায়ের সঙ্গে হারেম ও ধনরত্ন লইয়া মুলতানের পথে রওয়ানা হইলেন। মালিক রজব, কুতুব-উদ-দীন রজব, আহমদ হাবিব ও আমীর জালাল তাঁহার সঙ্গে গমন করিলেন। বালক সুলতানের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর নাগরিকরা আলা-উদ-দীনকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য ভীড় করিতে শুরু করিল। আলা-উদ-দীন নিজ নামে মুদ্রার প্রচলন করিলেন এবং ৬৯৬ হিজরীর (১২৯৬ খ্রীঃ) শেষভাগে বিজয়গর্বে শহরে প্রবেশ করিয়া বিপুল শানশওকতের সঙ্গে রুবী মহলে তাঁহার অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। আলা-উদ-দীন মহাআড়ম্বর ও তোড়জোড় সহকারে রাজত্ব শুরু করিলেন এবং জনসাধারণকে সর্বপ্রকার স্ফূর্তি ও আমোদ-আহ্লাদে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। নির্বোধ জনসাধারণ ইহাতে এতো তুষ্ট হইল যে, অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই সাবেক সুলতান ও তাঁহার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের

স্মৃতি তাহাদের অন্তর হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া গেল। যাহার লোকের ঘৃণার পাত্র হওয়ার কথা ছিল তিনিই সকলের প্রশংসার পাত্র হইলেন। তাঁহার বদান্যতার অন্তরালে তাহার দুষ্কর্মের ছবি আর কাহারও দৃষ্টিগোচর হইল না।

এইসব উপায়ে যেমন তিনি নিম্নস্তরের লোকদের প্রশংসা অর্জন করিলেন তেমনি খেতাব ও উপহারাদি দ্বারা উচ্চশ্রেণীর তথা অর্থলোলুপ লোকদের হৃদয় জয় করিবার প্রয়াস পাইলেন। খাজা খাত্তিরকে প্রধান উজিরের পদ প্রদান করিলেন। খাজা খাত্তির সেই অধঃপতনের যুগেও পুণ্যকার্যের জন্য প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। কাজী সদর-উদ-দীন আরিফ ওরফে সদরিজাহানকে দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারক নিযুক্ত করা হইল এবং উমদাতুল মুলক মালিক হামিদ-উদ-দীনকে ও মালিক আইজ-উদ-দীনকে কর্মসচিব মনোনীত করা হইল। উভয়েই বিদ্বান ও প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। আরও অনেককে উচ্চপদ প্রদান করা হইল। আলা-উদ-দীন সৈন্যবাহিনীর প্রত্যেককে ছয়মাসের মাহিনার সমপরিমাণ অর্থ দান করিলেন এবং সেই সঙ্গে জালাল-উদ-দীনের বংশধরদিগকে নির্মূল করিবার ব্যবস্থাও গ্রহণ করিলেন। তিনি তাহার ভ্রাতা আলফ খানকে এবং তাঁহার সঙ্গে জাফর খানকে চল্লিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ মুলতান পাঠাইলেন। সেখানে পৌঁছিয়াই তাঁহারা শহর পরিবেষ্টন করিলেন এবং দুই মাস যাবৎ অবরোধ স্থায়ী রাখিলেন। শেষে মুলতানের সকল নাগরিক ও সৈন্যরা শাজাদা আরকুলী খান ও কুদ্দুব খানের স্বার্থের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া তাঁহাদিগকে শুধু প্রাণভিক্ষার প্রতিশ্রুতিতে আত্ম-সমর্পণ করিতে বাধ্য করিল। শাহাজাদাদের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা হইবে না—আল্লার নামে শপথ করিয়া আলফ খান এই নিশ্চয়তা দান করেন।

অভিযানের উদ্দেশ্য পুরাপুরি হাসিল করিয়া আলফ খান ভ্রাতার নিকট তাঁহার সাফল্যের বিবরণ লিখিয়া পাঠাইলেন। নামাজান্তে প্রত্যেক মসজিদে এই বিবরণ পাঠ করিয়া শোনানো হইল এবং এই উপলক্ষে এক বিরাট উৎসবের আয়োজন করিবার হুকুম দেওয়া হইল। ইতিমধ্যে আলফ খান সসৈন্যে বিজয়গর্বে বন্দীদিগকে সঙ্গে করিয়া দিল্লীর পথে রওয়ানা হইয়াছেন। পথে কোতোয়াল মালিক নসরত খান আগাইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন এবং বন্দীদের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিবার জন্য সুলতানের আদেশ তাঁহাকে জ্ঞাত করাইলেন। এই দণ্ডাজ্ঞা শুধু দুইজন শাহজাদার উপরই সীমবদ্ধ

ছিল না। চেঙ্গিশ খানের পৌত্র ওগ্‌লু খান, আহমদ হাবিব এবং আরও কয়েকজন স্বল্প প্রসিদ্ধ ব্যক্তির জন্যও এই আদেশ প্রযোজ্য ছিল। তাঁহাদের সমস্ত মালপত্র বাজেয়াপ্ত করা হইল। দুই হতভাগ্য শাহজাদাকে অতঃপর হান্‌সীর দুর্গে আটক করিয়া রাখা হইল। সেখানে অল্পকাল পরেই তাহাদিগকে হত্যা করা হয়। ওদিকে মালেকা জাহান ও সাবেক সুলতানের হারেমের সমস্ত মহিলাদের এবং মালেকা জাহানের অন্যান্য সন্তানদিগকে দিল্লীতে কয়েদ করিয়া রাখা হইল।

এই হুকুমতের দ্বিতীয় বর্ষে উজিরের আসন হইতে খাজা খাত্তিরকে অপসৃত করিয়া তদস্থলে নসরত খানকে নিযুক্ত করা হইল। অভিষেককালে সুলতান জনসাধারণের মধ্যে ও আমীর-ওমরাহদের মধ্যে যে অর্থ বিতরণ করিয়াছিলেন, এই উজির সেই অর্থ ফেরৎ চাহিলেন। বলাবাহুল্য, ইহাতে সকলেই বিরক্ত হইল এবং এই ব্যাপারকে কেন্দ্র করিয়া এক হাঙ্গামার উপক্রম হইল। ঠিক এই সময় দিল্লীতে সংবাদ আসিল যে মা-উরা-উন্নাহার অধিপতি মুলতান, পাঞ্জাব ও সিন্ধু জয়ের উদ্দেশ্যে একলক্ষ মোগল সৈন্য প্রস্তুত করিয়াছেন এবং তিনি তলোয়ার ও অগ্নি দ্বারা পথ পরিষ্কার করিয়া অতি দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছেন। আক্রমণকারীদিগকে বাধা দানের জন্য আলা-উদ-দীন তাঁহার ভ্রাতা আলফ খানকে পাঠাইলেন। লাহোর এলাকায় দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইলে এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হইল। মোগলরা হারিয়া গেল। তাহাদের ১২,০০০ সৈন্য ও অনেক সেনানায়ক নিহত হইল। নানা শ্রেণীর বহুলোক বন্দী হইল। কয়েকদিন পরে তাহাদের সকলকে কতল করা হইল। মোগল শিবিরে যেসব শিশু ও স্ত্রীলোক ধৃত হইয়াছিল, তাহারাও পরিত্রাণ পায় নাই। এই জয়লাভে সুলতানের সামরিক শক্তির খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। রাজ্যে তাঁহার আসন মজবুত হইল এবং বিদেশী শত্রুদের প্রাণে ভীতির সঞ্চার হইল। এই সময় আলা-উদ-দীন তাঁহার ভ্রাতা আলফ খানের পরামর্শে অনেক ওমরাহকে বন্দী করিলেন। ইহারা সাহায্যদানের প্রতিশ্রুতিতে বিপদকালে মালেকা জাহানের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ আদায় করিয়াছিলেন। এইসব ব্যক্তিদের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করিয়া তাহাদের জায়গীর ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইল। ফলে শাহী খাজাঞ্চিখানায় প্রচুর ধনাগম হইল।

৬৯৭ হিজরীর (খ্রীঃ ১২৯৭) প্রারম্ভে সুলতানের ভ্রাতা আলফ খান ও উজির নসরত খানকে এক সৈন্যবাহিনীসহ গুজরাটে প্রেরণ করা হইল। ইহারা দেশে ধ্বংসকাণ্ড চালাইয়া রাজধানী নিহারওয়ালা আসিয়া পৌঁছিলেন এবং উহা অধিকার করিলেন। রাজা রায়করন নগর ত্যাগ করিয়া দাক্ষিণাত্যে পালাইয়া যান এবং দেবগিরির রাজা রাম দেবের শরণাগত হন। তাঁহার সহায়তায় রায়করণ পরে দেশে ফিরিয়া আসিয়া বাগলানায় বসবাস আরম্ভ করেন। বাগলানা ছিল রাম দেবের রাজ্যের সীমান্তবর্তী গুজরাটের একটি প্রদেশ। কিন্তু তাহার স্ত্রীগণ, সন্তানাদি, হস্তী, অশ্ব, সমস্ত মালপত্র ও ধনরত্ন মুসলমানদের হস্তে পতিত হয়। বন্দীদের মধ্যে ছিল তাঁহার পরমাসুন্দরী স্ত্রী কমলাদেবী। এই অভিযান শেষ করিয়া নসরত খান সেনাবাহিনীর একাংশ লইয়া ক্যাম্বে গমন করেন। ক্যাম্বেতে বহু বণিকের বাস ছিল। ইহা ছিল এক অতি সমৃদ্ধশালী দেশ। এখানে আক্রমণকারীদের ভাগ্যে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য মিলিয়াছিল। এইখানেই নসরত খান ক্যাম্বের এক বণিকের নিকট হইতে কাফুর নামক এক সুশ্রী ক্রীতদাসকে বলপূর্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এই ব্যক্তিই পরে মালিক কাফুর নামে অশেষ খ্যাতি ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইয়াছিলেন। মুসলমানদের অর্থ ও শোণিত পিপাসা পরিপূর্ণভাবে নিবৃত্তির পর বিজিত প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া এবং আত্মরক্ষার জন্য সেনাবাহিনীর একাংশ রাখিয়া তাহারা দিল্লী রওয়ানা হয়। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে সৈন্যবাহিনী জালোর পৌঁছিলে সেনাপতিদ্বয় পূর্বে যাহা পাইয়াছিল তাহা ছাড়াও সৈন্যদের নিকট হইতে লুণ্ঠিত দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ দাবী করিয়া বসিল। ইহাতে শিবিরে সিপাহী বিদ্রোহের সৃষ্টি হইল। পেশাদার মোগল সৈন্যদের সর্দার মুহাম্মদ শাহ্ আরও কতিপয় সেনাপতির সঙ্গে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। উহাদের একদল উজির নসরত খানের ভ্রাতাকে ও আরও কয়েকজনকে হত্যা করিয়া বসিল। অন্য একদল সুলতানের ভ্রাতা আলফ খানের শিবিরে ছুটিল। আলফ খান পদব্রজে ছুটিয়া উজিরের শিবিরে পালাইয়া গিয়াছিলেন। বিদ্রোহীরা সেখানে সুলতানের নিদ্রিত ভাগিনেয়কে আলফ খান ভ্রমে হত্যা করিল। এই সময় আতঙ্কগ্রস্ত উজির সৈন্যদিগকে অস্ত্র ধারণ করিবার সংকেতসূচক কাড়া নাকাড়া বাজাইলেন। যাহারা বিদ্রোহের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল না, তাঁহারা ইহাকে কোন শত্রুর আগমন সঙ্কেত

মনে করিয়া স্ব স্ব স্থানে যাইয়া দণ্ডায়মান হইল। ইহাতে বিদ্রোহীদের দল ভাঙ্গিয়া গেল এবং তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া নানাদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। বিদ্রোহীরা পরে একস্থানে সমবেত হয় এবং প্রধান বাহিনী পরদিন তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পথে অনেক লোকজন হারাইয়া শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা রনথম্বরের রাজা ভীম দেবের রাজ্যে পালাইয়া যায় এবং তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করে। ইত্যবসরে আলফ খান ও নসরত খান দিল্লীর পথে রওয়ানা হয়।

গুজরাটের বন্দিনী রানী কমলাদেবী রূপেগুণে বিদ্যাবুদ্ধিতে হিন্দুস্থানের পুষ্পস্বরূপ ছিলেন। আলা-উদ-দীন দর্শন মাত্র তাঁহাকে স্বীয় হারেমের জন্য মনোনীত করিলেন। এই অভিযানে প্রাপ্ত পুর্বোল্লিখিত গোলাম কাফুরও আলা-উদ-দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিগত সিপাহী বিদ্রোহে লিপ্ত এবং সংশ্লিষ্ট মোগল ও অন্যান্য লোকদের পরিবারের সমস্ত লোককে সুলতানের নির্দেশে উজির কাটিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিলেন। সুদর্শনা রমণী, রোরুদ্যমানা মাতা, স্তনপানরত সহাস্য শিশু—কাহারও প্রতি কোন করুণা প্রদর্শন করা হইল না।

এই সময় চোল্দী খান নামক এক মোগল দলপতি ও তাহার ভ্রাতা এক বিশাল বাহিনী লইয়া হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিয়া সিস্তানের দুর্গ অধিকার করে। তাহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন জাফর খান। তিনি ঐ দুর্গ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিলেন। তিনি দুর্গটিই শুধু পুনরুদ্ধার করিলেন না, অধিকন্তু চোল্দী খান ও ২,০০০ হাজার মোগল সৈন্যকে বন্দী করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় দিল্লী প্রেরণ করেন। এই অভিযানে জাফর খান এতো খ্যাতি অর্জন করেন যে, স্বয়ং সুলতান তাঁহার প্রতি ঈর্ষান্বিত হইলেন। সুলতান তাঁহাকে শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারণ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কিন্তু তখনকার মত তাঁহাকে বিরত হইতে হইল—কারণ এই সময় মা-উরা উন্নাহার সুলতান আমীর দাউদ খানের পুত্র কুতলুগ খানের অধীনে আর এক বিশাল মোগল বাহিনী ভারতাক্রমণে অগ্রসর হইল। দুই লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সম্বলিত এই বিরাট মোগল বাহিনী স্থায়ীভাবে সমস্ত হিন্দুস্থান অধিকারের সংকল্প লইয়া আসিয়াছিল। এই জন্যই কুতলুগ খান সিন্ধুর অপর পাড়ে অবস্থিত যে-সব স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদের উপর কোন প্রকার অত্যাচার হইতে দেন নাই। নদী পার হইয়া তাহারা দিল্লীর দিকে ধাবিত হয় এবং নির্বিঘ্নে দিল্লী পর্যন্ত আসিয়া যমুনার তীরে শিবির স্থাপন করেন। জাফর

খান ক্রমাগত পশ্চাদাপসরণ করিয়া আসেন। মোগলদের ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া দেশের লোকেরা রাজধানীতে আসিয়া ভীড় করিতে লাগিল। ফলে শহর এমন জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল যে রাজপথগুলি লোক চলাচলের অনুপযোগী হইল এবং সমস্ত কারবার ও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল—ইহাতো মসিবতের ভূমিকামাত্র। শহরে যে খাদ্য ছিল তাহা অচিরেই নিঃশেষ হইয়া গেল। ওদিকে খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থাও অচল হইয়া পড়িল। ফলে ভয়াবহ অন্নাভাব দেখা দিল। প্রত্যেকের মুখে নৈরাশ্য ও মৃত্যুর আভাস পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই জরুরী অবস্থার মোকাবিলার জন্য আলা-উদ-দীন ওমরাহদের সঙ্গে পরামর্শ করেন। কিন্তু তাহাদের অমতা সত্ত্বেও আলা-উদ-দীন শত্রুকে আক্রমণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিন লক্ষ অশ্বারোহী ও ২,৭০০ হস্তী সম্বলিত বিরাট বাহিনী লইয়া তিনি বাদায়ুন তোরণ-পথে নিক্রান্ত হইলেন। শহরতলীর বাহিরে অবস্থিত সমতল ক্ষেত্রে আসিয়া তিনি যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনীকে কাতারবন্দী করিলেন। শত্রুরাও তাহার মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইল। হিন্দুস্থানে মুসলমানদের প্রথম আগমনের সময় হইতে কোন সমরক্ষেত্রে এরূপ বিশাল সমাবেশ ঘটে নাই। শুধু তাই নয়, ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এমন বিপুল সংখ্যক দুই বাহিনীর সেনা এই সময়ে একই স্থানে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছে বলিয়া আমার জানা নাই। আলা-উদ-দীন তাঁহার বাহিনীর দক্ষিণ ভাগের পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করিলেন সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ সিপাহ্‌সালার জাফর খানের উপর। জাফর খানের অধীনে রহিল তাহার শাসনাধীন প্রদেশ সামানা পাঞ্জাব ও মুলতানের সৈন্যদল। বাম ভাগের নেতৃত্ব প্রদত্ত হইল সুলতানের ভ্রাতা আলফ খানের উপর। আলফ খানের অধীনে ছিল সুলতানের শ্যালক রুকুন খান। ১২,০০০ স্বেচ্ছাসেবক লইয়া কেন্দ্রে স্থান গ্রহণ করিলেন সুলতান নিজে। ইহাদের অধিকাংশই ছিল খিলজী সম্প্রদায়ের লোক। ইহাদের পরিচালনার দায়িত্ব লইলেন নসরত খান। বাছাই করা হস্তীগুলি দ্বারা সম্মুখের কাতার প্রস্তুত করা হইল এবং উজিরের অধীনস্ত একদল উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যকে সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য নিয়োজিত করা হইল।

দক্ষিণভাগে জাফর খান মহাবিক্রমে আক্রমণ শুরু করিলেন এবং তাঁহার হস্তীবাহিনী দ্বারা শত্রুবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিলেন এবং ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সহকারে শত্রুকে তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। শত্রুবাহিনীর বামপার্শ্ব এই প্রকারে

পিছু হটিয়া কেন্দ্রভাগে আসিয়া জড় হইল। ফলে যুদ্ধ পুরাপুরি আরম্ভ হইবার পূর্বেই শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রভাগে মহা বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল এবং তাহারা হটিতে আরম্ভ করিল। ইহা দেখিয়া আলা-উদ-দীন তাঁহার ভ্রাতা আলফ খানকে (যিনি বাম পার্শ্বে নেতৃত্ব করিতেছিলেন) শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে বলিলেন। কিন্তু জাফর খানের সুখ্যাতিতে ঈর্ষাপরায়ণ আলফ খান কিছুদুর অগ্রসর হইয়া জাফরকে একা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিতে রাখিয়া নিজে আসিয়া পড়িলেন। জাফর খানের দল একা ত্রিশ মাইলের বেশী পথ শত্রুর পিছু পিছু ছুটিয়া গেল। পরদিন এক মোগল সেনাপতি লক্ষ্য করিল যে, জাফর খানের দল একাই তাহাদের পিছু লইয়াছে—আর কেহ তাঁহাকে সাহায্য করিতেছে না। তখন তিনি জাফর খানকে আক্রমণ করিবেন স্থির করিলেন। এই মোগল সেনাপতির বাহিনী তখনও যুদ্ধে লিপ্ত হয় নাই। তিনি মোগল বাহিনীর প্রধান সেনাপতি কুৎলুগ খানকেও এই সংবাদ জানাইলেন। কুৎলুগ খানও তাঁহার ১০,০০০ সৈন্য লইয়া জাফর খানের দলের পশ্চাতে আসিয়া পড়িলেন। এইরূপে পরি-বেষ্টিত হইয়া জাফর খান প্রমাদ গণিলেন। পিছু হটিবার কোন উপায় ছিল না। তাঁর সৈন্যসংখ্যা শত্রু সৈন্যের অর্ধেকেরও কম। তবুও তিনি ভগ্নোৎসাহ হইলেন না। তিনি তাহার দলকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পশ্চাতে ও সম্মুখে অবস্থিত শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম শুরু করিলেন। যুদ্ধে তাঁহার প্রত্যেক সৈন্যই বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিল। শত্রুর তলোয়ারের আঘাতে জাফর খানের ঘোড়ার পা কাটিয়া গেল এবং তিনি মাটিতে পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি লাফাইয়া উঠিয়া ধনুর্বাণ হস্তে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তাঁর মত সুদক্ষ তীরন্দাজ খুব কম হয়। মৃত্তিকায় দণ্ডায়মান থাকিয়া তিনি চতুর্দিকে যেন মরণ বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া চলিলেন। এতক্ষণে তাঁহার অধিকাংশ লোক হয় নিহত না হয় বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। কুৎলুগ খান তাঁহার বীরত্বের তারিফ করিয়া তাঁহাকে উচ্চঃস্বরে আত্মসমর্পণ করিতে বলিলেন এবং তাহার অসামান্য বীরত্বের যথোপযুক্ত মর্যাদা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। জাফর খান দৃঢ়তার সঙ্গে জানাইলেন যে নিজের কর্তব্য সাধন করিয়া মৃত্যুবরণ করা অপেক্ষা বৃহত্তর কোন মর্যাদার কথা তাঁহার জানা নাই। ইহা শুনিয়া মোগল সেনাপতি একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিয়া জীবিতাবস্থায় বন্দী করিবার নির্দেশ দান করিলেন। কিন্তু জাফর খান সেই অনুগ্রহ গ্রহণ করিতেও প্রস্তুত

ছিলেন না। শেষ পর্যন্ত কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের সঙ্গে তাঁহাকে টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ফেলা হইল।

এইখানে জয়লাভ করিয়াও মোগলদের মনোবল বাড়িল না। তাহারা পলায়নের সঙ্কল্প ত্যাগ না করিয়া দ্রুত ভারত ছাড়িয়া চলিয়া গেল। জাফর খানের বীরত্বের কাহিনী মোগলদের মধ্যে প্রবাদে পরিণত হইল। তাহাদের ঘোড়া কখনও আঁৎকিয়া উঠিলে তাহারা ঘোড়াকে জিজ্ঞাসা করিত, সে জাফর খানের ভূত দেখিয়াছে নাকি। কথিত আছে যে, এই মহান সেনাপতির মৃত্যুকে আলা-উদ-দীন তাঁহার জয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার রূপে গণ্য করিয়াছিলেন। এই দুঃসংবাদে তিনি তাহার আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারেন নাই। মোগলদের পলায়নোপলক্ষে দিল্লীতে এক মহা উৎসব ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করা হয় এবং সেনাপতিদিগকে তাহাদের কৃতিত্ব ও আনুগত্যানুযায়ী খেতাব ও সামরিক মর্যাদা প্রদান করা হয়। অল্পসংখ্যক কয়েকজনের শৈথিল্য প্রদর্শনের অপরাধে, পদাবনতি ঘটানো হয়। একজন সেনাপতিকে গাধার পৃষ্ঠে উঠাইয়া শহর প্রদক্ষিণ করানো হইয়াছিল।

আলা-উদ-দীনের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে তাঁহার সামরিক শক্তির খ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। এই সময় তিনি কতকগুলি উদ্ভট খেয়ালে মাতিয়া ওঠেন। ইহাদের একটি ছিল নূতন এক ধর্ম প্রবর্তন করা—যাহাতে ভবিষ্যৎ বংশধররা তাঁহাকে মুহাম্মদের (দঃ) মতই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে। সুরা পানকালে তিনি প্রায়শঃই ভ্রাতা আলক খান, উজির নসরত খান এবং রুকন খানের সঙ্গে এই ব্যাপারে আলোচনা করিতেন। তাঁহার অন্য খেয়ালটিও ছিল অনুরূপ অবাস্তব। হিন্দুস্থানে এক প্রতিনিধি রাখিয়া মহাবীর আলেকজাণ্ডারের মত তিনি পৃথিবী বিজয়ে বাহির হইবেন। এই সঙ্কল্পের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি দ্বিতীয় আলেকজাণ্ডার উপাধি ধারণ করেন এবং মুদ্রায় উক্ত নাম অঙ্কিত করান। নিজের সম্বন্ধে যার এতো উচ্চ ধারণা—সেই আলা-উদ-দীন ছিলেন একজন বর্ণজ্ঞানহীন নীরেট মূর্খ। এইসব হাস্যকর পরিকল্পনায় তিনি এরূপ অটল রহিলেন যে, যাঁহারা তাঁহার এইসব খেয়াল সমর্থন করিতে বা সমর্থন করিবার ভাণ করিতে ঘৃণাবোধ করিতেন, তাঁহারা দরবারে হাজির হওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন অথবা হাজির হইলেও কোন প্রকার মন্তব্য করিতে

বিরত থাকিতেন। কিন্তু দরবারে তাঁহার মোসাহেবের অভাব ছিল না। ইহারা জ্ঞাতসারেই সুলতানের এইসব উদ্ভট অভিলাষকে অভিনন্দন জানাইতেন এবং এমন ভাব দেখাইতেন যেন তাঁহারা সুলতানের সঙ্গে এই ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত।

সুলতান তাঁহার ধর্মীয় পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করিবার জন্য শহরের বৃদ্ধ কোতোয়াল আলাওল মুল্‌ককে দরবারে হাজির হইবার তলব দিলেন। অতি স্থুল-কায় বিধায় তিনি মাসে একবারের বেশী দরবারে আসিতেন না। আলাওল মুল্‌ক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া আসিলেন যে, ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে কিছু বলা হইলে তিনি তাহার প্রতিবাদ করিবেন। তাহাতে ভাগ্যে যাহা ঘটে ঘটিবে। সুলতানের উদ্ভট খেয়ালকে সমর্থন জ্ঞাপনের পরিবর্তে তিনি বরং জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটি বৎসর বিসর্জন দিবেন। এই কঠোর সংকল্পে বুক বাঁধিয়া তিনি দরবারে হাজির হইলেন। তিনি আসিয়া দেখিলেন, সুলতান কয়েকজন আমীরের সঙ্গে মদ্য পানে রত। সুলতান আলাওল মুল্‌কে দেখিয়া অমনি তাঁর প্রিয় বিষয়ের অবতারণা করেন। কিন্তু বৃদ্ধ আরজ করিলেন যে, তিনি গোপনে তাঁহার মত ব্যক্ত করিতে অভিলাষী—সুতরাং শরাবের সঙ্গীদিগকে বিদায় করিয়া দিলে তিনি খুব সুখী হইবেন।

সুলতান মৃদু হাসিয়া চারিজন ব্যতীত আর সকলকে সভাকক্ষ ত্যাগ করিতে বলিলেন। আলাওল মুল্‌ক এইবার ভূমি চুম্বন পূর্বক নিবেদন করিলেন, "হে শাহান শাহ! ধর্ম আল্লাহ্‌র বিধান। আল্লাহ্‌ই তাহার পয়গম্বরদের অন্তরে ধর্মীয় প্রেরণা সঞ্চার করিয়া থাকেন। আল্লাহ্‌র বাণীতেই এই বিশ্বাস আমাদের মনে বদ্ধমূল হইয়াছে যে, সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদের (সঃ) সঙ্গেই নবুয়ত শেষ হইয়াছে। ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল অবস্থার ও সকল জাতির মুসলমান এ সত্য একবাক্যে স্বীকার করে। এমতাবস্থায় ইসলামবিরোধী আপনার এই বাসনা যখন প্রকাশিত হইবে তখন সমস্ত মুসলমানদের অন্তর আপনার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে এমন হাঙ্গামা ও রক্তপাত শুরু হইবে যে, তাহা কল্পনা করিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে। এইজন্য আপনার উচিৎ এইসব অদ্ভুত সঙ্কল্প পরিত্যাগ করা—কারণ ইহা কার্যকরী করা মানুষের সাধ্যাতীত। মহাপরাক্রান্ত মোগলাধিপতি চেঙ্গিশ খান ও তাঁহার বংশধররা আমাদের পবিত্র ধর্মকে উৎখাত করিয়া তদস্থলে তাহাদের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য কি কম চেষ্টা করিয়াছিল? কত লহুর দরিয়া প্রবাহিত হইল। যে ধর্মকে

নির্মূল করিবার জন্য তাহাদের চেষ্টার অবধি ছিল না—তাহারাই শেষ পর্যন্ত সেই পবিত্র ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া ধন্য হইল।" সুলতান মনোযোগ সহকারে তাহার কথাগুলি শুনিয়া বলিলেন, "আপনি সত্য কথাই বলিয়াছেন এবং আমার শুভার্থী হিসাবেই সংযুক্তি প্রদান করিয়াছেন। এই ধর্মীয় পরিকল্পনা—যাহা এতোদিন আমার মস্তিষ্ক জুড়িয়া ছিল—তাহা এই মুহূর্তে চিরতরে পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু এখন বলুন, আমার বিশ্ব জয়ের পরিকল্পনা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?"

প্রবীন রাজকর্মচারী ইহার উত্তরে বলিলেন: "হজরত! আপনি ইদানিং যে বাসনা পোষণ করিয়াছেন, পূর্বেও কোন কোন সুলতান তেমনি উচ্চাভিলাষ পোষণ করিয়াছেন। আপনার সামরিক শক্তি, ব্যক্তিগত সাহস ও সম্পদের দিক দিয়া বিচার করিলে আলেকজাণ্ডারের মত সাফল্য অর্জন করা আপনার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়। কিন্তু জামানা আপনার পক্ষে ততটা অনুকূল নয়। হিন্দুস্থানে আপনার সাম্রাজ্য এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নাই যে, আপনার অনুপস্থিতিতে ইহা অটুট থাকিবে। বিশ্বাসঘাতকতা ও অকৃতজ্ঞতা দিন দিন মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে। ভাই ভাইয়ের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে, পুত্র পিতার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতেছে। আলেকজাণ্ডারের যুগে ছিল ন্যায়-নীতির প্রাধান্য। সে যুগ আর এ যুগে অনেক পার্থক্য। মানুষের মন তখন উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত ছিল। শঠতা ও বিশ্বাসঘাতকতাকে তাহারা সম্পূর্ণ ঘৃণার চক্ষে দেখিত। অ্যারিস্টটলের মত কোন সৎ উপদেষ্টা কি শাহানশাহর আছে? অ্যারিস্টটল তাঁহার জ্ঞান ও ন্যায়-নীতির শাসন দ্বারা শুধু নিজের দেশেরই শান্তি ও নিরাপত্তা বিধান করেন নাই—অধিকন্তু অন্য জাতিকেও স্বেচ্ছায় তাঁহারা সম্রাটের সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। অ্যারিস্টটলের মত বিশ্বাসভাজন কোন ওমরাহ যদি আপনার থাকেন এবং আলেকজাণ্ডারের মত আপনার প্রজাদের ভালবাসার উপর যদি নির্ভরশীল হইতে পারেন, তাহা হইলে আপনি আপনার দিগ্বিজয়ের সঙ্কল্পে অগ্রসর হইতে পারেন। নচেৎ এই সঙ্কল্প আপনার এখনই পরিত্যাগ করা উচিৎ।" কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সুলতান বলিলেন, "আপনার কথায় যুক্তি ও আন্তরিকতা সুপরিস্ফুট। কিন্তু একটা কথার জওয়াব দিন। এই সামরিক শক্তি, বিপুল ঐশ্বর্য ও বিশাল রাজ্য কি কাজে লাগিল যদি না

এসব যশঃ ও গৌরববৃদ্ধির কার্যে নিয়োজিত না করি এবং যাহা আছে তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকি ?" মালিক আলাওল মুল্‌ক উত্তর দিলেন ঃ 'দুইটি কাজ আছে যাহাতে আপনার অর্থের সদ্ব্যবহার হইতে পারে—হিন্দুস্থানের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্যগুলি যথা- রনথম্বর, চিতোর, জালোর ও চান্দেরী অধিকার করা এবং উত্তর পশ্চিম দিকে লামঘান ও কাবুল পর্যন্ত অধিকার করিয়া সেখানে মোগলাক্রমণের বিরুদ্ধে প্রাচীর স্বরূপ সীমান্ত-রক্ষীবাহিনী মোতায়েন করা।" তিনি বলিলেন, এই কার্যগুলি সমাধা করিলে আপনার সাম্রাজ্য সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইবে, দেশে শান্তি স্থাপিত হইবে, লোকে সুখে স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করিতে পারিবে। ইহাই হইবে আপনার জন্য অক্ষয় কীর্তি। সমরানলে পৃথিবী ভস্মীভূত করার মধ্যে কোন গৌরব নাই। তবে এইসব কাজ হাসিল করিতে হইলেও আপনাকে অতিরিক্ত মদ্যপান ও ইন্দ্রিয়াশক্তি পরিত্যাগ করিতে হইবে।" বৃদ্ধ লোকটি যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহার বিপরীত হইল। সুলতান তাঁহার সমস্ত নসিহত মানিয়া লইলেন এবং নির্ভীক উক্তির জন্য তাঁহার তারিফ করিয়া তাঁহাকে সম্মানসূচক খেলাৎ, দশ হাজার টাকা এবং মূল্যবান জিন-শোভিত দুইটি অশ্ব উপহারস্বরূপ প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের ভোগের জন্য দুইটি গ্রাম নিস্কর জমিদারীরূপে প্রদান করিলেন। মনের কথা প্রকাশ করিবার মত সততা ও সাহস যদিও সভাসদদের ছিল না—তবুও কোতোয়ালের নির্ভীক উক্তিতে তাঁহারা অত্যন্ত খুশী হইলেন এবং তাঁহারাও কোতোয়ালকে অনেক উপহার পাঠাইলেন।

মালিক আলাওল মুলকের উপদেশ মোতাবেক কার্য করিবার জন্য সুলতান তাঁহার ভ্রাতা আলফ খানকে সামানা হইতে, উজিরকে কারা হইতে এবং অন্যান্য আমীরদিগকে স্ব স্ব সুবা হইতে দরবারে হাজির হইতে বলিলেন। এক বিরাট বাহিনীসহ তাঁহাদিগকে রনথম্বরের রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইহারা প্রথম ঝাইনের দুর্গ অধিকার করে এবং পরে রাজধানী পরিবেষ্টন করে। যুদ্ধের সময় উজির নসরত খান একবার প্রাচীরের নিকটে আসিয়াছিলেন। তখন যন্ত্র দ্বারা নিক্ষিপ্ত এক প্রস্তরাঘাতে তিনি চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া মারা যান। শত্রুরা সেনাপতির মৃত্যুর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইল। রাজা হাম্বির দেব অতি অল্প সময়ের মধ্যে দুই লক্ষ সৈন্য সজ্জবদ্ধ করিয়া দুর্গ হইতে বাহিরে আসিয়া শত্রুকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। এই সৈন্যবল দ্বারা তিনি আলফ খানকে প্রচুর

ক্ষতি স্বীকার করিয়া ঝাইনে পশ্চাদাপসরণ করিতে বাধ্য করিলেন। এই পরাজয়ের সংবাদ দিল্লী পৌঁছিলে সুলতান স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন স্থির করিলেন। পথে ঝিলপুত নামক একস্থানে বিশ্রামের জন্য থামেন। সেইখান হইতে তিনি শিকারে বহির্গত হন এবং শিকারের অনুসরণে শিবির হইতে বহুদূরে চলিয়া যান এবং অনুচরদের সঙ্গে এক জঙ্গলে রাত্রি যাপন করিতে বাধ্য হন। প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে তিনি একটা উচ্চস্থানে আরোহণ করিয়া দুই তিনজন সঙ্গীসহ সেখানে উপবেশন করিলেন এবং লোকদিগকে নিম্নে সমভূমিতে আমোদ আহ্লাদ করিতে হুকুম দিলেন। শাহজাদা সুলেমান ওরফে রুকুন খান ইহা লক্ষ্য করিলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার মনে হইল এইবার সুলতানকে স্বচ্ছন্দে কাটিয়া ফেলা যায়—যেমন তিনি নিজে তাঁর মুরব্বিকে কাটিয়া ফেলিয়াছেন। রুকুন খান আরও ভাবিলেন যে, সম্পর্কে তিনি সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র। সেই সম্পর্কের জোরে এবং সুলতানের কর্মসচিব হিসাবে সৈন্যদের উপর তাহার যে প্রভাব আছে তাহার বলে আলা-উদ-দীনের মতই তিনিও নিজেকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন।

কয়েকজন নবদীক্ষিত মোগলের নিকট তিনি তাঁর মতলব প্রকাশ করিলেন। ইহারা কিছুদিন যাবৎ তাঁহার অধীনে চাকুরী করিয়া আসিতেছিল। উহাদের উপর তাহার পূর্ণ আস্থা ছিল। যাহাহউক সঙ্কল্প স্থির করিয়া রুকুন খান অশ্ব ছুটাইয়া টিলার উপর উঠিলেন এবং সুলতানের উপর এক পশলা তীরবৃষ্টি করিলেন। দুইটি তীর সুলতানের শরীরে বিদ্ধ হইল এবং সুলতান মৃতবৎ মাটিতে শুইয়া পড়িলেন। রুকুন খান তখন তলোয়ার কোষমুক্ত করিয়া সুলতানের মাথা কাটিতে ছুটিয়া গেলেন। দেহরক্ষীরা তাঁহাকে বলিলেন যে, সুলতান প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তখন তিনি তাঁর শিরচ্ছেদ করা নিষ্প্রয়োজন বিবেচনা করিলেন।

অতঃপর রুকুন খান শিবিরে ফিরিয়া আসিয়া সিংহাসনে আরোহণ করিলেন এবং নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। সেনাদলে মহাবিভ্রান্তির সৃষ্টি হইল। প্রধান ব্যক্তিরা দরবারে হাজির হইয়া নূতন সুলতানকে নজরানা দান করিলেন। প্রচলিত নিয়মানুযায়ী কোরান শরীফ হইতে আয়াত পাঠ করা হইল এবং রুকুন-উদ-দীনের নামে খোৎবাও পাঠ করা হইল। নকীবরা নূতন সুলতানের অভিষেকের কথা চতুর্দিকে ঘোষণা করিল। অভিষেকান্তে শাহজাদা রুকুন সিংহাসন হইতে উঠিয়া হারেমে গমন করিলেন। কিন্তু প্রধান খোজা মালিক দিনার সমস্ত রক্ষীবাহিনী একত্র করিয়া তাঁহার পথরোধ করিলেন এবং বলিলেন,

প্রাণ থাকিতে আলা-উদ-দীনের মস্তক না দেখা পর্যন্ত সে তাঁহাকে হারেমে প্রবেশ করিতে দিবে না। ইতিমধ্যে আলা-উদ-দীন সম্বিৎ ফিরিয়া পান এবং তাঁহার ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দেওয়া হয়। তিনি ভাবিলেন যে, রুকুন খানের বিশ্বাসঘাতকতার সঙ্গে নিশ্চয়ই ওমরাহদের যোগসাজস আছে। সুতরাং যে ৬০ জন অনুচর তখনও তাঁহার নিকট ছিল উহাদের সঙ্গে তিনি ঝাইনে তাঁহার ভ্রাতার নিকট গমন করিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু সুলতানের দ্বাররক্ষক মালিক হামিদ সুলতানকে এই পন্থাবলম্বনে বারণ করিলেন এবং তাঁহাকে কালবিলম্ব না করিয়া শিবিরে যাইয়া সৈন্যদিগকে দেখা দিতে পরামর্শ দিলেন। তিনি বলিলেন, আত্মসাৎকারী তখনও নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই এবং সুলতানের তদ্রাতপ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্র সমস্ত সৈন্য স্ব স্ব কর্তব্যপালনে তৎপর হইবে। তিনি একথাও বলিলেন যে, আর সামান্য বিলম্ব হইলে অবস্থা পুনরুদ্ধারের বাহিরে চলিয়া যাইবে।

এই উপদেশ গ্রহণ করিয়া আলা-উদ-দীন অতিকষ্টে অশ্বারোহণ করিলেন। ভূলুণ্ঠিত শ্বেত চন্দ্রাতপ মস্তোপরিবিস্ফারিত করিয়া অনুচরদল পরিবেষ্টিত হইয়া শিবিরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে প্রধান সেনাবাহিনীর ঘাস সংগ্রহকারী দল তাঁহার সঙ্গে যোগদান করায় তাঁহার অনুচর সংখ্যা পাঁচশত হইল এবং ইহাদের সঙ্গে তিনি শিবিরের সমীপবর্তী হইলেন। শিবির হইতে তাঁহাকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় এরূপ এক উচ্চস্থানে তিনি আরোহণ করিলেন। তাঁহাকে ও তাঁহার অনুচরদিগকে দেখিয়া সৈন্যরা হাজারে হাজারে আসিয়া তাঁহার চতুষ্পার্শ্বে ভিড় করিয়া দণ্ডায়মান হইল। অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্যায়রূপে সিংহাসন অধিকারীর আসর ভাঙ্গিয়া গেল এবং তিনি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ হইয়া পড়িলেন। অনোন্যপায় হইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ অশ্বারোহণ করিয়া আফগানপুর অভিমুখে ছুটিলেন। আলা-উদ-দীন শাহী খিমায় আসিয়া তখ্‌তে আরোহণ করিয়া সকলকে দর্শনদান করিলেন। কালবিলম্ব না করিয়া সুলতান একদল অশ্বারোহী সৈন্যকে তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতুষ্পুত্রের অনুসরণ করিতে প্রেরণ করিলেন। ইহারা শীঘ্রই রুকন খানকে ধরিয়া ফেলিল এবং তাঁহার মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিয়া সুলতানের পদপ্রান্তে স্থাপন করিল। রুকন খানের ভ্রাতা কুৎলুগ খান ও অন্যান্য প্রধান ষড়যন্ত্রকারীদিগকেও তখনই গ্রেফতার করিবার হুকুম দেওয়া হইল এবং উহাদের সকলকেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইল।

প্রথম সারিলে আলা-উদ-দীন রনথম্বর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ভ্রাতা আলফ খানের সঙ্গে মিলিত হইয়া সুলতান অবরোধ পুনঃ স্থাপনের হুকুম দিলেন। কিন্তু হিন্দুরা এমন মৃত্যুপণ করিয়া নগর রক্ষা করিতে লাগিল যে প্রতি দিন সুলতানের বহু সৈন্য নিহত হইতে লাগিল। আলা-উদ-দীন অবশ্য পূর্ণোদ্যমে আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁহার বাহিনীর কিয়দংশ মালব ও ধরের পার্শ্ববর্তী এলাকায় লুণ্ঠন কার্যে নিযুক্ত হইল। অবরোধ কয়েক মাস চলিল। সেই সুযোগে সুলতানের দুই ভাগিনের—ওমর খান ও মাঙ্গু খান বাদায়ুনে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। ইহাদের উপর বাদায়ুনের শাসনভার ন্যস্ত ছিল। আলা-উদ-দীন সেই প্রদেশের কয়েকজন বিশ্বস্ত আমীর ও জমিদারকে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিদ্রোহ দমন করিবার নির্দেশদান পূর্বক পত্র লিখিলেন। তাঁহাদের প্রচেষ্টায় বিদ্রোহ প্রশমিত হইল। তাহারা বিদ্রোহীদ্বয়কে বন্দী অবস্থায় সুলতানের শিবিরে চালান দিল। প্রথম দফায় সুলতান উহাদের দৃষ্টি-শক্তি নষ্ট করিয়া দেন এবং পরে সর্বসমক্ষে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য উহাদিগকে বধ করিবার হুকুম দেন। এসব কঠোরতা সত্ত্বেও এক হাজী মাওলা কর্তৃক ইতিহাসের অন্যতম বিস্ময়কর ষড়যন্ত্র সংঘটিত হইল। এই হাজী মাওলা ছিলেন দিল্লীর বিখ্যাত কোতোয়াল ফখর-উদ-দীনের এক ক্রীতদাসের পুত্র। সুলতান জালাল উদ-দীনের রাজত্বকালে ফখর-উদ-দীন ইন্তেকাল করেন।

উচ্চাভিলাষী যুবক হাজী মাওলা সুলতানকে এই দীর্ঘকাল রনথম্বর অবরোধে নিযুক্ত দেখিয়া সাম্রাজ্যে একটা বিপ্লব ঘটাইবার মতলবে মাতিয়া উঠিলেন। তদানীন্তন কোতোয়ালের প্রতিনিধি তরমুজি খানের প্রতি শহরবাসীদের ঘৃণা ও বিদ্বেষ তাঁহাকে সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগ প্রদান করিল। কোতোয়াল সুলতানের সঙ্গে শিবিরে ছিলেন। তরমুজি খান সেই সুযোগে লোকের উপর অত্যধিক জুলুম করিতেছিলেন। প্রথম পদক্ষেপে হাজী মাওলা যাহা করিলেন তাহা এই: একদিন মধ্যাহ্নে অত্যধিক উত্তাপের দরুন লোকেরা যখন স্ব স্ব গৃহে বিশ্রাম লাভে রত তখন হাজী মাওলা সুলতানের জাল পত্র দেখাইয়া কতকগুলি শহরবাসীকে লইয়া একটা দল গঠন করেন। ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি সত্বর তরমুজি খানের গৃহ-দ্বারে যাইয়া হাজির হইয়া তাঁহাকে সংবাদ পাঠাইলেন যে, সুলতানের নিকট হইতে পত্র লইয়া এক দূত তাহার নিকট আসিয়াছেন।

শাহী পত্রের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তরমুজি খান দরজায় ছুটিয়া আসিলেন। তরুণ প্রবঞ্চক এক হাতে তাঁহার সম্মুখে পত্র ধরিলেন এবং অন্য হাতে আঘাত করিয়া তাঁহাকে কাটিয়া ফেলিলেন—যাহার মর্ম ছিল এই যে সুলতানই হাজী মাওলাকে এই হত্যাকাণ্ড সম্পন্ন করিতে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছিলেন।

শীঘ্রই বহু লোক আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে জমা হইল। তখন হাজী মাওলা শহরের তোরণগুলি দখল করিবার জন্য কয়েক দল লোক প্রেরণ করিলেন। অতঃপর তিনি নূতন শহরের কোতোয়াল আলা-উদ-দীন আয়াজের নিকট এক লোক মারফত তাগিদ পাঠাইলেন যে, তিনি যেন সুলতানী ফরমান পড়িবার জন্য তাঁহার নিকট তখনই চলিয়া আসেন। হাঙ্গামার খবর ইতিমধ্যেই সেই রাজ-কর্মচারীর কর্ণগোচর হইয়াছিল। তিনি এই আমন্ত্রণের উপর কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না—বরং নিজের সদর দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দিলেন। ইত্য-বসরে হাজী মাওলা জনতাকে পরিচালিত করিয়া রুবী মহলে গমন করিয়া সমস্ত রাজবন্দীকে আজাদ করিয়া দিলেন। সুলতানের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র, ধনরত্ন ও মূল্যবান দ্রব্যাদি যাহা পাইলেন সব তাঁহার লোকজনের মধ্যে বন্টন করিয়া দিলেন। তারপর তিনি আলভি ওরফে শাহনান্নীকে বলপূর্বক সিংহাসনে উপবেশন করাইয়া শহরের প্রবীন ব্যক্তিদিগকে তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হুকুম দিলেন। রাজবন্দী আলভি ছিলেন শামস-উদ-দীন আলতামাসের একজন নিকটতম বংশধর। এইসব ঘটনার সংবাদ সুলতানের নিকট পৌঁছিল। কিন্তু এইজন্য তিনি অবরোধ ব্যবস্থা একটুও শিথিল করিলেন না। সুলতান শুধু তাঁহার পোষ্য ভ্রাতা মালিক হামিদকে এ বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থাবলম্বন করিতে লিখিলেন। মালিক হামিদ সিংহাসন আত্মসাতের সপ্তম দিবসে একদল লোক সংগ্রহ করিয়া বাদায়ুন তোরণ অধিকার করেন। অতঃপর মালিক হামিদ যুদ্ধে অগ্রসর হন। এই সময় আমরোহা হইতে আগত একদল সৈন্য তাঁহার সঙ্গে যোগদান করে। এই সৈন্যদল লইয়া মালিক হামিদ অতর্কিতে গজনী-তোরণের মধ্য দিয়া শহরে পুনঃ প্রবেশ করেন। কিন্তু ভিন্দ নামক দ্বিতীয় দরওয়াজায় পৌঁছিলে তিনি হাজী মাওলা ও তাহার সঙ্গীদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হন। তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। মালিক হামিদ অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া হাজী মাওলার নিকট ছুটিয়া যান (হাজী মাওলা অসীম সাহসিকতার সঙ্গে তাঁহার দলকে পরিচালিত করিতেছিলেন) এবং তাঁহাকে অশ্ব হইতে

টানিয়া নামাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দিয়া তাহাকে হত্যা করেন। নিজেও এই সময়ে সামান্য আঘাত পান। নেতার মৃত্যুতে হতোদ্যম হইয়া হাজী মাওলার দলের লোকেরা যে যেদিকে পারিল শহরের মধ্যে পালাইয়া গেল। মালিক হামিদ তখন রুবী মহলে যাইয়া শাহনারী আল্‌ভিকে তখ্‌ত হইতে নামাইয়া হত্যা করেন। তঁহার মস্তক বর্শাবিদ্ধ করিয়া সারা শহর প্রদর্শন করা হইল। এইরূপে এই বিদ্রোহের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিদ্রোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি-দিগকে শায়েস্তা করিবার জন্য সুলতান তাঁহার ভ্রাতা আলফ খানকে দিল্লী প্রেরণ করেন। মৃত ফখর-উদ-দীন কোতোয়ালের পুত্রগণকে তাঁহাদের পরিবারের সকলের সঙ্গে সন্দেহ বশে হত্যা করা হয়। হাজী মাওলা তাঁহাদের একজন অনুগত ব্যক্তি ছিল—ইহা ছাড়া তাহাদিগকে শাস্তিদানের আর কোন কারণ ছিল না।

ওদিকে রনথম্বর অবরোধের এক বৎসর অতিক্রান্ত হইল। সমস্ত কৌশল ব্যর্থ হইবার পর আলা-উদ-দীন অন্য ব্যবস্থাবলম্বন করেন: তিনি বহুলোক সংগ্রহ করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মাথায় এক বস্তা করিয়া বালুকা উঠাইয়া দিলেন। তাহারা দুর্গের কিছু দূর হইতে আরম্ভ করিয়া বস্তাদ্বারা দুর্গের প্রাচীরের উপর আরোহণ করিবার সিড়ি প্রস্তুত করে। এই প্রকারে শেষ পর্যন্ত দুর্গ অধিকৃত হয়।[১] রাজা হাম্বির দেব, তাঁহার পরিবারের সমস্ত লোক ও দুর্গ রক্ষাকারী সমস্ত সৈন্যকে তলোয়ারের মুখে বিসর্জন করা হয়। সমস্ত হিন্দুস্থানে এই দুর্গ সর্বাপেক্ষা সুদৃঢ় বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। মোগল সেনাপতি আমীর মুহাম্মদ শাহ—যিনি জালোরের সেনা বিদ্রোহকালে পালাইয়া রনথম্বরে আশ্রয় লইয়াছিলেন—তিনি দুর্গ রক্ষায় প্রাণপণে যুদ্ধ করেন এবং তাহার সমস্ত লোক হারাইয়া শেষ পর্যন্ত আহতাবস্থায় মাটিতে শুইয়া পড়েন। এই সময় আলা-উদ-দীন দুর্গে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে এই অবস্থায় দেখিয়া বিদ্রূপ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, "আমি যদি তোমার জখম এখনই সারাইয়া দিই, তবে তুমি কি প্রকারে আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিবে?" মোগল সর্দার

১ বালুকার বস্তাগুলি কিভাবে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তাহা বলা হয় নাই। সমতলভূমি হইতে আরম্ভ করিয়া দুর্গের প্রাচীর পর্যন্ত রাস্তা তৈরী করা হইল—অথচ দুর্গাভ্যন্তরস্থ সৈন্যরা কিছুই করিল না—তাহাদিগকে এতোটা নির্জীব মনে করিবার কোন কারণ তো নাই? উহারাই এক বৎসর যাবৎ সমস্ত আক্রমণ ব্যর্থ করিয়াছে।

ক্রুদ্ধস্বরে উত্তর দেন, "আমি জালেম আলা-উদ-দীনকে হত্যা করিব এবং হাম্বির দেবের পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া আমার প্রতি তাঁহাদের দয়ার ঋণ শোধ করিবার চেষ্টা করিব"। এই উত্তরে রুষ্ট হইয়া আলা-উদ-দীন তাঁহাকে হস্তী পদতলে নিক্ষেপ করাইলেন। পরে সুলতানের মনে হয় যে আমীর মুহাম্মদ শাহ একজন প্রকৃত বীর ছিলেন এবং সুলতান নিজে বহুবার তাঁহার বীরত্ব স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। তখন তাহার প্রতি কিছুটা অনুকম্পাবোধ করেন এবং তিনি সেই মোগল বীরের দেহ কফিনে উঠাইয়া সসম্মানে সমাহিত করিবার হুকুম দান করেন।

অবরোধকালে রাজা হাম্বির দেবের মন্ত্রী তাঁহার সমস্ত লোকজন লইয়া আসিয়া সুলতানের সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। পুরস্কারস্বরূপ সুলতান তাঁহাকে ও তাঁহার সমস্ত অনুচরকে হত্যা করিবার হুকুম দিলেন এবং বলিলেন, "যাহারা তাহাদের প্রকৃত রাজার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে তাহারা কখনই অন্যের প্রতি বিশ্বস্ত থাকিতে পারিবে না"। অতঃপর রনথম্বরের শাসন-ভার ভ্রাতা আলফ খানের উপর ন্যস্ত করিয়া সুলতান সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্যসহ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। আলফ খান ইহার প্রায় ছয় মাস পরে পীড়িতা-বস্থার দিল্লী গমনকালে পথে প্রাণত্যাগ করেন। বিগত ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সুলতানের মনে তাঁহার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্রের আশঙ্কা প্রবল হইয়া উঠে। এজন্য তিনি ওমরাহদিগকে আহ্বান করিয়া এসব দুর্ঘটনা কি প্রকারে রোধ করা যায় এবং এসব বিপ্লবের মূল কারণ কিসে সম্বন্ধে তিনি তাহাদিগকে অকপটে মত প্রকাশ করিতে বলেন। তাঁহারা উত্তরে বলিলেন, "অনেক উৎস হইতেই ভীষণ ও মারাত্মক বিপ্লবের উদ্ভব হইতে পারে"। অন্যান্য কারণের মধ্যে রাজকোর্যের প্রতি সুলতানের সম্পূর্ণ অমনোযোগ এবং তাহার ফলে প্রজাদের অভিযোগের প্রতিকারাভাবের প্রতি তাঁহারা অঙ্গুলী নির্দেশ করেন। দেশে অবাধ ও অতিরিক্ত সুরাপানের প্রচলনকে তাঁহারা গোলযোগের আর একটি হেতু মনে করেন। কারণ মদ্যপায়ীরা পানোন্মত্ত অবস্থায় নিঃসঙ্কোচে মনের গোপন অভিসন্ধিগুলি পরস্পরের নিকট প্রকাশ করিয়া ফেলে এবং প্রায়ই সুরামত্ত হইয়া দুঃসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়। দরবারের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপনকেও তাঁহারা সাম্রাজ্যের প্রতি বিপজ্জনক মনে করেন। আন্তঃ বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ অল্পসংখ্যক লোকের উপর রাজ্যের

অভিবাবকত্ব ন্যস্ত হওয়ার ফলে ইহারা এমন শক্তিশালী হইয়া পড়েন যে, পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া যে-কোন সময় বিদ্রোহ সংঘটন করা তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইতে পারে। সম্পদ বন্টনের অসাম্যতাকেও তাঁহারা অন্যতম গুরুতর হেতু মনে করেন। তাঁহাদের মতে, একটা সমৃদ্ধ সাম্রাজ্যের সম্পদ যদি মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে এবং এইসব ব্যক্তিই যদি প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন, তাহা হইলে সুলতানের কর্মচারীর মত না থাকিয়া স্বাধীন সুলতানের মত আচরণ করাই তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক।

আলা-উদ-দীন তাঁহার পরিষদবর্গের অধিকাংশ মন্তব্যই সমর্থন করিলেন এবং তাঁহারা যেসব সুপারিশ পেশ করিলেন সেসব তখনই কার্যকরী করিতে উদ্যোগী হইলেন। জনসাধারণের অভিযোগাদির প্রতিকারার্থে তিনি সর্বপ্রথম বিচার বিভাগের কার্যাবলীর কঠোর তদন্তে মনোনিবেশ করিলেন। সেই সঙ্গে সমস্ত সরকারী কর্মচারীর ব্যক্তিগত চরিত্র সম্বন্ধে প্রতক্ষ্যভাবে অনুসন্ধান করিবার ব্যবস্থাও করিলেন। শহরের সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকদের প্রতি গোপনীয় আলোচনাদির সংবাদ পর্যন্ত তিনি সংগ্রহ করিতে লাগিলেন এবং অতি দূরবর্তী প্রদেশগুলির প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলির বিবরণ তাহার কর্ণ-গোচর যাহাতে হয় সে ব্যবস্থাও তিনি করিলেন। তিনি এমন কঠোর বিচারের ব্যবস্থা করিলেন যে, চুরি ডাকাতি—যাহা এতোদিন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিদায় গ্রহণ করিল। পথিকরা এখন নিরাপদে পথপার্শ্বে নিদ্রা যাইতে পারে। তিনি ফরমান জারি করিলেন যে, মদ অথবা মাদকতা উৎপাদনকারী কোন পানীয় সেবন করিলে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইবে। সুলতানের ভূ-গর্ভস্থ ভাণ্ডারে যত মদ মজুদ ছিল তিনি সব বাহির করিয়া পথে ঢালিয়া ফেলিয়া নিজে সকলের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করিলেন। সকলেই সুলতানের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিল। ফলে কয়েকদিন যাবৎ শহরের পয়প্রণালী দিয়া মদের প্রবাহ চলিল। তিনি আরও ফরমান জারি করিলেন যে, সুলতানের অনুমতি ব্যতীত সম্ভ্রান্ত পরিবারে লোকদের মধ্যে কোন বিবাহ হইতে পারিবে না এবং ওমরাহরা কোন গোপন সভায় মিলিত হইয়া রাজ-নৈতিক আলোচনা করিতে পারিবে না। এইভাবে সমাজে আমোদ-প্রমোদের দ্বার কঠোরভাবে রুদ্ধ হইল। শেষোক্ত হুকুম এমন কঠোরতার সঙ্গে পালিত হইতে লাগিল যে কোন ব্যক্তি উজিরের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি ব্যতীত

কোন বন্ধুকে দাওয়াৎ করিতে সাহসী হইত না। শেষে সুলতান এতটা লোলুপ হইয়া উঠিলেন যে, তিনি লোকের ব্যক্তিগত সম্পদ কাড়িয়া লইতে শুরু করিলেন এবং হিন্দু মুসলমানের জমিদারী সমভাবে বাজেয়াপ্ত করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে সুলতান তাঁহার ধনাগারে প্রচুর অর্থ আমদানী করিলেন। মোট কথা, সারা সাম্রাজ্যে মানুষ প্রায় সমান অবস্থায় নামিয়া আসিল। সর্বপ্রকার রাজকর্মচারীদের বেতন হ্রাস করা হইল এবং এইসব পদে যাহারা নিযুক্ত থাকিলেন তাঁহারা এখন এমন গরীব হইয়া পড়িলেন যে তাঁহারা সুলতানের শাসনযন্ত্রের নিকৃষ্টতম গোলামে পরিণত হইলেন। তিনি ফরমান জারি করিলেন যে, সমস্ত সাম্রাজ্য হইতে যেন বাৎসরিক উৎপাদনের অর্ধাংশের মূল্য করস্বরূপ আদায় করিয়া নিয়মিত রাজকোষে প্রেরণ করা হয়। তিনি কর আদায়কারী কর্মচারীদের কার্যের তদারক করিবার জন্য কর্মচারী নিযুক্ত করেন। জমিদাররা নিজেরা যে কর ধার্য করিয়াছেন কৃষকদের নিকট হইতে তার অতিরিক্ত কিছু দাবী না করে তাহা লক্ষ্য করা ছিল এইসব কর্মচারীর কাজ। ইহারা অবাধ্য হইলে বা কার্যে অবহেলা প্রদর্শন করিলে তাহাদের নিকট হইতে বেতন ফেরৎ নেওয়া হইত এবং উপরন্তু জরিমানা আদায় করা হইত। কৃষকরা নির্ধারিত পরিমাণ জমির অতিরিক্ত জমি, নির্দিষ্ট সংখ্যার অধিক চাকর ও গবাদিপশু রাখিতে পারিত না। পশুপালকরা নির্দিষ্ট সংখ্যক গরু, মেষ ও ছাগলের অতিরিক্ত রাখিতে পারিত না এবং ঐ নির্দিষ্ট সংখ্যার জন্য কর দিতে হইত। যেসব কর্মচারী গ্রামে এইসবের তালিকা প্রস্তুত করিত তাহারা অনেকেই অধিক কড়াকড়ির জন্য কর্মত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। মুকুদ্দম বা গ্রামের মাতব্বররা পূর্বে অনেক জমি রাখিত এবং তাহাদের অধীনে অনেক লোকজন কাজ করিত। এখন নূতন ব্যবস্থার ফলে তাহারা চাকর-দিগকে বরখাস্ত করিতে বাধ্য হইল এবং দাসদাসীর কাজ এখন তাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যাদিগের উপর ন্যস্ত হইল। কাহারও চাকরীর ইস্তফাপত্র গ্রহণ করা হইত না—যতক্ষণ না তাহার মত কার্যক্ষম আর একজনকে পাওয়া না যাইত। সুলতান প্রায়ই বলিতেন, "রাজ্য শাসনের সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নাই। ধর্ম মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের ব্যাপার বা বিলাসিতা। নানা মুনির নানা মত অপেক্ষা একজন বিজ্ঞ নরপতির ইচ্ছা অনেকাংশে বেশী নির্ভুল।" সুলতান ছিলেন সম্পূর্ণ নিরক্ষর। সেই জন্য দরবারের বিদ্বান লোকেরাও স্থির

করিয়াছিলেন যে, সুলতানের জ্ঞানের বহির্ভূত কোন বিষয়ের অবতারণা তাঁহারা করিবেন না। শিক্ষার অভাবে তাঁহাকে পদে পদে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তাহাতে তাঁহার মনে লেখাপড়া শিখিবার বাসনা প্রবল হইয়া উঠে এবং চেষ্টা ও অধ্যবসায়ের ফলে অতি শীঘ্রই পারস্য ভাষায় পত্রাদি পাঠ করিবার মত ব্যুৎপত্তি অর্জন করিলেন এবং ঐ ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখকদের লেখার সঙ্গেও পরিচয় লাভ করিলেন। বিদ্বান লোকদের সঙ্গে আলোচনায় যোগদান করিবার মত বিদ্যা অর্জনের পর তিনি সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হইলেন এবং সাহিত্যিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মনোযোগী হইলেন। সে যুগের বিখ্যাত মনীষী বিশেষভাবে কাজী মাওলানা কোহ্রামী ও কাজী মখিজ-উদ-দীন তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করেন। কাজী মখিজ-উদ-দীনকে সুলতান আইন ব্যাখ্যা করিবার জন্য নিযুক্ত করেন। সুলতান যে বিষয়েই তাঁহার মত জিজ্ঞাসা করিতেন তিনি শরীয়তানুযায়ী তাহার উত্তর দিতেন। অবশ্য সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা সম্বন্ধে সুলতানের যে ধারণা ছিল, তাহার সঙ্গে যেখানে বিরোধ বাধিত সেখানে কাজী সাহেব নির্ভয়ে ও বিনা দ্বিধায় মত প্রকাশ করিতে পারিতেন না।

সুলতান একদিন কাজী মখিস-উদ-দীনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমি আপনাকে শরীয়ত সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে চাই।" কাজী সাহেব একটু বিস্মিত হইলেন—কারণ ইতিপূর্বে সুলতান কখনও আলেমদের সঙ্গে কোন বিষয়ে আলোচনা করা প্রয়োজনবোধ করেন নাই। বরং তিনি আলেমদিগকে প্রকাশ্যে মোনাফেক ও বদ্‌মায়েশ বলিতেন। কাজী বলিলেন, "হযরতের প্রস্তাব শুনিয়া মনে হইতেছে আমার অন্তিমকাল উপস্থিত। যদি তাহাই হয় এবং আমার মৃত্যুই যদি হযরতের কাম্য হয়, আমি মরিতে প্রস্তুত আছি। তবে হযরতকে আমি শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, আল্লাহুর কালাম মোতাবেক সত্যকথা বলার জন্য যদি আমাকে শাস্তিদান করা হয়, তাহা হইলে অনর্থক হযরতের পাপের বোঝা ভারী হইবে।" সুলতান জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি কেন ভয় পাইতেছেন?" উত্তরে কাজী বলিলেন, "আমি যদি সত্য কথা বলি এবং সে সত্য যদি আপনার নিকট অপ্রিয় হয় তবে আমার প্রাণ হারাইবার আশঙ্কা রহিয়াছে; অপরপক্ষে আমি যদি মিথ্যা কথা বলি এবং সুলতান অন্য ব্যক্তিদের নিকট হইতে প্রকৃত সত্য জ্ঞাত হন তখনও আমার

নিস্তার নাই।" সুলতান তাঁহাকে অভয়দান করিয়া রসূলুল্লার (সঃ) আইনের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করিয়া উত্তর দান করিতে বলিলেন। সুলতানের প্রথম প্রশ্ন: "কোন্ শ্রেণীর হিন্দুর নিকট আনুগত্য ও কর আদায় আইনসঙ্গত।"

উত্তর: সর্বশ্রেণীর কাফেরের নিকট হইতে আনুগত্য ও করগ্রহণ বিধিসম্মত এবং বিনা প্রতিবাদে যাহারা জিজিয়া ও অন্যান্য কর প্রদান করিয়া থাকে তাহাদিগকেই অনুগত বিবেচনা করা চলিবে। বলপূর্বক কর আদায় করাও অসঙ্গত হইবে না। কারণ রসূলুল্লার (দঃ) বিধানে কাফেরদের সম্বন্ধে বলা আছে, 'তাহাদের নিকট হইতে যত বেশী সম্ভব কর আদায় কর অথবা তাহাদিগকে একেবারে নিপাত কর'। ইসলামের পাণ্ডিতরা ইসলাম ধর্মের অনুসারীদিগকে আরও আদেশ করিয়াছেন, 'তাহাদিগকে হত্যা কর অথবা ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত কর।' রসূলুল্লা (সঃ) নিজেও এইরূপ নির্দেশ দান করিয়াছেন। ইমাম আবু হানিফা অবশ্য পরে প্রাণে না মারিয়া তাহাদের উপর জিজিয়া ও অন্যান্য করভার চাপাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। এই প্রকারে তিনি কাফেরদিগকে নির্বিচারে হত্যা করা বারণ করিয়াছেন। তবে সেই সঙ্গে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, তাহাদের নিকট হইতে শেষ কপর্দক পর্যন্ত জিজিয়া ও খিরাজ (কর) আদায় করিতে হইবে—যাহাতে তাহাদের কষ্ট মৃত্যু যন্ত্রণার চাইতে কম না হয়।"

সুলতান মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "আপনি বোধহয় লক্ষ্য করিয়াছেন যে, জ্ঞানগর্ভ কেতাবাদি অধ্যয়ন না করিয়াও আমি নিজের খুশীমত যাহা করিয়া থাকি, তাহা পয়গম্বরের আদেশের পরিপন্থী নয়।"

দ্বিতীয় প্রশ্ন: "যে সমস্ত সরকারী কর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করে এবং সরকারকে ফাঁকি দেয় তাহাদিগকে চোরের মত সাজা দেওয়া কি আইনসঙ্গত?"

উত্তর: "যদি সরকারী কর্মচারীকে তার দায়িত্ব ও পরিশ্রমানুযায়ী পর্যাপ্ত বেতন প্রদান করা হয় এবং তাহা সত্ত্বেও যদি সে উৎকোচ গ্রহণ করে অথবা তাঁহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকদের নিকট হইতে বলপূর্বক অর্থ আদায় করে, তবে সরকার তাহার নিকট হইতে সেই অর্থ যথাবিধি আদায় করিতে পারেন। কিন্তু সাধারণ অপরাধীর ন্যায় তাহার প্রাণ বধ করা বা অঙ্গচ্ছেদন করা বেআইনী।" সুলতান বলিলেন, "এই ব্যাপারেও আমি যাহা করিয়া থাকি তাহা সম্পূর্ণ শরীয়তসম্মত। সরকারী কর্মচারীরা যেসব অর্থ অসদুপায়ে অর্জন করিয়াছে বলিয়া

প্রমাণিত হইয়াছে, আমি সেইসব অর্থ আদায় করার—তথা প্রয়োজনবোধে পীড়ন ও যন্ত্রণাদান করিয়া আদায় করার নীতি গ্রহণ করিয়াছি।"

তৃতীয় প্রশ্ন: "সিংহাসনারোহণের পূর্বে দেবগিরি অভিযানে আমি যে ধনরত্ন লাভ করিয়াছি তাহা আমি ব্যক্তিগত সম্পদ হিসাবে রাখিতে পারি কি না—অথবা উহা আমার রাজকোষে জমা দেওয়া উচিৎ কিনা? আর সেই লুণ্ঠিত দ্রব্যের উপর সেনবাহিনীর কোন দাবী আছে কি না?"

উত্তর: "সেই অভিযানে যে সমস্ত সৈন্য আপনার সঙ্গে গমন করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকে যাহা পাইবে আপনিও তাহাই পাইবেন"। এই উত্তরে অসন্তুষ্ট হইয়া সুলতান বলিলেন, "উহা কি প্রকারে সরকারী সম্পদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এবং সৈন্যদেরই বা উহাতে অধিকার থাকিবে কেন? যে সময় আমি ঐ দৌলৎ লাভ করিয়াছিলাম তখন আমি ছিলাম একজন সিপাহসালার এবং ব্যক্তিগত উদ্যম দ্বারা উহা অর্জিত হইয়াছে"। কাজী উত্তরে বলিলেন, "একক চেষ্টা দ্বারা আপনি যাহা কিছু অর্জন করিয়াছেন তাহা আপনারই। কিন্তু যাহা সৈনিকদের শ্রমদ্বারা অর্জিত হইয়াছে তাহা আপনাকে সৈনিকদের সঙ্গে তুল্যাংশে বন্টন করিয়া লইতে হইবে।"

চতুর্থ প্রশ্ন: "উল্লিখিত সম্পদের কতটা আমার এবং কতটা আমার সন্তানের প্রাপ্য?"

কাজী মনে মনে বলিলেন, "আমার মৃত্যু এবার অবধারিত। কারণ পূর্বের উত্তরেই সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। এবার আমাকে যাহা বলিতে হইবে, তাহা আরও অধিক অপ্রীতিকর হইবে।"

সুলতান বলিলেন, "আপনি নির্ভয়ে বলুন। আমি আপনাকে অভয় দান করিতেছি।"

কাজী বলিলেন, "হে সুলতান! এ ব্যাপারে তিনটি নীতির যে-কোন একটি আপনি অবলম্বন করিতে পারেন:

১। আপনি যদি কঠোরভাবে ন্যায়নীতি ও খলিফাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতে চান তবে যাহারা ঐ বিপদে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের প্রত্যেকের তুল্য অংশ গ্রহণ করিয়াই আপনাকে সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।

২। আপনি যদি মধ্যপথ অবলম্বন করিতে চান তবে ঐ অভিযানের যে সেনাপতির ভাগ্যে সর্বাধিক লুণ্ঠিত দ্রব্য পতিত হইয়াছে আপনি তাহারই সমপরিমাণ অংশ নিজের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন।

৩। 'পক্ষান্তরে আপনি যদি সেইসব আলেমদের মত গ্রহণ করেন, যাহারা স্বেচ্ছাচার সুলতানদের কার্য অনুমোদনের জন্য কোরান শরীফের আয়াত অনুসন্ধান করেন, তবে যে-কোন সেনাপতি অপেক্ষা অল্প কিছু অধিক নিজের জন্য গ্রহণ করিতে পারেন—শুধু রাজমুকুটের মর্যাদা ও গৌরব রক্ষার জন্য। সুলতানরা ইহার অধিক গ্রহণ করিবার কোন অজুহাত বাহির করিতে পারিবেন বলিয়া আমি মনে করি না। আপনার সন্তান—শাহজাদাদিগকেও তদনুযায়ী একজন সাধারণ সৈনিকের অথবা একজন পদস্থ সেনাপতির সমপরিমাণ হিস্সা প্রদান করা যাইতে পারে'।"

সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তাহা হইলে আপনি বলিতে চান যে, আমার সংসারের খরচ বাবদ এবং পুরস্কারাদি বাবদ যে অর্থ ব্যয়িত হয় সেসব বেআইনীভাবে ব্যয়িত হয়?" কাজী উত্তর দিলেন, "হযরত। আপনি যখন আমার সঙ্গে শরীয়ত সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন তখন আমাকে বাধ্য হইয়া কোরান শরীফের লিখিত নির্দেশানুযায়ী মত প্রকাশ করিতে হইবে। কিন্তু আপনি যদি রাজনীতি ও শাসনকার্যের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য করিয়া মত দান করিতে বলেন, তবে আমি এইটুকু বলিতে পারি যে আপনি যাহা করেন তাহাই ঠিক, রাজধর্মের রীতি অনুযায়ী আপনি যত অধিক ধনোপার্জন ও অর্থ-ব্যয় করিবেন আপনার ও আপনার হুকুমতের গৌরব ও শান-শওকত ততই বৃদ্ধি পাইবে"। ইহা শুনিয়া সুলতান বলিলেন: "যেসব সৈন্য কার্যে যোগ-দান করিতে অবহেলা প্রদর্শন করে, গত তিন বৎসর যাবৎ আমি তাহাদের এক মাসের বেতন কাটিয়া আসিতেছি, আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ করে আমি স্বতঃসিদ্ধভাবে তার পরিবারের সমস্ত লোককে হত্যা করিয়া থাকি এবং তাহার যেখানে যত সম্পত্তি আছে সব বাজেয়াপ্ত করি। আপনি কি বলিতে চান লম্পট, তস্কর ও মাতালদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করা বেআইনী"? সুলতানের কথা ও কণ্ঠস্বরে ভীত হইয়া কাজী সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং কক্ষের দরজা পর্যন্ত যাইয়া ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া অভিবাদন জ্ঞাপন করিলেন। তারপর উঠিয়া বলিলেন: "হে শাহানশাহ্। আপনি যাহা কিছু করেন, সব শরীয়ত

বিরোধী।" এই বলিয়া তিনি সরিয়া পড়িলেন। সুলতান মহাক্রোধে খাস কামরায় চলিয়া গেলেন। ওদিকে কাজী সাহেব গৃহে ফিরিয়া প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং আত্মসমর্পণের সঙ্কল্প লইয়া ঘাতকের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

পরদিন সুলতান কাজীকে তলব করিলেন এবং অভাবিতভাবে তাঁহাকে সদয়তার সাথে গ্রহণ করিলেন। সুলতান, কাজীকে জরির ঝালরযুক্ত একটি সুন্দর ফতুয়া এবং এক হাজার টাকার একটি তোড়া প্রদান করিয়া বলিলেন: "আপনার মত কেতাব পড়িবার সুযোগ যদিও আমার হয় নাই তবুও আমি যে মুসলমানের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছি, সে কথা আমি কখনও বিস্মৃত হই নাই; আপনার কথার সত্যতা স্বীকার করিতে আমি প্রস্তুত। কিন্তু তবুও বলিতে হয়, 'যেসব মতবাদকে আপনি শরীয়ত বলেন, উহা কার্যকরী করিলে শাসনকার্য ব্যাহত হইবেই—বিশেষভাবে হিন্দুস্থান রাষ্ট্রের। অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তি প্রদান না করিলে কখনও অপরাধের মূলোৎপাটন করা যাইবে না। তাই আমি আমার সুচিন্তিত বিচারবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হইয়া এইসব ক্ষেত্রে কঠোর ব্যবস্থা প্রয়োগ করি—আর আল্লার উপর ভরসা রাখি যে, যদি ভুল করিয়া থাকি তবে এই অনুতপ্ত পাপীর জন্য তাঁর রহমতের দরওয়াজা নিশ্চয়ই উন্মুক্ত থাকিবে'।"

আলা-উদ-দীন বাংলার পথে তেলিঙ্গানায় ওয়ারাঙ্গল দুর্গ জয় করিবার জন্য এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং তিনি নিজে চিতোরাভিমুখে যাত্রা করেন। ইতিপূর্বে আর কোন মুসলমান বাহিনী চিতোর আক্রমণ করে নাই। ছয় মাসকাল অবরোধের পর ৭০৩ হিজরীতে (১৩০৩ খ্রী:) তিনি চিতোর অধিকার করিতে সমর্থন হন এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহজাদা খিজির খানের উপর ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। শাহজাদার নামানুসারে ইহার নূতন নাম হয় খিজিরাবাদ। এই সময় সুলতান খিজির খানকে শাহী মর্যাদা প্রদান করেন এবং সর্বসাধারণের নিকট তাঁহাকে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। আলা-উদ-দীন দূরাঞ্চলে যুদ্ধে ব্যাপৃত—এই সংবাদ মা-উরা-উন্নাহারে পৌঁছিলে মোগল দলপতি তুঘাই খান ভাবিলেন যে, এই অভিযানে সুলতানকে বহুদিন রাজধানীর বাহিরে থাকিতে হইবে। সুতরাং তিনি ইহাকে ভারতাক্রমণের সুবর্ণ সুযোগ বলিয়া মনে করিলেন। এই তুঘাই খানই ইতিপূর্বে জাফর খানের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছিল। এই বিপজ্জনক হামলার

কথা শুনিয়া আলা-উদ-দীন তখনকার মত দাক্ষিণাত্য অভিযানের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া সেনাবাহিনী দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা করাইলেন। এদিকে এক লক্ষ বিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত বার "তোমান" মোগল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তখনই খান দিল্লী পৌঁছিয়া যমুনার তীরে শিবির স্থাপন করেন। আলা-উদ-দীনের অধিকাংশ অশ্বারোহী সৈন্য তখন ওয়ারঙ্গল যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। সুতরাং সমান শক্তি লইয়া শত্রুর মোকাবিলা করিবার মত অবস্থা সুলতানের তখন ছিল না। এ-জন্য তিনি স্থির করিলেন যে, শহরতলীর বাহিরে সমতলক্ষেত্রে খন্দক খুঁজিয়া পদাতিক সেনাদলকে সেখানে অপেক্ষমান রাখিবেন—যতদিন না দূরাঞ্চলের সেনাবাহিনী ফিরিয়া আসে। ইতিমধ্যে মোগলরা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি দখল করিয়া ভারতীয় বাহিনীর সাহায্য আসিবার পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিল। সুলতানের উপস্থিতিতেই তাহারা দিল্লীর শহরতলী লুণ্ঠন করিল। সুলতানের বাধাদানের সাহস হইল না। দুই মাসকাল এই অবস্থা বিরাজ করিল। কোন কোন লেখক বলেন যে, আলা-উদ-দীন এই সময় অলৌকিক শক্তির সাহায্য প্রার্থনায় নিজাম-উদ-দীন আউলিয়া নামক এক দরবেশের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। এক রাত্রে বিনা কারণে মোগল শিবিরে আতঙ্ক সৃষ্টি হয় এবং তাহারা উর্ধ্বশ্বাসে স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করে। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও দিল্লীর অধিবাসীরা মনে করিয়াছিলেন যে, দরবেশের অলৌকিক শক্তির মাহাত্মেই এই অস্বাভাবিক কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল। এই সঙ্কটকালে সুলতান স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, তাঁহার বিশ্বজয়ের কল্পনা অবাস্তব।

এই আক্রমণের বিভীষিকা হইতে মুক্তিলাভের পর যে স্থানে তিনি সেনাদলকে খন্দকাশ্রিত করিয়া রাখিয়াছিলেন—সেই খানেই এক রাজ-প্রাসাদ নির্মাণের হুকুম দিলেন এবং দিল্লীর পুরাতন কেল্লা ভাঙ্গিয়া উহা পুনর্নির্মাণের আদেশ দিলেন। অনুরূপ আর একটা মোগলাক্রমণের আশঙ্কায় তিনি সৈন্য সংখ্যা এতো বৃদ্ধি করিলেন যে, ইহার বিপুল ব্যয় হিসাব করিয়া তিনি দেখিলেন তাঁহার রাজস্ব, গচ্ছিত ব্যক্তিগত ধনরত্ন সবকিছু ব্যয় করিয়াও ছয় বৎসরের অধিককাল এই বাহিনী পোষণ করা সম্ভবপর হইবে না। এই উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি সৈন্যদের বেতন হ্রাস করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। অবশ্য তিনি ইহা উপলব্ধি করিতে পারিলেন যে অশ্ব, অস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্যের মূল্য সেই অনুপাতে হ্রাস না হইলে বেতন হ্রাস করা যায় না। এতদুদ্দেশ্যে তিনি সমস্ত

দ্রব্যের মূল্য বাঁধিয়া দিয়া এক ফরমান জারি করিলেন এবং সমস্ত সাম্রাজ্যে যাহাতে উহা কঠোরভাবে পালিত হয় তাহার ব্যবস্থা করিলেন। শস্যের মূল্য-হ্রাস কার্যকরী করিবার জন্য তিনি মালিক কাবুলের নির্দেশে গঙ্গা ও যমুনার তীরে এবং জলপরিবহণের সুবিধা আছে এরূপ অন্যান্য স্থানে বহু বৃহদাকার শস্যভাণ্ডার নির্মাণ করাইলেন। সুলতান মালিক কাবুলকে ভূমি রাজস্বের অর্ধাংশ শস্যহিসাবে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা প্রদান করেন। বাজারে কোন দ্রব্যের মূল্য সরকার-নির্ধারিত মূল্যের অধিক হইলে রাজকর্মচারীরা বাজারে সেই দ্রব্য সরবরাহ করিত।

দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রথম দিল্লীতে প্রবর্তন করা হয় এবং সেখানে দ্রব্যের যে মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইতে আমরা দেশের অন্যান্য শহরের দ্রব্যমূল্য অনুমান করিতে পারি।

এক দোম্‌নি গমের মূল্য ৭½ জিতুল[২]
এক দোম্‌নি বার্লির মূল্য ৪ জিতুল
এক দোম্‌নি চেনির মূল্য ৫ জিতুল
এক দোম্‌নি ধানের মূল্য ৫ জিতুল
এক দোম্‌নি ওরুদের মূল্য ৩ জিতুল
এক দোম্‌নি মাটের মূল্য ৩ জিতুল

সুলতানের রাজত্বকাল ব্যাপী এই দ্রব্যমূল্য নির্দিষ্ট ছিল। কিন্তু দেশে অনাবৃষ্টিজনিত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হওয়ায় এই আইনের প্রয়োগে কিছু রদ-বদলের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছিল। ইহা ধারণা করা কঠিন যে, লক্ষ্য ঠিক রাখিয়া এমন অসাধারণ একটা পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইয়াছিল। এরূপ পরিকল্পনা ইতিপূর্বে কেহ কখনও কার্যকরী করে নাই এবং পরেও কেহ প্রয়োগ করিবার চেষ্টা করে নাই। এই সুলতানের সারা রাজত্বকাল ব্যাপী এই ব্যবস্থা যে চালু ছিল তাহাতে কোন সন্দেহের অবকাশ নাই। শস্য আমদানী করিতে উৎসাহ প্রদান করা হইত; কিন্তু খাদ্যশস্য বা অন্য যে কোন প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিদেশে রপ্তানি করাকে গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণ্য করা হইত। শস্য ভাণ্ডারগুলি হইতে দৈনিক কত শস্য বিক্রয় হইত এবং কত জমা থাকিত—তাহার হিসাব নিকাশ প্রতিদিন সুলতানের সম্মুখে দাখিল

২ এক দোম্‌নি ২ পাউণ্ডের সমান এবং জিতুল একটা তামার পয়সা।

করিতে হইত। আইনের অপব্যবহার হয় কিনা, তাহা লক্ষ্য করিবার জন্য বিভিন্ন বাজারে পর্যবেক্ষক নিযুক্ত ছিল এবং এরূপ অপরাধের জন্য কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা ছিল।

আলা-উদ-দীন একটা পৃথক সরকারী দফতর ও অনেক পরিদর্শক নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাদের কাজ ছিল—গুণানুসারে বিভিন্ন প্রকার কাপড়ের মূল্য বাঁধিয়া দেওয়া, সওদাগরদিগকে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে দোকান খুলিতে এবং নির্ধারিত মূল্যে জিনিস বিক্রয় করিতে বাধ্য করা।

দ্বিতীয় ফরমানে বস্ত্রের মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হয়।

বস্ত্র	প্রতি খণ্ড	তঙ্কা	জিতল
দেহলী[৩] চিয়ার	,,	১৬	০
কোটলা ,,	,,	৬	০
সাধারণ ,,	,,	৩	০
সাধারণ কুলাইয়া	,,	০	৮
নল নাগোরী	,,	০	২৪
মসৃণ সাফ শাড়ী	,,	৫	০
মধ্যম ,, ,,	,,	৩	০
মোটা ,, ,,	,,	২	০
মসৃণ ছিলাহাটি	,,	৪	০
মধ্যম ,,	,,	৩	০
মোটা ,,	,,	২	০
মসৃণ কার্পাস	২০ গজ[৪]	১	০
মধ্যম ,,	২০ ,,	১	০
মোটা ,,	২০ ,,	১	৪

একদিকে যেমন দ্রব্যের মূল্য বাধিয়া দেওয়া হইল, অন্যদিকে সেই সঙ্গে বায়তুলমাল হইতে বণিকদিগকে ঋণদানের ব্যবস্থা করা হইল—যাহাতে তাহারা

৩ এইসব অধিকাংশ বস্ত্রের নাম এখন অবলুপ্ত।
৪ ২১ হইতে ৩২ ইঞ্চি পর্যন্ত গজের মাপ ছিল।

পার্শ্ববর্তী দেশগুলি হইতে বস্ত্র আমদানী করিতে পারে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলিতে জনসাধারণের অবস্থা খারাপ ছিল—এজন্য তাদের প্রস্তুত দ্রব্যাদি সস্তা ছিল। উৎকৃষ্ট বস্ত্র দেশের লোককে যথেচ্ছ পরিধান করিতে দেওয়া হইত না—অথচ সেসব বস্ত্র কেন যে বিদেশে রপ্তানি করিতে দেওয়া হইত না তাহার কারণ বুঝা যায় না। উৎকৃষ্ট বস্ত্র পরিধান ছিল সুলতানের অনুমতি সাপেক্ষ এবং কেবল পদস্থ ব্যক্তিদিগকেই এই অনুমতি প্রদান করা হইত।

ব্যবসায়ীরা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ঘোড়ার মূল্য অনেক বৃদ্ধি করিয়া ফেলিয়াছিল। তাহারা পারস্য ও উত্তর দেশীয় বণিকদের নিকট অশ্ব ক্রয় করিয়া চড়া মূল্যে বিক্রয় করিত। এই অবস্থার মোকাবিলার জন্য সুলতান ফরমান জারি করিলেন যে, বণিকগণ কত দামে অশ্ব ক্রয় করে তাহা সরকারী দপ্তরে লিখিয়া জানাইতে হইবে এবং তাহাদিগকে সরকার নির্ধারিত মুনাফায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ক্রয়েচ্ছু লোকদের নিকট ঐ অশ্ব বিক্রয় করিতেই হইবে। নতুবা সরকার নিজে ঐ অশ্ব ক্রয় করিবেন। সুলতান তৃতীয় দফায় ঘোড়ার মূল্য বাঁধিয়া দিলেন।

প্রথম শ্রেণীর	অশ্ব	১০০	হইতে	১২০	তঙ্কা[৫]
দ্বিতীয় ,,	,,	৮০	,,	৯০	তঙ্কা
তৃতীয় ,,	,,	৬৫	,,	৭০	,,
টাট্টু ঘোড়া		১২	,,	২০	,,

এইসব অশ্ব-আমদানীকারী বণিকরা যাহাতে ঐসব জন্তু অন্য ব্যবসায়ীদের নিকট পাইকারী দরে বিক্রয় করিতে না পারে সে বিষয়ে বিশেষ সতকর্তা অবলম্বন করা হইয়াছিল। অশ্ব যাহারা নিজের কাজে ব্যবহার করিবে—শুধু তাহাদেরই নিকট বিক্রয় করা চলিত। এই নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সত্ত্বেও অনেকেই আইনের চক্ষে ধুলি দিতো। এইজন্য সরকার কয়েকজন অশ্ব-ব্যবসায়ীকে বেত্রাঘাত করিয়া শহর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন এবং কয়েকজনকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিয়াছিলেন।

চতুর্থ দফায় বাঁদী ও গোলামদের বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হয়।

প্রথম শ্রেণীর	মূল্য	১০০	হইতে	২০০	তঙ্কা
দ্বিতীয় ,,	,,	২০	,,	৪০	,,
তৃতীয় ,,	,,	৫	,,	১০	,,

৫ ১২০ তঙ্কা ১৬০ টাকার সমান।

পঞ্চম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল গবাদি পশু, ষাঁড়, মেষ, ছাগল, উট এবং গাধা প্রভৃতির বিক্রয় সম্পর্কে। মোট কথা, সমস্ত প্রয়োজনীয় জন্তু ও ব্যবহার্য দ্রব্য সরকারী নির্ধারিত মুল্যে বাজারে বিক্রয় হইত।

মুদিখানায় যেসব জিনিস বিক্রয় হয় তাহাদের মূল্যও বাঁধিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

মিছরি	একসের	২ জিতুল
ঝোলা গুড়	একসের	১ ,,
লাল ও মোটা গুড়	,,	১/৪ ,,
চেরাগী তৈল	তিনসের	১ ,,
ঘি	একসের	১/২ ,,
লবণ	পাঁচসের	১ ,,
পেঁয়াজ ও রশুন	একসের	১ ,,

তিনটি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ হইতে সুলতান এইসব ব্যাপারে প্রতিদিন-খবর পাইতেন। নির্দিষ্ট মুল্যের বাহিরে বেচা-কেনা হয় কিনা, তাহা গোপনে লক্ষ্য করিবার জন্য তিনি অনেক রাস্তার বালককে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ইহারা ঘুরিয়া ঘুরিয়া দ্রব্যাদি খরিদ করিত।

শেখ আইন-উদ-দীন বিজাপুরীর মুলহিকাতে বর্ণিত আছে: "সুলতানের এক বন্ধু একদা রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, সমস্ত দ্রব্যের সঙ্গে গণিকাদেরও দর বাঁধিয়া দেওয়া উচিৎ'। সুলতান হাসিয়া বলিয়াছিলেন "তাই হবে।" অতঃপর বেশ্যাদিগকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয়—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছিল।

সে সময়ের টাকার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করিতে হইলে ইহা জানিয়া রাখিতে হইবে যে তঙ্কার ওজন ছিল এক তোলা—তা সে স্বর্ণ মুদ্রাই হউক বা রৌপ্য-মুদ্রাই হউক। একটা রৌপ্য তঙ্কার মূল্য ছিল ৫০ জিতুলের সমান। জিতুল ছিল ক্ষুদ্র তাম্র মুদ্রা। জিতুলের ওজন কত ছিল তাহা জানা যায় নাই। কেহ কেহ মনে করেন ইহার ওজন ছিল এক তোলা। আবার কেহ কেহ এমনও মনে করেন যে, বর্তমান পয়সার মত জিতুলের ওজন ছিল ১/৪ তোলা। জালাল-উদ-দীনের সময় মণের ওজন ছিল ৪০ সের এবং প্রত্যেক সেরের ওজন ছিল ২৪ তোলা।

যখন আমি সাধারণভাবে তোলার কথা বলি তখন রৌপ্য-তোলার কথাই বুঝিতে হইবে এবং এই কিতাবের পরবর্তী সকল পরিমাপ ক্ষেত্রে ইহাই প্রয়োগ করিতে হইবে।[৫]

দ্রব্যাদির মূল্য এই প্রকারে নিয়ন্ত্রিত করিবার পর সুলতান সেনাবাহিনী পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করিলেন। প্রত্যেক অশ্বারোহী সৈনিককে তাহার নিজের জন্য ও অশ্বের জন্য বেতন নির্ধারিত করিয়া দিলেন। শ্রেণীগতভাবে প্রথম শ্রেণীর অশ্বের জন্য বাৎসরিক ২৩৪ তঙ্কা, দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য ১৫৬ তঙ্কা এবং তৃতীয় শ্রেণীর জন্য ৮৮ তঙ্কা বরাদ্দ করিয়া দিলেন। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার যুদ্ধাশ্বের সংখ্যা ছিল ৪,৭৫,০০০।

এই সময় ৭০৪ হিজরীতে (১৩০৪ খ্রীঃ) চেঙ্গিশ খানের অন্যতম বংশধর আলী বেগ ও খাজা তাস ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। তাঁহারা লাহোরের উত্তর অংশে আসিয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে সেবালিক পর্বতমালার পাশ দিয়া অগ্রসর হইয়া নির্বিঘ্নে আমরোহায় প্রবেশ করিলেন। সুলতান তাঁহাদের বিরুদ্ধে তোগলোগ খানকে --একদল উৎকৃষ্ট সৈন্য-সহ প্রেরণ করিলেন। মোগলদের পরাজয় ঘটিল এবং তাহাদের পক্ষে ৭,০০০ সৈন্য হতাহত হইল এবং ৯,০০০ সৈন্যসহ আলী বেগ ও খাজা তাস বন্দী হইলেন। তাহাদের সকলকে শৃঙ্খলাবদ্ধাবস্থায় সুলতানের নিকট প্রেরণ করা হইল। সুলতান সর্দারদিগকে হস্তী পদতলে নিষ্পিষ্ট করিবার এবং সৈনিকদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দিলেন। যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সুলতান তোগলোগ খানকে পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করিলেন।

এই সময় আলফ খানকে[৬] গুজরাটের সুবাদার ও গুজরাটী সেনা-

---

৫ বর্তকান কালের টাকা ওজনে এক তোলা বা প্রায় আট পেনি ওয়েট রৌপ্যের সমান এবং মূল্যে ৬৮-৭২ অথবা ৭৬ তাম্র পয়সার সমান। অবশ্য উহার আয়তন অনুযায়ী। কারণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উহা বিভিন্ন আকারের হইয়া থাকে। অতএব আমরা যদি তঙ্কার পরিবর্তে টাকা লিখি এবং জিতুলের পরিবর্তে পয়সা লিখি তাহা হইলে গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী সত্যের কাছাকাছিই থাকিব। এবং পাঠকও উল্লিখিত মুদ্রাগুলির মূল্য সম্বন্ধে একটি ধারণা করিয়া লইতে পারিবেন।

৬ সাম্প্রতিক কিতাব মিরাট আহমদীর লেখকের মতে আলুফ খান নির্মিত মস্‌জিদ এখনও নিহারওয়ালায় বিদ্যমান আছে।

বাহিনীর সিপাহসালার মনোনীত করা হইল। এক বিরাট বাহিনীসহ তাঁহাকে গুজরাট প্রেরণ করা হইল। আইন-উল-মুল্‌ক মুলতানী নামক অন্য একজন আমীরকে মালব বিজয়ে প্রেরণ করা হইল। মালব রাজ কোকা ৪০,০০০ রাজপুত অশ্বারোহী ও একলক্ষ পদাতিক সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী লইয়া বাঁধাদানে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু যুদ্ধে আইন-উল-মুল্‌কের জয় হইল এবং উজ্জয়িনী মান্দু ধরানগরী ও চান্দেরী দুর্গ তাঁহার হস্তগত হইল। এই সাফল্যের বিস্তারিত বিবরণ সুলতানের নিকট প্রেরিত হইয়াছিল এবং সুলতানের হুকুমে সাতদিন ব্যাপী দিল্লী শহরে উৎসব ও আলোকসজ্জা চলিয়াছিল। আইন-উল-মুল্‌কের সাফল্যে ভীত হইয়া জালোরের রাজা নিহার দেব বিনাযুদ্ধে দেশ ছাড়িয়া দিলেন। এই সময় চিতোরের রাজা রায় রতন সিংহ বিস্ময়করভাবে দিল্লী হইতে পলায়ন করেন। সুলতান কর্তৃক চিতোর অধিকারের সময় হইতেই রতন সিংহ দিল্লীতে বন্দী জীবনযাপন করিতেছিলেন। তাঁহার পলায়নের বৃত্তান্ত এইরূপ: রাজার অসামান্য রূপ-লাবন্যময়ী ও বিদূষী এক কন্যা ছিলেন। তাঁহার রূপের খ্যাতি শুনিয়া আলা-উদ-দীন রাজাকে বলেন যে, তাঁহার কন্যাকে সমর্পণ করিলে তাঁহাকে মুক্তিদান করা হইবে। বন্দী দশায় অশেষ লাঞ্ছনা ভোগে অতিষ্ঠ হইয়া রাজা সম্মত হইলেন এবং সুলতানের কামানলে সতীত্ব বিসর্জনের জন্য কন্যাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। পরিবারের লোকেরা এই জঘন্য প্রস্তাবের কথা শুনিয়া স্তম্ভিত হইল এবং চিতোরের রাজবংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য কন্যাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু রাজকন্যা এমন এক কৌশল উদ্ভাবন করিলেন যাহাতে পিতার মুক্তি ও তাঁহার সম্মান উভয়ই রক্ষা হয়। তিনি পিতাকে লিখিলেন যে, অমুক দিন তিনি সানুচর দিল্লী আগমন করিতেছেন—এবং তিনি যেন সুলতানকে ইহা জ্ঞাত করান। রাজকুমারী কি করিতে চান তাহাও রাজাকে জানানো হইল। পরিবারের অতি অনুগত কতকগুলি লোককে বর্মাবৃত করিয়া গোপনে পাল্‌কীতে আরোহণ করানো হইল এবং তৎকালীন প্রথানুযায়ী একজন রাজকুমারীর সঙ্গে যত সংখ্যক অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গমন করিতে পারে তাহা লইয়া চিতোর কুমারী দিল্লীর পথে রওয়ানা হইলেন। পিতার মধ্যস্থতায় তিনি সুলতানের ছাড়পত্র প্রাপ্ত হইলেন এবং মিছিল ধীরে ধীরে দিল্লী অভিমুখে

অগ্রসর হইতে লাগিল। বিনা বাধায় তাহারা দিল্লী নগরীতে প্রবেশ করিল। তখন রাত্রিকাল। সুলতানের বিশেষ অনুমতিক্রমে পাল্কীগুলিকে কারাগারে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইল। রক্ষীদল বাহিরে অবস্থান করিল। পালকীগুলী প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবা মাত্র সশস্ত্র লোকগুলি পাল্কী হইতে লম্ফ দিয়া নামিয়া কাররক্ষীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল এবং তাহাদিগকে কাটিয়া ফেলিল। অতঃপর রাজাকে খালাস করিয়া একটি অশ্বে আরোহণ করানো হইল। তাঁহার পলায়নের জন্য অশ্ব পূর্ব হইতেই নির্দিষ্ট রাখা ছিল। রাজা অশ্বে আরোহণ করিয়া স্বীয় অনুচরদের সঙ্গে দ্রুত অশ্ব ছুটাইয়া শহর হইতে নির্গত হইলেন এবং একেবারে নিজের দেশে আসিয়া পর্বতমালার মধ্যে আশ্রয় লইলেন। কেহই বাধাদানের অবকাশ পর্যন্ত পাইল না। বুদ্ধিমতি কন্যার প্রচেষ্টায় রাজা এইরূপে মুক্তি লাভ করিয়া তাঁহার পরিবারের লোক-দিগকে দুর্গম পার্বত্য আশ্রয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। অতঃপর তিনি নবোদ্যমে মুসলমানাধিকৃত এলাকায় লুটপাট শুরু করিয়া দিলেন। শেষ পর্যন্ত সুলতান বুঝিতে পারিলেন যে, চিতোর অধিকারে রাখিতে গেলে তাঁহাকে শুধু ক্ষতি-গ্রস্থই হইতে হইবে— কোন লাভ হইবে না। সুতরাং তিনি খিজির খানকে নির্দেশ দিলেন–রানার ভ্রাতুষ্পুত্রের হস্তে চিতোরের অধিকার অর্পণ করিয়া তিনি যেন দিল্লী ফিরিয়া আসেন। সুলতান নিয়োজিত এই নূতন রানা অতি শীঘ্রই চিতোরকে পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং আলা-উদ-দীনের রাজত্বের শেষ দিন অবধি সুলতানের করদরাজা হিসাবেই তিনি সুলতানকে প্রচুর মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিতেন এবং উপরন্তু প্রতি বৎসর প্রচুর অর্থও প্রেরণ করিতেন। প্রয়োজনকালে ৫,০০০ অশ্বারোহী ও ১০,০০০ পদাতিক সৈন্য লইয়া সুলতানের পতাকা তলে সমবেত হইতেন।

৫৭০ হিজরীতে মা উরা-উন্নাহারের সুলতান আমীর দাউদ খানের অন্যতম সেনাপতি আইবক খান-আলিবেগ ও খাজা তাসের মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিলেন। তিনি মুলতান লুন্ঠন করিয়া সেবালিক গমন করেন। গাজী বেগ তোগলোক এই সময় সিন্ধুনদের তীরে একস্থানে মোগলদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে সৈন্য সমাবেশ করিয়া তাহাদের অপেক্ষা করিতে থাকেন। প্রত্যাবর্তনকালে তিনি অতর্কিতভাবে মোগলদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বহু হতাহতের সঙ্গে তাহাদিগকে পরাস্থ ও বিপর্যস্থ করেন। তলোয়ারের

কবল হইতে যাহারা কোনক্রমে রক্ষা পাইল কিন্তু দেশের দিকে অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বিবেচনায় তাহারা মরুভূমির মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বাতাস ও জলকষ্টে সকলেরই অভিশপ্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছিল। ৫৭,০০০ অশ্বারোহী ও ততোধিক পদাতিক সৈন্যের মধ্যে মাত্র তিন হাজার সৈন্য পরাজয়ের পরে বাঁচিয়াছিল এবং তাহারাও বন্দী হইয়াছিল। সর্দার আইবক খানের সঙ্গে তাহাদের সকলকে দিল্লী প্রেরণ করা হইল এবং সেখানে তাহারা হস্তী পদতলে নিষ্পিষ্ট হইল। উহাদের মস্তক দ্বারা বাদায়ুন তোরণের সম্মুখে একটি স্তম্ভ নির্মাণ করা হইল। আমি শুনিয়াছি, উহার অংশ বিশেষ নাকি এখনও সেখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যেসব মোগল শিশু ও স্ত্রীলোক এই যুদ্ধে ধৃত হইয়াছিল—তাহাদিগকে রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে হাটবাজারে বিক্রয়ের জন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। পুনঃ পুনঃ এইরূপ ভাগ্যবিপর্যয়ের পরেও মোগলদের কণা মাত্র শিক্ষা হইল না। অনতিকাল পরেই ইয়েকবাল মান্দ নামক আর একজন বিখ্যাত সেনাপতি পুনরায় হিন্দুস্থান আক্রমণ করেন। এবারও গাজী বেগ তোগলোক বহু হতাহতের সঙ্গে তাহাদিগকে পরাস্থ করেন এবং কয়েক সহস্র লোককে বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন। পূর্বানুসৃত প্রথানুযায়ী তাহাদের সকলকে হত্যা করা হয়। এই ঘটনার পর মোগলরা বহুদিনের জন্য ভারতাক্রমণের সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। এমনকি অতঃপর তাহাদিগকে আত্মরক্ষার জন্যই ব্যস্ত থাকিতে হয়। কারণ—গাজী বেগ তোগলোক প্রতি বৎসরই উহাদের দেশে প্রবেশ করিয়া কাবুল, কান্দাহার, গজনী, গারম্‌শীর প্রভৃতি প্রদেশ লুণ্ঠন করিয়া অধিবাসীদের নিকট হইতে মোটা কর আদায় করিতে থাকেন।

এই সময় আলা-উদ-দীন আভ্যন্তরীণ শাসন ব্যবস্থার উন্নতি সাধনে তৎপর হন। তিনি যেখানে হাত দিলেন সেখানেই আশাতিরিক্ত সাফল্য অর্জন করিলেন। তাঁহার প্রত্যেক নববিধানের সুফল দর্শনে লোকে এতো আশ্চর্যান্বিত হইল যে কুসংস্কারপ্রবণ লোকেরা এসবকে আল্লাহ্‌র অনুমোদিত বিধান বলিয়া মনে করিতে লাগিল।

দেবগিরির রাজা রাম দেব গত তিন বৎসর যাবৎ কর প্রেরণে গাফিলতি করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহাকে দমন করার প্রয়োজন দেখা দিল। সুলতান এই

কার্যের জন্য মালিক কাফুরকে (হাজার দিনার নামে পরিচিত)[৭] মনোনীত করিলেন এবং তাঁহাকে মালিক নায়েব উপাধিতে ভূষিত করিয়া সেনাবাহিনীর সর্বময় কর্তৃত্ব প্রদান করিলেন। দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলিকে পদানত করিবার জন্য সুলতান মালিক কাফুরের অধীনে বহু খ্যাতনামা সেনানায়ক ও এক বিরাট সেনাবাহিনী নিয়োজিত করিলেন। বলা বাহুল্য যে দেশগুলিকে স্থানীয় লোকের ভাষায় দাক্ষিণাত্য বলা হইত। মালিক কাফুরের প্রতি সুলতানের অনুগ্রহ সমস্ত সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল। তিনি তাঁহাকে ওমরাহদের পর্যায়ভুক্ত করিয়া সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। ওমরাহগণের উপর আদেশ হইল—তাঁহারা যেন প্রতিদিন মালিক কাফুরকে রাজকীয় সম্মান জ্ঞাপন করেন। ইহাতে তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের ভাব লক্ষিত হইল। কিন্তু কেহই মুখ ফুটিয়া কিছু বলিতে সাহসী হইলেন না। দাক্ষিণাত্য অভিযানে খাজা হাজীকে সহকারী সেনাপতি নিযুক্ত করা হইল। তিনি একজন চরিত্রবান লোক হিসাবে সেকালে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। জাহান-তারা রচয়িতা কাজী আহমদ গাফারীর মতে এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সম্বলিত এই বাহিনী ৭০৬ হিজরীর প্রথম ভাগে (খ্রীঃ ১৩০৬) দিল্লী হইতে নির্গত হয়। পথে মালবের শাসনকর্তা আইন-উল্-মুল্‌ক ও গুজরাটের শাসনকর্তা আলফ খানের সৈন্যদলও এই বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করে। এই অভিযানের কথা শুনিয়া সুলতানের অন্যতম স্ত্রী—পূর্বোল্লিখিত কমলাদেবী সুলতানের নিকট এক অরাজ পেশ করেন। পূর্ব স্বামীর ঔরসে কমলাদেবীর দুইটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। কমলাদেবী শুনিয়াছিলেন, উহাদের বড়টি মারা গিয়াছে এবং ছোটটি তখনও জীবিত। তাহার নাম দেবলা দেবী। কমলা দেবী তাহাকে চারি বৎসর বয়সে ফেলিয়া আসিয়াছিলেন। সুলতানের সেনাপতিরা যাহাতে সেই কন্যাকে হস্তগত করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন—তাঁহাদিগকে সেই মর্মে আদেশ করিবার জন্য কমলাদেবী সুলতানকে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইলেন।

মালব রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়া মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং দেবলা দেবীকে সমর্পণ করিবার জন্য করণসিংহের নিকট সুলতানের আদেশ প্রেরণ করিলেন। রাজা কোনক্রমেই

৭ মালিক কাফুরকে হাজার দিনার দিয়া ক্রয় করা হইয়াছিল।

এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না এবং তিনি ইহা সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিলেন। ফলে শত্রুতা আরম্ভ হইল। 'মুলহিকাত' অনুযায়ী মালিক নায়েব কাফুর যেখানে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করিয়াছিলেন, সেখানকার শহর ও অঞ্চলের নাম সেই সময় হইতেই "সুলতানপুর" হইয়াছে।

সে অঞ্চলের হিন্দুরাজাদের উপর কোনরূপ প্রভাব বিস্তার করিতে না পারিয়া মালিক কাফুর সেখান হইতে ছাউনী উঠাইলেন। সেই সঙ্গে আলফ খানকে নির্দেশ পাঠাইলেন, তিনি যেন তাঁহার সেনাবাহিনী লইয়া বাগ্‌লানার পার্বত্য পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন—যাহাতে তাহারা একত্রে দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতে পারেন। করন সিংহ আলফ খানের পথরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন এবং দুই মাস যাবৎ তাঁহার অগ্রসর হইবার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিলেন। এই সময় কয়েকবার সংঘর্ষ হয়।

দেবগিরির রাজকুমার সঙ্কল দেব বহুদিন হইতে তরুণী দেবলা দেবীর পাণি প্রার্থী ছিলেন। কিন্তু যেহেতু দেবলা দেবী রাজপুত বংশদ্ভূত এবং সঙ্কল দেব ছিলেন মারাঠা - সেইজন্য করণ সিংহ এই বিবাহে সম্মত হন নাই। এই সময় সুযোগ বুঝিয়া সঙ্কল দেব ভ্রাতা ভীম দেবকে বহু উপহারাদিসহ করন সিংহের নিকট প্রেরণ করিলেন। তিনি করন সিংহকে বুঝাইলেন যে, দেবলা দেবীর জন্যই যখন যুদ্ধ, তখন তাঁহাকে সঙ্কল দেবের হস্তে সমর্পণ করিলেই সকল বিপদ কাটিয়া যাইবে। উদ্দেশ্য হাসিল হইল না দেখিয়া মুসলমান সৈন্যরা হতাশ হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যাইবে। সঙ্কল দেবের সাহায্য লাভের আশায় করণ সিংহ এই প্রস্তাবে রাজী হইলেন এবং অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষীয়া কন্যাকে সঙ্কল দেবের সঙ্গে বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন।

এই সংবাদ পাইয়া আলফ খান অত্যন্ত বিচলিত হইলেন। কারণ—তাঁহার ভয় হইল সুলতান মনে করিবেন, তাঁহার অবহেলা'র জন্যই দেবলা দেবী হাত ছাড়া হইয়াছে। সুতরাং স্বামীর রাজ্যে গমনের পুর্বেই যে-কোন উপায়ে দেবলা দেবীকে হস্তগত করিতেই হইবে। তাঁহার ভয় হইল যে অকৃতকার্য হইলে সুলতান তাঁহাকে জীবিত রাখিবেন না। তিনি সেনাপতিদের নিকট তাঁহার সঙ্কটজনক পরিস্থিতির কথা প্রকাশ করিলেন। তাহারা একবাক্যে তাঁহাকে এ ব্যাপারে যথাসাধ্য সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিলেন। মুসলমান ফৌজ নানাদিক হইতে পর্বতাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রাজাকে যুদ্ধে

সম্পূর্ণ পরাস্ত করিল। তাঁবু ও অন্যান্য বহু সরঞ্জাম যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলিয়া করন সিংহ দেবগিরি অভিমুখে পলায়ন করিলেন। আলফ খান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করতঃ কতিপয় গিরিপথ অতিক্রম করিয়া প্রায় দেবগিরির সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পলাতকদের পথের দিশা হারাইয়া তিনি গভীর নিরাশায় নিমজ্জিত হইয়া পড়েন। এই সময় আকস্মিকভাবে তিনি তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত বস্তু প্রাপ্ত হন। ঘটনাটি এইরূপ: সৈন্যদের ক্লান্তি দূরীকরণের জন্য তিনি পর্বতের অভ্যন্তরে দুইদিন বিশ্রাম করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। এই সময় তাঁহার একদল সৈন্য (সংখ্যায় ৩০০ শতের মত) অনুমতি না লইয়াই দেবগিরির সমীপবর্তী এলাকার গিরিকন্দর দর্শন করিতে গিয়াছিল। এই স্থান শিবির হইতে বেশী দুরে ছিল না। পথে তাহারা দেখিতে পাইল যে, কিছুসংখ্যক অশ্বারোহী সৈনিক তাহাদের দিকে আসিতেছে। উহারা যে সকল দেবের লোক তাহা বুঝিতে বিলম্ব হইল না। সংখ্যায় নগণ্য হইলেও মুসলমান সৈন্যরা পালাইয়া প্রাণ রক্ষার কথা চিন্তা না করিয়া আত্মরক্ষার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইল। আগন্তুক সৈন্য-দল ছিল ভীম দেবের অনুচর। ভীম দেব বালিকা বধূকে লইয়া তাঁহার ভ্রাতার নিকট আসিতেছিলেন। দুইদল তৎক্ষণাৎ পরস্পরকে আক্রমণ করিল। হিন্দু সেনাদল শীঘ্রই রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এই সময় দেবলা দেবীর অশ্ব তীরবিদ্ধ হইয়া মাটিতে গড়াগড়ি যায় এবং দেবলা দেবী ভূপতিত হন। উহা দেখিতে পাইয়া বিজয়ীরা তাঁহাকে ও তাঁহার কতিপয় অনুচরকে তথায় পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। ফলে সেখানে এক তুমুল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। যাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া এই যুদ্ধ, তাঁহার প্রাণহানিই ঘটিতে পারিত যদি না রাজকুমারীর অন্যতম দাসী তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া তাঁহাকে মুসলমান সেনাপতির নিকট লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ না করিত। ইহা শুনিয়া সৈনিকরা বুঝিল যে, তাহার প্রতি অসম্মান প্রদর্শন করা সম্ভব নয়। তাঁহারা আলফ খানের নিকট দ্রুত সংবাদ পাঠাইলেন এবং অতীব সম্মানের সঙ্গে রাজকন্যাকে লইয়া শিবিরাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। প্রার্থিত বস্তু প্রাপ্ত হইয়া আলফ খান আনন্দে আত্মহারা হইলেন। তিনি জানিতেন, দেবলা দেবীকে পাইলে সুলতান যার-পর-নাই পরিতুষ্ট হইবেন—কারণ সুলতানের উপর দেবলা দেবীর মাতার তখন অপরিসীম প্রভাব। ইহা চিন্তা করিয়া তিনি বিজয়াভিযান

সেইখানে স্থগিত রাখিয়া গুজরাট প্রত্যাগমন করেন এবং সেখান হইতে দেবলা দেবীসহ দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন। দেবলা দেবীকে তাঁহার মাতার হস্তে সমর্পণ করা হয়। তাঁহার অসামান্য রূপে মুগ্ধ হইয়া শাহজাদা খিজির খান তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য পাগল হন এবং দিল্লী পৌছিবার অল্প দিনের মধ্যে শাহজাদার সঙ্গে দেবলা দেবীর শাদী হয়। আমীর খসরু দেহলভী রচিত এক সুন্দর কবিতায় এই দম্পতির প্রেমের ইতিহাস বর্ণিত আছে।

এইবার মালিক নায়েব কাফুরের নিকট প্রত্যাবর্তন করা যাউক—যাঁহাকে আমরা দাক্ষিণাত্যের প্রবেশপথে রাখিয়া আসিয়াছি। মহারাষ্ট্র দেশের অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া তিনি তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বন্টন করিয়া দেন। অতঃপর তিনি দেবগিরি (অধুনা দৌলতাবাদ) অবরোধে অগ্রসর হইলেন। মুসলমানদিগকে বাধাদান করার মত অবস্থা রাম দেবের ছিল না। পুত্র সঙ্কল দেবকে দুর্গে রাখিয়া প্রচুর উপঢৌকনসহ রাম দেব শান্তি ভিক্ষার জন্য বিজয়ী শত্রুর শিবিরে গমন করেন। মালিক নায়েব কাফুর তাঁহার অভিযানের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন এবং কিছুদিন পরে বহুমূল্যবান উপহার ও ১৭টি হস্তীসহ রাম দেবকে লইয়া স্বয়ং দিল্লী আগমন করেন। দিল্লীতে মালিক কাফুরকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। রাম দেবকে যথারীতি রাজকীয় মর্যাদা প্রদর্শন করা হয়। রায়রায়ান উপাধিতে ভূষিত করিয়া রাম দেবকে নিজ রাজ্যে পুনর্বহাল করা হইল এবং উপরন্তু আরও কতিপয় অঞ্চল তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়া দেওয়া হইল। বিনিময়ে রাম দেব সুলতানের আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে বাৎসরিক কর প্রদানে অঙ্গিকারাবদ্ধ হন। সুলতান গুজরাটের সমীপবর্তী নওসেরা জেলা রাম দেবকে ব্যক্তিগত তালুক হিসাবে দান করেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তনের খরচ বাবদ তাঁহাকে একলক্ষ তঙ্কা প্রদান করেন। রাম দেব যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন দিল্লীতে বাৎসরিক কর প্রেরণে কোনদিন শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নাই।

মালিক কাফুর যখন দাক্ষিণাত্য অভিযানে লিপ্ত ছিলেন সেই সময় সুলতান নিজে দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত এক সুদৃঢ় দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার করেন। সেবানার রাজা শীতল দেব ছিলেন সেই দুর্গের মালিক। প্রতিরক্ষা শক্তি নিঃশেষ হইবার পর শীতল দেব—আত্মসমর্পণের প্রতীকস্বরূপ এক শৃঙ্খলিত স্বর্ণমূর্তি সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। ইহার সঙ্গে শান্তির মূল্যস্বরূপ একশত হস্তী ও

বহু মূল্যবান উপহারও প্রেরণ করেন। আলা-উদ-দীন উপহারগুলি গ্রহণ করিয়া শীতল দেবকে জানান যে তাঁহাকে নিজে আসিয়া আত্মসমর্পণ করিতে হইবে—শুধু নির্বাক-উপহারগুলির দ্বারা কার্যসিদ্ধি হইবে না। শত্রুকে অনমনীয় দেখিয়া রাজা শেষ পর্যন্ত রাজ্য ত্যাগ করিয়া নিজেকে সম্পূর্ণ সুলতানের করুণার উপর নিক্ষেপ করেন। তাঁহার রাজ্য যথেচ্ছ লুণ্ঠন করিবার পর সুলতান শীতল দেবকে পুনরায় তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দেন। অবশ্য তাঁহার রাজ্যের বৃহত্তর অংশ বিচ্ছিন্ন করিয়া সুলতান স্বীয় অনুগত আমীরদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেন। রাজা অবশিষ্টাংশ সুলতানের আনুগত্যাধীনে শাসন করিতে স্বীকৃত হন।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, জালোরের রাজা নিহার দেব দিল্লীতে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন সুলতান দম্ভ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বর্তমানে হিন্দুস্থানে এমন কোন রাজা নাই যে আমার শক্তির মোকাবিলা করিতে সাহসী হইবে।" ইহা শুনিয়া নিহার দেব নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনপূর্বক বলিয়াছিলেন যে, "তাঁহাকে সৈন্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ প্রদান করিলে তিনি সুলতান কর্তৃক জালোর দুর্গ অধিকারের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দিবেন—আর অকৃতকার্য হইলে তিনি স্বেচ্ছায় মৃত্যুদণ্ড গ্রহণ করিবেন।" সুলতান তদানুযায়ী তাঁহাকে দিল্লী ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। নিহার দেব দেশে ফিরিয়া সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। তখন সুলতান জালোর অবরোধ করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নিহার দেবের প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে সুলতান এই বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করিলেন গুল্‌বেহেশ্‌ত্‌ নাম্নী এক বাঁদীকে। অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া গুল্‌বেহেশ্‌ত্‌ প্রায় দুর্গটি অধিকার করিয়াই ফেলিয়াছিল। কিন্তু এই সময় অসুস্থ হইয়া সে মারা যায়। অতঃপর তাহার পুত্র শাহীন অবরোধ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। নিহার দেব দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া সুলতানী ফৌজকে আক্রমণ করেন এবং স্বহস্তে শাহীনকে নিহত করেন। মুসলমানরা পশ্চাদাপসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা পিছু হটিয়া চারিদিনের পথ অতিক্রম করিয়া আসে। সুলতানী ফৌজের বিপর্যয়ের সংবাদ পাইয়া আলা-উদ-দীন অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করেন। তিনি বিখ্যাত সেনাপতি কামাল-উদ-দীনের অধীনে এক শক্তিশালী সাহায্যকারী বাহিনী প্রেরণ করেন। শেষ পর্যন্ত জালোর দুর্গ অধিকৃত হইল এবং দুর্গবাসীদের উপর নৃশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইল। নিহার দেব ও তাঁহার পরিবারপরিজন তলোয়ারের মুখে

নিক্ষিপ্ত হইল এবং তাঁহার সমস্ত ধনরত্ন লুণ্ঠিত হইল। এই বিজয়ের সংবাদ রাজধানীতে পৌঁছিলে সেখানে তুমুল উল্লাসের সৃষ্টি হইল।

এই সময় সুলতান খবর পাইলেন যে, বাঙ্গালার পথে তেলিঙ্গানার অন্তর্গত ওয়ারাঙ্গলে তিনি যে সেনাবাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন, তাহারা পরাস্ত হইয়া অশেষ কষ্টের মধ্যদিয়া পশ্চাদাপসরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। সুলতান তখন দেবগিরির পথে ঐ রাজ্য আক্রমণের জন্য মালিক কাফুরের অধীনে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন (হিঃ ৭০৯ : খ্রীঃ ১৩০৯)। মালিক কাফুরের উপর নির্দেশ ছিল যে, ওয়ারাঙ্গলের রাজা লুদ্দুর দেব যদি প্রচুর উপহার প্রদান করেন এবং বাৎসরিক করদানে প্রতিশ্রুত হন, তবে যেন তিনি তাঁহার রাজ্য আক্রমণে বিরত হন। মালিক কাফুর ও খাজা হাজী দেবগিরি পৌঁছিলে রাম দেব উপঢৌকনসহ তাহাদের সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং তাঁহাদিগকে স্বীয় প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদের প্রতি আতিথেয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। মুসলমান শিবিরের বাজারে তাঁহার প্রজারা যাহাতে সুলতানের রাজ্যে প্রচলিত মূল্যের অধিক মূল্যে কিছু বিক্রয় না করে, সে সম্পর্কে রাজা তাহাদিগকে কঠোরভাবে সতর্ক করিয়া দেন। দেবগিরি ত্যাগ করিয়া মালিক কাফুর তেলিঙ্গানা সীমান্তে অবস্থিত ইন্দোর [৮] আসিয়া পৌঁছিলেন এবং হত্যা ও অগ্নিকাণ্ড দ্বারা দেশে বিভীষিকা সৃষ্টির জন্য সৈন্যদিগকে লেলাইয়া দিলেন। নিরীহ নিরপরাধ জনসাধারণের উপর এইরূপ নৃশংস আচরণে সকলে স্তম্ভিত হইল। এই মহা বিপদে রাজা লুদ্দুর দেবকে সাহায্য করিবার জন্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজারা সসৈন্যে রওয়ানা হইল। কিন্তু সাহায্য পৌঁছিবার পূর্বেই মুসলমান ফৌজ ক্ষিপ্রগতিতে ওয়ারাঙ্গল আসিয়া পৌঁছিল। রাজা দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। মিত্র রাজারা রাজ্যে কয়েকটি শক্তিশালী দুর্গ অধিকার করিলেন। মালিক কাফুর ইতিমধ্যে ওয়ারাঙ্গল দুর্গ অবরোধ করিয়া আক্রমণ শুরু করিয়াছিলেন। অসীম সাহসের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজার সৈন্যরা তাঁহার আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দিল। ওদিকে মিত্র-রাজগণ বাহিরের দিক হইতে মুসলমান বাহিনীকে উত্যক্ত করিতে আরম্ভ করিল। এসব সত্ত্বেও কয়েকমাস অবরোধের পর একদিন প্রচণ্ডভাবে হানা দিয়া মালিক কাফুর শহরটি অধিকার করিয়া ফেলিলেন। দুর্গবাসী সৈন্যদের অধিকাংশই তলোয়ারের মুখে

৮ দাক্ষিণাত্যের হায়দরাবাদ শহরের ৬০ মাইল পশ্চিমে এই শহর অবস্থিত—ইহাকে মালবের ইন্দোর বলিয়া ভুল করা চলিবে না।

নিহত হইল—কারণ দুর্গে সকলের স্থান সঙ্কুলান হইত না। এই চরম ভাগ্য বিপর্যয়ের পর লুদ্দর দেব ৩০০ হস্তী, ৭,০০০ অশ্ব, বিপুল পরিমাণ অর্থ ও রত্নাদি প্রদান করিয়া শান্তি ক্রয় করিয়া লইলেন এবং সেই সংগে বাৎসরিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতিও দান করিলেন। এইরূপ সুবিধাজনক শর্তে সন্ধিস্থাপন করিয়া মালিক কাফুর সসৈন্যে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। আগমনের পূর্বেই মালিক কাফুর বিজয়ের সমস্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান দিল্লীতে মহোৎসব পালন করিতে এবং প্রত্যেক মস্‌জিদের মিম্বার হইতে এই বিজয়ের বিবরণ পাঠ করিয়া শুনাইবার হুকুম দিলেন। মালিক কাফুর দিল্লী পৌঁছিলে সুলতান স্বয়ং বাদায়ুন দরওয়াজার সন্নিকট চবুত্রানাসেরীতে আসিয়া তাঁহাকে সানন্দে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। বিজয়ী সিপাহসালার সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য সুলতানের পদপ্রান্তে স্থাপন করেন।

৭১০ হিজরীতে (১৩১০ খ্রী:) দ্বার সমুদ্র ও মা-আবির[৯] অধিকার করিবার জন্য সুলতান পুনরায় মালিক কাফুর ও খাজা হাজীর অধিনে এক বিশাল সেনাবাহিনী দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করেন। সুলতান শুনিয়াছিলেন এইসব স্থানে স্বর্ণ-রত্নাদিপূর্ণ অনেক মন্দির আছে। দেবগিরি পৌঁছিয়া তাহারা দেখিলেন যে বৃদ্ধ রাম দেব আর ইহজগতে নাই এবং তাঁহার স্থলাভিষিক্ত তরুণ রাজকুমার সঙ্কল দেবের মতিগতি সুবিধাজনক নয়। এইজন্য গোদাবরী তীরে পাইতুন নামক স্থানে কয়েকজন সেনাপতির অধীনে কিছু সংখ্যক সৈন্য মোতায়েন রাখিয়া মালিক কাফুর দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা অব্যাহত রাখিলেন। দেবগিরির রাজার রাজ্য-সীমা অতিক্রম করিবার পর মুসলমান সেনাবাহিনী লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্য আরম্ভ করিল এবং অবশেষে দিল্লী ত্যাগের তিন মাস পরে সমুদ্রোপকূলে আসিয়া পৌঁছিল। পথে প্রত্যেক হিন্দু-রাজ্য অতিক্রমকালে তাহারা বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে কর্নাটের[১০] রাজা বিশাল দেবের সঙ্গে যুদ্ধ বিশেষ

৯ আরবদের ন্যায় ভারতীয় মুসলমানরাও ভারতের পশ্চিম উপকূলকে মা-আবির বা অবতরণ স্থান বলিত। এই নাম আরবদের সমুদ্রপথে আসিয়া প্রথম এখানে অবতরণ করার স্মৃতি বহন করিতেছে।

১০ এখানে কর্নাটক বলিতে সাতারা ও বিজাপুরের দক্ষিণে মহীশূর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বুঝিতে হইবে। ইউরোপিয়ানরা যে অঞ্চলকে কর্নাটক বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল—ইহা সে কর্নাটক নয়।

উল্লেখযোগ্য। যুদ্ধে রাজা পরাস্ত ও বন্দী হন এবং মালিক কাফুরের সৈন্যদল তাঁহার রাজ্য ছারখার করে। মুসলমানরা মন্দির লুণ্ঠন করিয়া বেশুমার ধনরত্ন লাভ করিয়াছিল। ইহার মধ্যে ছিল মূল্যবান প্রস্তরের অলঙ্কার শোভিত বহু স্বর্ণমূর্তি এবং দেবদেবীর নামে উৎসর্গীকৃত আরও অনেক মূল্যবান দ্রব্য। বিজেতারা সমুদ্রোপকূলে একটি ক্ষুদ্র মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়া সেখানে ইসলাম ধর্মানুযায়ী প্রার্থনা করিবার ও আলা-উদ-দীনের নামে খোৎবা পাঠ করিবার হুকুম দেয়। রামেশ্বর সেতুবন্ধে[১১] সেই মসজিদ এখনও বিদ্যমান আছে। কারণ ঈশ্বরের নামে উৎসর্গীকৃত উপাসনালয় বিবেচনা করিয়া কাফেররা এই ঘর ধ্বংস করে নাই। আমার মনে হয়—দ্বার সমুদ্র নগর সমুদ্র-গর্ভে বিলীন হইয়াছে।

অভিযানের উদ্দেশ্য হাসিল হওয়ার পর মালিক কাফুর লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করিতেছিলেন। পরিকল্পিত যাত্রা-দিবসের পূর্ব-রাত্রে শিবিরে আশ্রিত দুইজন ব্রাহ্মণের মধ্যে বচসা আরম্ভ হয়। মুসলমান ফৌজের মধ্যে একজন উহাদের ভাষা বুঝিতে পারিত। সে বুঝিতে পারিল যে কোন গুপ্তধন লইয়া উহাদের মধ্যে এই কলহ। বাজার সরকারের নিকট এই সংবাদ পৌঁছিলে তিনি ব্রাহ্মণদ্বয়কে বাঁধিয়া মালিক কাফুরের নিকট হাজির করাইলেন। প্রথমে তাহারা বোকা সাজিল এবং গুপ্তধন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভাণ করিল। কিন্তু পরে যখন প্রাণনাশের ভয় দেখানো হইল এবং তাহাদিগকে পৃথকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার ব্যবস্থা করা হইল, তখন তাহাদের ভয় হইল যে উহাদের মধ্যে একে অন্যের উপর সব দোষ চাপাইতে পারে। সেই ভাবিয়া তাহারা গুপ্তধনের কথা প্রকাশ করিয়া ফেলিল। শিবিরের নিকটেই সাতটা পৃথক স্থানে এই গুপ্তধন লুক্কায়িত ছিল। মাটি খুঁড়িয়া এই ধন বাহির করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে উঠাইয়া মালিক কাফুর দিল্লীর পথে রওয়ানা হইলেন (৭১১ হিঃ, ১৩১১ খ্রীঃ)। পথে কোন উল্লেখযোগ্য বিঘ্ন ঘটে নাই। মালিক কাফুর সুলতানকে ৩১২টি হস্তী, ২০,০০০ অশ্ব, ৯৬,০০০ স্বর্ণ-পিণ্ড ও কয়েক বাক্স মণি-মুক্তা নজরানা দেন। পারভিজের

১১ এই রামেশ্বর মানার উপসাগরে অবস্থিত "আদমের সেতু" নয়। গোয়ার দক্ষিণে কানা রায় ঐ নামে অভিহিত অন্য একটি স্থান আছে—ইহা সেই স্থান।

বাদাওয়ার্দ[১২] অপেক্ষাও বিপুল এই দৌলৎ দর্শনে আলা-উদ-দীন আনন্দে অভিভূত হইলেন এবং তাঁহার প্রত্যেক সেনাধ্যক্ষকে পুরস্কৃত করিলেন। প্রত্যেক প্রধান সেনাপতিকে ১০টি এবং প্রত্যেক সহকারী সেনাপতিকে ৫টি করিয়া স্বর্ণ-পিণ্ড প্রদান করা হইল। দরবারের প্রত্যেক বিদ্বান ব্যক্তি এক থালা করিয়া স্বর্ণ পাইলেন। এইরূপে সুলতান তাঁহার লোকজনের মধ্যে পদমর্যাদা ও গুণানুযায়ী ধনরত্ন বণ্টন করিয়া দিলেন। অবশিষ্ট স্বর্ণ গলাইয়া মুদ্রা প্রস্তুত করিয়া বায়তুলমাল তহবিলে গচ্ছিত রাখা লইল। এই অভিযানে প্রাপ্ত ধনের মধ্যে রৌপ্যের কোন উল্লেখ নাই—তাহাতে অনুমান করা যায় যে, সে সময় ঐ সব দেশে রৌপ্যমুদ্রার প্রচলন ছিল না। স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোন ধাতু নির্মিত বাজুবন্ধ, হার বা অঙ্গুরী কেহ পরিধান করিত না। বিত্তশালী লোকদের গৃহের এবং মন্দিরের সমস্ত থালাগুলি স্বর্ণ—নির্মিত ছিল।

নবদীক্ষিত মোগলদিগকে পাইকারীভাবে হত্যা করা আলা-উদ-দীনের রাজত্বের আর একটি লোমহর্ষক ঘটনা। কোন বিশেষ কারণ না দর্শাইয়াই আলা-উদ-দীন এই সম্প্রদায়ের সকল লোককে একদিন বরখাস্ত করেন এবং তাহাদিগকে অন্যত্র চাকুরী যোগাড় করিতে বলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ ওমরাহদের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিল এবং অধিকাংশই দিল্লীতে মহা কষ্টে দিন যাপন করিতে লাগিল। তাহাদের মনে আশা ছিল যে উহাদের দুর্দশা দেখিয়া একদিন সুলতানের করুণার উদ্রেক হইবেই। কিন্তু সুলতানের মন একটুও গলিল না—তিনি তাঁহার সঙ্কল্পে অটল রহিলেন। দুর্দশার তাড়নায় অতীষ্ঠ হইয়া কয়েকজন দুঃসাহসী মোগল সুলতানকে হত্যা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিল। এই ষড়যন্ত্রের কথা যখন ফাঁস হইল তখন সুলতান ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকেই শুধু শাস্তিদান করিয়া ক্ষান্ত হইলেন না বরং ঐ সম্প্রদায়ের সকলের উপর গজব নাজেল করিলেন। তিনি সমস্ত মোগলকে হত্যা করিবার হুকুম দিলেন। ফলে একদিনে ১৫,০০০ মোগলের লাশ দিল্লীর রাজপথে গড়াগড়ি গেল। তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে গোলাম করা হইল। মোগলদের প্রতি সুলতানের মনোভাব এমন নির্মম ও কঠোর হইয়াছিল যে কেহই তাহাদের সাহায্যে আগাইয়া

১২ কথিত আছে বিপুল ধনরত্ন পরিপূর্ণ এক জাহাজ বায়ুচালিত হইয়া কৃষ্ণসাগরের পূর্বতীরে আসিয়া পড়ে এবং পারভিজের হস্তগত হয়। এই ধনকে বাদার্দ বা বায়ু-প্রদত্ত বলা হইয়াছে।

আসিতে সাহসী হইল না। তাহাদের পরম বন্ধুও কাহাকে লুকাইয়া রাখিয়া প্রাণ বাঁচাইবার প্রয়াস পাইল না। এই হতভাগ্যদের একজনও রক্ষা পাইয়াছে বলিয়া জানা যায় নাই।

তাঁহার সামরিক শক্তির অসামান্য সাফল্যে স্ফীত হইয়া সুলতান অত্যধিক অহঙ্কারী ও স্বেচ্ছাচার হইয়া উঠিলেন। তিনি আর কাহারও পরামর্শ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা বোধ করেণ নাই—রাজত্বের প্রথম দিকে যেমন করিতেন। সুলতানের খেয়াল খুশীমত সবকিছু চলিতে লাগিল। এসব সত্ত্বেও ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এই সুলতানের রাজত্বকালে দিল্লী সাম্রাজ্যের সর্বাধিক উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। সাম্রাজ্যের দূরতম প্রদেশগুলিতে সুবিচার ও শৃঙ্খলা বিরাজমান ছিল এবং রাজ্যে সর্বত্র প্রাচুর্য্য ও সমৃদ্ধির লক্ষণ পরিস্ফুট ছিল। রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, বিশ্ববিদ্যালয়, হাম্মাম, সমাধিসৌধ, কেল্লা এবং আরও বহুবিধ সরকারী ও বেসরকারী ইমারত যেন কোন যাদুকরের মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আবির্ভূত হইতে লাগিল। কোন কালে কোথাও নানা দেশে এতো অধিক-সংখ্যক বিদ্বান ব্যক্তির সমাবেশ হইতে দেখা যায় নাই। বিজ্ঞানে সর্বোচ্চ জ্ঞানসম্পন্ন ৪৫ জন পণ্ডিত বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাকার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

দরবেশদের মধ্যে দিল্লীর শেখ নিজাম-উদ-দীন আউলিয়া, অযোধ্যার প্রসিদ্ধ শেখ ফরিদ-উদ-দীন শুকরগঞ্জের পৌত্র শেখ আলা-উদ-দীন, সদর-উদ-দীন আরিফের পুত্র এবং মুলতানের সুপ্রসিদ্ধ আউলিয়া শেখ বাহা-উদ-দীন জাকারিয়ার পৌত্র শেখ রুকুন-উদ-দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। বাহা-উদ-দীন জাকারিয়ার পরিবারের এমন মর্যাদা ও প্রভাব ছিল যে, যে-কোন অপরাধ করিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহার পরিবারে আশ্রয় লইতে পারিলে, বাঁচিয়া যাইত। তিনি তাঁহার বংশধরদের জন্য বিপুল পরিমাণ ধনদৌলত রাখিয়া গিয়াছিলেন। তাহার পুত্র ও পৌত্রের আমলে সেসব সম্পদ দান খয়রাতে ব্যয়িত হইয়াছিল, সৈয়দ কুতুব-উদ-দীনের পুত্র সৈয়দ তাজ-উদ-দীনের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি অগাধ পাণ্ডিত্য ও অপরিসীম দানশীলতার জন্য সুবিখ্যাত ছিলেন। প্রথমে তিনি অযোধ্যার কাজী ছিলেন এবং শেষে বাদায়ুনের কাজী হিসাবে ইন্তেকাল করেন। তাঁহার ভ্রাতা কারা প্রদেশের কাজী সৈয়দ রুকন-উদ-দীনও সেকালের অন্যতম মনীষী হিসাবে খ্যাতি

অর্জন করিয়াছিলেন। কেতুলেও দুই ভ্রাতা ছিলেন—যাহাদের এক জনের নাম সৈয়দ মখিজ-উদ-দীন ও অন্যজনের নাম সৈয়দ মুন্তাজিব-উদ-দীন। ইহারা নওয়াযেত সৈয়দ নামে অভিহিত ছিলেন। উভয়েই বিদ্যা ও চরিত্রের নিষ্কলুষতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন।

এই সুলতানের রাজত্বকালের কবিদের মধ্যে নিম্নোক্তদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য : আমীর খসরু দেহলভী, হাছান সান্‌জারী, সদর-উদ-দীন আলী, ফখর-উদ-দীন খোয়াজ, হামিদ-উদ-দীন রাজা, মওলানা আরিফ, আব্দুল হাকিম ও শাহাব-উদ-দীন সদর নিশিন। ইহাদের বাহিরে ছিলেন—কয়েকজন ঐতিহাসিক ও সে যুগের আত্মজীবনীগুলির সঙ্কলনকারীগণ। উপরিলিখিত ব্যক্তিদের অধিকাংশই সুলতানের বৃত্তিভোগী ছিলেন।

এই সময়ই বোধহয় সুলতান ক্ষমতা ও গৌরবের উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সব কিছুরই ধ্বংস অনিবার্য। একমাত্র আল্লাহ্‌ই অবিনশ্বর। সুলতানের উদ্বেলিত সমৃদ্ধিতেও ভাটা আরম্ভ হইল এবং তাঁহার হুকুমতের জৌলুস ম্লান হইতে লাগিল। রাজ্য পরিচালনার লাগাম তিনি সম্পূর্ণভাবে মালিক কাফুরের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। মালিক কাফুরের সমস্ত রাজনীতি বিরুদ্ধ ও অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা তিনি অনুমোদন করিয়া যাইতে লাগিলেন। ইহাতে ওমরাহগণ তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইতে লাগিলেন এবং জনসাধারণের মধ্যেও ব্যাপক অসন্তোষ দানা বাঁধিয়া উঠিতে লাগিল। নিজের সন্তানদের শিক্ষার প্রতিও তিনি মনোযোগ দেন নাই এবং অতি অপরিণত বয়সে তাহাদিগকে হারেম হইতে বাহির করিয়া প্রদেশের নিরঙ্কুশ শাসন ক্ষমতা প্রদান করেন। খিজির খানকে যখন চিতোরের সুবাদার নিযুক্ত করা হয়, তখন তিনি বালক মাত্র। তাঁহাকে পরামর্শদান করিবার জন্য বা তাঁহার কার্য তদারক করিবার জন্য কোন বিজ্ঞব্যক্তিকে নিয়োজিত করা হয় নাই। অন্য শাহ্‌জাদাদিগকেও যথা—শাদীখান, মুবারক খান ও শাহাব-উদ-দীনকেও অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ সরকারী কার্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

এই সময় তেলিঙ্গানার রাজা সুলতানের নিকট কিছু উপহার ও ২০টি হস্তী প্রেরণ করেন এবং তৎসঙ্গে প্রেরণ করেন এক পত্র। পত্রে তিনি সুলতানকে জানান যে, মালিক কাফুরের নিকট অঙ্গীকৃত কর তিনি প্রস্তুত রাখিয়াছেন।

মালিক কাফুর দাক্ষিণাত্যে আর একটি অভিযান পরিচালনা করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। তিনি সুলতানকে প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, তেলিঙ্গানার কর আদায় করা ছাড়াও তিনি এই অভিযানে আরও কিছু হাসিল করিবেন—অর্থাৎ দেবগিরি ও অন্যান্য রাজ্যের রাজারা যাহারা কর দানে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিবেন, তাঁহাদিগকে তিনি পুনরায় বশ্যতা স্বীকারে ও কর প্রদানে বাধ্য করিবেন। যুবরাজ খিজির খানের প্রতি ঈর্ষাবশতঃই মালিক কাফুর এই অভিযান পরিচালনার দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। কারণ, তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল যে, সুলতান খিজির খানকেই এই অভিযানের দায়িত্ব অর্পণ করিতে পারেন। কেননা শাহজাদা কর্তৃক শাসিত সুবা হইতে দাক্ষিণাত্য অভিযানে বহির্গত হওয়া অত্যন্ত সুবিধাজনক ছিল। আলা-উদ-দীন মালিক কাফুরের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর কাফুর ৭১২ হিজরীতে (১৩১২ খ্রীঃ) চতুর্থবার দাক্ষিণাত্য অভিযানে যাত্রা করিলেন। কাফুর দেবগিরির রাজাকে বন্দী করিলেন এবং অমানুষিক নৃশংসতার সঙ্গে তাঁহাকে হত্যা করিলেন। অতঃপর মালিক কাফুর দাবুল ও চাউল হইতে আরম্ভ করিয়া রাচোর ও মুড্‌কুল পর্যন্ত বিস্তৃত মহারাষ্ট্র ও কানারী রাজ্যে ব্যাপক ধ্বংসলীলা চালাইলেন। পরে তিনি দেবগিরি ফিরিয়া আসিয়া সেখানে অবস্থান করিতে থাকেন এবং সেখানে থাকিয়াই তেলিঙ্গানা ও কর্ণাটের রাজাদের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন এবং তাহা সম্পূর্ণ দিল্লীতে প্রেরণ করেন।

অতিরিক্ত মদ্যপান ও অমিতাচারের দরুন এই সময় আলা-উদ-দীনের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তিনি গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন। তাঁহার বেগম মালেকা জাহান [১৩] ও পুত্র খিজির খান তাঁহাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমোদ-প্রমোদ ও উচ্ছৃঙ্খলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুলতান দেখিলেন তিনি ক্রমশঃ হীনবল হইয়া পড়িতেছেন। এজন্য তিনি দাক্ষিণাত্য হইতে মালিক কাফুর ও গুজরাট হইতে ভ্রাতা আলফ খানকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সুলতান তাহাদের নিকট গোপনে পত্র লিখিয়া তাঁহার প্রতি পীড়িতাবস্থায়

---

১৩ দিল্লীর সুলতানদের অনেক বেগমই মালেকা জাহান অর্থাৎ বিশ্বের রানী উপাধি ধারণ করিতেন। ইনি জালাল-উদ-দীন খিলজির বেগম, মালেকা জাহান নন।

পুত্র ও বেগমের অকরুণ ও অকৃতজ্ঞ আচরণের কথা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। সিংহাসনের উপর মালিক কাফুরের লোলুপ দৃষ্টি বহুদিন পূর্বেই পতিত হইয়াছিল। এইবার তিনি সক্রিয়ভাবে শাহী খান্দানের উচ্ছেদ সাধনে তৎপর হইলেন। তিনি সুলতানকে ইঙ্গিতে জানাইলেন যে খিজির খান, মালেকা জাহান ও আলফ খান তাঁহার প্রাণনাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। ঠিক এই সময় মালেকা জাহান আলফ খানের কন্যার স.ঙ্গ পুত্র শাদী খানের বিবাহ দিবার জন্য অত্যন্ত উদগ্রীব হইয়া পড়িলেন। ফলে মালিক কাফুরের অভিযোগ বিশ্বাস-যোগ্য হইয়া উঠিল। মালিক কাফুর এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিতে কিছুমাত্র কসুর করিলেন না। শেষ পর্যন্ত মালিক কাফুরের প্ররোচণায় বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় সুলতান পুত্র খিজির খানকে আমরোহা চলিয়া যাইতে হুকুম দিলেন এবং আরোগ্যলাভের পূর্বে তাঁহাকে দিল্লী ফিরিতে বারণ করিয়া দিলেন। যৌবনসুলভ নির্বুদ্ধিতার দাস হইলেও খিজির খানের এই বার চৈতন্যোদয় হইল। পিতার এই অস্বাভাবিক আদেশ তাঁহার প্রাণে গভীর রেখাপাত করিল এবং রুগ্ন পিতার প্রতি এতদিন যে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছেন—এইবার তিনি তাহা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিলেন। প্রস্থানকালে অনুতপ্ত শাহজাদা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, আল্লাহ্ যদি পিতার জীবন রক্ষা করেন, তাহা হইলে তিনি পায়ে হাঁটিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিবেন। কিছুদিন পরে পিতার স্বাস্থ্যোন্নতির সংবাদ পাইয়া শাহ্জাদা তাঁহার প্রতিজ্ঞানুযায়ী পায়ে হাঁটিয়া পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। বিশ্বাসঘাতক মালিক কাফুর তাঁহার পিতৃভক্তিকেও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে কুণ্ঠাবোধ করিলেন না। তিনি ইঙ্গিতে বুঝাইলেন যে, শাহজাদার এই আকস্মিক পরিবর্তন ছলনা বৈ আর কিছুই নয়। শাহজাদা অবশ্য পিতার অনুমতি না লইয়াই দিল্লী আসিয়াছিলেন। মালিক কাফুর সুলতানকে বুঝাইলেন, ওমরাহদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বিপ্লব ঘটাইবার জন্যই শাহজাদা পিতার অনুমতির জন্য অপেক্ষা না করিয়াই দিল্লী চলিয়া আসিয়াছেন। মালিক কাফুরের এসব ইঙ্গিতের উপর সুলতান বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করিলেন না বরং পুত্রকে নিকটে ডাকিয়া তাঁহার পিতৃভক্তির অকৃত্রিমতা প্রমাণিত করিলেন। পিতাকে দর্শনমাত্র খিজির খানের রোদনের বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল। পুত্রকে এই প্রকারে রোদন করিতে দেখিয়া পিতার মন হইতে সমস্ত সন্দেহের কালিমা মুছিয়া

গেল এবং তিনি পুত্রের আন্তরিকতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দিগ্ধ হইলেন। মাতা ও ভগ্নীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য সুলতান তাঁহাকে হারেমে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রদান করিলেন। দুর্ভাগ্যবশত: শাহজাদা তাঁহার যৌবনসুলভ অস্থিরতার বশবর্তী হইয়া পুনরায় উচ্ছৃঙ্খলতা শুরু করিয়া দিলেন এবং পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার কথা কয়েকদিন যাবৎ বেমালুম ভুলিয়া রহিলেন। ইত্য-বসরে শাহজাদার ধূর্ত দুশমন মালিক কাফুর সুলতানের কয়েকজন গৃহভৃত্যকে হাত করিলেন এবং খিজিরের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ প্রমাণিত করিবার জন্য ইহাদিগকে সাক্ষীস্বরূপ দাঁড় করাইলেন।

এইরূপে সহস্রপ্রকার কপটতা ও অভিনয় দ্বারা মালিক কাফুর তাঁহার উদ্দেশ্যসিদ্ধি করিতে সক্ষম হইলেন। সুলতান মালিক কাফুরের কথামত তাঁহার দুই পুত্র—খিজির খান ও শাদী খানকে গোয়ালিয়র দুর্গে এবং তাঁহাদের মাতাকে দিল্লীর দুর্গে আটক করিয়া রাখিতে সম্মত হইলেন। কাফুর এই সঙ্গে আলফ খানকে বন্দী করাইয়া তাঁহাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করাইলেন। আলফ খানের ভ্রাতা জালোরের সুবাদার নিজাম খানও কামাল খান কর্তৃক নিহত হইলেন এবং কামাল খানকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করা হইল। এই পর্যন্ত মালিক কাফুরের সমস্ত পরিকল্পনা সাফল্যমণ্ডিত হইল। বহুদিন পূর্ব হইতেই রাজ্যের নানা স্থানে বিদ্রোহের অগ্নি ধূমায়িত ছিল। এইবার তাহা ব্যাপকভাবে জ্বলিয়া উঠিল। গুজরাটে প্রথম এই বিদ্রোহের শিখা দৃষ্টিগোচর হইল। বিদ্রোহ প্রশমিত করিবার জন্য কামাল খানকে প্রেরণ করা হইল। সাবেক সুবাদার আলফ খানের অনুগত লোকেরা ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের মধ্যে দিয়া কামাল খানকে পরাজয়বরণ করিতে বাধ্য করিল। কামাল খান তাহাদের হস্তে বন্দী হইয়া যন্ত্রণাময় মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিলেন। ইতিমধ্যে চিতোরের রাজপুতরাও মুসলমান আমীরদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। ওদিকে রাম দেবের জামাতা হরপালও দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালাইলেন এবং কতিপয় দুর্গ হইতে মুসলমান সৈন্যদিগকে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।

এইসব দুঃসংবাদ পাইয়া সুলতান ক্রোধে নিজের হস্তপদ কামড়াইতে লাগিলেন। রোষে ও ক্ষোভে তাঁহার ব্যাধির অবনতি ঘটিতে লাগিল। চিকিৎ-সায় আর কোন ফল দর্শিল না। ৭১৬ হিজরীর (১৩১৬ খ্রী:) ৬ই শওয়াল

সন্ধ্যায় তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করে। কিন্তু তাঁহার মৃত্যু সন্দেহাতীত ছিল না। তিনি যাঁহাকে ধূলিকণা হইতে আসমানে উঠাইয়াছিলেন, অনেকের ধারণা সেই শয়তান কাফুরই তাঁহাকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন। আলা-উদ-দীন ২০ বৎসর কয়েকমাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। কারিগর প্রভৃতি লইয়া এই সুতানের গৃহ-ভৃত্যের সংখ্যা ছিল ১৭,০০০। সুলতান সর্বদাই তাহাদিগকে কার্যে নিযুক্ত রাখিতেন। তাঁহার পূর্বে যাঁহারা হিন্দুস্থানে রাজত্ব করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারও ধন-দৌলৎ আলা-উদ-দীনের সমতুল্য ছিল না। সুলতান মাহমুদ গজনভী ১০টি অভিযানে যে ধন-রত্ন সংগ্রহ করিয়াছিলেন, আলা-উদ-দীনের দৌলৎ তদপেক্ষাও অধিক ছিল। এই বিপুল সম্পদ তিনি অন্যের ভোগের নিমিত্ত রাখিয়া যান।

ওমর খিলজী

[সুলতান কর্তৃক কনিষ্ঠ পুত্র ওমর খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া মালিক কাফুরের উপর নাবালকাবস্থায় তাঁহার অভিভাবকের দায়িত্ব অর্পণ করিয়া গিয়াছেন এই মর্মে মালিক কাফুরের একটা জাল দলিল প্রদর্শন। তাঁহার দ্বারা সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খান এবং অন্য পুত্র শাদী খানকে দৃষ্টিহীন করানো। অন্য পুত্র মোবারক খানকেও সেই উদ্দেশ্যেই কয়েদ-করণ। মালিক কাফুর কর্তৃক শিশু সুলতানের মাতাকে শাদী। দেহরক্ষী বাহিনীর সর্দারদের অভিভাবককে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র। মালিক কাফুর আততায়ীর হস্তে নিহত। শাহজাদা মোবারকের তখ্‌তে আরোহণ। বালক শাহজাদা ওমর খানকে দৃষ্টিহীন করিয়া চিরজীবনের মত গোয়ালিয়র দুর্গে আটক করিয়া রাখা।]

সদরজাহান গুজরাটির ইতিহাস পাঠে আমরা জানিতে পাই যে, আলা-উদ-দীন খিলজীর মৃত্যুর পর দিন মালিক কাফুর ওমরাহগণকে সমবেত করিয়া মৃত সুলতানের নামে একটা জাল দলিল প্রদর্শন করেন। এই দলিলে সুলতান সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ওমর খানকে উত্তরাধিকারী নিযুক্ত করিয়াছেন এবং নাবালকাবস্থায় তাঁহার অভিভাবক হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছেন মালিক কাফুরকে। খিজির খান ও অন্যান্য শাহজাদাদের অগ্রাধিকার সম্পূর্ণভাবে ইহাতে উপেক্ষিত হয়।

ওমর খানের বয়স তখন মাত্র সাত বৎসরে পড়িয়াছে। এই দলিলের উপর ভিত্তি করিয়া তাহাকে সিংহাসনে আরোহণ করাইয়া মালিক কাফুর রাজ্যশাসন আরম্ভ করিলেন। সর্বপ্রথম কর্তব্য হিসাবে তিনি গোয়ালিয়রে একজন লোক পাঠাইলেন খিজির খান ও শাদী খানের চক্ষু উৎপাটন করিবার জন্য। তাঁহার হুকুম অমানুষিক নৃশংসতার সঙ্গে পালিত হইল। তাঁহাদের মাতা মালেকা জাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার সমস্ত ধন-দৌলত বাজেয়াপ্ত করা হইল। চক্ষু উপ্‌ড়াইয়া ফেলিবার উদ্দেশ্যে আলা-উদ-দীনের তৃতীয় পুত্র মোবারক খানকেও বন্দী করা হইল।

মালিক কাফুর আর এক হাস্যকর কাণ্ড করিলেন। নিজে নপুংসক হইয়াও সাবেক সুলতানের তৃতীয় পত্নী, ওমর খানের মাতাকে শাদী করিলেন। সুলতান আলা-উদ-দীনের দ্বিতীয় পত্নী অর্থাৎ শাহজাদা মোবারকের মাতা,

যখন শুনিলেন যে, সুলতানের অভিভাবক তাঁহার পুত্রের চক্ষু উপড়াইয়া ফেলিতে উদ্যত—তখন তিনি অনন্যোপায় হইয়া শেখ নিজাম-উদ-দীনের শরণাপন্ন হইলেন (হিঃ ৭১৬ : খ্রীঃ ১৩১৬)। শেখ নিজাম উদ-দীন তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তাঁহার পুত্রের সেই মসিবত কাটিয়া যাইবে।

এদিকে মালিক কাফুর তাঁহার দুরভিসন্ধি ঢাকিবার জন্য শিশু সুলতানকে প্রতিদিন তখ্‌তে বসাইয়া ওমরাহদিগকে তাঁহাকে যথাবিধি সম্মান প্রদর্শন করিতে বলিতে লাগিলেন। শাহজাদা মোবারককে কতল করিবার জন্য তিনি এক রাত্রিতে কয়েকজন গুণ্ডাকে পাঠাইলেন। উহারা কক্ষে প্রবেশ করিলে শাহজাদা মোবারক তাহাদিগকে তাঁহার মরহুম পিতার কথা স্মরণ করাইয়া দেন—যিনি তাহাদের মালিক ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি গলা হইতে একটা বহুমূল্য রত্নাহার খুলিয়া তাহাদের হস্তে প্রদান করেন। পিতার দোহাই অপেক্ষা এই হারেই বেশী কাজ হইল। তাহারা তাহাদের কুমতলব ত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। কিন্তু বাহিরে চলিয়া আসিবার পর রত্নের ভাগ বণ্টন লইয়া তাহাদের মধ্যে কলহ আরম্ভ হইল। শেষ পর্যন্ত তাহারা স্থির করিল যে, এই হার লইয়া তাহারা পদাতিক রক্ষীবাহিনীর নিকট হাজির হইবে। শাহজাদা সম্পর্কে মালিক কাফুরের কি হুকুম ছিল এবং শাহজাদা তাহাদিগকে কি বলিয়াছিলেন—সবকিছু তাহারা এই সর্দারের নিকট ব্যক্ত করিল।

পদাতিক দেহরক্ষীদলের সর্দার মালিক মশির ও তাঁহার সহকারী সেনাপতি সাবেক সুলতানের নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ ছিলেন—কেননা সুলতানের অনুগ্রহেই তাঁহারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। মালিক কাফুরের বর্বরোচিত কার্যাবলী লক্ষ্য করিয়া ইহারা স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহারা যখন দেখিলেন তাঁহাদের অনুচরেরাও এই ব্যাপারে তাহাদিগকে সাহায্য করিতে উৎসুক—তখন সেই নপুংসকের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতে আর তাঁহারা দ্বিধা করিলেন না। ইহার কয়েক ঘণ্টা পরেই তাঁহারা সদলবলে কাফুরের কক্ষে প্রবেশ করিয়া তাঁহার দলভুক্ত কয়েকজন খোজার সঙ্গে তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন। আলা-উদ-দীনের মৃত্যুর ৩৫ দিন পর এই ঘটনা সংঘটিত হইল।

বন্দীদশা হইতে মুক্ত করিয়া শাহজাদা মোবারকের হস্তে রাজ্যের লাগাম তুলিয়া দেওয়া হইল। মোবারক অবশ্য তখনই শিরে তাজ ধারণ করিলেন না।

দুই মাস কাল যাবৎ তিনি তাঁহার ভ্রাতার অভিভাবক মুরুব্বি হিসাবেই কার্য পরিচালনা করিলেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি আমীর ওমরাহদিগকে হাত করিয়া সিংহাসনের উপর তাহার জন্মগত অধিকারের দাবী উত্থাপন করিলেন এবং ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া নিজে রাজক্ষমতা হস্তগত করিলেন। সেই যুগের বর্বর প্রথা অনুসরণ করিয়া তিনিও তাঁহার ভ্রাতা ওমর খানের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করাইয়া চিরজীবনের মত তাঁহাকে গোয়ালিয়র দুর্গে আটক করিলেন। রাজোপাধি গ্রহণের তিন মাস কয়েকদিন পরে ওমর খানের ভাগ্যে এই বিপদ নামিয়া আসিয়াছিল।

মোবারক খিলজী

[দেহরক্ষী বাহিনীর সব সর্দারকে হত্যা। নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে উচ্চাসনে বসাইয়া সুলতান ওমরাহদের বিরাগভাজন। মালিক খসরু নামক এক নিম্নবংশোদ্ভূত হিন্দুকে ওমরাহদের শ্রেণীভুক্ত করিয়া তাহাকে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্তি। বিনা বিচারে কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেওয়া। ফলে ১৭,০০০ কয়েদীর মুক্তি লাভ। পিতা কর্তৃক প্রবর্তিত ব্যবস্থা সম্পর্কীয় সমস্ত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা বাতিলকরণ। সুলতানের অতিমাত্রায় ইন্দ্রিয়াসক্তি এবং নানা প্রকার জঘন্য পাপকর্ম সংঘটিতকরণ। গুজরাটে সৈন্য প্রেরণ এবং নিজে দাক্ষিণাত্যে গমন। মালিক খসরুকে প্রধান সেনাবাহিনীসহ মালাবার অভিমুখে প্রেরণ এবং সুলতানের দিল্লী প্রত্যাবর্তন। সুলতানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র ফাঁস। ষড়যন্ত্রের নেতা সুলতানের চাচাতো ভাইকে হত্যা। গোয়ালিয়রে আটক শাহজাদাগণকে হত্যা। তাঁহাদের একজনের বিধবা স্ত্রীকে আনিয়া হেরেমে স্থান প্রদান। সুলতানের মাত্রাতিরিক্ত ইন্দ্রিয় সুখভোগ ও নানা পাপ কর্মের ফলে বিবেক ও শালীনতাবোধহীনতা। মালিক খসরুর দাক্ষিণাত্য হইতে প্রত্যাবর্তন কালে সুলতান কর্তৃক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে আগাইয়া আসা এবং সর্বসমক্ষে তাঁহাকে আলিঙ্গন। খসরুকর্তৃক অতঃপর সিংহাসনাধিকারের বাসনা পোষণ। সুলতানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রের কথা জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ্যে আলোচনা। সুলতানের গৃহ শিক্ষক কর্তৃক তাঁহাকে সতর্কীকরণ। কিন্তু তাঁহার কথায় সুলতানের কর্ণপাত না করা। অবশেষে মালিক খসরু কর্তৃক সুলতান নিহত।]

৭১৭ হিজরীর ৭ই মহরম (১৩১৭ খ্রীঃ, ২২ শে মার্চ) মোবারক খিলজী সিংহাসনে আরোহণ করেন। যাহাদের সাহায্যে তিনি সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং যাঁহারা তাঁহার প্রাণ বাঁচাইয়াছিলেন, পদাতিক রক্ষী বাহিনীর সেই প্রধান ও তাঁহার সহকারীকে হত্যা করিবার আদেশ প্রদান করিয়া সুলতান অকৃতজ্ঞতার চরম নিদর্শন স্থাপন করিলেন। অপরাধ আর কিছু নয়—তাঁহারা নাকি সুলতানের উপকার করিয়া অতিরিক্ত আত্মশ্লাঘাবোধ করিতেছিলেন। সম্ভবতঃ উঁহাদের দিক হইতে অনিষ্টের আশঙ্কাতেই সুলতান এই গর্হিত কর্ম করিয়াছিলেন। তিনি যে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অধীনস্থ সমস্ত প্রবীন যোদ্ধাকে অন্যত্র প্রেরণ করেন—তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয়। অতঃপর সুলতান সভাসদদের মধ্যে

অনুগ্রহ বিতরণ করিতে আরম্ভ করেন। কয়েকজন মোগলকে ওমরাহের পদে উন্নীত করা হয়। ইহাতে তিনি সকলের বিরাগভাজন হইয়া পড়েন। হস্তীর তত্ত্বাবধায়ক মালিক দিমার জাফর খান উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং সুলতানের মাতুল মুহাম্মদ মাওলা প্রাপ্ত হইলেন শেরশাহ্ উপাধি। মাওলানা জিয়া-উদ দীনকে সদর জাহান উপাধি প্রদান করা হইল। মালিক কিরান বেগকে রাজ্য-পরিষদের সদস্য মনোনীত করা হইল এবং হাসান নামক গুজরাটের এক নবদীক্ষিত পারওয়ারী[১] ক্রীতদাস, মালিক খসরু উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং সুলতানের অনুগ্রহে রাজ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিতে পরিণত হইলেন। প্রথম দফায় তাঁহাকে দাক্ষিণাত্য বিজেতা মালিক কাফুর ও খাজা হাজী যে ফৌজ পরিচালনা করিতেন—সেই ফৌজের সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করা হইল এবং সেই সঙ্গে তিনি "উজির" খেতাবও প্রাপ্ত হইলেন।

জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্যই হউক বা নিজের পূর্বাবস্থা স্মরণ করিয়াই হউক সুলতান সমস্ত বন্দীশালার দ্বার খুলিয়া দিতে হুকুম দিলেন। ইহার ফলে ১৭,০০০ বন্দীর ভাগ্যে দিবালোক উদ্ভাসিত হইল। সুলতান আর একটি ঘোষণা দ্বারা সমস্ত নির্বাসিত ব্যক্তিকে ফিরাইয়া আনিলেন। তারপর তিনি হুকুম দিলেন প্রত্যেক সিপাহীকে ছয় মাসের বেতন পুরস্কারস্বরূপ প্রদান করা হউক এবং ইহা ছাড়াও তিনি সৈন্যদিগকে আরও অনেক সুবিধা প্রদান করিলেন।

আবেদনকারীরা অবাধে সুলতানের নিকট আসিতে পারিবে—এই মর্মে তিনি এক ফরমান জারি করিলেন। ভূতপূর্ব সুলতানের রাজত্বকালে যাঁহাদের জমি ও জায়গীর বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া হইয়াছিল—তাঁহাদিগকে সেসব প্রত্যার্পণ করা হইল। তাঁহার পিতা কর্তৃক ব্যবসায়ের উপর আরোপিত কুখ্যাত নিয়ন্ত্রণব্যবস্থা ও তৎসংশ্লিষ্ট অতিরিক্ত শুল্ক ও কর তিনি ক্রমশঃ রহিত করিতে থাকেন। ইহার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় স্বাভাবিক পথে ফিরিয়া আসিল। কিন্তু এইসব পরিবর্তন সাধন করিতে যাইয়া তিনি তাঁহার পিতার আমলের কতকগুলি অতি কল্যাণকর ব্যবস্থাও বাতিল করিয়া দিলেন। বিচারবিভাগ

১ পারওয়ারীরা এক প্রকার অস্পৃশ্য হিন্দু। ইহারা সকল জন্তুর মাংস আহার করিত। তাহাদিগকে এমন অপবিত্র বলিয়া গণ্য করা হইত যে, কোন শহরের পরিসীমার মধ্যে তাহাদিগকে বসতি স্থাপন করিতে দেওয়া হইত না।

শীঘ্রই কলুষিত হইয়া উঠিল এবং দুর্নীতি চতুর্দিক হইতে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। ওদিকে সুলতান অসংগত আমোদ-প্রমোদ ও ইন্দ্রিয়সুখ সম্ভোগের স্রোতে গা ঢালিয়া দিলেন। সুলতানের দেখাদেখি সভাসদ্‌রাও এইসব পাপাচারে মাতিয়া উঠিলেন এবং দরবার হইতে সমস্ত দেশে এই সব অনাচার সংক্রামিত হইতে লাগিল।

রাজত্বের প্রথম বৎসরে গুজরাটে বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মোবারক বিখ্যাত আমীর আইন-উল-মুল্‌কের অধীনে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। আইন-উল-মুলক একজন অসাধারণ দক্ষ সেনাপতি ছিলেন। তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া তাহাদের নেতাদিগকে কতল করিলেন। দেশে শান্তি ফিরিয়া আসিল। সুলতান জাফর খানকে গুজরাটের শাসনকর্তার পদ প্রদান করিলেন। সুলতান জাফর খানের কন্যাকে শাদী করিয়াছিলেন। কিছুদিন পর জাফর খানকে সসৈন্যে গুজরাটের রাজধানী নিহারওয়ালায় গমন করিতে হয়। কারণ সেখানে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল। তিনি বিদ্রোহীদিগকে দমন করিয়া তাহাদের সমস্ত জায়গীর বাজেয়াপ্ত করেন এবং তাহাদের ধনরত্ন হস্তগত করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন।

রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে (৭১৮ হিঃ ১৩১৮ খ্রীঃ) সুলতান বিশাল সৈন্য-বাহিনী গঠন করিয়া রাম দেবের জামাতা হরপালকে শাস্তি দানের উদ্দেশে দাক্ষিণাত্য রওয়ানা হন। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া হরপাল মহারাষ্ট্র রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন। দাক্ষিণাত্য যাত্রাকালে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে প্রতিনিধিরূপে কাজ করিবার জন্য সুলতান, শাহীন নামক এক ক্রীতদাসের পুত্রকে দিল্লীতে রাখিয়া যান। শাহীনকে সুলতান ওয়াফা বেগ উপাধি প্রদান করেন। সুলতান সসৈন্যে দেবগিরি আসিয়া পৌঁছিলেন। মুসলমান-দিগকে বাধা দানের জন্য কয়েকজন হিন্দু রাজা তাহাদের সেনাবাহিনী লইয়া হরপালকে সাহায্য করিবার জন্য দেবগিরি আসিয়াছিল। মুসলমান ফৌজের আগমনের সংবাদ পাইয়া হরপাল ও তাঁহার মিত্ররাজারা পলায়ন করিলেন। উহাদের পশ্চাদ্ধাবনের জন্য সুলতান একদল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। তাহারা হরপালকে বন্দী করিয়া আনিল। জীবিতাবস্থায় হরপালের শরীরের চর্ম উঠাইয়া ফেলা হইল এবং তাঁহার মস্তক বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহারই রাজধানীর তোরণের উপর বিদ্ধ করিয়া রাখা হইল। সুলতান অতঃপর দেবগিরি হইতে দ্বার

সমুদ্র পর্যন্ত এলাকায় স্থানে স্থানে কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি বা থানা স্থাপন করিবার আদেশ দিলেন। তিনি দেবগিরিতে একটি মসজিদ নির্মাণ করাইলেন—যাহা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। তাঁহার পিতার অন্যতম ক্রীতদাস মালিক বেগ লাফীকে[১] তিনি দাক্ষিণাত্য বাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করিলেন। সুলতান তাঁহার পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া প্রিয়পাত্র মালিক খসরুকে শাহী নিশান প্রদান করিয়া তাঁহাকে মালাবার অভিমুখে প্রেরণ করিলেন এবং নিজে অতঃপর দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

সুলতান রাজকর্মে উদাসীনতা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন এবং প্রায় সর্বদাই সুরাপানে বিভোর থাকিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া সুলতানের মামাতো ভাই মালিক আসাদ-উদ-দীনের মনে সিংহাসন অধিকারের বাসনা প্রবল হইয়া উঠিল এবং তিনি সুলতানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যেই একজন ইহা ফাঁস করিয়া দেয়। ফলে আসাদ-উদ-দীনকে প্রাণদণ্ড ভোগ করিতে হয়। মোবারকের ভাইরা এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন বলিয়া তিনি কোন প্রমাণ পাইয়াছিলেন কি না, তাহা জানা যায় নাই। তবে এই সময়েই তিনি গোয়ালিয়রে এক ঘাতককে পাঠাইয়া বন্দী শাহজাদাদের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত করিয়াছিলেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা খিজির খানের পত্নী দেবলা দেবীকে আনিয়া সুলতানের হারেমে প্রবেশ করানো হইল।

গুজরাট, দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতের অধিকাংশ এলাকার উপর মোবারকের প্রভুত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পর সুলতান বল্গাহীন অমিতাচার আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি অতি মাত্রায় অহঙ্কারী প্রতিহিংসাপরায়ণ ও অত্যাচারী হইয়া উঠিলেন এবং তাঁহার রুচিবোধ একেবারেই লোপ পাইল। পূর্বে তিনি এরূপ কখনও ছিলেন না। তিনি কাহারও পরামর্শ আর সহ্য করিতে পারেন না ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করিতে পশ্চাদপদ হন না এবং শুধু খেয়াল ও একগুয়েমীর বশে তাহাদিগকে অন্যায় ও নিষ্ঠুরভাবে দণ্ডিত করিতে লাগিলেন। অনেকের মধ্যে গুজরাটের সুবাদার জাফর খানও তাঁহার প্রগলভতার শিকারে পরিণত হইলেন। ওয়াফা বেগেরও

---

১ পারস্যের নিম্নাঞ্চল ফারাসীস্তান নামে পরিচিত। সেই অঞ্চলের আদিমতম অধিবাসীদের এক সম্প্রদায়ের নাম লাফ।

সেই দশা ঘটিল। ইহাদের উপর তিনি এক সময় অনুগ্রহ স্তূপীকৃত করিয়াছিলেন। কোন প্রকার অপরাধ আরোপ না করিয়াই ইহাদিগকে হত্যা করা হইল। মানবচরিত্র যত প্রকারে কলুষিত হইতে পারে—সুলতানের তাহা হইল। তাঁহার এমন মানসিক বিকৃতি ঘটিল যে অভিনেত্রীদের সঙ্গে স্ত্রীলোকের পোশাক পরিধান করিয়া সভাসদদের গৃহে নৃত্য করিতে যাইতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কোন কোন সময় তিনি ঘৃণিত অর্ধ-নগ্ন বীরাঙ্গণাদিগকে সঙ্গে লইয়া শাহীমহলের সম্মুখ দিয়া ঘোরা-ফিরা করিতেন। ওমরাহগণ দরবারে হাজির হইলে তিনি তাহাদের সম্মুখে এই বারবণিতাদিগকে দেহ অনাবৃত করিতে বলিতেন। এইরূপ আরও অনেক জঘন্যকর্ম করিতে লাগিলেন—যাহা উল্লেখ্য নয় এবং এইসবই ছিল তাঁর প্রতিদিনের আমোদ-প্রমোদের বিষয়বস্তু। জাফর খানের মৃত্যুর পর মালিক খসরুর পিতৃব্য হিসাম-উদ-দীন গুজরাটের সুবাদারের পদ প্রাপ্ত হন। গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরই তিনি কতিপয় আমীরের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। গুজরাটের অন্যান্য আমীরগণ তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ এবং তাঁহাকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া দিল্লী প্রেরণ করেন। সুলতান তাঁহার অপরাধ মার্জনা করিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, উপরন্তু তিনি তাঁহাকে পুনরায় প্রিয়পাত্রদের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলেন। তাঁহার স্থলে গুজরাটে ওয়াজ-উদ-দীন কোরেশীকে প্রেরণ করা হইল। এই সময় খবর আসিল যে, দাক্ষিণাত্যের সুবাদার মালিক বেগ লাফী বিদ্রোহ করিয়াছেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য এক সৈন্যবাহিনী প্রেরিত হইল। ইহারা কৌশলে মালিক বেগ ও তাঁহার প্রধান সহকর্মীদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া দিল্লী পাঠাইলেন। সেখানে মালিক বেগের কর্ণচ্ছেদ করা হইল এবং তাঁহার সহচরদিগকে অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করা হইল। দাক্ষিণাত্যের সুবাদারের পদ প্রদান করা হইল আইন-উল-মুলক্‌কে।

মালিক খসরু মালাবারে যাইয়া (হিঃ ৭১৯ : খ্রীঃ ১৩১৯) প্রায় এক বৎসরকাল সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেখানে লুণ্ঠন কার্য চালাইয়া তিনি ১২০টি হস্তী, ১৬৮ রতি ওজনের একটা খাঁটি হিরক খণ্ড, আরও অনেক রত্ন এবং অপরিমিত স্বর্ণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই বিপুল পরিমাণ সম্পদ লাভ করিবার পর তাঁহার মনে উচ্চাশা প্রকট হইয়া উঠিল এবং তিনি দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে মাতিয়া উঠিলেন। কিন্তু তিনি সেনানায়কদের কাহাকেও যখন দলে

টানিতে পারিলেন না, তখন তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশেই তিনি গোয়াদ্বীপের শাসনকর্তা মালিক তুবলি খাঁকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। মালিক তাইমুর ও মালিক গুলকেও তলব করা হইল। এই আফগান আমীরদ্বয় অন্যত্র নিয়োজিত ছিলেন এবং ইঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, মালিক খসরুর দিল্লী প্রত্যাবর্তনের হুকুম হইয়াছে। মালিক খসরুর দুরভিসন্ধির আভাস পাইয়া ইহারা তাঁহার হুকুম তামিল করিতে অস্বীকার করিলেন এবং মালিক খসরুকে রাজদ্রোহী সাব্যস্ত করিয়া দরবারে অভিযোগ প্রেরণ করিলেন। সুলতান হুকুম দিলেন, "মালিক খসরুকে বন্দী করিয়া প্রেরণ করা হউক।" আমীরগণ কোন প্রকারে সুলতানের এই আদেশ কার্যকরী করিতে সমর্থ হইলেন। কিন্তু সুলতানের সম্মুখে যখন তাঁহাকে হাজির করানো হইল, তখন খসরু এমন কৃতিত্বের সঙ্গে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করিলেন এবং এমন বিশ্বাসযোগ্যভাবে অভিযোগকারীদিগের কার্যের সমলোচনা করিলেন যে, সুলতানের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে খসরুর প্রতি বিদ্বেষ ও তাঁহার অধীনে কর্ম করিতে ঘৃণবোধই আমীরদের অভিযোগের মূল কারণ। সুলতান অবিলম্বে অভিযোগকারীদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহারা তাঁহাদের অভিযোগের পক্ষে অকাট্য প্রমাণ পেশ করিলেন। কিন্তু সুলতান তাঁহাদের কোন কথাই শুনিলেন না। তাঁহাদের সকলকে অপদস্ত করিলেন এবং জমিদারী বাজেয়াপ্ত করিয়া তাঁহাদিগকে নিঃসম্বল করিয়া ছাড়িলেন। অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বুঝিলেন যে, মালিক খসরুর শত্রুদের সকলেরই এই দশা ঘটিবে। তাঁহারা নানা অজুহাতে ছুটি লইয়া সাম্রাজ্যের দুরাঞ্চলে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। কয়েকজন তোষামোদকারী মাত্র খসরুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিল। ইহারা সকলেই ভীতির কারণ হইয়া দাঁড়াইল এবং যাহাকিছু সম্মান প্রতিপত্তি ও পদোন্নতি ইহাদেরই ভাগে জুটিতে লাগিল। সুলতানের প্রিয়পাত্রের (খসরু) মনে ইতিমধ্যেই উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাসা বাঁধিয়াছিল এবং এইবার তিনি সিংহাসন অধিকার করিবার উপায় উদ্ভাবন করিতে সচেষ্ট হইলেন।

তাঁহার উদ্দেশ্য সফল করিবার নিমিত্ত তিনি সুলতানের নিকট এই আরজ করিলেন, "আমার রাজভক্তির জন্য জাঁহাপনার নিকট আমি যথোচিত পুরস্কার লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। সামরিক ব্যাপারে আমাকে জাঁহাপনার আরও অনেক খেদমতদানের প্রয়োজন আছে। এইজন্য আমি চাই সুলতান আমাকে

গুজরাট হইতে আমার আত্মীয়-স্বজনকে দিল্লী আনিবার হুকুম দিবেন। অন্যান্য আমীরদের অপেক্ষা তাহাদের উপর আমি নিশ্চয়ই অনেক বেশী নির্ভর করিতে পারিব—কারণ সুলতানের অন্যান্য আমীরগণ আমার পদোন্নতিতে আমার প্রতি ঈর্ষান্বিত।" সুলতান তাঁহার আবেদন মঞ্জুর করিলেন। তখন মালিক খসরু তাঁহার কয়েকজন দালালের মারফত গুজরাটে প্রচুর অর্থ প্রেরণ করিয়া সেই অর্থে খসরুর নিজের সম্প্রদায়ের নিম্নশ্রেণীর লোকদের মধ্যে হইতে ২০,০০০ লোক সংগ্রহ করিয়া দিল্লী আনয়ন করিলেন। প্রত্যেক লাভজনক ও গুরুত্ব-পূর্ণ পদে এইসব অসভ্য লোকদিগকে নিয়োজিত করা হইল। ইহারা মালিক খসরুর স্বার্থের সঙ্গে নিজদিগকে দৃঢ়ভাবে সংশ্লিষ্ট রাখিল।

একদা সুলতান সুরসাওয়ার দিকে শিকারে যাইতেছিলেন। সেই সময় (হিঃ ৭২১ : খ্রীঃ ১৩২১) তাঁহাদের হত্যা করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করা হইয়াছিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে কোন এক বিষয়ে মতানৈক্য হওয়ায় এই সঙ্কল্প তখনকার মত পরিত্যাগ করা হয়। তাহারা স্থির করিল রাজপ্রাসাদেই এই জঘন্য কার্য সমাধা করিবে। রাজধানীতে ফিরিয়া মোবারক পুনরায় ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলেন। ষড়যন্ত্র পাকাপাকি করিয়া মালিক খসরু একদিন এক অনুকূল মুহূর্তে তাঁহার বন্ধুদিগকে প্রাসাদের বহিরাঙ্গনে ভোজদানের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সুলতান যে শুধু তাঁহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিলেন তাহাই নয়—তিনি তাহাদিগকে সব সময়ের জন্য অবাধে প্রাসাদে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রদান করিলেন। ফলে প্রসাদ প্রাঙ্গণ খসরুর অনুচরদের দ্বারা জনাকীর্ণ হইয়া উঠিল। এমনকি সুলতানকে খুন করিবার কথাও গোপন ছিল না। মালিক খসরু কর্তৃক এই কার্যে নিয়োজিত বেপরোয়া ও লম্পট লোকদের নিকট হইতে শহরের অনেক লোকই ইহা জানিয়া ফেলিয়াছিল। কিন্তু সুলতানের প্রতি তাঁহার এতো বেশী প্রভাব ছিল যে, এ কথা কেহই সুলতানদের নিকট প্রকাশ করিতে সাহস করিল না। অবশেষে শহরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিদ্বান ব্যক্তি কাজী জিয়া-উদ-দীন কোন প্রকারে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সুলতানকে সতর্ক করিয়া দেন যে, এরূপ এক ষড়যন্ত্রের কথা শহরময় রাষ্ট্র হইয়াছে। সুলতানের বাল্যাবস্থায় কাজী জিয়া-উদ-দীন তাঁহার শিক্ষক ছিলেন। তিনি সুপারিশ করিলেন যে, কালবিলম্ব না করিয়া খসরুকে বন্দী করিতে হইবে এবং তারপর সত্যতা নিরূপণের জন্য তদন্তের ব্যবস্থা করিতে

হইবে। তিনি সুলতানকে বুঝাইলেন যে, এরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দ্বিধাবোধ করা উচিত নয়—কারণ তদন্তের ফলে ইহা যদি নিঃসন্দেহে অমূলক প্রতিপন্ন হয়, তাহা হইলে খসরু মালিকের লাভই হইবে। কেননা তাহা হইলে তিনি সুলনতানের আরও অধিক প্রিয়পাত্র হইবেন। ঠিক এই সময় খসরু মালিক স্ত্রীলোকের বেশে এবং সর্বতোভাবে স্ত্রীলোকের মত অঙ্গভঙ্গী সহকারে কক্ষে প্রবেশ করিলেন। তিনি সব কথা শুনিয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিবা-মাত্র সুলতান দণ্ডায়মান হইয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং কাজী জিয়া-উদ-দীন কি বলিয়াছিলেন সব ভুলিয়া গেলেন। সেই রাত্রে কাজীর চক্ষে ঘুম আসিল না— আসন্ন বিশ্বাসঘাতকতার আশঙ্কায় তাঁহার অন্তর দুলিতেছিল। প্রহরীরা জাগিয়া আছে কি না দেখিবার জন্য তিনি প্রায় মধ্যরাত্রে বাহিরে আসিলেন। পথে খসরুর চাচা মান্দুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে তাঁহাকে কথাবার্তায় আটকাইয়া ফেলিল। ইতিমধ্যে জহিরবা নামক এক দুর্বৃত্ত পিছন দিক হইতে আসিয়া তলোয়ারের এক আঘাতে তাঁহাকে ভূলতশায়ী করিল। "রাজদ্রোহ। রাজদ্রোহ। খুন্। রাজদ্রোহ শুরু হইয়াছে"—এই কয়েকটি কথা কোন প্রকারে উচ্চারণ করিতেই কাজী সাহেবের জীবন প্রদীপ নির্বাপিত হইল। দুই তিন জন ভৃত্য যাহারা কাজী সাহেবের সঙ্গে ছিল, তাহারা—"কাজী সাহেব খুন, কাজী সাহেব খুন" বলিয়া চিৎকার করিতে করিতে ছুটিয়া পালাইল। প্রহরীরা মহা গোলমালের মধ্যে জাগিয়া উঠিল। কিন্তু ষড়যন্ত্রকারীরা অমনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বসিল এবং আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইবার পূর্বেই তাহাদিগকে খতম করিয়া ফেলিল।

হৈচৈ শুনিয়া আতঙ্কগ্রস্ত সুলতান, মালিক খসরুকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মালিক খসরু সুলতানের কক্ষেই ছিলেন। শয়তান এমনভাব দেখাইলেন যেন তিনি কিছুই জানেন না। অনুসন্ধান করিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেলেন। ছাদে যাইয়া কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "প্রহরীদের কয়েকটি ঘোড়া বন্ধন মুক্ত হইয়া মারামারি শুরু করিয়া দিয়াছে এবং তাহারা উহাদিগকে বাঁধিবার চেষ্টা করিতেছে।" ইহাতে মোবারক তখনকার মত আশ্বস্ত হইলেন। শিগ্রই ষড়যন্ত্রকারীরা সিড়ি বাহিয়া সুলতানের শয়ন কক্ষের সম্মুখস্থ ছাদে উঠিয়া পড়িল। এইখানে ইব্রাহিম ও ইছাহাক নামক দুই ভৃত্য তাহাদিগকে বাধা দিল এবং খাসকামরার শান্ত্রীরাও তাহাদের

সঙ্গে যোগ দিল। কিন্তু তাহাদের সকলকেই কাটিয়া ফেলা হইল। নিকটেই এইরূপ অস্ত্রের ঠোকাঠুকীও মুমূর্ষুর গোঙানি শুনিয়া সুলতান আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া শয্যা ত্যাগ করিলেন এবং একটা গোপন পথ দিয়া হারেমের দিকে ছুটিলেন। সুলতান পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিতে পারেন—এই আশঙ্কায় মালিক খসরু পিছু ছুটিয়া যাইয়া সুলতানকে চুলে ধরিয়া আটকাইয়া ফেলিলেন। সেখানে কিছুক্ষণ দুই জনের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি হইল। মোবারকের গায়ে বেশী জোর ছিল। তিনি খসরুকে মাটিতে ফেলিয়া দিলেন। কিন্তু খসরু এমনভাবে সুলতানের চুল তাঁহার হাতে পাকাইয়া ফেলিয়াছিলেন যে সুলতান কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিলেন না। শেষ পর্যন্ত অন্য ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন আসিয়া পড়িল এবং তলোয়ারের এক আঘাতে সুলতানের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিম্নে প্রাঙ্গণে নিক্ষেপ করিল।

ওদিকে নীচে প্রাসাদ-রক্ষী সৈন্য ও সুলতানের ভৃত্যারা নানাদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের উপর দৃঢ়ভাবে চাপ দিতেছিল। কিন্তু সুলতান খুন হইয়াছে এই সংবাদ শুনিবামাত্র তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া প্রাসাদের বাহিরের দিকে ছুটিয়া পালাইতে লাগিল। ষড়যন্ত্রকারীরা এই সময় প্রাসাদের তোরণ বন্ধ করিয়া দিল। যাহারা পালাইতে পারে নাই তাঁহারা মারা পড়িল। পাষণ্ডরা ইহার পর মহিলাদের মহলে ঢুকিয়া পড়িয়া শাহ্‌জাদা ফরিদ খানের মাতা, আলা-উদ-দীনের কনিষ্ঠ পুত্রগণ ও শাহ্‌জাদা ফরিদ আলী ও ওমরকে হত্যা করিল। ইহা ছাড়াও হারেমের মহিলাদের উপর তাহাদের পাশবিক বাসনা যথেচ্ছা চরিতার্থ করিল। এইরূপে বিধাতার রোষে আলা-উদ-দীনের বংশ নির্মূল হইল। পিতৃব্য ফিরোজকে হত্যার পাপ ও অসংখ্য নিরপরাধ নরনারীর রক্তপাতের পাপের এইরূপে প্রায়শ্চিত্ত হইল। তাঁহার পুত্র মোবারকের উপরও খোদার গজব নাযিল হইল। তাঁহার নাম ও ঘৃণিত কার্যাবলীর বিবরণ কিতাবে স্থান পাওয়ার যোগ্য নয়। কিন্তু ঐতিহাসিকের কর্তব্যজ্ঞান আমাদিগকে এই নীচ কাজ করিতে বাধ্য করিয়াছে। তবুও কয়েক স্থানে আমরা কতকগুলি ঘটনার উপর আবরণ টানিতে বাধ্য হইয়াছি—কারণ সেসব এমন লোমহর্ষক ও জঘন্য যে তাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না।

৭২১ হিজরীর ২৫শে রবি-উল-আউয়াল (মার্চ, ১৩২১ খ্রীঃ) এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। প্রভাতে মালিক খসরু অনুচর পরিবৃত হইয়া সিংহাসনে

আরোহণ করিলেন এবং নাসির-উদ-দীন উপাধি ধারণ করিলেন। মোবারকের ভৃত্য ও গোলামদের মধ্যে যাহাদের বিন্দু মাত্র সততা ছিল বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল—তিনি তাহাদের সকলকে কতল করিয়া ফেলিবার হুকুম দিলেন এবং তাহাদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করাইলেন। তাঁহার ভ্রাতাকে—"খান খানান বা ওমরাহদের প্রধান"—এই উপাধিতে ভূষিত করিলেন এবং আলা-উদ-দীনের এক কন্যার সঙ্গে তাহার শাদী দিলেন। তাঁহার বিগত প্রভু ও সুলতানের বিধবা স্ত্রী দেবলা দেবীকে খসরু নিজে গ্রহণ করিলেন এবং হারেমের অন্যান্য মহিলাদিগকে তাঁহার ভিক্ষুক-সদৃশ আত্মীয়দের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিলেন। তারপর গৃহরক্ষী সৈন্যদিগকে ঘুষ দেওয়ার পালা।[৩] বিপ্লবের চেয়ে বড় আর কিছু ইহাদের কাম্য ছিল না—কারণ প্রত্যেক বিপ্লবের পর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ছয় মাসের বেতনের পরিমাণ অর্থ ইহারা পুরস্কারস্বরূপ লাভ করিয়া আসিতেছিল। কোন প্রকার কৃতজ্ঞতা বা আত্মসম্মানবোধ ইহাদের ছিল না। অতি সামান্য মূল্যে এইসব হৃদয়হীন ক্রীতদাসদের সাহায্য ক্রয় করা সম্ভব হইত।

কিমার নামক এক দস্যুসর্দারের পুত্রকে শায়েস্তা খান উপাধি প্রদান করিয়া প্রধান কর্মসচিব নিযুক্ত করা হইল। আর আইন-উদ-মুলক্ মুলতানীকে সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক মনোনীত করা হইল। মালিক ফকর-উদ-দীন জুনা খান খসরু খান উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং তাঁহাকে 'আখুর বেগ' বা অশ্বের প্রধান তত্ত্বাবধায়ক এবং আরও অনেক সম্মানজনক মর্যাদা প্রদান করা হইল। তাঁহার পিতা লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তা গাজী বেগ তুগলুককে দলে ভিড়াইবার জন্যই জুনা খানের উপর অপর্যাপ্ত অনুগ্রহ বর্ষণ করা হইল। আত্মসাৎকারী, গাজী বেগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। পদোন্নতি সত্ত্বেও যেসব কাণ্ড ঘটিয়াছিল তাহাতে জুনা খান অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিল। তাঁহার পিতা অসম সাহসী ও আত্মমর্যাদাজ্ঞানশীল ব্যক্তি বলিয়া খ্যাত ছিলেন। দরবারে যেসব জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হইয়াছিল তাহা অবগত হইয়া তিনি ক্রোধে আত্মহারা হইলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি পুত্রকে তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন এবং জুনা খান প্রথম সুযোগেই দিল্লী হইতে পালাইয়া

৩ ইতিহাসের পাঠক মাত্রই এইরূপ বিপ্লবে কি ঘটিয়া থাকে তাহা স্মরণ করিবেন—সে বিপ্লব রোমের কনস্টান্টিনোপল বা দিল্লীতেই হউক।

আসিয়া পিতার সঙ্গে মিলিত হইলেন। জুনা খানের পলায়নে আত্মসাৎকারী হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন এবং নিজের শক্তিতে আস্থাহীন হইয়া পড়িতে লাগিলেন। গাজী বেগ তুগলুক আর কালক্ষেপ না করিয়া শত্রুতার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তিনি গোপনে পত্র দ্বারা প্রত্যেক ওমরাহকে পতাকাতলে সমবেত হইবার আহ্বান জানাইলেন। অনেক প্রদেশের সুবাদারই তাঁহার সাহায্যার্থে সৈন্যবাহিনী রওয়ানা করিয়া দিলেন। কিন্তু মুলতানের সুবাদার মোগল তুগীন এই বিপ্লবে সাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। এইজন্য তিনি এই মিত্র-বাহিনীর সঙ্গে যোগদান করিতে অস্বীকার করেন। ফলে তিনি বৈরাম আবিয়া নামক সেই অঞ্চলের এক গোলাম সর্দারের হস্তে নিহত হইলেন। সামানার শাসনকর্তা মালিক বেগ লাফী, গাজী বেগ তুগলুকের গোপনপত্র খসরু মালিকের নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্রোহ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল করাইলেন—যদিও খসরু মালিকের জন্য তাহার কর্ণচ্ছেদ হইয়াছিল। মালিক বেগ মিত্র-বাহিনীর মোকাবিলা করিতে যাইয়া সম্পূর্ণ পরাস্ত হন এবং দিল্লী অভিমুখে পলায়নকালে জমিদারগণ কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হন। আত্মসাৎকারী এইবার তাঁহার ভ্রাতা খান-খানান ও ইউসুফ সফিকে নির্ভরযোগ্য আর সকলের সংগে মিত্র-বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন।

মুলতান হইতে আগত বৈরাম আবিয়া ও অন্যান্য প্রদেশের সুবাদারদের ফৌজ একত্র করিয়া গাজী বেগ আত্মসাৎকারীর বাহিনীর মোকাবিলা করিবার জন্য সরস্বতী তীরে আসিয়া হাজির হইলেন। গাজী বেগের সৈন্যরা পুনঃ পুনঃ মোগলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অত্যধিক পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। ওদিকে আলস্যে ও ইন্দ্রিয়ভোগে সময় কাটাইয়া খসরু মালিকের সৈন্যরা অথর্ব হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা ছাড়া উহাদের কোন সামরিক মর্যাদাবোধও ছিল না। প্রথম ধাক্কাতেই তাহারা ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইতে লাগিল এবং তাহাদের কোষাগার, হস্তী ও সরঞ্জামাদি সব শত্রুহস্তে পতিত হইল। বিজেতারা যুদ্ধ-ক্ষেত্রেই লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি বণ্টন করিয়া লইল। তারপর তাহারা বিজয়োল্লাসে দিল্লীর দিকে ধাবিত হইল। মাহাবিভ্রান্তির মধ্যে আত্মসাৎকারী শহর হইতে বহির্গত হইয়া হাউজে আলা-উদ-দীনীর নিকট এক সুদৃঢ় স্থানে সৈন্য সমাবেশ করেন। ইহার পশ্চাতে থাকিল কেল্লা এবং সম্মুখে রহিল উচ্চ প্রাচীরবিশিষ্ট কতিপয় উদ্যান। তিনি কোষাগার উজাড় করিয়া সৈন্যদিগকে তিন বৎসরের

বেতন প্রদান করিলেন। নিজের জন্য রত্নাদি ব্যতীত আর কিছুই রাখিলেন না। রত্নেরও কিছু অংশ বিতরণ করিয়া দিলেন। মিত্রবাহিনী আসিয়া পড়িল। পরদিন প্রভাতে যুদ্ধ শুরু হইবে মনে হইল। কিন্তু রাত্রিকালে আইন-উল-মুল্‌ক মুলতানী তাঁহার সৈন্যসহ আত্মসাৎকারীর দলত্যাগ করিয়া মান্দু অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। ইহাতে খসরুর সৈন্যবল অনেক হ্রাস পাইল। তবুও তাঁহার ফৌজ যুদ্ধের জন্য কাতারবন্দী হইয়া দণ্ডায়মান হইল। গলিপথে অগ্রসর হইবার কালে মালিক তাবলিঘা ও শায়েস্তা খান মহাবিক্রমে মিত্র-বাহিনীকে বাধাদান করিল। কিন্তু ইহাদের শক্তিতে কুলাইল না—তাহারা উভয়েই নিহত হইল। আত্মসাৎকারীর বাহিনী এমন সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া লইয়াছিল যে তাহারা সন্ধ্যা পর্যন্ত অনায়াসে আত্মরক্ষা করিতে পারিত। কিন্তু খসরু মালিক সন্ধ্যার দিকে কয়েকজন বন্ধুসহ জিলপুতের দিকে পলায়ন করিলেন (রজব ৩০, ৭২১; আগস্ট ২২, ১৩২১ খ্রীঃ)। পথে তাঁহার অধিকাংশ অনুচরই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল এবং তিনি এক কবরে লুকাইতে বাধ্য হইলেন। পরদিন তাঁহাকে সেখান হইতে টানিয়া বাহির করা হইল এবং ভ্রাতার সঙ্গে তাঁহাকে মৃত্যু-দণ্ড প্রদান করা হইল। তাঁহার ভ্রাতা নিকটস্থ এক উদ্যানে ধৃত হইয়াছিল। এই ঘটনার পরদিন (১লা সাবান ৭২১ হিঃ; ২২শে আগস্ট ১৩২১ খ্রীঃ) আমীর ওমরাহ ও শহরের ফৌজদাররা বিজয়ীকে মোবারকবাদ জানাইতে আসিলেন। তাঁহাকে শহরের চাবি প্রদান করা হইল। গাজী বেগ অশ্বারূঢ় হইয়া বিজয় গর্বে শহরে প্রবেশ করিলেন। 'হাজার মিনার' প্রাসাদের সম্মুখে আসিয়া তিনি রোদন করিতে লাগিলেন এবং উচ্চস্বরে বিলাপ করিয়া বলিলেন, "হে মহা সাম্রাজ্যের অধিবাসীবৃন্দ আমি তোমাদেরই মত একজন। জালিমের হাত হইতে তোমাদিগকে নাজাত করিবার জন্য এবং দুনিয়াকে রাক্ষসের কবল হইতে মুক্ত করিবার জন্যই আমি অসি কোষমুক্ত করিয়াছিলাম। আল্লার রহমতে আমার সে প্রচেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শাহী খান্দানের কেহ যদি এখনও জীবিত থাকে তাঁহাকে এখানে আনিয়া তাঁহার প্রতি সুবিচার করা হউক। আমরা সকলে তাঁহার বান্দা হিসাবে তাঁহার তখতের সম্মুখে ভূ-লুণ্ঠিত হইয়া তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি। আর যদি জালিমের রক্তাক্ত হস্ত হইতে কেহ পরিত্রাণ না পাইয়া থাকে, ওমরাহদের মধ্যে যে ব্যক্তি যোগ্যতম তাঁহাকেই আপনারা সুলতান নির্বাচিত করুন। আমি শপথ করিয়া বলিতেছি,

যে, আমি আপনাদের নির্বাচন সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করিব।" সমবেত জনতা সমস্বরে চিৎকার করিয়া বলিলেন। শাহ্জাদাদের মধ্যে কেহই জীবিত নাই। আপনি আমাদিগকে মোগলদের জিঘাংসা হইতে বর্মবৎ রক্ষা করিয়াছেন এবং জালিমের কোপানল হইতে বাঁচাইয়াছেন। রাজ্যভার গ্রহণ করিতে আপনার অপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তি আর কেহ নাই। অতঃপর জনতা তাঁহাকে উঠাইয়া লইয়া তখতে বসাইল এবং শাহজাহান বা বিশ্ব-সম্রাট বলিয়া তাঁহাকে অভিবাদন করিল। কিন্তু তিনি 'গিয়াস-উদ-দীন' এই অনাড়ম্বর উপাধি গ্রহণ করিয়াই তুষ্ট রহিলেন। খসরুর রাজত্বকাল মাত্র পাঁচ মাস স্থায়ী হইয়াছিল।

গিয়াস-উদ-দীন তোগলক

[নূতন মন্ত্রীসভা গঠন। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এক সেনাবাহিনীসহ তেলিঙ্গানায় প্রেরিত। ওয়ারাঙ্গল অবরোধ ও সেনাপতিদের মধ্যে অসন্তোষ। সৈন্যদের নানা দিকে গমন। শাহজাদার পুনরায় ওয়ারাঙ্গল গমন ও অধিকার। রাজা সপরিবারে দিল্লী প্রেরিত। শাহজাদার জাজনগর গমন, পুনরায় ওয়ারাঙ্গল আগমন এবং সেখান হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তন। পুত্রকে দিল্লী রাখিয়া সুলতানের বাঙ্গালা গমন। তিরহুল আক্রমণ এবং তারপর দিল্লী অভিমুখে যাত্রা। আফগানপুরে পুত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ। পিতার অভ্যর্থনার জন্য শাহ্জাদা কর্তৃক এক অস্থায়ী ইমারত নির্মাণ। ইমারত ধ্বসিয়া পড়ায় কতিপয় অনুচরসহ সুলতানের জীবনাবসান।]

কি প্রাচীন কি আধুনিক—সকল ঐতিহাসিকই এই সুলতানের উৎপত্তি সম্বন্ধে নীরব। ইহার ফলে তাঁহার পূর্বপুরুষদের সম্বন্ধে কোন তথ্যই প্রকৃতপক্ষে জানা যায় নাই। আমি (এই গ্রন্থের রচয়িতা মুহম্মদ কাসিম ফিরিশ্‌তা) যখন আমার মুনীব বিজাপুরের সুলতান ইব্রাহীম আদিল শাহ কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া লাহোরের বাদশাহ জাহাঙ্গীরের দরবারে গিয়াছিলাম, তখন সেখানে ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানসম্পন্ন কয়েক ব্যক্তির সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাঁহাদের নিকট হইতে তোগলক বংশ সম্পর্কে তাঁহাদের যাহা জানা ছিল, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইয়াছি। তাঁহারা সকলেই একমত যে, এবিষয়ে কোন লিখিত বিবরণ নাই। কিন্তু তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, লোক-পরম্পরায় এই কথা সকলের মধ্যে প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল যে, গিয়াস-উদ-দীনের পিতার নাম তোগলক এবং তিনি গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের একজন তুর্কী গোলাম ছিলেন। তোগলক জাট সম্প্রদায়ের (লাহোর ও লাহোরের নিকটবর্তী অঞ্চলের কৃষক সম্প্রদায়) এক স্ত্রীলোককে শাদী করিয়াছিলেন এবং তিনিই ছিলেন গিয়াস-উদ দীন তোগলকের মাতা। মুলহিকাতের লেখক বলেন যে, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল কুতলুখ—উহাই পরিবর্তিত হইয়া হয় কুত্‌লু এবং পরে আরও বিকৃত হইয়া তোগলক হয়।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া গিয়াস-উদ-দীন তোগলক, বিশৃঙ্খল ও অরাজক শাসনব্যবস্থাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরাইয়া আনিলেন এবং

এমন সন্তোষজনকভাবে শাসনতন্ত্র সুনিয়ন্ত্রিত করিয়া ফেলিলেন যে, সকলে প্রশংসায় মুখর হইয়া উঠিল। তিনি পুরাতন প্রাসাদ ও কেল্লাগুলি মেরামত করাইলেন, কতকগুলি নূতন ইমারত তৈয়ার করাইলেন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দান করিতে লাগিলেন। তিনি রাজ্যের বিদ্বান ও প্রতিভাবান ব্যক্তিদিগকে দরবারে নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং তাহাদের দ্বারা বেসামরিক শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কোরানভিত্তিক অথচ পূর্ববর্তী দিল্লীর সুলতানগণ কর্তৃক অনুসৃত নীতি ও ব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধানাবলী সম্বলিত এক আইন পুস্তক প্রণয়ন করাইলেন।

সুলতান জ্যেষ্ঠপুত্র মালিক ফখর-উদ-দীন জুনাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহাকে আলফ খান উপাধি ও শাহীমর্যাদা প্রদান করিলেন। বৈরাম, জাফর, মাহমুদ ও নসরৎ নামে সুলতানের আরও চারি পুত্র ছিলেন। বৈরাম আবিয়াকে সুলতান ভ্রাতা রূপে গ্রহণ করিলেন—যিনি মুলতানের সেনাবাহিনী লইয়া তাঁহাকে কৃতিত্বের সঙ্গে সাহায্য করিয়াছিলেন (হিঃ ৭২১ ঃ খ্রীঃ ১৩২১)। তাঁহাকে কিসলু খান উপাধি প্রদান করিয়া সিন্ধু এলাকার প্রদেশগুলিতে সুলতানের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত করা হইল। সুলতানের ভাগ্নেয় আসাদ-উদ-দীনকে আরিজুল-মুমালিক নিযুক্ত করা হইল। ভরণ পোষণের জন্য মালিক বাহা-উদ-দীনকে সামানা প্রদেশ প্রদান করা হইল। সুলতান তাঁহার অন্য ভাগ্নেয় ও জামাতা মালিক শাদীকে উজির মনোনীত করিলেন। মালিক বুরহান-উদ-দীন দেবগিরির ও সুলতানের পোষ্যপুত্র তাতার খান জাফরাবাদের শাসনভার প্রাপ্ত হইলেন।

সুলতান ইতিমধ্যেই কাবুল সীমান্তে সৈন্য স্থাপন করিলেন এবং মোগল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য দুর্গাদি নির্মাণ করিয়া সীমান্তের রক্ষণব্যবস্থা দৃঢ় করিলেন। এই ব্যবস্থার দ্বারা সুলতানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে সাধিত হইল। তাঁহার জীবদ্দশায় আর তাঁহাকে মোগল আক্রমণ লইয়া মাথা ঘামাইতে হয় নাই। রাজত্বের দ্বিতীয় বৎসরে সুলতান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র আলফ খানকে চান্দেরী, বাদায়ুন ও মালবের সম্মিলিত সেনাবাহিনীসহ তেলিঙ্গানার দিকে প্রেরণ করেন। শাহাজাদার সঙ্গে কয়েকজন প্রবীণ আমীর ছিলেন। খুব সম্ভব বিগত গোলযোগের সময় ওয়ারাঙ্গলের রাজা লুদ্দর দেব কর প্রদান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন এবং দেবগিরি রাজ্যেও বোধ হয় বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি

হইয়াছিল। শাহজাদা আলফ খান এই অঞ্চলে প্রবেশ করিয়াই ব্যাপকভাবে লুটতরাজ শুরু করিয়া দিলেন। রুদ্র দেব অসীম সাহসিকতার সঙ্গে মুসলমানদিগকে বাধাদান করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পিছু হটিয়া ওয়ারাঙ্গল দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন।

অবরোধ চলিল। উভয়পক্ষে বহুলোক হতাহত হইল। দুর্গটি অল্পদিন পূর্বেই মেরামত করা হইয়াছিল। এই জন্য উহার প্রাচীরে কোথাও ভাঙ্গন সৃষ্টি করা সম্ভব হইল না। এদিকে উষ্ণ বাতাস ও চরম আবহাওয়ার দরুন মুসলমান শিবিরে মহামারী দেখা দিল। প্রতিদিন মহামারীর কবলে শতশত লোক পতিত হইতে লাগিল। অনেকেই গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইল এবং তাঁহারা উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য মিথ্যা গুজব ছড়াইতে লাগিল। ফলে সৈন্যদের মধ্যে বিশেষ আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। মাসাধিক কাল দিল্লী হইতে কোন সংবাদ আসিয়া পৌঁছায় নাই। দামাস্কাসের এক শেখজাদা, ওবায়েদ নামক এক কবি এবং শাহজাদার আরও কতিপয় সহচর প্রচার করিয়াছিলেন যে, সুলতান ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং ইতিমধ্যে দিল্লীতে এক রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হইয়া গিয়াছে। গুজব রটনাকারীরা এখানেই ক্ষান্ত হইল না। তাহারা সীল মহর রক্ষক মালিক কাফুর ও মালিক তুগীনের শিবিরে যাইয়া তাহাদিগকে দিল্লীর কাল্পনিক বিপ্লবের কথা অবগত করাইল। ইঁহারা উভয়েই উচ্চপদস্থ সেনা-নায়ক ছিলেন। কুচক্রীরা এই সেনাপতিদ্বয়কে সতর্ক করিয়া দিল যে, সিংহাসনের সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সন্দেহ করিয়া শাহজাদা আলফ খান তাঁহাদিগকে ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন।

এই মিথ্যা সংবাদে প্রতারিত হইয়া উক্ত সেনাপতিদ্বয় সেই রাত্রেই তাঁহাদের সমস্ত অনুচরসহ শিবির ত্যাগ করেন। সেনাবাহিনীর একাংশ হারাইয়া নিরুপায় শাহজাদা আলফ খান অবরোধ উঠাইয়া শশব্যস্ত বিশৃঙ্খলভাবে দেব-গিরি অভিমুখে পলায়ন করিলেন (হিঃ ৭২২ : খ্রীঃ ১৩২২)। শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহার বহুলোককে হত্যা করিল। দেবগিরি পৌঁছিয়া তিনি অনতিকাল পূর্বে লিখিত দিল্লীর এক পত্র প্রাপ্ত হইলেন। এই পত্র পাঠে গুজবের অসারতা প্রমাণিত হয়। শাহজাদা সেখানে থামিয়া বিক্ষিপ্ত সৈন্যদলকে একত্রিত করিলেন। দলত্যাগকারী সেনাপতিদের মধ্যে মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় তাঁহারা প্রত্যেকে স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেন। বিধর্মীরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের

হস্তী, উষ্ট্র ও মালপত্র সব লুণ্ঠন করিয়া লয় এবং পথে আরও নানাভাবে তাহাদিগকে লাঞ্ছিত করে; ইহাদের মধ্যে মালিক তাইমুর ও মালিক তুগীন প্রাণ হারান। এক হিন্দু রাজার কারাগারে মালিক তাইমুরের জীবনাবসান ঘটে। মালিক তুগীন মারাঠাদের হস্তে নিহত হন। মালিক গুন আফগান ও মালিক কাফুর নামক অন্য দুই পলাতক সর্দারকে সৈন্যরা বাঁধিয়া দেবগিরি লইয়া আসে। তাঁহাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনুসন্ধানের জন্য তদন্তের ব্যবস্থা হইল। গুজব রটনাকারীরা ধরা পড়িল। তাহাদিগকে বাঁধিয়া দিল্লী প্রেরণ করা হইল। দিল্লী পৌঁছিলে সুলতান তাহাদিগকে জীবন্ত কবর দেওয়ার হুকুম দিলেন এবং মন্তব্য করিলেন যে, "তাহারা আমাকে মিছামিছি জীবন্ত কবর দিয়াছিল, আমি তাহাদিগকে সত্যিকারভাবেই জীবন্ত কবর দিলাম"।

দেবগিরি হইতে পশ্চাদাপসরণ করিয়া তাঁহার বিশাল সেনাবাহিনীর মধ্যে মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া শাহজাদা দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। দুই মাসের মধ্যে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তিনি পুনরায় ওয়ারাঙ্গল অভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে তেলিঙ্গানা সীমান্তে অবস্থিত ওয়ারাঙ্গল রাজার এলাকাধীন বিদর রাজ্য নগর অবরোধ ও অধিকার করেন। তিনি আরও কয়েকটি স্থান অধিকার করিয়া সেসব স্থানে সৈন্য মোতায়েন করিয়া যান। ইহার পর তিনি রাজধানী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া পুনরায় ওয়ারাঙ্গল অবরোধ করেন এবং রাজাকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। কয়েক সহস্র হিন্দুকে হত্যা করা হইল। লুদ্দর দেবকে সপরিবার বন্দী করিয়া কোষাগার, হস্তী ও সমস্ত ব্যক্তিগত সম্পদাদিসহ কুদ্দর খান ও খাজা হাজীর তত্ত্বাবধানে তাঁহাকে দিল্লী প্রেরণ করা হইল। এই খাজা হাজীই মালিক কাফুরের অধীনে দ্বিতীয় সেনাপতিরূপে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা দিল্লী পৌঁছিলে নূতন কেল্লায় মহা ধুমধামের ব্যবস্থা করা হইল। নূতন কেল্লার নির্মাণকার্য সবেমাত্র শেষ হইয়াছিল এবং উহার নামকরণ হইয়াছিল 'তোগলকাবাদ'। তেলিঙ্গানা রাজ্য শাসনের জন্য আলফ খান অনেক কর্মচারী নিযুক্ত করিলেন এবং ওয়ারাঙ্গলের নাম দিলেন সুলতানপুর।[১] অতঃপর আলফ খান নিজে জাজনগর অভিমুখে যাত্রা করেন। এই সময় তিনি রাজার নিকট

১ অতি শীঘ্র ওয়ারাঙ্গল তাহার মুসলমান নাম হারায় এবং অদ্যাবধি উহা প্রাচীন হিন্দু নামই ধারণ করিয়া রহিয়াছে।

হইতে ৪০টি হস্তী লইয়া পিতার নিকট প্রেরণ করেন। তিনি পুনরায় ওয়ারাঙ্গল ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিবার পর দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ৭২৪ হিজরীর প্রথম ভাগে (খ্রীঃ ১৩২৩) লক্ষ্ণাবতী ও সোনারগাঁও হইতে খবর আসিল যে, তথাকার শাসনকর্তারা লোকের উপর অত্যাচার করিতেছেন। আলফ খানের উপর দিল্লীর শাসনভার ন্যস্ত করিয়া গিয়াস-উদ-দীন তোগলক স্বয়ং বাঙ্গালার পথে রওয়ানা হইলেন। তিনি নাহিব[২] আসিয়া পৌঁছিলে গিয়াস-উদ-দীন বুলবনের পুত্র ও কায়কোবাদের পিতা নাসির-উদ-দীন কারাখান, সুলতানকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য বহু মূল্যবান উপহারসহ লক্ষ্ণাবতী হইতে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তার পদে স্থায়ীভাবে বহাল করা হইল এবং তাঁহাকে রাজকীয় মর্যাদাসূচক চিহ্নাদি ব্যবহার করিবার অনুমতি প্রদান করা হইল। দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পূর্বে সুলতান তাঁহার পোষ্য-পুত্র তাতার খানকে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন এবং তাহাকে বাহাদুর শাহ নামক আলা-উদ-দীন খিলজীর আমলের এক আমীরকে দমন করিবার নির্দেশ-দান করেন। বাহাদুর শাহ যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং পরে তাতার খান কর্তৃক বন্দী হইয়া সুলতানের নিকট প্রেরিত হন। ফতহ-স্-সালাতিনে[৩] বর্ণিত আছে যে, সুলতান যখন তিরহুতের পার্বত্যাঞ্চলের নিকট দিয়া গমন করিতেছিলেন, তখন তিরহুতের রাজা সশস্ত্র সেনাবাহিনী লইয়া পথরোধ করেন। রাজাকে জঙ্গলের মধ্যে খেদাইয়া লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু জঙ্গল ভেদ করিয়া সেনাবাহিনীর অগ্রসর হওয়া অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। তখন সুলতান অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া স্বহস্তে কুঠার দ্বারা একটা বৃক্ষ ভূপাতিত করিয়া ফেলিলেন। ইহা দর্শনে সুলতানের সৈন্যরা এমন উৎসাহের সঙ্গে জঙ্গল কাটিয়া সাফ করিতে লাগিল যে, মনে হইল জঙ্গল যেন তাহাদের সম্মুখ হইতে গায়েব হইয়া যাইতেছে। অবশেষে তাহারা একটা দুর্গের নিকট আসিয়া পৌঁছিল। দুর্গটি জলপূর্ণ সাতটি পরিখা এবং একটি সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল। সুলতান দুর্গটি অবরোধ করিয়া তিন সপ্তাহের মধ্যে পরিখাগুলি

২ পাণ্ডুলিপিতে এই নামটি অস্পষ্টভাবে লেখা আছে। খুব সম্ভব ইহা ভুল।

৩ আমার মনে হয় ফতহ-স্-সালাতিন বা সুলতানদের বিজয়-কাহিনী একটা অপ্রামাণ্য সংকলন মাত্র। জামিউল হিকায়েত বা অন্যান্য চমকপ্রদ ঐতিহাসিক গল্পগুচ্ছের পর্যায়ে ইহাকে ফেলা যাইতে পারে।

ভরাট করাইলেন এবং প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। রাজাকে সপরিবারে বন্দী করা হইল এবং সুলতান অনেক ধনসম্পদ প্রাপ্ত হইলেন। অতঃপর মালিক তাবলিখার পুত্র আহমদ খানের উপর তিরহুতের শাসনভার ন্যস্ত করিয়া সুলতান দিল্লী অভিমুখে রওনা হইলেন। সুলতান আফগানপুর পৌঁছিলে পুত্র আলফ খান দরবারের সমস্ত আমীর ওমরাহদিগকে সঙ্গে লইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। পিতা ছহি ছালামতে ফিরিয়া আসিলেন। সেই আনন্দে আলফ খান তাঁহাকে মোবারকবাদ জ্ঞাপন করিতে আগাইয়া আসিয়াছিল। পিতার সম্বর্ধনার জন্য আলফ খানও তিন দিনের মধ্যে একটা অস্থায়ী কাঠের ইমারত তৈয়ার করাইয়াছিলেন। ভোজন শেষে সুলতান তাঁহার মালপত্র অগ্রে প্রেরণ করিবার হুকুম দিলেন এবং নিজেও যাত্রার উদ্যোগ করিলেন। সকলেই তাড়াতাড়ি করিয়া বাহিরে আসিয়া সুলতানের সঙ্গে গমনের জন্য দণ্ডায়মান রহিল। এই সময় সহসা ইমারতের ছাদ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং সুলতান তাঁহার পাঁচজন অনুচরের সঙ্গে নিষ্পিষ্ট হইয়া মারা গেলেন।

কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, ইমারতের দুর্বলতার জন্যই এই দুর্ঘটনা হইয়াছিল এবং আবার কেহ কেহ মনে করেন, বাহিরে অপেক্ষমান হস্তী দলের ধাক্কায় এই কাঠের ঘর ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। অন্যেরা ইহা একটা চক্রান্ত এবং তাঁহারা শাহজাদা আলফ খানকে এই চক্রান্তের মালিক বলিয়া অভিযুক্ত করেন—কারণ তাহাদের মতে শিবিরে এরূপ একটা ইমারত নির্মাণ করার কোন প্রয়োজনীয়তাই ছিল না। জিয়া-উদ-দীন বার্নীর ইতিহাসে এই ঘটনার উল্লেখ নাই। জিয়া-উদ-দীন বার্নী ফিরোজ তোগলকের সমসাময়িক ছিলেন এবং আলফ খানের (পরে মুহাম্মদ তোগলক) তাঁহার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। প্রত্যেক নিরপেক্ষ ব্যক্তির নিকটই এই অভিযোগ অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইবে। কারণ একথা ভুলিলে চলিবে না যে, ভোজনকালে শাহজাদা নিজেও পিতার সঙ্গে ঐ ইমারতেই ছিলেন। তিনি বাহিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই ইমারত ধ্বসিয়া পড়িবে—এমন অলৌকিক কৌশলের কথা চিন্তা করা কঠিন। গুজরাটের সদর জাহানের কথা সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ। তিনি বলেন, শাহজাদা যাদু বলে প্রাসাদটি নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং মন্ত্রশক্তি দ্বারাই উহা দণ্ডায়মান রাখিয়াছিলেন। তারপর যে মুহূর্তে তিনি যাদু-শক্তি প্রত্যাহার করেন, সেই মুহূর্তেই ইমারতটি

ধ্বসিয়া পড়ে। হাজী মুহাম্মদ কান্দাহারীর মতে বজ্রপাতের ফলে ইমারতটি ধ্বসিয়া পড়িয়াছিল। কথাটি উড়াইয়া দেওয়া যায় না। যাহাহউক সত্য ঘটনা কি তাহা একমাত্র আল্লাহ্ই জানেন।

৭২৫ হিজরীর (ফেব্রুয়ারী, ১৩২৫ খ্রীঃ) রবিউল আউয়াল মাসে চারি বৎসর কয়েক মাস রাজত্বের পর গিয়াস-উদ-দীন তোগলক মৃত্যুমুখে পতিত হন। দিল্লীর আমীর খসরু এই সুলতানের রাজত্বের শেষভাগ অবধি জীবিত ছিলেন এবং তিনি সুলতানের নিকট হইতে মাসিক ১,০০০ তঙ্কা বৃত্তি স্বরূপ পাইতেন। তিনি 'তোগলক নামা নাম' দিয়া এই সুলতানের রাজত্বের ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই গ্রন্থ এখন দুষ্প্রাপ্য।

মুহাম্মদ তোগলক

[শাহজাদা আলফ খানের সিংহাসনে আরোহণ ও মুহাম্মদ উপাধি ধারণ। তুমুশ্রিন খানের নেতৃত্বে চুগতাই তুর্কীদের ভারতাক্রমণ। দাক্ষিণাত্যে অভিযান। সাম্রাজ্যব্যাপী বিদ্রোহ। সৈনিকদের বিদ্রোহ। নূতন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও তার ব্যর্থতা। চীন অভিযান ও তার শোচনীয় ব্যর্থতা। দাক্ষিণাত্যে সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র কর্তৃক বিদ্রোহ। রাজা বিলাক দেব কর্তৃক তাঁহাকে ধরাইয়া দেওয়া এবং ধৃত বিদ্রোহীকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা। সুলতানের দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ও দেবগিরির দৌলতাবাদ নামকরণ। দিল্লীর অধিবাসীদের বাধ্যতামূলকভাবে দেবগিরি গমন। মুলতানে বিদ্রোহ। পুনরায় দিল্লীতে রাজধানী স্থানান্তর। আফগানগণ কর্তৃক পাঞ্জাব আক্রমণ। দিল্লীতে বিদ্রোহ। গোক্ষররা সমস্ত পাঞ্জাব ছাইয়া ফেলে। সম্বলে বিদ্রোহ। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরা সুলতানের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হয় এবং সেখানে সুলতানের সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ। মালবে বিদ্রোহ। গুজরাটে বিদ্রোহ। অতিরিক্ত মৎস্য ভক্ষণে সুলতানের মৃত্যু।]

সুলতানের জানাজা সমাপনান্তে, তৃতীয় দিবসে জ্যেষ্ঠ পুত্র আলফ খান মুহাম্মদ তোগলক উপাধি ধারণ করিয়া তখ্‌তে আরোহণ করেন এবং তোগলোকাবাদ হইতে মিছিল সহকারে দিল্লী প্রবেশ করেন। এই উপলক্ষ্যে রাজপথ পুষ্পাচ্ছাদিত করা হয় এবং দুই পার্শ্বের গৃহাদি সুসজ্জিত করিয়া অপরূপ শ্রীমণ্ডিত করিয়া তোলা হয় এবং সেই কুসুমাস্তীর্ণ পথে বাদ্যধ্বনির তালে তালে প্রমোদমত্ত মিছিল শহরে প্রবেশ করে। স্বর্ণ ও রৌপ্য বোঝাই কয়েকটি হস্তী মিছিলের অগ্রে ও পশ্চাতে স্থাপন করা হয় এবং সেই হস্তী-পৃষ্ঠ হইতে জনতার মধ্যে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা বর্ষণ করা হয়।

যে তাতার খানকে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে এই সময় বৈরাম খান উপাধি প্রদান করা হইল এবং তৎসঙ্গে তাঁহাকে একশত হস্তী, এককোটি স্বর্ণ মুদ্রা ও দুই সহস্র অশ্ব ইনামস্বরূপ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার সুবাদার নিযুক্ত করা হইল। মালিক সান্‌জার বাদাখ্‌শানী সত্তর লক্ষ (১১৬৬৬৬ পাঃ ৪ শিঃ ৪ পেঃ) মালিক-উল-মুল্‌ক ইমাদ-উদ-দীন আশি লক্ষ এবং সুলতানের ওস্তাদ মাওলানা আজদ্‌-উদ-দীন চল্লিশ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হন। এই বিপুল

পরিমাণ অর্থ একদিনেই দান করা হয়। মালিক নাসির-উদ-দীন রুমীর জন্য বার্ষিক একলক্ষ টাকা মঞ্জুরীকৃত হয় এবং কবি মালিক গাজীর জন্যও সম-পরিমাণ বৃত্তি বরাদ্দ করা হয় (হিজরী ৭২৫ ; খ্রী: ১৩২৫)। সমসাময়িক ঐতি-হাসিকগণ কর্তৃক বিবৃত এই বিপুল পরিমাণ অর্থদানের কথায় নিজাম-উদ-দীন আহমদ বক্শী বিস্মিত হন এবং ইহা তাঁহার নিকট অবিশ্বাস্য মনে হয়। তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া প্রাচীন দলিল-পত্র ঘাঁটিয়া প্রমাণ করেন যে, প্রকৃত-পক্ষে ঐ মুদ্রাগুলি ছিল বর্তমান কালের রৌপ্য মুদ্রার সমতুল্য এবং উহাতে প্রচুর পরিমাণ খাদ ছিল—ফলে উহার একটি তঙ্কার মূল্য ১৬টি তামার পয়সার বেশী ছিল না।

সুলতানের বদান্যতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার রাজত্বের প্রথম ভাগে এশিয়ার কয়েকজন শ্রেষ্ঠ মনীষী দিল্লী আগমন করেন এবং স্বর্ণ ও সম্মানে সমৃদ্ধ হইয়া স্বদেশ প্রত্যাগমন করেন। প্রচুর অর্থব্যয়ে সুলতান পীড়িতের জন্য হাসপাতাল এবং অসহায় বিধবা এবং এতিমদের জন্য দানছত্র স্থাপন করেন। সে সময় তাঁহার মত বিদ্বান ও বাগ্মী নরপতি পৃথিবীর কোন দেশে ছিল না। আরবী ও ফার্সী ভাষায় লিখিত তাঁহার যেসব পত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে সুলতানের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, মার্জিত রুচী ও গভীর জ্ঞানের ছাপ পরিস্ফুট। পরবর্তী যুগের শক্তিশালী লেখকরাও সেসব পাঠ করিয়া প্রশংসামুখর হইয়াছেন। ইতিহাসের প্রতি সুলতানের গভীর অনুরাগ ছিল এবং তাঁহার স্মৃতিশক্তি এমন অসাধারণ ছিল যে, কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থ একবার পাঠ করিয়া তারিখসহ তাহার সমস্ত ঘটনা মনে রাখিতে পারিতেন। পদার্থবিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও অঙ্কশাস্ত্রে তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার মানুষ চিনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। সামান্য পরিচয়ের পরই তিনি যে-কোন লোকের চরিত্র সম্বন্ধে সঠিক ধারণায় পৌঁছিতে পারিতেন। চিকিৎসাশাস্ত্রেও তাঁহার গভীর জ্ঞান ছিল এবং অনেক গুরুতর রুগীর চিকিৎসা তিনি নিজে করিয়াছেন। গ্রীক দর্শন-শাস্ত্রেও তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল এবং তখ্‌তে আরোহণ করিবার পর তিনি দার্শনিক আসদমান তুর্কী, কবি ওবায়েদ, নিজাম-উদ-দীন ইন্‌তিশার, মাওলানা আইন-উদ্‌-দীন শিরাজী প্রমুখ বিদ্বান ব্যক্তিদের সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। কাল্পনিক গল্প ও আজগুবি কাহিনী পাঠে তিনি কোন আনন্দ পাইতেন না।

নট ও ভাঁড়দিগকে তিনি কোন প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি কবিত্ব শক্তিরও অধিকারী ছিলেন এবং ফার্সী ভাষায় কয়েকটি উৎকৃষ্ট কবিতা রচনা করিয়াছিলেন। জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তিদিগকে তিনি সর্বতোভাবে সাহায্য করিতেন। এক কথায়, যে-সব গুণাবলীর অধিকারী হইলে একজন মানুষ মানবজাতির মুকুট-মণিরূপে শোভা পায় সেসবই তাঁহার ছিল। ইহা ছাড়াও যুদ্ধক্ষেত্রে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্যও তিনি সমধিক প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের বাসনা তাঁহার মজ্জাগত ছিল এবং এইজন্য জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁহাকে শিবিরে অতিবাহিত করিতে হইয়াছে। তাঁহার চরিত্রে কতকগুলি পরস্পরবিরোধি গুণ ও প্রবণতা প্রকটভাবে বিদ্যমান ছিল যার জন্য সে যুগের ঐতিহাসিকরা তাঁহাকে আল্লাহ্‌র এক আজব সৃষ্টি বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন। তিনি একাধারে সম্রাট ও ধর্মনেতার দায়িত্ব পালন করিবার অভিলাষী ছিলেন। তিনি নিয়মিত নামাজ আদায় করিতেন এবং নামাজে অবহেলা প্রদর্শনকারী-দিগকে শাস্তি প্রদান করিতেন। অবৈধ ইন্দ্রিয় ভোগ, মদ্যপান ও কোরানে নিষিদ্ধ সর্বপ্রকার পাপকর্ম হইতে তিনি নিজেকে মুক্ত রাখিতেন। কিন্তু এত গুণাবলীর অধিকারী হইয়াও তিনি প্রজাদের প্রতি কেন যে নিষ্ঠুর আচরণ করিতেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। তিনি প্রায়ই অন্যায়ভাবে তাহাদিগকে সাজা দিতেন এবং তাঁহার প্রদত্ত সাজা সর্বদাই হইতো অতি কঠোর ও নিষ্ঠুর। আল্লাহ্‌র বান্দার প্রাণনাশ করিতে তিনি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। রাগান্বিত হইলে তিনি এমন ভয়ঙ্কর মূর্তি ধারণ করিতেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইত যেন তিনি এইবার সমস্ত মানবজাতিকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিবেন। এমন কোন সপ্তাহ ছিল না যে সপ্তাহে তাঁহার অনুগৃহীত মোল্লা, আলেম, ও কর্মসচিবদের মধ্যে কেহ প্রাণ না হারাইয়াছেন।

সুলতান হইবার পর তিনি তাঁহার আত্মীয় ও সভাসদদিগকে উচ্চ পদ ও পদবী প্রদান করেন। যাঁহারা অতিরিক্ত অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কেবল তাঁহাদের নামই উল্লেখ করা হইতেছে। চাচাতো ভাই মালিক ফিরোজকে "নায়েবে বারবিক" বা সহ-অভ্যর্থনাকারীর পদ প্রদান করা হয়। মালিক বেদার খিলজী কুদ্দুর খান উপাধি প্রাপ্ত হন এবং নাসির-উদ-দীন-খিলজীর মৃত্যুর পর তাঁহাকে লক্ষণাবতীর সুবাদার নিযুক্ত করা হয়। কুতলুগ খান ভকিল্-ই-দার মনোনীত হন। মালিক মকবুলকে ইমাম-উল-মুলক উপাধি প্রদান

করা হয় এবং তাহাকে উজির-উল-মুমালিক মনোনীত করা হয়। আহমদ আয়াজকে খাজা জাহান উপাধি প্রদান করিয়া গুজরাটের শাসনকর্তার পদ প্রদান করা হয়। মালিক মকবিল 'খান জাহান' উপাধি প্রাপ্ত হন এবং তাঁহাকে গুজরাটে মন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ভরণপোষণের জন্য কুতলুগ খানের পুত্র মুহাম্মদকে গুজরাটের এক জমিদারী প্রদান করা হয়। মালিক শিহাব-উদ-দীনকে মলিক-উৎ-তুজ্জার (বণিকদের প্রধান) মনোনীত করিয়া ভরণপোষণের জন্য তাঁহাকে 'নওশারী' তালুক প্রদান করা হয়।

মুহাম্মদ তোগলকের রাজত্বের প্রথম ভাগে—শাসনব্যবস্থায় তখনও স্থিতিশীলতা আসে নাই—সেই সময় দুর্ধর্ষ মোগল সেনাপতি তুমুশ্রি খান এক বিশাল বাহিনী লইয়া হিন্দুস্থান প্রবেশ করেন। তুমুশ্রি খান ছিলেন চুঘতাই সম্প্রদায়ের নেতা। সমগ্র হিন্দুস্থান জয় করা ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। লামঘান, মুলতান এবং উত্তরাঞ্চলের আরও কয়েকটি প্রদেশ পদানত করিয়া তিনি দ্রুত দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতে আরম্ভ করেন। মুহাম্মদ তোগলক বেশ বুঝিতে পারিলেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর সম্মুখীন হওয়ার মত শক্তি তাহার নাই। দিল্লীর পতন তাহার নিকট আসন্ন বলিয়া মনে হইল। অনন্যোপায় হইয়া তিনি শান্তির প্রস্তাব প্রেরণ করিলেন এবং মোগল সেনাপতির হৃদয় জয় করিবার জন্য অনেক স্বর্ণ ও রত্ন উপহারস্বরূপ পাঠাইলেন। শেষে একটা সাম্রাজ্যের মূল্যের সমপরিমাণ অর্থ ক্ষতিপূরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া তিনি আক্রমণ প্রত্যাহার করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে সম্মত হন। তিনি গুজরাট ও সিন্ধুর মধ্য দিয়া দেশে ফিরিয়া যান এবং যাইবার কালে এই দুইটি দেশ যথেচ্ছ লুণ্ঠন করিয়া বহু অধিবাসীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। জিয়া-উদ-দীন বার্নীর জীবদ্দশায় ইহা ঘটিয়াছিল। কিন্তু সুলতানের উত্তরাধিকারী ফিরোজ তোগলকের বিরাগভাজন হওয়ার ভয়ে তিনি এই গুরুতর মোগল হামলার কথা বেমালুম চাপিয়া গিয়াছেন।

ইহার পর সুলতান ভারতে কিছু রাজ্য বিস্তারে প্রয়াস পান। দ্বার সমুদ্র, মাবির, কুম্পিলা, ওয়ারাঙ্গল, লক্ষণাবতী, চাটগাঁও, সোনারগাঁও প্রভৃতি দূরবর্তী প্রদেশগুলিকে এমনভাবে শাসনাধীনে আনয়ন করা হইল যে, দিল্লীর সন্নিকটবর্তী গ্রামগুলির মতই সেগুলি প্রত্যক্ষভাবে দিল্লী সাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত হইল

দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থে ওমান[1] সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত কর্নাটক প্রদেশ তিনি স্বাধিকারে আনয়ন করেন। কিন্তু ইহার অনতিকাল পরেই সাম্রাজ্যে যে-সব বিপ্লব শুরু হয়, তাহাতে গুজরাট ব্যতীত সমস্ত বিজিত রাজ্যই হস্তচ্যুত হয় এবং সেগুলি আর পুনরুদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নাই।

যে-সব কারণে সাম্রাজ্যে গোলযোগ ও অরাজকতার সৃষ্টি হয় তাহা প্রধানতঃ এইগুলি ঃ

১। দোয়াব ও অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীদের উপর গুরু কর-ভার স্থাপন।

২। শাহী ফরমান দ্বারা রৌপ্যমুদ্রার স্থলে তাম্রমুদ্রার প্রচলন।

৩। খোরসান ও মা-উরা-উন্নাহার বিজয়ের উদ্দেশ্যে ৩,৭০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ।

৪। চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী পার্বত্যাঞ্চলে ১,০০,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ।

৫। ভারতের বিভিন্ন এলাকায় হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহু অধিবাসীর হত্যা সাধন।

আরও অনেক গৌণ কারণ ছিল। কিন্তু সংক্ষিপ্ততা রক্ষা করিবার জন্য আমরা সেসব উল্লেখ করিতে বিরত থাকিলাম।

মানুষের জীবনধারণের জন্য যে-সব দ্রব্য নিত্য-প্রয়োজনীয় তাহাদের সকলের উপর করধার্য করা হইয়াছিল এবং সেইসব কর এমন জুলুম করিয়া আদায় করা হইতে লাগিল যে, ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হইয়া পড়িল। ফলে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। কৃষকরা বাড়ী-ঘড় ছাড়িয়া জঙ্গলে পালাইয়া গেল এবং লুটপাট করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিল। কৃষিক্ষেত্র অকর্ষিত পড়িয়া রহিল। দেশে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল এবং প্রদেশগুলি জনশূন্য হইয়া পড়িতে লাগিল। দুঃখ-দুর্দশা সহ্য করিতে করিতে জনসাধারণের মন হইতে আনুগত্যের সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া গেল। উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণের অভাবে তাম্রমুদ্রা প্রচলনে দারুণ বিশৃংখলার সৃষ্টি হইল। মুদ্রা ব্যবস্থার এই বিশৃংখলা মানুষের দুর্দশা আরও বাড়াইয়া তুলিল। প্রজাদের দুর্ভাগ্য যে, চীন দেশে কাগজের মুদ্রার প্রচলন ছিল এবং উহা শুনিয়াই সুলতান তাঁহার

১ আরব ও ভারতীয় উপদ্বীপের মধ্যবর্তী মহাসমুদ্রের নাম ওমান।

রাজ্যে তাম্রমুদ্রা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চীন দেশে নগদ টাকার পরিবর্তে সম্রাটের শীলমোহর যুক্ত কাগজের নোট বা দলিল প্রদান করা হইত। শীলমোহর যুক্ত কাগজের নোটের স্থলে সুলতান বাহির করিলেন তামার নোট এবং নিজের খেয়ালমত উহার একটা মূল্য নির্ধারিত করিয়া এক ফরমান দ্বারা সমস্ত হিন্দুস্থানে উহা চালু করিয়া দিলেন। টাকশালার উপযুক্ত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে জাল নোট তৈরী করিয়া অনেক মহাজন প্রচুর ধনসম্পদ অর্জন করিতে লাগিল। বিদেশী বণিকেরা দেশী পণ্য প্রস্তুতকারকদের নিকট হইতে তামার মুদ্রায় জিনিস কিনিয়া সেইসব দ্রব্যাদিই বিদেশের বাজারে বিক্রয় করিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লাভ করিতে লাগিলেন। টাকশালে এতো বেশী দুর্নীতি চলিতে লাগিল যে, মুদ্রাবিভাগের কর্তাদিগকে ঘুষ দিয়া সওদাগররা নির্ধারিত মূল্যের অনেক কম মূল্যে মুদ্রা তৈরী করিয়া লইতে লাগিল। সরকারী কর্মচারীরা এইসব অপকর্ম দেখিয়াও দেখিতেন না। তাম্রমুদ্রা প্রচলনের পথে সবচেয়ে বড় বিঘ্ন সৃষ্টি করিল সরকারের অস্থায়িত্বের প্রশ্ন। হিন্দুস্থানের মত রাষ্ট্রে—যেখানে ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটিয়া থাকে সেখানে দীর্ঘস্থায়ী সরকারী ঋণের প্রশ্নই উঠে না। সাম্রাজ্যের দূরবর্তী প্রদেশের লোকেরা কি ভরসায় মুদ্রার পরিবর্তে কোষাগারের নোট বা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করিবে (হিঃ ৭২৭ : খ্রীঃ ১৩২৬)—যে কোষাগারের মালিকানা ঘন ঘন পরিবর্তিত হইয়া থাকে।

এইসব অসুবিধার দরুন চারিদিকে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল এবং সুলতান তাম্রমুদ্রা প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হইলেন। টাকশালায় এমনি চুরি হইয়াছিল যে সরকারের কোষাগার শূন্য করিয়া দেওয়ার পরও লোকের অনেক পাওনা বাকী রহিল। সুলতান এইসব ঋণ নাকচ করিয়া দিলেন। ফলে হাজার হাজার লোকের সর্বনাশ হইল। এই অভিনব ও আনাড়ী পরিকল্পনা দ্বারা রাষ্ট্রের কোন ফায়দা তো হইলই না—হইল সুলতানের কোষাগার শূন্য। মাঝখান দিয়া কিছু সংখ্যক মহাজন ও বণিক প্রজাদের ক্ষতি সাধন করিয়া প্রচুর অর্থোপার্জন করিল।

আমীর নওরোজ বেগ নামক এক মোগল সর্দার তাঁহার সম্প্রদায়ের এক হাজার অনুচর লইয়া সুলতানের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার

প্ররোচনায় মাতিয়া উঠিয়া সুলতান পারস্য ও খোরাসান বিজয়কে সহজ-সাধ্য ব্যাপার বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। কিন্তু এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ করিবার পুর্বেই সৈন্যদের বেতন বাকী পড়িল। সুলতানকে বেতন দানে অপারগ দেখিয়া সৈনিকরা দলত্যাগ করিয়া রাজ্যের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িয়া যথেচ্ছা লুণ্ঠন, নরহত্যা ও ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইয়া যাইতে লাগিল। এইসব গোলযোগের সঙ্গে বহু বৎসরের পারিবারিক ব্যাপারও জড়িত ছিল।

পুর্বোক্ত অবিবেচনা-প্রসূত পরিকল্পনার ফলে সরকারী কোষাগার শূন্য হওয়ায়, সুলতান উহা পূরণের জন্য আর একটি উদ্ভট পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। চীন দেশের বিপুল সম্পদের কথা তিনি অবগত ছিলেন। তিনি স্থির করিলেন, চীন সাম্রাজ্য জয় করিতে হইবে। কিন্তু চীন সাম্রাজ্য জয় করিতে হইলে চীন ও ভারতের মধ্যবর্তী হিমাচল অঞ্চল [২] প্রথম অধিকার করিতে হয়। এই উদ্দেশ্যে ৭৩৮ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৩৩৭) সুলতান তাঁহার ভাগ্নেয় খসরু মালিকের অধীনে একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী এই পার্বত্যাঞ্চলে প্রেরণ করিলেন। এই অঞ্চল অধিকার করিবার পর চীনের সীমান্ত পর্যন্ত কতকগুলি দুর্গ স্থাপন করিবার নির্দেশ রহিল তাহাদের উপর। এইসব প্রাথমিক কার্য সম্পন্ন হইবার পর সুলতান স্বয়ং তাঁহার সমস্ত সেনাবাহিনী লইয়া চীন দেশ আক্রমণে অগ্রসর হইবেন এইরূপ স্থির হইল। আমীর ওমরাহরা সুলতানকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন যে, ভারতের বাহিনী কখনও চীনের মাটিতে পদক্ষেপ করিতে সমর্থ হয় নাই এবং হইবে না। কিন্তু সুলতান তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না। তিনি কিছুতেই বুঝিলেন না যে, তাঁহার এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণ অবাস্তব ও অসাধ্য। তিনি একবার পরীক্ষা দেখিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি সৈন্যবাহিনী রওয়ানা করিয়া দিলেন। পাহাড়ের মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইবার সময় যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাঁহারা পথের পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুর্গ নির্মাণ করিয়া চলিল। এইরূপে তাহারা চীন সীমান্তে যাইয়া পৌঁছিল। সেখানে অগণিত সৈন্যের এক বিশাল বাহিনী তাহাদিগকে বাধা প্রদান করিতে আগাইয়া আসিল। হিন্দুস্থানী বাহিনীর সংখ্যা ইতিমধ্যেই অনেক হ্রাস

---

২ নেপাল ও হিমালয়ের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত অঞ্চল।

পাইয়াছিল। শত্রুবাহিনীর বিপুল সংখ্যাধিক্য দর্শনে তাঁহাদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তদুপরি যখন তাহারা চিন্তা করিয়া দেখিল যে, তাহারা অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছে এবং অনেক দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হইয়াছে; তদুপরি বর্ষা আগত প্রায়, এদিকে রসদও প্রায় নিঃশেষিত—তখন তাহাদের আতঙ্ক আরও বহুগুণ বৃদ্ধি পাইল। তাহারা পর্বতের পাদদেশে পিছু হটিয়া আসিতে আরম্ভ করিল। পাহাড়ীরা তাহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সরঞ্জামাদি লুট করিয়া লইয়া গেল। ওদিকে চীনা সৈন্যরাও তাহাদের অনুসরণ করিতে লাগিল। অনশনক্লিষ্ট ভারতীয়বাহিনী এই সংকটাপন্ন অবস্থায় সাতদিন একস্থানে অবস্থান করিল। তারপর শুরু হইল মুষলধারে বৃষ্টি। মাটিতে পানি জমা হইতে লাগিল এবং অশ্বারোহী সৈন্যেরা অশ্বপৃষ্ঠে পানির মধ্যেই দাঁড়াইয়া রহিল। পানি ঘোড়ার পেট পর্যন্ত স্পর্শ করিল। বর্ষার জন্য চীনা সৈন্যরা তাহাদের শিবির দূরে সরাইয়া লইতে বাধ্য হইল। ইহাতে খসরু মালিকের প্রাণে কিছু আশার সঞ্চার হইল যে, তিনি পশ্চাদাপসরণ করিতে সমর্থ হইবেন। কিন্তু পলায়নের পথ কোথায়? নিম্নাঞ্চলগুলি সম্পূর্ণ প্লাবিত এবং পর্বতগাত্র অভেদ্য জঙ্গলে আচ্ছন্ন। সৈন্যদের দুঃখ-দুর্দশা চরমে পৌঁছিল। যে গিরিপথ দিয়া আসিয়াছিল সেই গিরিপথেই তাহাদিগকে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে। কিন্তু পাহাড়ীরা তাহা ইতিমধ্যেই দখল করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপে অবরুদ্ধ হইয়া মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে বিশাল ভারতীয় বাহিনী দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পতিত হইয়া সুলতানের দুরাকাঙ্ক্ষার খেসারত প্রদান করিল। একটা প্রাণীও রক্ষা পাইল না যে ফিরিয়া আসিয়া এই ভাগ্যবিপর্যয়ের বিশদ বিবরণ প্রদান করিবে। পথে স্থানে স্থানে যেসব সৈন্যদল রাখিয়া যাওয়া হইয়াছিল—তাহারাই কেবল দেশে ফিরিয়া ভারতীয় বাহিনীর নিশ্চিহ্ন হওয়ার সংবাদ প্রদান করে। শত্রুর দৃষ্টি এড়াইয়া কোন মতে প্রাণ লইয়া যাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল শত্রুর চেয়েও ভয়ঙ্কর সুলতানের ক্রোধানলে তাহারা প্রাণ হারাইল। দুঃসংবাদ বহন করিয়া দিল্লী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গেই সুলতান তাহাদিগকে হত্যা করার আদেশ প্রদান করেন।

সুলতানের অন্যতম ভ্রাতুষ্পুত্র বাহা-উদ-দীন দাক্ষিণাত্যে সাগুর[৩] প্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল কুরশাসিপ এবং তিনি একজন

৩ কুলবর্গার নিকটে যে সাগুর আছে ইহা নিশ্চয়ই সেই সাগুর।

উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন আমীর ছিলেন। তিনি সিংহাসন অধিকারের দুরভিসন্ধি পোষণ করিয়া স্বীয় সুবার অনেক পদস্থ কর্মচারীকে দলে ভিড়াইলেন। তিনি বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদও অর্জন করিয়াছিলেন। এই সম্পদ এবং প্রধান কর্মচারীদের সমর্থনের ফলে তিনি নিজেকে যথেষ্ট শক্তিশালী মনে করিতে থাকেন এবং শীঘ্রই সুলতানের আনুগত্যে অটল কয়েকজন সিপাহ্সালারকে আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে মান্দু দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। এই বিদ্রোহের সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সুলতান খাজা জাহানকে আরও অনেক সেনাধ্যক্ষের সঙ্গে গুজরাটের সমস্ত বাহিনী লইয়া বিদ্রোহী আমীরকে শায়েস্তা করিবার জন্য অগ্রসর হইবার হুকুম দেন। সুলতানী ফৌজ দেবগিরি পৌঁছিয়া দেখিল যে কুরশাসিপের সৈন্যদল তাহাদের মোকাবিলার জন্য যুদ্ধের ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। বীরবিক্রমে যুদ্ধ করিয়াও বিদ্রোহী নেতা পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। এই পরাজয়ের কারণ ছিল তাঁহার অন্যতম সেনাপতি খিজির বাহরামের দলত্যাগ। যুদ্ধকালে তিনি সদলবলে বাহির হইয়া শত্রুবাহিনীতে যাইয়া যোগদান করেন। কুরশাসিপ সাগুরে পালাইয়া যান। কিন্তু তিনি সেখানে অবস্থান করিতে ভরসা পাইলেন না। তিনি তাঁহার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদ বহন করিয়া কর্নাটের কুম্পিলায়[৪] চলিয়া গেলেন এবং তথাকার রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই রাজার সঙ্গে পূর্ব হইতেই তাঁহার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। ইত্যবসরে মুহাম্মদ তোগলক স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসিয়া পৌঁছিলেন এবং দ্রুত দেবগিরি গমন করিলেন। সেখান হইতে কুম্পিলায় কুরশাসিপ ও কুম্পিলার রাজার বিরুদ্ধে খাজা জাহানের অধীনে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। সুলতানী ফৌজ দুই দুইবার পরাভূত হইল। দেবগিরি হইতে নূতন সাহায্যকারী সৈন্যদল আসিয়া পড়ায় খাজা জাহান রাজার সঙ্গে তৃতীয়বার যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন। এইবার তিনি জয়লাভ করিলেন এবং কুম্পিলার রাজা তাঁহার হাতে বন্দী হইলেন। কুরশাসিপ বিলক দেবের রাজধানীতে পালাইয়া গেলেন। পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজার ন্যায় নিজের বিপদ ডাকিয়া আনার ইচ্ছা তাহার ছিল না। তিনি কুরশাসিপকে বাঁধিয়া খাজা জাহানের নিকট প্রেরণ করেন এবং সেই

৪ আমার বিশ্বাস, বিজয়নগরের নিকট তুঙ্গভদ্রা নদী তীরে এই নামের একটি স্থান আছে।

সঙ্গে দিল্লীর সুলতানের প্রভুত্ব মানিয়া লন। খাজা জাহান কালবিলম্ব না করিয়া বন্দীকে শাহী দরবারে পাঠাইয়া দিলেন। সেখানে সুলতানের আদেশে জীবন্তাবস্থায় তাঁহার শরীরের চামড়া তুলিয়া ফেলা হইল। তারপরই এই লোমহর্ষক দৃশ্য সমস্ত শহরে প্রদর্শন করা হইল। ঘাতক সঙ্গে থাকিয়া উচ্চস্বরে ঘোষণা করিতেছিল, "সুলতানের দুশমনদের পরিণাম এই হইবে।"

দেবগিরির অবস্থান ও দুর্ভেদ্যতা দর্শনে সুলতান অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। দিল্লী সাম্রাজ্যের এক পার্শ্বে অবস্থিত, আর দেবগিরি কেন্দ্রে অবস্থিত বলা যাইতে পারে। এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। উজিরদের নিকট এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করায় তাঁহাদের অধিকাংশই উজ্জয়িনীর পক্ষে মত প্রকাশ করিলেন। তাহাদের মতে, রাজধানী স্থাপন করিবার পক্ষে উজ্জয়িনী সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত স্থান। কিন্তু দেবগিরিকে রাজধানী করিতে সুলতান ইতিপূর্বেই কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। তিনি হুকুম জারি করিলেন—আবালবৃদ্ধবণিতা নির্বিশেষে দিল্লীর সমস্ত অধিবাসীকে তাহাদের সমস্ত মালপত্র ও গৃহপালিত জীবজন্তু লইয়া দেবগিরি রওয়ানা হইতে হইবে। লোকদের কষ্টলাঘবের জন্য তিনি পথের দুইধারে সারিবদ্ধভাবে বৃক্ষ প্রোথিত করাইলেন। এই বৃক্ষগুলি অন্যস্থান হইতে শিকড়সহ উৎপাটিত করিয়া আনিয়া পথের ধারে লাগানো হইয়াছিল। তিনি ঘোষণা করিলেন যে পথের ব্যয় বহনে যাহারা অক্ষম তাহাদিগকে সরকারী ব্যয়ে আহার করানো হইবে। তিনি দেবগিরির নূতন নামকরণ করিলেন 'দৌলতাবাদ'। সুলতান দৌলতাবাদে কতিপয় সুদৃশ্য ইমারত তৈরী করাইলেন এবং কেল্লার চতুষ্পার্শ্ব বেষ্টন করিয়া একটি গভীর পরিখা খনন করাইলেন। তিনি কেল্লার সংস্কার সাধন করিয়া উহাকে আরও সুদৃঢ় ও সুদৃশ্য করিয়া তোলেন। একটা পাহাড়ের উপর ঐ দুর্গটি অবস্থিত ছিল। তিনি সেখানে পানির হাউজ ও রমনীয় উদ্যান তৈরী করাইলেন। কিন্তু এই রাজধানী স্থানান্তরের জন্য সুলতানের জনপ্রিয়তা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল এবং লোকে তাঁহার উপর অত্যন্ত বিতৃষ্ণ হইয়া উঠিল।

রাজধানী স্থানান্তরের কাজ সমাপ্ত হইবার পর মুহাম্মদ তোগলক জুনারের নিকটে অবস্থিত কোনধানা[৫] দুর্গ অধিকারের জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন

---

৫ পোমার নিকট অবস্থিত বর্তমান সিংহুরের নামই ছিল কোনধানা।

খেয়ালী সুলতানের নৃশংসতার নজীর পৃথিবীর ইতিহাসে খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। নিম্নোল্লিখিত ঘটনা উহার অন্যতম লোমহর্ষক দৃষ্টান্ত। দিল্লীতে অবস্থান করিবার সময় তিনি একদিন সেনাবাহিনী লইয়া শিকারে বাহির হইয়াছিলেন। সুলতানরা মাঝে মাঝে এরূপ শিকারে বাহির হইয়াই থাকেন। বৈরাম জেলায় পৌঁছিয়া তিনি সেনাপতিদিগকে স্পষ্ট জানাইয়া দেন যে, তিনি পশু শিকারে আসেন নাই—আসিয়াছেন মানুষ শিকার করিতে। বিনা কারণে শতশত নিরীহ অধিবাসী নিহত হইতে লাগিল। বর্বরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সুলতান উহাদের হাজার হাজার মস্তক সঙ্গে করিয়া আনিয়া শহরের প্রাচীরের উপর ঝুলাইয়া রাখিলেন। আর একবার কনৌজের দিকে ভ্রমণে গমন করিয়া তিনি শহর ও শহরের কয়েক মাইলের মধ্যে যেসব লোক বাস করিত, তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিয়াছিলেন। তিনি যে দিকে গিয়াছেন সে দিকেই মৃত্যুর বিভীষিকা ও গজব ছড়াইয়া দিয়াছেন। এই সময় মালিক বৈরাম ইন্তেকাল করেন এবং তাহার মৃত্যুর পর মালিক ফখর উদ-দীন সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। তিনি কুদ্দুর খানকে হত্যা করিয়া সাম্রাজ্যের তিনটি প্রদেশই যথা লক্ষণাবতী, সোনারগাঁও ও চাটগাঁওয়ের উপর নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। আরও সংবাদ আসিল যে, মাবিরের সৈয়দ হাসান বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। ইহা শুনিয়া সুলতান সৈয়দ হাসানের পুত্র সৈয়দ ইব্রাহিম ও তাহার সমস্ত পরিবারবর্গকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন এবং কনৌজ ধ্বংস করিবার পর ৭৪২ হিজরীতে (১৩৪১ খ্রী:) তিনি স্বয়ং মাবিরের দিকে রওয়ানা হইলেন। দৌলতাবাদ পৌঁছিয়া তিনি ঐ শহর ও শহরের পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলির অধিবাসীদের উপর অতিরিক্ত কর ধার্য করিলেন। ইহাতে সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিল। কিন্তু অগণিত শাহী ফৌজ শীঘ্র বিদ্রোহ দমন করিয়া অধিবাসীদিগকে পূর্ববৎ বশীভূত করিল। দৌলতাবাদ হইতে খাজা জাহানের অধীনে সেনাবাহিনীর একাংশ দিল্লী পাঠাইয়া তিনি নিজে তেলিঙ্গানার পথে মাবির রওয়ানা হইলেন।

ওয়ারাঙ্গল পৌঁছিলে মুহাম্মদ তোগলকের শিবিরে মহামারী দেখা দিল। ইহাতে সেনাবাহিনীর বহুলোক মৃত্যুমুখে পতিত হইল এবং সুলতান নিজেও মরণাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ফলে তিনি দৌলতাবাদ ফিরিয়া আসিতে

বাধ্য হন। ফিরিবারকালে ইমাদুল মুলকের উপর সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব প্রদান করিয়া আসেন। পথে দাঁতের ব্যাথায় তিনি বিষম কষ্ট ভোগ করেন এবং তাঁহার একটি দাঁত উঠাইয়া ফেলিতে হয়। তিনি বিয়ারে মহাসমারোহ সহকারে এই দাঁতটি কবর দিবার ব্যবস্থা করেন এবং ঐ কবরে উপর এক জমকালো সমাধিসৌধ নির্মাণ করিয়া উহার রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার অহমিকা ও নির্বুদ্ধিতার স্মৃতি বহন করিয়া সেই সৌধটি এখনও সেখানে বিদ্যমান রহিয়াছে।

মুঙ্গি পত্তন পৌঁছিয়া তিনি কথঞ্চিৎ আরামবোধ করেন এবং ঔষধ গ্রহণের জন্য তিনি সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করেন। সাহাবউদ-দীন মুলতানীকে এই স্থানে নসরত খান উপাধি প্রদান করিয়া তাঁহাকে বিদর ও উহার অধীনস্ত এলাকার শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এই প্রদেশ হইতে বাৎসরিক এক কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হইত। এই সময়েই তিনি দৌলতাবাদ ও মহারাষ্ট্র রাজ্যের শাসনভার কুতলুগ খানের উপর ন্যস্ত করেন। বাল্যকালে কুতলুগ খান ছিলেন তাঁহার শিক্ষক।

রাজধানীতে আফগানদের মধ্যে কিছু গোলযোগের সৃষ্টি হয়। সেই সংবাদ পাইয়া সুলতান পাইতুন হইতে পাল্কীতে চড়িয়া দিল্লী রওয়ানা হন। দৌলতাবাদ হইতে যাহারা দিল্লী ফিরিবার জন্য উদগ্রীব ছিল, সুলতান এই সময় তাহাদিগকে অনুমতি প্রদান করেন। হাজার হাজার লোক দিল্লীর পথে রওয়ানা হইল। পথে খাদ্যাভাবে কয়েক সহস্র লোক মারা গেল। মালব ও চান্দেরী প্রদেশকে ইহারা ছারখার করিয়া চলিল। যাহারা কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া দিল্লী পৌঁছিল তাহারা ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হইল। কারণ তখন দিল্লীতে ভীষণ দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই তখন জীবন ধারণের জন্য নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাড় করা অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। প্রজাদের দুর্দশা দর্শনে সুলতানের অন্তর বিগলিত হইল। তিনি সাময়িকভাবে তাঁহার স্বভাব বদলাইলেন এবং চাষাবাদ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি সাধনে যত্নবান হইলেন এবং এতদুদ্দেশে তিনি কোষাগার হইতে প্রজাদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিলেন। কিন্তু লোকের ঘরে খাদ্য নাই ফলে সরকারী অর্থ খাদ্য ক্রয়েই ব্যয়িত হইল—কৃষিকার্যের উন্নতি সাধন আর হইল না। সুলতান ক্রোধান্বিত হইয়া ইহাদের অনেককেই কঠোর শাস্তি দিলেন।

পার্বত্য-আফগান সর্দার শাহু[৬] এই সময় উত্তরাঞ্চলে দৌরাত্ম শুরু করিয়া দিল—তাঁহার অনুচরবর্গ স্রোতের ন্যায় সাম্রাজ্যের উপর আসিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিল। সুবাদার বেহজাদ খান যুদ্ধে নিহত হইল। তাঁহার সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পালাইয়া গেল। আফগানরা প্রদেশটি ছারখার করিয়া ফেলিল। সুলতান এক সৈন্যবাহিনী লইয়া দিল্লী হইতে মুলতানাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সুলতান আসিয়া পড়িলে শাহু তাঁহাকে এক বিনয়পূর্ণ পত্র লিখিয়া আফগানিস্তানের পর্বতে পালাইয়া গেলেন। অনুসরণ করা নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া সুলতান দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। দিল্লীতে তখন দুর্ভিক্ষের তাণ্ডবলীলা চলিতেছিল। এই চরম দুর্দিনে সুলতান পুনরায় কূপ খনন ও ভূমি কর্ষণের জন্য প্রজাদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করিলেন। কিন্তু অনশন ক্লিষ্ট প্রজারা তাহাদের আর্থিক অবনতি রোধের জন্য কিছুই করিতে সমর্থ হইল না—ওদিকে দীর্ঘস্থায়ী অনাবৃষ্টির ফলে তাহাদের সমস্ত পরিশ্রম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল। সুনাম ও সামানার পার্শ্ববর্তী এলাকায় মানডুলা, চৌহান, মিয়েনা ও ভাটিয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাস করিত। করদানে অসমর্থ হইয়া তাহারা জঙ্গলে পালাইয়া গেল। খবর পাইয়া সুলতান ক্ষিপ্ত হইলেন এবং সেখানে যাইয়া তাহাদের কয়েক সহস্র লোককে হত্যা করিলেন।

৭৪৩ হিজরীতে (১৩৪২ খ্রীঃ) গোক্করদের নেতা মালিক হায়দার পাঞ্জাব আক্রমণ করিলেন। লাহোরের সুবাদার তাতার খান যুদ্ধে নিহত হইল। তাহাকে দমন করিবার জন্য খাজা জাহানকে পাঠানো হইল। এই সময় সুলতানের মাথায় আর একটি নূতন খেয়ালের উদ্ভব হইল। তাঁহার মনে হইল যে, সিংহাসনে আরোহণকালে তিনি আব্বাসীয় খলিফার অনুমোদন লাভ করেন নাই। এবং তাঁহার বিশ্বাস সাম্রাজ্যের সমস্ত দুর্ভাগ্যের মূল কারণ তাহাই। সেইজন্য তিনি আরব দেশে খলিফার নিকট দুত ও উপহার প্রেরণ করিলেন এবং মুদ্রায় তাঁহার নিজের নামের সঙ্গে খলিফার নামও ছাপাইলেন। খলিফার অনুমোদন আসিবার পূর্বে খোত্‌বায় তাঁহার নিজের নাম ব্যবহার করিতে বারণ করিয়া দিলেন।

---

৬ মুল গ্রন্থে বোধ হয় ভুল লেখা ছিল। সম্পাদকের এ ভুল সংশোধনের অধিকার নাই।

৭৪৪ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৩৪৪) দূতের সঙ্গে হাজী সৈয়দ হুরমুজী নামক রসুলুল্লাহ্‌র (সঃ) বংশের এক সুফী ব্যক্তি হিন্দুস্থানে আসিলেন। তিনি খলিফার নিকট হইতে সুলতানকে লিখিত একটি পত্র এবং সুলতানের জন্য প্রেরিত একটি খেলাৎ লইয়া আসিয়াছিলেন। সুলতান পায়ে হাঁটিয়া শহরের বাহিরে ১২ মাইল দূরে যাইয়া খলিফার দূতকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। খলিফার পত্র গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথমে মাথার উপরে রাখিলেন। তারপর অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে পত্রটি খুলিলেন। শহরে ফিরিয়া তিনি এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিবার হুকুম দিলেন। যেসব দিল্লীর সুলতান খলিফার অনুমোদন লাভ করেন নাই, তিনি খোত্‌বায় তাঁহাদের নামোল্লেখ নিষেধ করিয়া দিলেন। সেইসব লাঞ্ছিত পরলোকগত সুলতানদের মধ্যে তাঁহার নিজের পিতাকে সামিল করিয়া দিলেন। তাঁহার খলিফা-ভক্তি এতোদূর গড়াইয়া গেল যে, তিনি তাঁহার সমস্ত লেবাস ও আসবাবপত্রে খলিফার নাম লিখাইলেন। কয়েকদিন সুলতানের আদর আপ্যায়ন গ্রহণ করিবার পর দূত খলিফার জন্য এক সম্ভ্রমপূর্ণ পত্র এবং বহু উপহারাদি লইয়া স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। গৃহরক্ষীবাহিনীর সর্দার কবির খানকে তাঁহার সঙ্গে পাঠানো হইল।

এই বৎসর লুদ্দ্‌র দেবের পুত্র কৃষ্ণনাগ গোপনে ওয়ারাঙ্গল হইতে কর্নাটকের রাজা বিলাল দেবের নিকট যাইয়া তাঁহাকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে প্ররোচিত করিতে লাগিলেন। তিনি বিলাল দেবকে বলিলেন যে, দাক্ষিণাত্যের মুসলমানরা হিন্দুদিগকে নির্মূল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছে। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্য হিন্দুদিগকেও সঙ্ঘবদ্ধ হইতে হইবে। বিলাল দেব তাঁহার জ্ঞাতিদিগকে এক সভায় আহ্বান করিলেন এবং সেই সভায় স্থির হইল যে, প্রথমে রাজ্যের দুর্গগুলিকে সুরক্ষিত করিতে হইবে এবং তারপর পর্বতাভ্যন্তরে রাজধানী স্থানান্তরিত করিতে হইবে। কৃষ্ণনাগ তাঁহার দিক হইতে এই প্রতিশ্রুতি দান করিলেন যে, বিলাল দেবের সুপরিকল্পিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ হইলেই তিনি ওয়ারাঙ্গল ও তেলিঙ্গানায় হিন্দু অভ্যুত্থান ঘটাইয়া স্বয়ং তাঁহার নেতৃত্ব গ্রহণ করিবেন।

এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বিলাল দেব তাঁহার রাজ্যের সীমান্তে এক সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করাইয়া তাঁহার পুত্র বিজয়ের নামানুসারে উহার নাম দিলেন বিজয় নগর।

নগর শব্দের অর্থ শহর। অতঃপর তিনি সৈন্যবাহিনী গঠন করিয়া তাহার একাংশ কৃষ্ণ নাগের অধীনে প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ নাগ ওয়ারাঙ্গল আক্রমণ করিয়া সুবাদার ইমাদুল মুলককে দৌলতাবাদ হটিয়া যাইতে বাধ্য করিলেন। বিলাল দেব ও কৃষ্ণ নাগের বাহিনীর সঙ্গে দ্বার সমুদ্র ও মাবির রাজ্যের সেনাবাহিনীও মিলিত হইল। এই দুইটি রাজ্য পুর্বে কর্নাটকের রাজার করদরাজ্য ছিল। এই সম্মিলিত হিন্দুবাহিনী দাক্ষিণাত্যের মুসলমান অধিকৃত সমস্ত রাজ্য পুনরাধিকার করিয়া মুসলমানদিগকে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে দৌলতাবাদ ব্যতীত দাক্ষিণাত্যে মুহাম্মদ তোগলকের অধিকারে আর কোন স্থান রহিল না।

এইসব সংবাদে সুলতান ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইলেন এবং স্বভাবসিদ্ধ নৃশংসতার মাত্রা আরও বাড়াইয়া দিলেন। তাঁহার সমস্ত ক্রোধ যাইয়া পড়িল প্রজাদের উপর এবং তিনি তাহাদিগকে নির্বিচারে হত্যা করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃশংসতার প্রতিবাদে রাজ্যের সর্বত্র অসন্তোষের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল এবং সমস্ত সাম্রাজ্যে অরাজকতা বিস্তৃত হইয়া পরিল। দিল্লী শহরে তখনও দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হয় নাই। লোকেরা শহর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। সুলতানের পরিবারের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করা কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। অগত্যা তিনিও সপরিবার শহর ত্যাগ করিলেন। অনতিকাল পুর্বে সুলতান যেসব লোককে কারারুদ্ধ করিরাছিলেন—সেই অর্ধভুক্ত লোকদিগকে কারাগারের দ্বার খুলিয়া মুক্ত করিয়া দিলেন। হাজার হাজার লোক বাংলাদেশে আসিয়া ভীড় জমাইতে লাগিল। বাংলাদেশ ইতিপুর্বেই অধীনতাপাশ ছিন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। মুহাম্মদ তোগলক গঙ্গার তীরবর্তী কাম্পিলা[৭] ও পাতিয়ালায় শিবির স্থাপন করিয়া অযোধ্যা ও কারা প্রদেশ হইতে খাদ্য আমদানী করিতে লাগিলেন। শিবিরের অন্যান্য লোকেরাও এইখানে গৃহ নির্মাণ করিতে লাগিল—ফলে সেখানে সাজদেওয়ারী নামে এক শহরই গড়িয়া উঠিল।

৭৪৫ হিজরীতে (১৩৪৫ খ্রীঃ) সম্ভলের শাসনকর্তা নিজাম বাইন বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই ব্যক্তি সুলতানকে প্রতিশ্রুত কর প্রদানে অসমর্থ হইয়া

৭ এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কাম্‌পিলা নামে দুইটি স্থান ছিল—একটি গঙ্গার তীরে এবং অন্যটি কর্নাটক রাজ্যে বিজয় নগরের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল।

একদল বিক্ষুব্ধ কৃষককে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং আলা-উদ-দীন উপাধি ধারণ করেন। সুলতান তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার পূর্বেই অযোধ্যার সুবাদার আইন-উল-মুল্ক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং বিদ্রোহীকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার মস্তক দরবারে পাঠাইয়া দেন। নসরত খান নামক এক আমীর বাৎসরিক এক কোটি টাকা করদানের প্রতিশ্রুতিতে বিদর প্রদেশ ইজারা লইয়াছিলেন। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুত অর্থ দানে অসমর্থ হইয়া তিনিও বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করেন। সুলতানের আদেশে কুত্‌লুগ খান দৌলতাবাদ হইতে আসিয়া তাঁহাকে বিদর হইতে বহিষ্কার করিয়া দেন। এই সময় অন্যতম[৮] আমীর জাদিয়া জাফর খান এলাহীর ভ্রাতুষ্পুত্র আমীর আলীকে দৌলতাবাদ হইতে কুলবর্গায় রাজস্ব আদায় করিতে প্রেরণ করা হইয়াছিল। তিনি দেখিলেন, সেখানে সুলতানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন প্রতিনিধি নাই। তখন তাহার মনে উচ্চাশা জাগিয়া উঠিল এবং তিনি তাঁহার সম্প্রদায়ের মোগলদিগকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া এক সেনাবাহিনী গঠন করিলেন এবং ৭৪৬ হিজরীতে (খ্রী: ১৩৪৬) কুলবর্গা ও বিদর অধিকার করিয়া লইলেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য মুহম্মদ তোগলক কুতলুগ খানের সাহায্যার্থে মালবে সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কুতলুগ খান বিদর সীমান্তে আসিয়া পৌঁছিলে আমীর আলী তাহাকে বাধাদান করিলেন। কিন্তু যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি শহরে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং পরে আত্মসমর্পণ করিলেন। কুত্‌লুগ খান তাঁহাকে বন্দী করিয়া মাজ দেওয়ারীতে সুলতানের নিকট লইয়া আসেন। সুলতান তাঁহাকে ও তাঁহার স্বজাতীয় সকলকে গজনীতে নির্বাসিত করেন। কিছুকাল পরেই এই লোকগুলি বিনানুমতিতে দিল্লী ফিরিয়া আসে। তখন তাহাদের সকলকে ধরিয়া হত্যা করা হয়। অযোধ্যার সুবাদার আইন-উল-মুল্ক সুলতানের বিশেষ অনুগত ছিলেন এবং কৃতিত্বের সঙ্গে সুলতানের

৮ এখানে বলিয়া রাখা উচিত যে, নবদীক্ষিত মোগল ও তাহাদের বংশধরদিগকে আমীর জাদিয়া নামে অভিহিত করা হইত। এই মোগলরা ভারতাক্রমণ করিতে আসিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া দিল্লী সুলতানদের অধীনে কর্ম গ্রহণ করে। বিদেশী বলিয়া স্থানীয় লোকদের প্রতি ইহাদের কোন পক্ষপাতিত্ব ছিল না। স্বেচ্ছাচারী সুলতানরা তাঁহাদের অন্যায় আদেশ ইহাদের সাহায্যে কার্যকরী করিতেন। তাহারা অবশ্য খুব সাহসী ছিল এবং সহজেই আনুগত্য ছিন্ন করিত।

অনেক কার্য সমাধা করিয়া সুলতানের একান্ত বিশ্বাস ভাজন হইয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে কুতলুগ খানের স্থানে দৌলতাবাদ ও ওয়ারাঙ্গলে সুবাদার মনোনীত করেন। আইন-উল-মুল্ক সুলতানের অনুগ্রহের ভুল অর্থ করিলেন এবং তিনি মনে করিলেন যে, তাঁহাকে পদচ্যুত করার প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে তাঁহাকে অন্যত্র নিয়োগ করা হইতেছে। কুত্‌লুগ খান দাক্ষিণাত্যে বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে সুলতানের সকল কার্য সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহার স্থলে অন্য কাহাকেও নিয়োগের কোন কারণ দেখা যাইতেছিল না এবং তিনি সুলতানের অধীনে যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করিয়া আসিতেছিলেন। এইসব চিন্তা করিয়া আইন-উল-মুল্‌ক্ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, সুলতান তাঁহাকে তাঁহার প্রদেশ হইতে সরাইয়া পরে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করিবেন। এই সময় রাজস্ব বিভাগের কয়েকজন কেরানী দুর্নীতির অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হয়। তাহাদের মধ্যে কয়েকজন পালাইয়া আইন-উল্-মুল্‌কের নিকট চলিয়া যায়। ইহারা সুলতানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আইন-উল-মুল্‌কের মনে যে সন্দেহ ছিল তাহা আরও উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে। আইন-উল-মুল্‌ক দাক্ষিণাত্য গমন করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। তিনি তাঁহার ভ্রাতার অধীনে একদল অশ্বারোহী সৈন্য সুলতানের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। আইন-উল-মুল্‌কের ভ্রাতা সুলতানের শিবিরের নিকটে আসিয়া—মাঠে সুলতানের যেসব অশ্ব, উষ্ট্র ও হস্তী চরিতেছিল সেসব তাড়াইয়া লইয়া গেলেন। সুলতান নিকটবর্তী প্রদেশের সৈন্যদিগকে তাহার সাহায্যার্থে তলব করিলেন। দিল্লী হইতে সসৈন্যে খাজা জাহান আসিয়া যোগদান করিলেন। সুলতান আইন-উল-মুল্‌কের বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। আইন-উল-মুল্‌ক গঙ্গা পার হইয়া ইতিমধ্যেই অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। আইন-উল-মুল্‌ক আশা করিয়াছিলেন সুলতানের বিক্ষুব্ধ সৈন্যরা আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিবে। এই সময় সুলতান অসীম সাহসিকতার সঙ্গে নিজেই সৈন্য পরিচালনা করেন এবং এক ভীষণ সংঘর্ষের পর বিদ্রোহী বাহিনীকে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। আইন-উল-মুলক বন্দী হইলেন (হিঃ ৭৪৭ : খ্রীঃ ১৩৪৬)। তাঁহার ভ্রাতা শেখ উল্লাহ্ আহতাবস্থায় সন্তরণ করিয়া গঙ্গা পার হইবার সময় ডুবিয়া মারা গেলেন। অন্য ভ্রাতা রহিম দাদ যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ হারাইলেন। সকলের অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত করিয়া সুলতান আইন-উল-মুলককে ক্ষমা করিয়া তাঁহাকে

পূর্বপদে বহাল করিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমি জানি আইন-উল-মুলক সর্বদাই আমার বিশেষ অনুগত ছিল– অন্যের দ্বারা প্ররোচিত না হইলে তিনি কখনই বিদ্রোহ করিতেন না।" এই ঘটনার পর মুহাম্মদ তোগলক সুলতান মাহমুদ গজনভীর বংশধর সালার মাসুদ গাজীর কবর জিয়ারত করিবার জন্য ভাইরাক গমন করেন। ৫৫৭ হিজরীতে (খ্রী: ১১৬২) মাসুদ গাজী ভাইরাকে হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিলেন। ভাইরাকে যেসব ফকির বাস করিত তাদের মধ্যে অর্থ বিতরণ করিয়া সুলতান দিল্লী ফিরিয়া যান। ইহার কিছুদিন পরেই হাজী রজব রাকিয়া বাগদাদ হইতে ফিরিয়া আসেন এবং খলিফার দূত শেখ-উস্-শেখ মিছরীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসেন। পূর্ববর্তী দূতের মতই তাহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় এবং বহু মূল্যবান উপহারাদিসহ বিদায় দান করেন। ইহার অল্পকাল পরেই আব্বাসীয় বংশের এক শাহজাদা দিল্লী আগমন করেন। সুলতান পালাম গ্রাম পর্যন্ত আগাইয়া যাইয়া মহাসমারোহে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁহাকে দুই লক্ষ তঙ্কা, একটি জমিদারী, দিল্লী শহরে একটি ইমারত এবং পাঁচটি উদ্যান উপহারস্বরূপ প্রদান করেন। খলিফার প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ এই শাহজাদাকে দরবারে সুলতানের দক্ষিণ পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিতে দেওয়া হয়। কোন কোন সময় সুলতান নীচে গালিচার উপর উপবেশন করিতেন।

এই সময় কতিপয় আমীর দৌলতাবাদের শাসনকর্তা কুতলুগ খানের নামে কুৎসা রটনা করেন এবং তাঁহাকে অত্যাচারী ও ক্ষমতার অপব্যবহারকারী বলিয়া অভিযুক্ত করেন। কিন্তু কুতলুগ খান প্রকৃতপক্ষে একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। সুলতান তাঁহাকে তলব করিয়া পাঠাইলেন এবং তাহার ভ্রাতা নিজাম-উদ-দীনকে দাক্ষিণাত্যের শাসনভার গ্রহণ করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহাকে আলম-উল-মুল্ক উপাধি প্রদান করা হইল এবং দরবার হইতে যতদিন অন্য কাহাকেও প্রেরণ করা না হয় তত দিন সুবাদারের দায়িত্ব পালন করিবেন বলিয়া আদিষ্ট হইলেন। নিজাম-উদ-দীন বারোচ হইতে দৌলতাবাদ আসিলেন। সুলতানের হুকুমনামা যখন আসিয়া পড়িল তখন কুতলুগ খান একটা পানির হাউজ নির্মাণ করাইতে ব্যস্ত ছিলেন। ঐ হাউজ এখনও আছে এবং উহা হাউজ-ই-কুতলুগ নামে পরিচিত। তিনি তাঁহার ভাইকে হাউজের নির্মাণকার্য

সমাপ্ত করিবার অনুরোধ করিয়া দিল্লী গমনের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ধারাগিরি নামক দৌলতাবাদের এক পার্বত্য দুর্গে তিনি দাক্ষিণাত্যের রাজস্ব গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন। দিল্লী আসিবার কালে তিনি ঐ অর্থ সঙ্গে করিয়া আনেন। কুতলুগ খান চলিয়া আসিবার পর দাক্ষিণাত্যকে চারটি প্রদেশে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক প্রদেশের জন্য একজন সুবাদার মনোনীত করা হইল। তাহাদের উপর নির্দেশ রহিল যে, তাহারা দাক্ষিণাত্যের সমস্ত অংশের উপর পূর্বের ন্যায় সুলতানের কর্তৃত্ব স্থাপন করিবেন। এতোদ্দেশে তিনি ইমাদ-উদ-মুল্‌কে সিপাহসালার নিযুক্ত করিয়া তাহার পরিচালনাধীনে এক বিশাল বাহিনী দৌলতাবাদ পাঠাইয়া দিলেন। সরওয়াকুল মুল্‌ক ও ইউসুফ বোখরাজ নামক আরও দুই বিখ্যাত সেনাপতিকে তাহার সঙ্গে পাঠানো হইল। এই তিনজন সেনাপতিকে নবনিযুক্ত শাসনকর্তা আলম-উল্‌-মুল্‌কের অধীনে কাজ করিতে বলা হইল। এই ব্যবস্থার ফল ভাল হইল না। কুতলুগ খানের অপসারণে ও নূতন শাসনকর্তার অযোগ্যতায় বিরক্ত হইয়া জনসাধারণ চতুর্দিকে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে লাগিল। ফলে দেশ উচ্ছন্ন ও জনহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। দাক্ষিণাত্য হইতে সাতকোটি রৌপ্যতঙ্কা রাজস্ব আদায় হইবে অনুমান করা হইয়াছিল—তাহা আদায় করা সম্ভব হইল না। রাজস্বের ঘাটতি পূরণ ও নিজেদের অর্থক্ষুধা নিবৃত্ত করিবার জন্য দাক্ষিণাত্যের কর্মচারীরা প্রজাদের উপর যথেচ্ছ জুলুম করিতে লাগিল। এই সময়েই আজিজ নামক নীচ বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তিকে মালবের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। এই ব্যক্তি পূর্বে একজন শরাব বিক্রেতা ছিলেন। আমীর জাদিয়া বা নবদীক্ষিত মোগলদিগকে সুলতান সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন এবং তাহাদিগকে বিপজ্জনক মনে করিতেন। কি প্রকারে ইহাদের উচ্ছেদ করা যায় তাহার উপায় উদ্ভাবন করিতে মালবের নবনিযুক্ত শাসনকর্তা আজিজকে বলিলেন। ইহার পর সুলতান তাঁহার পূর্ব সামরিক ঘাঁটি সাজদেওয়ারিতে চলিয়া যান। সেখানে আসিয়া নিজের পরিকল্পনানুযায়ী তিনি চাষাবাদের উৎকর্ষসাধনে মনোনিবেশ করেন। তিনি 'আমুর গো' নাম দিয়া এক কৃষিতত্ত্বাবধায়কের পদ সৃষ্টি করেন। আমুর গোর আক্ষরিক অর্থ জুলুম দাতা। এই কর্মচারী দেশকে কয়েকটি কৃষি এলাকায় বিভক্ত করিলেন। প্রত্যেক এলাকার আয়তন ছিল ৬০ বর্গ মাইল। প্রত্যেক কৃষি অঞ্চলের চাষাবাদ ও সর্বপ্রকার উন্নতি সাধনের দায়িত্ব অর্পণ করা হইল

একজন কর্মচারীর উপর। এইরূপ একশত কর্মচারী সঙ্গে সঙ্গেই নিযুক্ত হইল এবং এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার জন্য তাহাদিগকে দুই বৎসরে কোষাগার হইতে ৭০ লক্ষ তঙ্কা বাহির করিয়া দেওয়া হইল। সুলতানের উদ্দেশ্য সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হইয়াছিল। সুলতান যদি কখনও দিল্লী ফিরিয়া আসিতেন তবে বোধহয় ঐ কর্মচারীদের একজনকেও জীবিত রাখিতেন না।

সুলতানের ইচ্ছানুযায়ী মালব প্রদেশের ধর নামক স্থানে পৌঁছিয়া আজিজ আমীর জাদিয়া বা মোগল সর্দারদিগকে এক মজলিসে দাওয়াত করেন। সেখানে অনুচরবর্গসহ ৭০ জন মোগল সর্দারকে খুন করা হয়। সুলতানকে এই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া পাঠাইলে সুলতান তাঁহাকে পুরস্কারস্বরূপ একটি পোশাক ও একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব পাঠাইয়া দেন। তিনি দরবারের প্রত্যেক সভাসদকে তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র ও উপহার পাঠাইতে নির্দেশ দান করেন। সম্প্রতি সুলতানের মাথায় ঢুকিয়াছিল যে, উচ্চ বংশের লোক অপেক্ষা নিম্ন বংশের লোকদের দ্বারাই তার কার্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে। এই জন্য তিনি লাচিনা নামক এক গায়ক, পিয়ারু নামক এক মালি ও তৎপুত্র মুঙ্গা নামক এক তাঁতী, মকবিল নামক ক্রীতদাস এবং আরও কতিপয় নিম্নশ্রেণীর লোককে ওমরাহের মর্যাদা প্রদান করেন। তাহাদের কাহাকেও প্রদেশের শাসনকর্তা এবং কাহাকেও দরবারে উচ্চ দায়িত্বশীল পদে নিযুক্ত করেন। কবির এই সতর্কবাণীর প্রতি তিনি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করিলেন না।

"যে ব্যক্তি কোন গোলামকে উচ্চপদে উন্নীত করে সে যেন কখনও তাহার নিকট কোন কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রতিদান কামনা না করে। তাহার সমস্ত আশা বিফল হইবে এবং সে পরিণামে বুঝিতে পারিবে কি বিষধর সর্প তার হৃদপিণ্ড জড়াইয়া ছিল।"[১]

সুলতান বুঝিছিয়াছেন যে, কোন চরিত্রবান লোক তাঁহার দুষ্কর্মের বাহক হইবে না। এই কারণেই তিনি এইসব "ছোটলোকদিগকে" মর্যাদা ও ক্ষমতা প্রদান করিতে লাগিলেন। ইহার ফল এই হইল যে জন্মগত "ভদ্রলোকরা" সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিবার ফাঁক খুঁজিতে লাগিল। মালবে আজিজ কর্তৃক আমীর জাদিয়া নিধনের পর এই সম্প্রদায়ের লোকেরাও বিদ্রোহের ছিদ্র খুঁজিতেছিল। গুজরাটে প্রথম এইসব অসন্তোষ বিদ্রোহের রূপ ধারণ

১ সুলতান মাহমুদ গজনভীর প্রতি ফেরদৌসীর বিদ্রূপাত্মক কবিতা হইতে।

করিল। সুলতানের প্রতি আমীর ওমরাহদের আক্রোশের আভাষ পাইয়া গুজরাটের নবনিযুক্ত সুবাদার মালিক মক্‌বিল কোষাগারসহ দিল্লীর পথে রওয়ানা হইলেন। মালিক মক্‌বিল সবেমাত্র খাজা জাহান উপাধিসহ ঐ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রওয়ানা হইয়াছেন শুনিয়া আমীর জাদিয়ারা এক দল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়ায়। উহারা তাঁহার সর্বস্ব লুট করিবার পর তাঁহাকে গুজরাটের রাজাধানী নিহারওয়ালায় ফিরিতে বাধ্য করিল। এই হাঙ্গামার সংবাদ পাইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া সুলতান স্বয়ং গুজরাট গমন করিতে মনস্থ করিলেন। ৭৪৮ হিজরীতে (১৩৪৭ খ্রীঃ) তিনি শহর হইতে ৩০ মাইল দূরে সুলতানপুরে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন এবং সেখান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রওয়ানা হইবেন স্থির করিলেন।

সুলতানের শিক্ষক দাক্ষিণাত্যের প্রাক্তন সুবাদার কুতলুগ খান তখন রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। তিনি তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর লেখক জিয়া-উদ-দীন বার্নী মারফত সুলতানের নিকট একটা পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি বলিয়াছেন যে, সেই সামান্য বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতানের সেখানে গমন করার কোন প্রয়োজন নাই এবং কুতলুগ খান নিজে যাইয়া ঐ কার্য সন্তোষজনকভাবে সমাধা করিবেন এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, সেই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাজধানীতে সুলতানদের অনুপস্থিতি অন্যান্য প্রদেশে বিদ্রোহের কারণ হইতে পারে। কিন্তু এই উপদেশ সুলতানের মনঃপুত হইল না। তিনি যাত্রার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এই সময় মালবের শাসনকর্তা (মদ ব্যবসায়ীর পুত্র) আজিজের নিকট হইতে এক পত্র আসিল। গুজরাটে বিদেশী সর্দারদিগকে দমন করিবার জন্য তিনি সুলতানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি গুজরাটের পাশেই ছিলেন এবং এই দায়িত্ব পালন করিবার মত সৈন্যবলও তাঁহার ছিল। সুলতান তাঁহাকে অনুমতি দিলেন। কিন্তু তাঁহার সাফল্য সম্বন্ধে সুলতানের মনে সন্দেহ রহিল—কারণ তিনি জানিতেন যে আজিজ একজন বর্বর কাপুরুষ ও অনভিজ্ঞ ব্যক্তি।

আজিজ গুজরাটে প্রবেশ করিলেন। যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কিন্তু যুদ্ধের শুরুতেই আতঙ্কগ্রস্ত আজিজ অশ্ব হইতে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার দল হারিয়া গেল। আজিজ ধৃত হইলেন এবং তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হইল।

এই বিপর্যয়ের সংবাদ পাইয়া সুলতান অবিলম্বে গুজরাটের পথে রওয়ানা হইলেন। এই সময় যাত্রা পথে ঐতিহাসিক জিয়া-উদ-দীন বার্নীকে সুলতান বলিয়াছিলেন, "আমার মনে হয় লোকে মনে করে, আমি কঠোর শাস্তিদান করিয়া থাকি বলিয়াই এই সব বিদ্রোহ হয়। কিন্তু শাস্তি না দিলে লোকে কখনই পাপকর্মে বিরত হইবে না। তুমিতো একজন ঐতিহাসিক এবং শরিয়ত সম্বন্ধেও ওয়াকিফহাল ব্যক্তি। তুমিই বলো দেখি, কি প্রকার অপরাধে কঠোর শাস্তির বিধান?" উত্তরে ঐতিহাসিক বলিয়াছিলেন যে, সাতপ্রকার অপরাধে কঠোরশাস্তির বিধান আছে। যেমন:

১। ধর্মত্যাগ, ২। নিরপরাধকে বধ, ৩। দ্বিবিধ জেনা, ৪। রাজদ্রোহ, ৫। সরকারী কর্মচারীর পক্ষে আইনসঙ্গত আদেশ অমান্য করা, ৬। পরস্বপহরণ এবং ৭। শরিয়ত বিকৃতিকরণ।

অতঃপর সুলতান জিজ্ঞাসা করেন, "এই সাতের মধ্যে কোরানে কয়টির উল্লেখ আছে?" জিয়া-উদ-দীন বলিয়াছিলেন, তিনটি। যথা: ধর্মত্যাগ, মুসলমানের রক্তপাত ও দ্বিবিধ জেনা। অন্য চারি প্রকার অপরাধে রাজনীতি ও ন্যায়নীতির খাতিরে শাস্তিদান করা উচিৎ।" সুলতান বলিলেন, "এসব খুবই সত্য। তবে ঐসব আইন যখন প্রস্তুত করা হইয়াছিল সেই সময়ের তুলনায় মানুষ এখন অনেক বেশী দুর্বৃত্ত হইয়াছে।"

গুজরাট সীমান্তে আবুগড় পর্বতে পৌঁছিয়া সুলতান বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে এক সেনাপতিকে পাঠাইলেন। দেবী গ্রামের নিকট ঐ সেনাপতির সঙ্গে বিদ্রোহীদের এক সংঘর্ষ হইল। বিদ্রোহীরা সম্পূর্ণ পরাজিত হইল। সুলতান অতঃপর মন্থর গতিতে অগ্রসর হইয়া বারোচ পৌঁছিলেন এবং মালিক মক্‌বিলকে বিদ্রোহীদের অনুসরণ করিতে পাঠাইলেন। মালিক মকবিল নর্মদা তীরে বিদ্রোহীদের নাগাল পাইলেন এবং তাহাদের অধিকাংশকেই কতল করিলেন। অল্প যে কয়জন রক্ষা পাইল তাহারা বাগলানার রাজা মানদেবের শরণাপন্ন হইল। মানদেব তাহাদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইলেন। এই সংঘর্ষে বহু মোগল সর্দার নিহত হয় এবং সুলতানী ফৌজ সুরাট ও ক্যাম্বে শহর লুণ্ঠন করে। সুলতান এইবার দাক্ষিণাত্যের সব আমীর জাদিয়াদের বন্দী করিবার সংকল্প গ্রহণ করিলেন। এই কার্যে নিযুক্ত করিলেন জয়েন-উদ্-দীন জান্দ ও রুকুন-উদ-দীন থানেশ্বরীর পুত্র মালিক

মক্‌বিলকে—ইহারা উভয়েই ছিল পাষণ্ড। আমীর জাদিয়াদিগকে ধরিবার জন্য ইহারা দৌলতাবাদ আসিল এবং সুলতানের নির্দেশানুযায়ী মালিক মক্‌বিল বারোচ, মুদ্‌কুল, কুলবর্গা, বিদর, বিজাপুর, গাঞ্জোট, রায়বাগ গিলহারী, হুকারী, ও বেরার[১০] হইতে আমীর জাদিয়াদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন।

এই আদেশ মান্য করিয়া আমীর জাদিয়ারা দৌলতাবাদের দিকে রওয়ানা হইল। দৌলতাবাদ পৌঁছিলে মালিক মক্‌বিল তাহাদিগকে একত্রিত করিয়া ১,৫০০ অশ্বারোহী সৈন্যের প্রহরাধীনে সুলতানের নিকট পৌঁছাইবার জন্য রওয়ানা করিয়া দিলেন। তাহারা যখন দাক্ষিণাত্যের সীমান্তে মানিকপুঞ্জ গিরিপথের মুখে আসিয়া পৌঁছিল তখন তাহাদের মনে সন্দেহ জন্মিল যে, সুলতান হয়তো তাহাদের প্রাণনাশের চক্রান্ত করিয়াছেন। তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইয়া রক্ষীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। রক্ষীদলের নেতা আহমদ লাচিন তাহার অনেক লোকের সঙ্গে নিহত হইল। অবশিষ্ট সুলতানী-সৈন্য হোসেন আলীর পরিচালনাধীনে দৌলাতাবাদ পালাইয়া গেল। আমীর জাদিয়ারা তাহাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিল এবং শহর বাসীরা আত্মরক্ষার জন্য দণ্ডায়মান হইবার পুর্বেই তাহারা শহর অধিকার করিয়া ফেলিল। দৌলতাবাদের সৈন্যরাও তাহাদিগকে সাহায্য করিয়াছিল। সুবাদার আলম-উল-মুলকের নিকট হইতে আমীর জাদিয়ারা অনেক অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিল। এইজন্য বিদ্রোহীরা তাঁহার জানমালের উপর হস্তক্ষেপ করিল না। কিন্তু সুলতানের অন্যান্য কর্মচারীদিগকে তাহারা হত্যা করিল। সরকারী কোষাগারের সমস্ত অর্থ তাহারা নিজেদের মধ্যে বণ্টন করিয়া লইল। গুজরাট ও অন্যান্য প্রদেশের যেসব আমীর জাদিয়ারা প্রাণ ভয়ে পাহাড় ও জঙ্গলে পালাইয়া গিয়াছিল, দাক্ষিণাত্যে স্বজাতীয়দের অভাবনীয় সাফল্যের সংবাদ পাইয়া তাহারা সকল স্থান হইতে আসিয়া উহাদের সঙ্গে যোগদান করিতে লাগিল। ইহারা তাহাদের অন্যতম নেতা ইস্‌মাইলকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং তাঁহাকে নাসির-উদ-দীন উপাধি প্রদান করিলেন।

এই বিপ্লবের সংবাদ পাইয়া মুহাম্মদ তোগলক বারোচ ত্যাগ করিয়া দৌলতাবাদের দিকে ছুটিলেন। আমীর জাদিয়ারা তাহাদের দলবল লইয়া বাহির হইয়া আসিয়া সুলতানের মোকাবিলা করিবার জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। দুই

---

১০ দাক্ষিণাত্যে স্বাধীন সুলতানদের রাজ্য প্রতিষ্ঠার পুর্বে মুসলমান অধিকার কতদুর বিস্তৃত ছিল এই স্থানগুলির উল্লেখে তাহার আভাষ পাওয়া যায়।

সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। সংখ্যার দিক দিয়া অনেক কম হইলেও—তাহাদের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করা হইয়াছিল এবং যেসব দুঃখ-কষ্ট তাহাদিগকে সহ্য করিতে হইয়াছে এবং হইতেছিল সেইসব কথা স্মরণ করিয়া অমিত তেজে আমীর জাদিয়ারা সুলতানী ফৌজকে আক্রমণ করিল। সুলতানী ফৌজের দক্ষিণ ও বাম উভয় পার্শ্ব পিছু হটিয়া গেল এবং সমস্ত সুলতানী ফৌজ পলায়ন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সম্মুখ ভাগে থাকিয়া যাহারা যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের অনেকেই নিহত হওয়ায় আমীর জাদিয়ারা হতাবশিষ্ট ৪,০০০ সৈন্য লইয়া রণে ভঙ্গ দিল। রাত্রি আসিয়া পড়ায় জয় পরাজয় অমীমাংসিত রহিল। আমীর জাদিয়ারা এক পরামর্শ সভা ডাকিল। যুদ্ধে তাহারা বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। সভায় স্থির হইল যে, সুলতান ইসমাইল অধিকাংশ সৈন্যসহ দৌলতাবাদ ফিরিয়া যাইবেন। অবশিষ্ট সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হইয়া থাকিবে এবং মুহাম্মদ তোগলক দাক্ষিণাত্য ত্যাগ করিবার পর তাহারা দৌলতাবাদ আসিয়া পুনর্মিলিত হইবে। সুলতান এলিচপুরে অবস্থানরত ইমাদ-উল-মুল্‌ককে পলাতকদের অনুসরণ করিবার নির্দেশ দান করিয়া নিজে দৌলতাবাদ অবরোধ করিলেন।

দৌলতাবাদের পরিস্থিতি যখন এইরূপ—তখন সংবাদ আসিল যে মালিক তোগান নামক এক ব্যক্তি গুজরাটের আমীর জাদিয়াদের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক জমিদার তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিয়াছে। তাহারা গুজরাটের রাজধানী নিহারওয়ালা তো অধিকার করিয়াছেই অধিকন্তু তাহারা গুজরাটের নায়েব মুইজ-উদ-দীনকে বন্দী করিয়াছে এবং ক্যাম্বে লুট করিয়া বারোচ অবরোধ করিতে আসিতেছে। এই সংবাদ পাইবা মাত্রই দৌলতাবাদের অবরোধ পরিচালনার দায়িত্ব এক সেনাপতির উপর ন্যস্ত করিয়া সুলতান গুজরাটাভিমুখে ছুটিলেন। পথে তাঁহার অনেক হস্তী এবং সরঞ্জামাদির এক বিরাট অংশ দাক্ষিণাত্যের অধিবাসীরা লুট করিয়া লইল এবং তাহারা সুলতানী ফৌজের পিছু লাগিয়াই থাকিল। বারোচ পৌঁছিয়া সুলতান নর্মদা তীরে ছাউনী ফেলিলেন। মালিক তোগান ক্যাম্বে পালাইয়া গেলেন। সুলতান মালিক ইউসুফ বোখরাজকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। মালিক ইউসুফ ক্যাম্বে আসিয়া পৌঁছিল। মালিক তোগান অনুসণরকারীদিগকে ক্যাম্বের নিকটে আক্রমণ করিয়া বসিলেন। যুদ্ধে সুলতানী ফৌজ পরাজিত হইল এবং মালিক ইউসুফ

এবং আরও অনেক বিখ্যাত সেনাপতি নিহত হইল। যুদ্ধে যাহারা বন্দী হইল এবং পূর্ব হইতে যাহারা বন্দী ছিল তাহাদের সকলকে একযোগে হত্যা করিবার হুকুম দেওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে গুজরাটের শাসনকর্তা মুইজ-উদ-দীনও ছিল।

এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা শুনিয়া মুহাম্মদ তোগলক প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উন্মত্তপ্রায় হইয়া দ্রুত ক্যাম্বে গমন করিলেন। বাধাদান করিতে অসমর্থ হইয়া মালিক তোগান পালাইয়া গেলেন। আবহাওয়া ও পথঘাট খারাপ হওয়ায় সুলতান আসাওয়ালে[১১] অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইলেন। কিছুদিন পর সুলতান খবর পাইলেন যে, মালিক তোগান নিহারওয়ালায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ করিতে আসিতেছে। কারীতে সুলতানের ফৌজের সঙ্গে তাহাদের মোকাবিলা হইল। মালিক তোগান বোকামী করিয়া তাহার সৈন্য-দিগকে যুদ্ধের পূর্বে প্রচুর কড়া মদ্য পান করাইয়া মাতাল করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলে তাহারা মাতালের মতই সুলতানী ফৌজকে আক্রমণ করিল। সম্মুখে স্থাপিত হস্তীবাহিনী তাহাদের সে আক্রমণ প্রতিহত করিল এবং শেষ পর্যন্ত তাহাদিগকে হটাইয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিল। অতি সহজেই সুলতানের জয় হইল। পাঁচশত শত্রুসৈন্য বন্দী হইল। তাহাদের সকলকেই হত্যা করা হইল। প্রায় সমসংখ্যক সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হইয়াছিল। যুদ্ধ শেষে সুলতান জনৈক সেনাপতিকে তোগানের পশ্চাদগমন করিতে পাঠাইলেন। তোগান নিহারওয়ালা ত্যাগ করিলেন। এবং পুত্র পরিজনবর্গসহ থাট্টায় পালাইয়া গেলেন। ইহার পর সুলতান নিহারওয়ালায় ফিরিয়া আসিয়া তথায় শান্তি ও শৃঙ্খলা আনয়নে মনোনিশে করিলেন।

এই সময় দক্ষিণাত্য হইতে সংবাদ আসিল যে, বিদেশী সৈন্যরা (মোগল) হাসান গঙ্গু নামক এক ব্যক্তির অধীনে পুনরায় সজ্ঞবদ্ধ হইয়া সুলতানী ফৌজের সিপাহসালার ইমাদ-উদ-মুল্‌ককে নিহত করিয়াছে এবং মস্ত সুলতানী সৈন্যকে মালবের দিকে বিতাড়িত করিয়াছে। আরও শোনা গেল যে, ইসমাইল তাঁহার দাবী পরিত্যাগ করিয়াছেন এবং হাসান গঙ্গুকে তাঁহার স্থলে সুলতান মনোনীত করা হইয়াছে। তাঁহার বর্তমান উপাধি আলা-উদ-দীন হাসান গঙ্গু

১১ বর্তমান আহমদাবাদ।

বাহমনী। এই দুঃসংবাদ পাইয়া সুলতান অনেকটা দমিয়া গেলেন। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার অতিরিক্ত কঠোরতার জন্য এসব বিদ্রোহ ঘটিতেছে। অতঃপর ভবিষ্যতে শাসনকার্যে কোমল ব্যবস্থা অবলম্বনের নীতি গ্রহণ করিবেন স্থির করিলেন। প্রথম দফায় তিনি তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ফিরোজ ও অন্যান্য ওমরাহ্‌দিগকে তাঁহাদের সৈন্যসহ দিল্লী হইতে আসিতে বলিলেন। ইহাদিগকে হাসান গঙ্গুর বিরুদ্ধে নিয়োজিত করিবেন এই ছিল তাহার উদ্দেশ্য। উহারা আসিবার পূর্বেই দাক্ষিণাত্য বাহিনী এমন অপরাজেয় হইয়া উঠিল যে, সুলতান স্থির করিলেন তাঁহাকে সর্বাগ্রে গুজরাটে শান্তি স্থাপন করিতে হইবে এবং গিরনাল (জুনাগড়) অধিকার করিতে হইবে। তাহার পর তিনি স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাইবেন। তদনুযায়ী তিন বৎসরের অধিকাংশ সময় গুজরাটে সৈন্য সংগ্রহে কাটাইলেন এবং পরের বৎসর গিরনাল ও কাচ অধিকারে অতিবাহিত করিলেন। নিজাম-উদ-দীন আহমদের মতে মুহাম্মদ তোগলক গিরনাল দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকরা প্রমাণসিদ্ধভাবে বলিয়াছেন যে, রাজার নিকট হইতে উপহার গ্রহণ করিয়া মুহম্মদ ঐ দুর্গ অধিকার করিতে বিরত হইয়াছিলেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, ৮৭৩ হিজরীর পুর্বে (১৪৬৯ খ্রীঃ) গিরনাল মুসলমানদের হাতে আসে নাই। ৮৭৩ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৪৬৯) গুজরাটের মাহমুদ শাহ বেগুড়া কর্তৃক ইহা সর্বপ্রথম অধিকৃত হয়। জিয়া-উদ-দীন বার্নী পাঠে আমরা জানিতে পারি যে, একদা মুহাম্মদ তোগলক তাঁহাকে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখো সাম্রাজ্যময় কি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছে। এক স্থানে বিদ্রোহ দমন করিবার পুর্বেই অন্য স্থানে বিদ্রোহ দেখা দিতেছে। তুমি কি ইহার কোন প্রতিকার নির্দেশ করিতে পার?" উত্তরে জিয়া-উদ-দীন বলিয়াছিলেন, "অসন্তোষ জনগণের মনে গভীরভাবে শিকড় গাঁড়িয়া বসিলে উহার মূলোৎপাটন করা যায় না। মূলোৎপাটন করিতে গেলে রাজ্যের হৃৎপিণ্ডও বিদীর্ণ হইয়া যায়"। তিনি বলিয়াছিলেন, "এখন সুলতানের বুঝিতে পারা উচিৎ যে শুধু শাস্তিদান করিয়া আর কোন ফলোদয় হইবে না।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন, "যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে বিজ্ঞলোকদের মতে তাঁহার উত্তরাধিকারীর অনুকূলে সিংহাসন ত্যাগ করাই উচিৎ—যাহাতে লোকে পূর্ব অত্যাচারের কথা ভুলিয়া যায় এবং তাহাদের মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আসে।" বলা বাহুল্য—কথাটা সুলতানের মনঃপূত হইল না। তিনি রুষ্টভাবে বলিয়াছিলেন, "এমন

কেহই নাই যাহাকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে। বিদ্রোহী প্রজাদের উপর আমি গযব নাযেল করিতে থাকিব—পরিণাম যাহাই হউক"।

বার্নীর সঙ্গে এই কথোপকথনের পরেই গিরনালের ১৫ মাইল দূরে গন্‌ডুল নামক শহরে সুলতান অসুস্থ হইয়া পড়েন। খাজা জাহানের আগমন পর্যন্ত তিনি সেখানেই রহিলেন। কিছুদিন পূর্বে সুলতান তাঁহাকে দিল্লী পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রতি নির্দেশ ছিল যে দিল্লীস্থ আমীর-ওমরাহ্‌দের সঙ্গে সমস্ত বিরোধ মিটাইয়া তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গুজরাট আসিবেন। রোগ হইতে সামান্য আরোগ্য লাভের পরই সুলতান সৈন্যবাহিনী প্রস্তুত করিলেন। উচা ও দিপালপুর হইতে নৌকাদি সংগ্রহ করিয়া থাট্টায় লইয়া আসিবার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর গন্‌ডুল হইতে রওয়ানা হইয়া সুলতানী ফৌজ সিন্ধুনদের তীরে আসিয়া পৌঁছিল। তোগান কর্তৃক কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি করা সত্ত্বেও তাহারা নদী পার হইল। এইখানে আলতুন বাহাদুরের অধীনে পাঁচ সহস্র মোগল অশ্বারোহী সৈন্য আসিয়া সুলতানের সঙ্গে যোগদান করিল। এই সাহায্য প্রাপ্ত হইবার পর সুলতান সিন্ধুর সুমুরাজাকে শাস্তিদানের জন্য থাট্টা অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এই রাজা তোগানকে আশ্রয়দান করিয়াছিলেন। এই শহর হইতে ৬০ মাইল দূরে একস্থানে মহরমের দশ দিন কাটাইবার জন্য সুলতান ছাউনী ফেলিলেন। এইখানে অবস্থানকালে একদিন অতিরিক্ত মৎস্য ভক্ষণ করিয়া সুলতান পীড়িত হইয়া পড়িলেন। আরোগ্যলাভ না করা পর্যন্ত তাঁহাকে সেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করিতে উপদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু তিনি সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। অসুস্থাবস্থায়ই একটা নৌকায় উঠিয়া রওয়ানা হইলেন এবং থাট্টার ৩০ মাইলের মধ্যে আসিয়া মহরম মাসের ২১ তারিখে ৭৫২ হিজরীতে (১৩৫১ খ্রীঃ ২০ শে মার্চ) তিনি ইন্তেকাল করেন। এইরূপে ২৭ বৎসর রাজত্বের পর এই হৃদয়হীন জালেমের জীবনাবসান হয়।

ফিরোজ তোগলক

[সেনাবাহিনীতে বিদ্রোহ। মোগল সৈন্যগণ কর্তৃক কোষাগার লুণ্ঠন। শিবিরে সুলতানের চাচাতো ভাই ফিরোজের অভিষেক। দিল্লীতে প্রতিবাদ এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহাকে স্বীকৃতিদান। দাক্ষিণাত্য ও বাঙ্গালাকে স্বাধীন রাজ্যরূপে স্বীকৃতিদান ও দূত গ্রহণ। বাঙ্গালার সঙ্গে যুদ্ধ। দিল্লী-বাহিনীর উড়িষ্যার জাজ নগর গমন। জ্যেষ্ঠ পুত্র মুহম্মদের উপর সন্দেহ। পিতা কর্তৃক পুত্রের হস্তে শাসনভার অর্পণ। গুজরাটে সুবাদার প্রেরণ। সুবাদারের গুজরাট প্রবেশে অসুবিধা। নূতন সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র এবং তাঁহাকে অবরুদ্ধকরণ। জনসাধারণ কর্তৃক বৃদ্ধ সুলতানকে আনয়ন ও নূতন সুলতানের বহিষ্কার। শাহজাদা গিয়াস-উদ-দীনের সিংহাসনে উপবেশন। নব্বই বৎসর বয়সে ফিরোজ তোগলকের ইন্তেকাল। তাঁহার চরিত্র। তাঁহার রাজত্বকালের জনহিতকর কার্যের বিবরণ।]

মুহাম্মদ তোগলকের মৃত্যুকালে তাঁহার চাচাতো ভাই ফিরোজ (গিয়াস-উদ-দীন তোগলকের ভ্রাতুষ্পুত্র) শিবিরেই ছিলেন। মুহাম্মদ তোগলক তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং তাঁহাকে উত্তরাধিকারী করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তদনুযায়ী তিনি মৃত্যু-শয্যায় ফিরোজকে সুলতান মনোনীত করিবার জন্য আমীর ওমরাহগণকে সুপারিশ করেন। সুলতানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই সেনাবাহিনীতে চরম উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়া আনিবার জন্য তিনি হিন্দুস্থানী সর্দারদের অধিকাংশকেই নিজের দলে ভিড়াইলেন এবং গোলযোগ শান্ত না হওয়া পর্যন্ত পেশাদার মোগল সৈন্যদিগকে শিবির হইতে কিছু দূরে রাখার ব্যবস্থা করিলেন। মোগল সৈন্যদের নেতা আমীর নওরোজ সেই রাত্রেই পালাইয়া যাইয়া অন্য মোগল নেতা আলতুনতাসের সঙ্গে যোগদান করেন। তিনি আলতুনতাসকে জানাইলেন যে, মৃত সুলতানের কোষাগার লুণ্ঠন করিতে হইলে উহাই সুবর্ণ সুযোগ। লুণ্ঠন করিয়া তাহারা স্বদেশে চলিয়া যাইবে। আলতুনতাস সেই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। মোগলরা পরদিন সকালে শিবিরে ফিরিয়া আসিল। শিবিরে তখনও দারুণ গোলমাল চলিতেছিল। এক ভীষণ সংঘর্ষের পরে মোগলরা কয়েকটি উষ্ট্র লুণ্ঠিত ধন-রত্ন বোঝাই করিল। আরও অধিক লুটপাটের হাত হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য ফিরোজ তাঁহার

সৈন্যবাহিনী লইয়া সেবুস্থান বা সেহ্ওয়াল যাইয়া পৌঁছিলেন এবং মোগলদের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য সর্বপ্রকার সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিলেন। এই সময় সেনাবাহিনীর প্রধানরা ফিরোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে সিংহাসনে আরোহণ করিতে অনুরোধ করেন। খানিকটা ইতস্তত: করিবার পর তিনি রাজী হইলেন এবং তাঁহাকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করা হইল। বিগত হাঙ্গামার সময় যে-সমস্ত লোক থাট্টার লোকদের হাতে পড়িয়াছিল—তখতে উপবেশন করিবার পরদিনই সেইসব লোককে ক্ষতিপূরণ দানে মুক্ত করিয়া আনিবার হুকুম দিলেন। তৃতীয় দিবসে তিনি মোগলদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মোগলরা পরাস্ত হইল এবং তাহাদের বহু সেনাপতি বন্দী হইল। ইহার পর তিনি ভাকার গমন করেন। সেখানে তিনি আমীর-ওমরাহদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। তখতে আরোহণ করিবার পর প্রত্যেক সুলতান ইহা করিতেন। সেখান হইতে সুলতান ইমাদ-উল-মুলক ও আমীর আলী ঘুরীকে কিছু সংখ্যক সৈন্যসহ বিদ্রোহী মালিক তোগরানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। সুলতান স্বয়ং উচার দিকে রওয়ানা হইলেন। এইখানে সুলতান অনেক সৎকর্ম ও দান-খয়রাত করেন।

উচায় অবস্থানকালে তাঁহার নিকট সংবাদ আসিল যে, সাবেক সুলতানের আত্মীয় নব্বই বৎসর বয়স্ক আমীর খাজা জাহান ছয় বৎসর বয়স্ক এক অজ্ঞাত পরিচয় বালককে মুহম্মদ নাম দিয়া তখ্‌তে বসাইয়াছেন এবং কতকগুলি লোক যোগাড় করিয়া আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করাইয়াছেন। ঐ বালককে খাজা জাহান পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বৃদ্ধ আমীরকে অনুরোধ করিয়া এবং ক্ষমতা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতিদান করিয়া যে-কোন প্রকারে স্বপক্ষে আনিবার জন্য এবং তাহার নূতন পরিকল্পনা পরিত্যাগ করাইবার জন্য সুলতান হস্তীশালার তত্ত্বাবধায়ক সাইফ-উদ-দীনকে দিল্লী প্রেরণ করিলেন। ইহার পর সুলতান সৈন্যদলসহ কিছুকাল দিপালপুর অবস্থান করিবার পর সেখান হইতে আজুধন গমন করেন। সেখানে মালিক মক্‌বিল আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। মক্‌বিল কিছুদিন আগে খান জাহান উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে শীলমোহর রাখিবার দায়িত্ব প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে সম্মানসূচক পোশাক দান করিয়া পূর্বের মত উজিরের পদে বহাল করিলেন।

ফিরোজ দিল্লীর পথে হান্সী পৌঁছিলে খাজা জাহানের দুত আসিয়া সেখানে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। দুত মারফত খাজা জাহান ফিরোজকে বলিয়াছিলেন যে, "হুকুমত মুহাম্মদ তোগলকের পুত্রের হাতে। সুতরাং ফিরোজের উচিত হইবে শিশু সুলতানের ন্যায্য অধিকার মানিয়া লইয়া বয়োপ্রাপ্তি পর্যন্ত তাঁহার প্রতিভূরূপে কার্য করিবার সুযোগ লাভ করিয়াই খুশী হওয়া।" দুত যখন সুলতানকে এই কথা বলেন তখন সভাসদরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন।[১] ফিরোজ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহারা মুহাম্মদ তোগলকের কোন পুরুষ বংশধরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু জানেন কি-না। তাঁহারা সকলে একবাক্যে বলিলেন, "মওলানা কামাল-উদ-দীন ছাড়া আর কাহারো জানিবার কথা নয়।" কামাল-উদ-দীন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, "মুহাম্মদ তোগলকের কোন পুত্র থাকিলেও এখন আর তাহা উত্থাপন করা সমীচীন হইবে না এবং 'সুলতানাত' সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাতেই অটল থাকিতে হইবে। দিল্লীতে যে শিশুকে তখ্‌তে বসানো হইয়াছে তিনি যে মুহাম্মদ তোগলকের পুত্র তাহা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু ওমরাহগণ তাঁহাকে স্বীকৃতি না দেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে করিয়াছেন।"

অতঃপর খাজা জাহানের দুত শেখ দাউদ তাঁহার মালিকের নিকট ফিরিয়া যান। প্রস্থানকালে শেখ দাউদকে বলিয়া দেওয়া হইল যে, তিনি যাহা শুনিয়াছেন সব খাজা জাহানকে যেন বলেন এবং তাঁহাকে ফিরোজের সঙ্গে রফা করিতে যেন অনুরোধ করেন। শেখ দাউদ শহরে পৌঁছার পুর্বেই কয়েকজন প্রধান ব্যক্তি শিবিরে আসিয়া ফিরোজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিলেন। এই সময় গুজরাট হইতে সংবাদ আসিল যে, ইমাদ-উল-মুল্‌ক মালিক তোগানকে পরাস্ত করিয়াছেন। ঠিক সেই দিনই সুলতানের এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

১ প্রথম হইতেই ফিরোজ সৈন্যবাহিনীর একাংশ হইতে যে বাধাপ্রাপ্ত হন এবং সম্রাট বলিয়া নিজেকে ঘোষণা করিবার পুর্বে যে সতর্কতা তিনি অবলম্বন করেন, তাহাতে মনে হয় খাজা জাহান যে বালককে দিল্লীর সিংহাসনে বসান, সে মুহাম্মদ তোগলকের পুত্র ছিল এবং ফিরোজ সিংহাসন অন্যায়ভাবে অধিকার করে। ফিরিস্তা খোলাখুলিভাবে না বলিলেও মনে হয়, তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে সে মুহাম্মদ তোগলকের পুত্র ছিল।

সুলতান তাঁহার নাম রাখিলেন ফতেহ্ খান। এইসব ঘটনাই ফিরোজের অনুকূলে গেল। শিশু সুলতানের দাবী প্রতিষ্ঠিত করা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া খাজা জাহান ফিরোজের সঙ্গে রফা করিতে সম্মত হইলেন। তিনি কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ফিরোজের নিকট পাঠাইলেন এবং তাঁহাদের মারফত সুলতানকে সম্মান প্রদর্শন করিতে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। ফিরোজ সানন্দে অনুমতিদান করিলেন। বৃদ্ধ আমীর কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে খালি মাথায় শিরস্ত্রাণ কণ্ঠদেশে জড়াইয়া সুলতানের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিতে আসিলেন। প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী সুলতান তাঁহাকে প্রাণ ভিক্ষা দিলেন। কিন্তু তাহাকে হান্সীর ফৌজদারের তত্ত্বাবধানে রাখা হইল। খাজা জাহানের দক্ষিণ হস্ত মালিক কাত্তাবকে বিতুণ্ডায় নির্বাসিত করা হইল।

৭৫২ হিজরী, ২রা রজব (১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৩৫১ খ্রীঃ) ফিরোজ দিল্লী প্রবেশ করেন। তখ্‌তে আরোহণ করিয়াই তিনি প্রজাদের প্রতি সুবিচার করিতে মনোনিবেশ করেন। প্রজারা চারদিক হইতে আবেদন লইয়া আসিতে লাগিল। পরে ৫ই সফর হিঃ ৭৫৪ (মার্চ ১২, ১৩৫৩) তিনি শিকারের অছিলায় সারমর পর্বতে দরবার স্থানান্তরিত করেন এবং সেখানকার জমিদারগণকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন। ৩রা জমাদিয়াল আউয়াল ৭৫৪ (জুন ৫, ১৩৫৩ খ্রীঃ) সোমবার, দিল্লীতে সুলতানের দ্বিতীয় পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে। তিনি তাহার নাম রাখেন মুহম্মদ। এই উপলক্ষে মহা ধুমধাম ও অনেক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। ৭৫৪ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৩৫৩) সুলতান কালানুরে শিকার করিতে যাইয়া সেখানে সরস্বতী নদী তীরে এক প্রাসাদ নির্মাণ করান। এই বৎসরই সাওয়াল মাসে খান জাহানের উপর দিল্লীর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া সুলতান স্বয়ং হাজী ইলিয়াসকে দমন করিবার জন্য লক্ষণাবতী রওয়ানা হন। লক্ষণাবতীর শাসনকর্তা হাজী ইলিয়াস দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করিয়া নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং সমস্ত বাঙ্গালা নিজের শাসনাধীনে আনয়ন করিয়া বেনারস পর্যন্ত স্বীয় অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন। সুলতান হইয়া তিনি শাম্‌স্-উদ-দীন উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সুলতান ফিরোজ গোরকপুর পৌঁছিলে তথাকার জমিদারগণ যথাবিধি নজরানা সহ সুলতানের সঙ্গে মোলাকাত করেন। এখান হইতে রওয়ানা হইয়া সুলতান হাজী ইলিয়াসের অন্যতম ঘাঁটি পাণ্ডুয়া পর্যন্ত আসিয়া পৌঁছেন। হাজী

ইলিয়াস পালাইয়া একডালা দুর্গে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সুলতানী ফৌজ তাঁহাকে অনুসরণ করিয়া ৭ই রবিউল আউয়াল একডালার নিকট আসিয়া দুর্গ অবরোধ করিলেন। বিশদিন পর্যন্ত অবরোধ স্থায়ী ছিল। ইহার পর ৫ই রবিউল আখের গঙ্গার তীরে যাইয়া শিবির স্থাপনের জন্য সুলতানী ফৌজ স্থানত্যাগ করিতে শুরু করে। ইহাতে হাজী ইলিয়াস ভাবিলেন যে, সুলতানী ফৌজ বিফলমনোরথ হইয়া সরিয়া পড়িতেছে। সেইজন্য তিনি তাহার সৈন্য-দিগকে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া সুলতানী ফৌজকে আক্রমণ করিতে হুকুম দেন। তখন তাহারা দুর্গের বাহিরে আসিয়া যুদ্ধের ভঙ্গীতে কাতারবন্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হয়। সুলতানী ফৌজও তখন আক্রমণের জন্য রুখিয়া দাঁড়ায়। ইহাতে ভীত হইয়া হাজী ইলিয়াসের সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পুনরায় দুর্গের দিকে ছুটিয়া পালায়। এই সময় তাহাদের ৪৪টি হাতী এবং অনেকগুলি নিশান সুলতানের হস্তগত হয়। ইহার পর বর্ষা আসিয়া পড়ায় সুলতান তাঁহার সঙ্কল্প ত্যাগ করিতে বাধ্য হন এবং এক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত করিয়া দিল্লী প্রত্যা-বর্তন করেন।

৭৫৫ হিজরীতে (১৩৫৪ খ্রীঃ) সুলতান দিল্লীর উপকণ্ঠে ফিরোজাবাদ শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং হিঃ ১২ই সাবান ৭৫৬ (জুলাই ১২, ১৩৫৫) দিপালপুর গমন করেন। সেখানে সাতলুগ হইতে কাগুর পর্যন্ত ৪৮ ক্রোশ দীর্ঘ এক খাল খনন করান। ৭৫৭ হিজরীতে (১৩৫৬ খ্রীঃ) যমুনা হইতে একটা খাল বাহির করিয়া মানভি ও সারমুর পাহাড়ের মাঝখান পর্যন্ত লইয়া আসেন। আরও সাতটি ক্ষুদ্র খাল কাটিয়া আনিয়া এইখানে এই খালের সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই খালগুলির মিলিত স্রোত হান্সীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া রায়সিন[২] আসিয়া পৌছে। সুলতান এই স্থানে একটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করিয়া উহার নাম রাখিলেন "হিসারে ফিরোজী"।

কাগার হইতে অন্য আর একটি খাল খনন করাইয়া সরস্বতীর উপর দিয়া পেরীকেহ্রা গ্রাম পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। সেইখানে আর একটি শহর নির্মাণ করাইয়া উহার নাম দেওয়া হয় ফিরোজাবাদ। "হিসারে ফিরোজে" তিনি এক বৃহৎ হ্রদও খনন করাইয়া দিলেন। যমুনা হইতে একটা খাল

২ মালবে এই নামের আর একটি শহর আছে। এই শহর উহা হইতে স্বতন্ত্র।

কাটিয়া আনিয়া এই হ্রদে যোগ করিয়া দেওয়া হয়। এই বৎসর জিলহজ্জ মাসে মিশরের খলিফা আবুল ফাত্তাহ্ আবুবকর আবুরাবিয়া সুলেমান, ফিরোজকে তাঁহার অভিষেক বার্ষিকীতে একটা সম্মানসূচক পোশাক ও একটি অভিনন্দন পত্র প্রেরণ করেন। এই মাসেই বাঙ্গালা হইতে নূতন প্রস্তাব লইয়া দূত আসে। সুলতান তাহাদিগকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং প্রস্তাব মঞ্জুর করেন। এই সময় হইতে বাঙ্গালা ও দাক্ষিণাত্য অনেকাংশে দিল্লীর আওতার বহির্ভূত হইয়া পড়িল বলা চলে। এই দুইটি এলাকা অতঃপর শুধু নাম মাত্র কিছু কর প্রদান করিত। ৭৫৮ হিজরীতে জাফর খান ফারসী সোনারগাঁও হইতে দিল্লী আগমন করেন এবং তাঁহাকে সহকারী উজিরের পদ প্রদান করা হয়।

৭৫৯ হিজরীতে (১৩৫৭ খ্রীঃ) বাঙ্গালার সুলতান কয়েকটি হস্তী এবং আরও অনেক উপঢৌকন দিল্লীতে প্রেরণ করেন। প্রতিদানে কয়েকটি আরব ও পারস্য দেশীয় অশ্ব, কিছু রত্ন ও অন্যান্য সৌখীন বস্তু বাঙ্গালার সুলতানকে পাঠাইয়া দেন। দিল্লীর দূতরা এইসব উপহার লইয়া বিহার পৌঁছিলে শুনিতে পাইল যে, বাঙ্গালার সুলতান শামস্-উদ-দীন ইলিয়াস মারা গিয়াছেন এবং তাঁহার পুত্র সিকান্দার শাহ তখ্‌তে উপবেশন করিয়াছেন। আর অগ্রসর হওয়া অনুচিত ও নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া দূতরা দিল্লী প্রত্যাগমন করে। এই বৎসর সুলতান সামানায় শিবির স্থাপন করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন। এইখানে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, মোগলরা ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়া দিপালপুর পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া শয়ন-কক্ষ রক্ষী কাবুল খানের অধীনে এক দল সৈন্য ইহাদের বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। কিন্তু তিনি সেখানে পৌঁছিবার পূর্বেই মোগলরা তাহাদের লুণ্ঠিত দ্রব্যাদি লইয়া সরিয়া পড়ে।

৭৬০ হিজরীতে (১৩৫৯ খ্রীঃ) সুলতান এক সৈন্যবাহিনী লইয়া লক্ষণাবতী অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে প্রবল বৃষ্টির দরুন সুলতানকে জাফরাবাদে বর্ষাকাল কাটাইতে হয়। এইখানে অবস্থানকালে শেখজাদা বুস্তামী মিশরের খলিফার তরফ হইতে দূতরূপে সুলতানের নিকট আসেন। তাঁহাকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয় এবং তিনি সুলতানকে খলিফার প্রদত্ত খেলাৎ প্রদান করেন। তখ্‌তে আরোহণ করিবার পর ফিরোজ এই বুস্তামীকেই দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। এইবার তাঁহাকে আজিম-উল-মুল্‌ক উপাধিতে ভূষিত করা

হয়। বাঙ্গালার নূতন সুলতান সিকান্দার শাহ পুরবিয়া সুলতান ফিরোজের নিকট এইখানে দূত প্রেরণ করেন। তাহারা সঙ্গে করিয়া আনিয়াছিল পাঁচটি হাতী এবং আরও অনেক মূল্যবান উপঢৌকন। এই শান্তির প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া বর্ষাবসানে ফিরোজ লক্ষণাবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সিকান্দার শাহ পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতানী ফৌজ দুর্গ অবরোধ করিল এবং দুর্গবাসীদের দুর্দশা চরমে পৌছিল। তখন সিকান্দার শাহ দিল্লীর সুলতানের নিকট শান্তির প্রস্তাব পাঠাইতে বাধ্য হইলেন এবং সঙ্গে পাঠাইলেন ৪০টি হস্তী। শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হইল এবং কয়েকদিনের মধ্যে ফিরোজ জৌনপুর পর্যন্ত সরিয়া আসিলেন। সেখানে সৈন্যবাহিনীকে এক ঋতু পর্যন্ত অপেক্ষা করিবার পর তিনি জাজ নগরাভিমুখে রওয়ানা হইয়াছিলেন। সুলতানী ফৌজ সম্বুর শহরে পৌছিলে তথাকার রাজা রায় সিদ্ধন পালাইয়া যান। কিন্তু তাহার এক কন্যা সুলতানের হাতে পড়ে। ইনি পরে শক্কর খাতুন নামে পরিচিত হন।[৩] সুলতান তাহাকে নিজের সন্তানের মত লালন পালন করেন। সুলতানী ফৌজ এই অঞ্চলে লুণ্ঠন কার্যে লিপ্ত হইয়াছিল। অতঃপর সুলতান জাজ নগরের রাজার রাজধানী বেনারস[৪] পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। সুলতানের আগমন বার্তা পাইয়াই রাজা তেলিঙ্গানার দিকে পালাইয়া গিয়াছিলেন, ফলে সুলতানী ফৌজ নির্বিঘ্নে তাঁহার রাজ্য লুণ্ঠন করিয়া চলিয়া আসে। পথে বীরভূমের রাজা সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং লুণ্ঠনের হাত হইতে তাঁহার রাজ্য রক্ষা করিবার জন্য সুলতানকে ৩৭টি হস্তী এবং আরও অনেক মূল্যবান দ্রব্য উপহার প্রদান করেন। অতঃপর পথ পরিবর্তন করিয়া সুলতানী ফৌজ পদ্মাবতীর মধ্য দিয়া রওয়ানা হয়। এই জঙ্গলে অনেক হাতী ছিল। তাঁহারা ৩০টি হাতী ধরে এবং দুইটিকে ধরিতে না পরিয়া মারিয়া ফেলে। ইহার পর সুলতান আর কোথাও অপেক্ষা না করিয়া ৭৬২ হিজরীর রজব মাসে (১৩৬০ খ্রীঃ) দিল্লী পৌছেন। দিল্লী পৌছিয়াই তিনি আর একটি খাল খনন করাইবার কার্যে হস্তক্ষেপ করেন। পারওয়ারের নিকট একটা পাহাড়

৩ শক্কর খাতুন (চিনি-সখা)—এই নাম বন্দী হওয়ার পরে সুলতান হইতে দিয়া থাকিবেন।

৪ ইহা গঙ্গা তীরের বেনারস নহে। রাজা নিশ্চয়ই পবিত্র বেনারসের নামানুসারে স্বীয় রাজধানীর নাম বেনারস রাখিয়াছিলেন।

আছে। সরস্বতী নামে এক নদী সেই পাহাড় হইতে নির্গত হইয়া শতদ্রুতে পতিত হইয়াছে। সরস্বতী নদীর অনতিদূরে সালিমা নামে অন্য একটি জলস্রোত আছে। এই দুই নদীর মধ্যখানে এক উচ্চ ভূমি দ্বারা বিচ্ছিন্ন। সুলতানকে বলা হইয়াছিল যে, এই উচ্চ ভূমির মধ্য দিয়া একটা খাল কাটিয়া যদি এই দুই নদীর সংযোগ সাধন করা যায় তবে সরস্বতীর পানি সালিমা নদীতে প্রবাহিত হইবে এবং সেই জলস্রোত মনসুরপুরের মধ্য দিয়া সুনাম পর্যন্ত প্রবাহিত হইবে এবং ইহা সারা বৎসর প্রবাহমান থাকিবে। ইহা শুনিয়া সুলতান সেই স্থানে গমন করিয়া প্রস্তাবিত খাল খননের সম্ভাব্যতা বিবেচনা করেন। অতঃপর তিনি এই কার্যের জন্য ৫০,০০০ মজুর সংগ্রহ করিবার হুকুমদান করেন। খননকালে সেই উচ্চ ভূমির মধ্যে মানুষ ও হাতীর অস্থি পাওয়া গিয়াছিল। একটা মানুষের বাহুর অস্থি পাওয়া গিয়াছিল—কনুই পর্যন্ত যাহার দৈর্ঘ্য ছিল তিন গজ। কতকগুলি অস্থি প্রস্তরিভূত অবস্থায় এবং কতকগুলি অস্থিরূপেই পাওয়া গিয়াছিল। সরহিন্দ পূর্বে সামানার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই সময় সামানাকে সারহিন্দ হইতে পৃথক করা হয় এবং সামানার চতুর্দিকে ১৫ মাইল এলাকা লইয়া এক নূতন সরহিন্দ জেলা গঠন করা হয়। এই জেলা জিয়া-উদ-দীন ও শামস্‌-উদ-দীন আলীরাজার অধীন করিয়া দেওয়া হয়। সেখানে একটা দুর্গও নির্মাণ করা হয় এবং উহার নাম দেওয়া হয় ফিরোজপুর। এইখান হইতে সুলতান নগরকোট গমন করেন এবং সেখানে তুষার ঝড়ে পতিত হন। নগরকোটের রাজা আত্মসমর্পণ করিলে তাঁহাকে স্বীয় রাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। প্রাক্তন সুলতানের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য নগরকোটের নূতন নামকরণ করেন মুহম্মদাবাদ। নগরকোটের লোকদের নিকট সুলতান শুনিতে পান যে, নগরকোটের মন্দিরে স্থাপিত যে মূর্তিটির হিন্দুরা পূজা করে, উহা প্রকৃতপক্ষে মহাবীর আলেকজাণ্ডারের পত্নী নওশাবার প্রতিমূর্তি। চলিয়া যাইবার সময় আলেকজাণ্ডার উহা হিন্দুদের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহা সেই সময় জালামুখী নামে পরিচিত ছিল। এই মন্দিরে একটি উৎকৃষ্ট পাঠাগার ছিল। উহাতে হিন্দুদের ১,৩০০ গ্রন্থ ছিল। দর্শন, জ্যোতিষ ও ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বলিত একটি গ্রন্থ আইজ্জ-উদ-দীন খালিদ খানী কর্তৃক পারস্য ভাষায় গদ্যে অনূদিত হইয়াছিল এবং ঐ গ্রন্থের নাম দেওয়া হইয়াছিল দুলাইল ফিরোজ শাহী। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, ফিরোজ তোগলক এই সময় নগরকোটের মূর্তিগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া উহাদের টুকরাগুলি গোমাংস

খণ্ডের সঙ্গে মিশাইয়া থলিতে রাখেন এবং ঐ থলিগুলি গলায় বাঁধিয়া ব্রাহ্মণদিগকে শিবিরের মধ্য দিয়া হাঁটিয়া যাইতে বাধ্য করেন। আরও বলা হয় যে, নওশাবার মূর্তিটি সুলতান মক্কায় পাঠাইয়া দেন এবং সেখানে মূর্তিটি এমন একটা রাস্তার উপর ফেলিয়া রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন—যেখানে উহা হজ্ব যাত্রীদের পদতলে মর্দিত হইবে। এই সঙ্গে কাবাগৃহের ইমাম ও খেদমদগারদের মধ্যে বিতরণের জন্য সুলতান একলক্ষ তঙ্কা প্রেরণ করিয়াছিলেন।[৫] নগরকোট বিজয়ের পর ফিরোজ সিন্ধুনদ বরাবর থাট্টা অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। থাট্টার জাম আফ্রার পুত্র জামবানী কর প্রদান রহিত করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং আত্মরক্ষার ব্যবস্থা সুদৃঢ় করিয়াছিলেন। সুলতানী ফৌজ শহর অবরোধ করে। কিন্তু অবরোধ বেশীদিন স্থায়ী রাখা সম্ভব হয় না। প্রবল বৃষ্টিপাত এবং শিবিরে রসদ ও পশু খাদ্যের অভাব লক্ষিত হওয়ায় সুলতান অবরোধ ত্যাগ করিয়া তখনকার মত গুজরাট গমন করাই যুক্তিযুক্ত মনে করেন। গুজরাটে কিছুকাল শিকার করিয়া কাটাইয়া বর্ষাশেষে জাফর খানের উপর গুজরাটের শাসনভার চাপাইয়া সুলতান পুনরায় থাট্টায় চলিয়া আসেন। এবার জামবানী অল্পকাল পরেই আত্মসমর্পণ করেন এবং সুলতান তাঁহাকে তাঁহার প্রধান সভাসদদের সঙ্গে দিল্লী লইয়া আসেন। কিন্তু কিছুকাল পরেই সুলতান দয়াপরবশ হইয়া জামবানীকে থাট্টায় শাসনকর্তার পদে পুনর্বহাল করেন।

৭৭৪ হিজরীতে (১৩৭২ খ্রী:) মালিক মক্‌বিল ওরফে খানজাহান পরলোক গমন করেন। তাঁহার পুত্র জুনাশাহ্‌ পিতার পদ ও উপাধির উত্তরাধিকারী হন। গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খানের ইন্তেকাল পর বৎসরের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। জাফর খানের পুত্র দরিয়া খান তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। ইহার পর বৎসর সুলতানের জীবনের সর্বাপেক্ষা মর্মান্তিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। তাঁহার প্রিয়তম পুত্র ও সকল আশা ভরসার স্থল ফতেহ খান মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহাতে সুলতান শোকে ভাঙ্গিয়া পড়েন।

---

৫ মনে হয় কোন গোঁড়া ঐতিহাসিক এই মহান ও উদারচেতা সুলতানের গৌরব বৃদ্ধির জন্য এই কল্পিত ঘটনা তাঁহার উপর আরোপ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, ইহাতে তাঁহার নির্মল চরিত্রে যে কত বড় কলঙ্ক আরোপিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদের ধারণাতীত ছিল। তাঁহার অন্যান্য কীর্তিকলাপের সঙ্গে ইহা এতই সামঞ্জস্যহীন যে, নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে—ইহা মিথ্যা।

৭৭৮ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৩৭৬) গুজরাটের রাজস্বে বিপুল ঘাট্‌তি হয়। এই সময় খাজা শাম্‌স্‌-উদ-দীন দামঘানী সুলতানের নিকট প্রস্তাব করেন যে, তাঁহাকে গুজরাটের শাসনকর্তার পদ প্রদান করা হইলে তিনি নির্ধারিত রাজস্বের উপরও প্রতি বৎসর আরও ১০০টি হস্তী, চল্লিশ লক্ষ তঙ্কা ও ৪০০ শত আবিসিনিয়ান গোলাম প্রদান করিবেন। সুলতান বলিলেন যে, বর্তমান সুবাদার জাফর খানের পুত্র সমপরিমাণ অর্থ প্রাদন করিতে সম্মত হইলে তাঁহাকেই শাসনকর্তার পদে বহাল রাখা যাইবে। কিন্তু জাফর খানের পুত্র এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। ফলে শাম্‌স্‌-উদ-দীনকেই শাসনকর্তার পদ প্রদান করা হয়। শামস্‌-উদ-দীন কালবিলম্ব না করিয়া গুজরাট গমন করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি কর প্রেরণ বন্ধ করেন এবং সরাসরি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁহার অত্যাচারে জর্জরিত জনগণ গুজরাটে বসবাসকারী আমীর জাদিয়াদের সহায়তায় তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার ছিন্ন মস্তক দিল্লী প্রেরণ করেন। ফিরোজের রাজত্বকালে এই একটি মাত্র বিদ্রোহই সংঘটিত হইয়াছিল। অতঃপর মালিক মুফারা ওরফে কারহাতুন মুলক্‌ গুজরাটের শাসনকর্তা নিয়োজিত হয়। মালিক মার্দান দৌলতের পুত্র মালিক শামস্‌-উদ-দীন সুলেমানকে কারা মাহোবা ও তৎসংলগ্ন এলাকার শাসনকর্তা মনোনীত করা হয়। হিশাম-উল-মুলক্‌কে অযোধ্য সম্বল ও কোরলার, মালিক বেহরোজকে জৌনপুর ও জাফরাবাদের এবং মালিক মার্দান দৌলতের কনিষ্ঠপুত্র নাসির-উল মুলক্‌কে পাঞ্জাব ও কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত সমস্ত অঞ্চলের জন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়।

৭৭৯ হিজরীতে (১৩৭৭ খ্রীঃ) এটোয়ার জমিদারের মধ্যে সামান্য বিদ্রোহের ভাব পরিলক্ষিত হয়। বিদ্রোহ সঙ্গে সঙ্গেই দমন করিয়া বিদ্রোহীদিগকে শাস্তি দান করা হয়। ভবিষ্যতে ইহারা যাহাতে সংযত থাকে তজ্জন্য ঐ অঞ্চলে দুর্গ নির্মাণ করা হয়।

৭৮১ হিজরীতে (১৩৭৯ খ্রীঃ) ফিরোজ সামানা, আম্বালা, সাহাবাদ হইয়া সাহারানপুর পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত গমন করেন এবং সারমোর পাহাড়ের উপর কর ধার্য করিয়া রাজধানী প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময় তিনি সংবাদ পান যে, কাটিহারের জমিদার কারও বাদায়ুনের সুবাদার সৈয়দ মুহাম্মদকে তাঁহার ভ্রাতা সৈয়দ আলা-উদ-দীন ও সৈয়দ মুহাম্মদের সঙ্গে গৃহে দাওয়াৎ করিয়া

নৃশংসভাবে হত্যা করিয়াছেন। এই দুঃসংবাদ পাইয়া সুলতান ক্রোধে আত্মহারা হইয়া তৎক্ষণাত কাটিহার রওয়ানা হন এবং জমিদার ও আত্মীয় স্বজনের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। তাহাদের সকলকে কাটিয়া ফেলিবার পর তাহাদের গৃহ ধূলিসাৎ করা হয়। কিন্তু হত্যাকারী কোন প্রকারে পালাইয়া প্রাণরক্ষা করে। কারগু কামাঘুনের পার্বত্যাঞ্চলে যাইয়া তথাকার রাজাদের আশ্রয় গ্রহণ করে। ফিরোজ পাহাড়ীদিগকে শাস্তিদানের জন্য তাঁহার সেনাবাহিনীর একাংশ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কুড়ি হাজার পাহাড়ীকে ধরিয়া ক্রীতদাস-রূপে বিক্রয় করা হয়। কিন্তু কারগুর কোন খবর পাওয়া যায় না। সুলতান মালিক দাউদ নামক এক আফগানকে একদল সৈন্যসহ সম্বলে মোতায়েন রাখেন। তাঁহার প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তিনি প্রতি বৎসরই কাটিহার আক্রমণ করিবেন এবং খুনীকে তাহার হস্তে সমর্পণ না করা পর্যন্ত পাহাড়ীদিগকে সে অঞ্চলে নিরাপদে বাস করিতে দিবেন না। সুলতানের আদেশ যথাযথ প্রতিপালিত হইতেছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য সুলতান প্রতিবৎসর একবার করিয়া সেখানে শিকারের ছলে গমন করিতেন। ছয় বৎসর সে দেশে কোন লোক বসতি ছিল না এবং কোন চাষাবাদও হয় নাই।

৭৮৭ হিজরীতে বৃদ্ধ সুলতানের দ্রুত দৈহিক অবনতি ঘটিতে লাগিল। ফলে উজির জাফর খান (খান জাহান) ফারসী নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। প্রতি ব্যাপারেই সুলতান তাঁহার কথামত কাজ করিতে লাগিলেন। শেষ পর্যন্ত এই বিশ্বাসঘাতক উজির সুলতানের পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ খানের উপর মিথ্যা ষড়যন্ত্রের অভিযোগ চাপাইলেন। তিনি নাকি সুলতানের প্রাণনাশের চক্রান্ত করিয়াছিলেন। এই মিথ্যা ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তিনি গুজরাটের প্রাক্তন সুবাদার জাফর খান, মাহোবার সুবাদার মালিক ইয়াকুত ও মালিক কামাল-উদ-দীনকেও জড়াইলেন। সুলতান উজিরের কথা পুরাপুরি বিশ্বাস করিলেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগকে ধরিবার জন্য উজিরকে ক্ষমতা দান করিলেন। জাফর খানকে মাহোবা হইতে ডাকিয়া আনিয়া কারারুদ্ধ করা হইল। তাঁহার বিরুদ্ধে এই গুরুতর দুরভিসন্ধিমূলক অভিযোগের সংবাদ পাইয়া শাহজাদা মুহাম্মদ খান নিরাপত্তার জন্য তাঁহার প্রাসাদ সুরক্ষিত করিলেন। এই অবস্থায় তিনি কিছুদিন গৃহে আবদ্ধ রহিলেন। শেষে সুলতানের সাক্ষাৎলাভের এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। সুলতানের হারেমের মহিলাদের সঙ্গে তাঁহার স্ত্রীর সাক্ষাতের অনুমতি আদায়

করিয়া বর্মাবৃত শাহজাদা রুদ্ধদ্বার পাল্‌কীতে উঠিয়া হারেমে প্রবেশ করেন। শাহজাদাকে দেখিয়া হারেমের মহিলাদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারা সুলতানের নিকট ছুটিয়া যাইয়া সংবাদ দেন যে, শাহজাদা বর্মাবৃত অবস্থায় 'রাজদ্রোহমূলক' উদ্দেশ্যে হারেমে প্রবেশ করিয়াছেন। শাহজাদা উহাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের কথা শেষ হইবার পূর্বেই পিতার পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া নিবেদন করিলেন, "আপনি আমার বিরুদ্ধে যে সন্দেহ পোষণ করিয়াছেন তাহা আমার নিকট মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর। সেইজন্য আপনার হস্ত হইতে চরম শাস্তি গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি। শুধু এইটুকু বলিতে চাই যে, আমার বিরুদ্ধে যাহাকিছু বলা হইয়াছে সব মিথ্যা। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। উদ্দেশ্যমূলকভাবে এই অভিযোগ প্রস্তুত করা হইয়াছে। উজির নিজের জন্য ক্ষমতা দখল করিতে অভিলাষী এবং ক্ষমতা লাভের পথ নিষ্কণ্টক করিবার জন্যই আমার ও অন্যান্য আমীরদের উপর জঘন্য মিথ্যা ষড়যন্ত্র আরোপ করা হইয়াছে।" সুলতানের মন হইতে সন্দেহের মেঘ কাটিয়া গেল। বৃদ্ধ সুলতান পুত্রকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন, "আমি প্রতারিত হইয়াছি।" বিশ্বাসঘাতকের প্রতি যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষমতা তিনি পুত্রের বিচার বুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দিলেন। এই আদেশ পাইয়া শাহজাদা মুহাম্মদ খান তৎক্ষণাৎ পিতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া ১২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যকে প্রস্তুত হইতে হুকুম দিলেন। ইহাদিগকে লইয়া তিনি উজিরের গৃহ ঘেরাও করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। শাহজাদার আগমনের সংবাদ পাইয়া উজির গুজরাটের জাফর খানকে মারিয়া ফেলিলেন—যাঁহাকে বিশ্বাসঘাতকতার মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল। অতঃপর উজির নিজের দলের লোকদিগকে একত্র করিয়া পথে বাহির হইয়া আসিয়া শাহজাদার সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি শাহজাদার বিরুদ্ধে সুবিধা করিতে পারিলেন না। আহতাবস্থায় প্রথমে নিজ গৃহে পালাইয়া গেলেন এবং সেখান হইতে নির্গত হইয়া মেওয়াটের দিকে উধাও হইলেন। শাহজাদা উজিরের সমস্ত ধনসম্পদ হস্তগত করিলেন এবং তাঁহার অনুচরদিগকে কাটিয়া ফেলিলেন। এইসব ঘটনাবলীর পর ফিরোজ শাসনকার্যের সমস্ত দায়িত্ব পুত্রের হস্তে অর্পণ করিয়া সিংহাসন ত্যাগ করেন।

শাহজাদা মুহাম্মদ খান ৭৮৯ হিজরীর সাবান মাসে (আগস্ট ১৩৪৭ খ্রীঃ) নাসির উদ দীন উপাধি ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু খোৎবায়

নিজের নামের সঙ্গে পিতার নামও উল্লেখ করিতে থাকেন। তখ্‌তে বসিয়া তিনি শাসনকার্যের জন্য নূতন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং আমীর-ওমরাহদের মধ্যে সম্মান-সূচক খেলাৎ বিতরণ করেন। অশ্বারোহী-বাহিনীর অধিনায়ক মালিক ইয়াকুব খানকে সিকান্দার খান উপাধি প্রদান করিয়া গুজরাটের সুবাদারের দায়িত্ব প্রদান করেন। গুজরাটের পথে মেওয়াট পৌঁছিলে কোকা চৌহান নামক মেওয়াটের এক রাজপুত জমিদার প্রাক্তন উজির খান জাহানকে বাঁধিয়া সিকান্দার খানের হস্তে অর্পণ করেন। খান জাহান তাঁহারই নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুলতানের ক্রোধানল হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত আশ্রিতকে তাঁহার শত্রু-হস্তে সমর্পণ করেন। সিকান্দার তাঁহার মাথা কাটিয়া দিল্লী পাঠাইয়া দেন।

৭৯০ হিজরীতে (১৩৮৯ খ্রীঃ) নাসির-উদ-দীন মুহাম্মদ সসৈন্যে সারমোর পর্বতে শিকারে যান। তিনি শিকারের আনন্দে যখন বিভোর তখন সংবাদ আসিল যে, গুজরাটের শাসনকর্তা ফারহাত-উল-মুল্‌ক্‌ সেখানকার আমীর জাদিয়াদের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন এবং নবনিযুক্ত শাসনকর্তা সিকান্দার খানকে পরাস্ত ও নিহত করিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া সুলতান দ্রুত গতিতে দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু দিল্লী আসিয়া সব ভুলিয়া গেলেন—এবং আমোদ-প্রমোদে এমনভাবে ডুবিয়া গেলেন যেন তাঁহার কোন ক্ষতিই হয় নাই এবং এরূপ কর্তব্যে অবহেলার পরিণতি কি হইতে পারে, তাহা বুঝিবার শক্তিই যেন তিনি হারাইয়া ফেলিয়াছেন। আমীর-ওমরাহগণ যখন তাঁহাকে সতর্ক ও সক্রিয় করিবার চেষ্টা করিলেন তখন তিনি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিয়া তাহাদের স্থলে তোষামোদকারী অনভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগকে নিয়োজিত করিতে লাগিলেন। অগত্যা আমীরগণ তাঁহার রাজত্বের অবসান ঘটাইবার জন্য তাঁহার চাচাতো ভাই শাহজাদা বাহা-উদ-দীন ও শাহজাদা কামাল-উদ-দীনের পক্ষাবলম্বন করিলেন। বিদ্রোহীরা এক লক্ষের মত লোক সংগ্রহ করিয়া শহরের বাহিরে যাইয়া শিবির স্থাপন করিল। বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য মালিক জহীর-উদ-দীন লাহোরীকে পাঠানো হইল। কিন্তু তিনি বিদ্রোহী শিবিরে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। বিদ্রোহীরা তাঁহার উপর প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তাঁহার সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করিয়াছিল এবং তিনি আহতাবস্থায় ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন।

আপোষ-নিষ্পত্তির আর কোন সম্ভাবনা নাই দেখিয়া শাহজাদা নাসির-উদ-দীন আলস্য পরিহার করিলেন এবং সেনাবাহিনী প্রস্তুত করিয়া ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হইল। বিদ্রোহীরা রণে ভঙ্গ দিয়া শহরের মধ্যে পালাইয়া গেল এবং প্রাসাদ দখল করিয়া নূতনভাবে সংগ্রাম আরম্ভ করিল। মহানগরী দিল্লীতে নরহত্যার তাণ্ডব লীলা শুরু হইল। দুই দিন ও দুই রাত্রি পথে মৃতদেহ ছড়াইয়া রহিল—শত্রু-মিত্র-বিজেতা ও পরাজিতের দেহ এক সঙ্গে জড়াজড়ি করিয়া রহিল। তৃতীয় দিবসে জনতা বৃদ্ধ সুলতান ফিরোজকে পাল্‌কীতে উঠাইয়া আনিয়া রাজপথে দুই বিবদমান দলের মধ্যখানে দণ্ডায়মান করাইলেন। শাহজাদা মুহাম্মদের সৈন্যরা তাঁহাদের সাবেক মালিককে দেখিয়া এবং স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া তিনি আসিয়াছেন মনে করিয়া সকলে শাহজাদাকে পরিত্যাগ করিয়া হর্ষধ্বনি সহকারে বৃদ্ধ সুলতানের চতুর্দিকে আসিয়া সমবেত হইল। সৈন্যগণ কর্তৃক এইরূপে পরিত্যাক্ত হইয়া শাহজাদা মুহাম্মদ সামান্য কিছু সংখ্যক অনুচরসহ সারমোর পার্বতাভিমুখে পলায়ন করিলেন। উভয় পক্ষের লোকেরা মিলিত হইয়া শান্তি স্থাপন করিল এবং বৃদ্ধ সুলতান ফিরোজ পুনরায় পূর্ণ ক্ষমতা গ্রহণ করিলেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত অক্ষমতার জন্য তিনি নিজেকে পরিস্থিতির মোকাবিলা করার অযোগ্য বিবেচনা করিয়া পুনরায় সিংহাসন ত্যাগ করিলেন এবং প্রাসাদ রক্ষী সৈন্যদের পরামর্শে পৌত্র—জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতেহ্ খানের পুত্র গিয়াস-উদ-দীনকে তখ্‌তে বসাইলেন। ইতাবসরে শাহী সৈন্যরা পলাতক শাহজাদা নাসির-উদ-দীনকে সাহায্য করার অপরাধে সুলতানের জামাতা আমীর সৈয়দ হাসানকে মারিয়া ফেলিল। সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরেই গিয়াস-উদ-দীন প্রথম যে হুকুম জারি করেন তাহা হইল এই যে, তাঁহার চাচার অনুচরদিগকে যেখানে পাওয়া যাইবে সেখানেই হত্যা করিতে হইবে। এই সময় ৩রা রমজান ৭৯০ হিজরীতে (১৩৮৮ খ্রীঃ ২৩শে অক্টোবর) নব্বই বৎসর বয়সে ফিরোজ তোগলক ইন্তেকাল করেন।

ফিরোজ তোগলক বিদ্বান ও অতিশয় ন্যায়পরায়ণ সুলতান ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে সামরিক ও বেসামরিক লোকেরা সমভাবে সুখী ছিল। কেহ কাহারো উপর অত্যাচার করিতে সাহস করিত না। তিনি নিজে 'ফাতেহাত্-এ-ফিরোজশাহী' নাম দিয়া এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে তিনিই

প্রথম আফগানদেরকে প্রাধান্তদান করিয়াছিলেন। ইহার পুর্বে তাহাদিগকে কেহই আমল দেয় নাই। তিনি ৩৮ বৎসরকাল হিন্দুস্থানে রাজত্ব করেন। 'ওফাতে ফিরোজ' বা 'ফিরোজ প্রয়াণ' শব্দের বর্ণগুলি তাঁহার মৃত্যুর তারিখ নির্দেশ করিতেছে। জিয়া-উদ-দীন বার্নী তাঁহার দরবারের অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি তাঁহার রচিত "তারিখ-ই-ফিরোজশাহী" গ্রন্থে এই সুলতানের রাজত্বের ঘটনাবলী সবিস্তার বর্ণনা করিয়াছেন। নিজাম-উদ-দীন আহম্মদ বখ্‌শী তাঁহার ইতিহাসে বর্ণনা করিয়াছেন যে, ফিরোজ প্রচলিত আইন-ব্যবস্থায় কতকগুলি কল্যাণকর সংস্কার সাধন করেন এবং তাঁহার রাজত্বকালে এইগুলি কার্যকরীভাবে বলবৎ ছিল। প্রথমটি হইল অপরাধীকে বিকলাঙ্গ করিবার প্রথা রহিত করা। হিন্দু হউক মুসলমান হউক তাঁহার কোন প্রজাকেই তিনি এরূপ শাস্তিদান করিতে দিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, তিনি চাষীদের রাজস্ব অনেকাংশে হ্রাস করিয়া দেন। ইহার ফলে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং পরিণামে রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়তঃ তিনি বিদ্যা ও বিদ্বানদের সর্বপ্রকার উৎসাহদানের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। জনসাধারণকে উপদেশ দানের জন্য তিনি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বিদ্বান লোকদের বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাহার নববিধানগুলি ফিরোজাবাদের মসজিদগাত্রে খোদাই করিয়া লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল। উহাদের মধ্য হইতে নমুনাস্বরূপ নিম্নে কিছুটা উদ্ধৃত করা হইল।

এতকাল সামান্য কারণে মুসলমানদের রক্তপাত করা হইয়াছে, সামান্য অপরাধে তাহাদিগকে বিকলাঙ্গ করা হইয়াছে—হাত, পা ও নাক, কান কাটিয়া, চক্ষু উৎপাটন করিয়া, পদাঘাতে জ্যান্ত মানুষের অস্থি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া, আগুনে দেহ পোড়াইয়া, ক্রুশে বিদ্ধ করিয়া, হাত পায়ে পেরেক মারিয়া জীবিতাবস্থায় চর্ম উঠাইয়া, উরুদেশের পশ্চাদ্ভাগের মাংসতন্ত্রী কাটিয়া খঞ্জ করিয়া, মানুষের দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া এবং আরও নানাবিধ উপায়ে অশেষ যন্ত্রণাদান করা হইয়াছে। আল্লাহ্ তালা তাঁহার অসীম অনুগ্রহে আমাকে এইসব কুপ্রথা রহিত করিবার সুমতি ও ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। ইহা ছাড়াও দৈনন্দিন নামাযে শাহী পরিবারের লোকদের জন্য মোনাজাত করিবার যে রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছে—তাহাতে আমি পূর্বগামী সকল দিল্লী সুলতানদের নাম যোগ করিয়া দিয়াছি—যাহাতে জনগণের দোওয়া আল্লাহ্ কবুল করিয়া ঐসব সুলতানদের প্রতি সুপ্রসন্ন হন এবং তাঁহারা আল্লাহ্‌র অসীম করুণা পুটে আশ্রয়লাভ করেন।

আরও ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কোতোয়ালী কর ও সরকারী কর্মচারীদের দস্তুরী নামে যেসব বিরক্তিকর কর ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদিগকে প্রদান করিতে হইত, খাস পতিত জমিতে পশু চরাইবার জন্য পশু-পালকদিগকে ইজারাদানের যে প্রথা ছিল এবং পুষ্পবিক্রেতা, মৎস্য-বিক্রেতা, তুলা ধুনকারী, রেশম বিক্রেতা ও দোকানীদের উপর যেসব পরিবর্তনশীল কর বাধ্যতামূলক ছিল—এই ফরমান দ্বারা সমগ্র সাম্রাজ্যে সেসব নাকচ করিয়া দেওয়া হইল। রাজস্ব আদায়কারী ও অন্যান্য কর্মচারীরা এইসব কর আদায় করিতে যাইয়া লোকদের উপর যে জুলুম করিত, তাহা বিবেচনা করিয়া রাজস্বের এই সামান্য অংশ ত্যাগ করাই যুক্তিযুক্ত মনে করা হইয়াছে। কোরানে লিখিত আইনের পরিপন্থী কোন কর আর ধার্য করা হইবে না। এতোদিন 'গনিমাতের' মালের ⅕ অংশ সৈনিকদিগকে দিয়া ⅘ অংশ সরকার গ্রহণ করিত। এখন হইতে সৈনিকদিগকে ⅘ অংশ দিয়া সুলতান ⅕ অংশ গ্রহণ করিবে।

নিম্নোল্লিখিত পাপকর্মে অপরাধী ব্যক্তিদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া হয়:

১। যাহারা নাস্তিকতাবাদের অনুসারী এবং যাহারা ধর্ম-বিরুদ্ধ মত পোষণ করে।

২। যেসব সরকারী কর্মচারী উৎকোচ গ্রহণ করে এবং যেসব লোক তাহাদিগকে উৎকোচ প্রদান করে।

প্রজাদের সম্মুখে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য আমি নিজে জঁাকালো রেশমী পোশাক ও রত্নাদি পরিধান করা ছাড়িয়া দিয়াছি। আমার পূর্বপুরুষগণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও নির্মিত প্রত্যেক ইমারত ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ; যথা—মসজিদ, পান্থশালা, কূপ, পুকুর, খাল, হাসপাতাল, শিক্ষাদান কেন্দ্র ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সবগুলির পরিচালন ও মেরামত করার দায়িত্ব আমি স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি এবং ইহাদের সংরক্ষণের জন্য রাজস্বের মোটা অংশ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছি।

আমার পূর্বগামী শাহানশাহ্ ও আমার মালিক মুহাম্মদ তোগলকের ক্রোধানলে যেসব হতভাগ্য ভস্মীভূত হইয়াছে, আমি অতিকষ্টে তাহাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে ভাতাদান ও কর্মদান করিয়া তাহাদের মনের খেদ কথঞ্চিৎ দূর করিবার প্রয়াস পাইয়াছি এবং এ যুগের

শ্রেষ্ঠ আলেম-দরবেশদের উপস্থিতিতে তাঁহাদের নিকট হইতে পরলোকগত সুলতানের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া লইয়াছি এবং সাক্ষীরূপে ঐসব আলেমদের মোহরযুক্ত সহি লইয়াছি। আমার সাধ্যানুসারে সকল মজলুমের নিকট হইতে এইসব ক্ষমা-পত্র সংগ্রহ করিয়াছি এবং সেইসব সিন্দুকে পুরিয়া মুহাম্মদ তোগলকের সমাধিসৌধে জমা করিয়া রাখিয়াছি। আমি আমার রাজ্যের সমস্ত অলি-আল্লাহ্ ও আলেমদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে দোওয়া গ্রহণ করিয়াছি এবং সর্বপ্রকারে তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছি। জখম কিংবা বার্ধক্য-বশতঃ আমার কোন সৈনিক অক্ষম হইয়া পড়িলে আমি তাহাকে যাবজ্জীবন পূর্ণ বেতনসহ অবসর প্রদান করিয়াছি। দুইবার আমাকে বিষ প্রয়োগের চেষ্টা করা হইয়াছে। কিন্তু আল্লাহ্‌র রহমতে তাহা সফল হয় নাই।"

এই সুলতানের রাজত্বকালে নিম্নোল্লিখিত জনহিতকর কার্যাবলী সম্পন্ন করা হইয়াছিল।

১। জলসেচের সুবিধার জন্য বিভিন্ন নদীতে ৫০টি বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছিল।

২। ৪০টি মসজিদ নির্মাণ করা হইয়াছিল।

৩। মসজিদ সংলগ্ন ৩০টি মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল।

৪। ২০টি ইমারত তৈরী হইয়াছিল।

৫। ১০০টি সরাইখানা নির্মাণ করা হইয়াছিল।

৬। ২০০টি শহর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছিল।

৭। সেচকার্যের জন্য ৩০টি দীঘি খনন করা হইয়াছিল।

৮। ১০০টি হাসপাতাল স্থাপন করা হইয়াছিল।

৯। ৫টি সমাধিসৌধ নির্মাণ করা হইয়াছিল।

১০। ১০০টি সরকারী স্নানাগার তৈরী হইয়াছিল।

১১। ১০০টি বিজয়-স্তম্ভ বা মিনার নির্মাণ করা হইয়াছিল।

১২। ১০টি সরকারী ইঁদারা খনন করা হইয়াছিল।

১৩। ১৫০টি সেতু নির্মাণ করা হইয়াছিল।

ইহা ছাড়াও অসংখ্য উদ্যান ও প্রমোদাগার নির্মাণ করা হইয়াছিল। এইসব সরকারী প্রতিষ্ঠানের সংরক্ষণ ও মেরামতের জন্য ভূমিদান করা হইয়াছিল।

গিয়াস-উদ-দীন তোগলক (২)

[সুলতান কর্তৃক নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করিবার পর শাহজাদা মুহাম্মদের বিরুদ্ধে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ। সুলতানের ঈর্ষা ও নিষ্ঠুরতার কবল হইতে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য তাঁহার আপন ভ্রাতা ও খুল্লতাত ভ্রাতার দিল্লী হইতে পলায়ন। পরে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়াইয়া ইহাদের সঙ্গে দিল্লী প্রত্যাগমন। সুলতানের অনুগামীদের কয়েকজন নিহত এবং সুলতান নিজেও বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত।]

সুলতান ফিরোজের ইন্তেকালের পর তাঁহার পৌত্র—শাহজাদা ফতেহ্ খানের পুত্র গিয়াস-উদ-দীন তোগলক ফিরোজাবাদের শাহীমহলে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং প্রচলিত প্রথানুযায়ী স্বীয় নামে খোতবা পাঠ করিবার ও তাঁহার নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন করিবার হুকুম জারি করেন। মালিক তাজ-উদ-দীনের পুত্র ফিরোজ আলীকে প্রধান উজির মনোনীত করিয়া তাঁহাকে খান জাহান উপাধি প্রদান করা হয় এবং গিয়াস-উদ-দীন নামক এক ব্যক্তিকে অস্ত্রশালার ভার প্রদান করা হয়। মালিক মোফারাকে গুজরাটের শাসনকর্তার পদে বহাল করা হয় এবং তিনি ফারহাতুল মুলক্ উপাধি প্রাপ্ত হন। সুলতান গিয়াস-উদ-দীন তাঁহার চাচা শাহজাদা মুহম্মদ খানকে সারমোর হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য তাঁহার বিরুদ্ধে উজির ও মুহম্মদ তাহিরের নেতৃত্বাধীনে এক সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। শাহী ফৌজ সারমোর পৌঁছিবার পূর্বেই শাহজাদা মুহম্মদ খান পার্বত্যাঞ্চলে পলায়ন করেন এবং সেখানে এক সুরক্ষিত স্থানে ঘাঁটি স্থাপন করেন। তাঁহার দলীয় সৈন্যদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে নিরাপদ স্থানে রাখিবার পর তিনি এইখানে শত্রুবাহিনীকে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতে থাকেন। কিন্তু তিনি শত্রুর বিরুদ্ধে সুবিধা অর্জন করিতে অসমর্থ হইয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে পলায়ন করিতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত নগরকোট দুর্গে আসিয়া প্রবেশ করেন হি: ৭৯০ : খ্রী: ১৩৮৮)। এই দুর্ভেদ্য দুর্গ অধিকার করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া শত্রুবাহিনী দিল্লী অভিমুখে গমন করে। ফলে শাহজাদা মুহম্মদ খান নির্বিবাদে নগরকোটের অধিকার লাভ করিয়া সেখানে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে সুলতান গিয়াস-উদ-দীন যৌবনের উন্মাদনায় ভোগ-বিলাসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া রাজকার্যে চরম উদাসীনতা প্রদর্শন করিতে আরম্ভ করিয়া দেন। ফলে চারিদিকে অত্যাচার, অনাচার ও দুষ্কৃতি মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে থাকে। সুলতান তাঁহার আপন ভ্রাতা সালার ও চাচাতো ভাই আবুবকরকে আটক করিয়া তাঁহাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে থাকেন। আবুবকর ছিলেন সুলতান ফিরোজ তোগলকের তৃতীয় পুত্র জাফরের পুত্র। গিয়াস-উদ-দীনের কোপানল হইতে নিষ্কৃতি লাভের জন্য এই শাহজাদাদ্বয় কোনক্রমে দিল্লী হইতে পালাইয়া যান এবং আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। বিদ্রোহী দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সহকারী উজির মালিম রুকুন-উদ-দীন এবং আরও কয়েকজন উচ্চ পদস্থ আমীর। শাহীমহল রক্ষাকারী সেনাবাহিনীও বিদ্রোহীদের পক্ষাবলম্বন করে। ষড়যন্ত্র পাকাপাকি হইবার পর একদিন বিদ্রোহীরা সহসা প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া আমিরুল ওমারা মালিক মুবারিক কবিরকে খুন করিয়া বসে। এইরূপ অতর্কিত হামলার জন্য সুলতান মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি হতবুদ্ধি হইয়া উজিরসহ যমুনা-তোরণ দিয়া বহির্গত হইয়া পলায়ন করেন। মালিক রুকুন-উদ-দীন তাঁহাদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। সুলতান ও উজির ধৃত হন এবং উভয়কে সঙ্গে সঙ্গেই হত্যা করা হয়। এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল ৭৯১ হিজরীর ২১শে সফর তারিখে (১৮ ফেব্রুয়ারী, ১৩৮৯ খ্রীঃ)। মাত্র পাঁচ মাস কয়েকদিন রাজত্বের পর সুলতান গিয়াস-উদ দীনের জীবনাবসান ঘটে।

আবুবকর তোগলক

[ফিরোজ তোগলকের তৃতীয় পুত্র শাহজাদা জাফর খানের পুত্র আবুবকরকে সিংহাসন প্রদান। আমীর জাদিয়া বা মোগল সর্দারগণ কর্তৃক আবুবকরকে সুলতান হিসাবে গ্রহণ করিতে অস্বীকার। আবুবকরের উজিরকে হত্যা করিবার পর মোগল সর্দারগণ কর্তৃক নির্বাসিত শাহজাদা মুহম্মদ খানকে সিংহাসন অধিকারের জন্য আমন্ত্রণ। তদনুযায়ী মুহম্মদ খানের দিল্লী আগমন এবং আবুবকরকে পরাজিত করিয়া দ্বিতীয়বার সিংহাসনে উপবেশন।]

সুলতান গিয়াস-উদ-দীনকে হত্যা করিবার পর ষড়যন্ত্রকারীরা ফিরোজ তোগলকের পৌত্র (শাহজাদা জাফরখানের তৃতীয় পুত্র) শাহজাদা আবুবকরকে সিংহাসন প্রদান করেন। মালিক রুকুন-উদ-দীন উজির নিযুক্ত হইয়া রাজ্যের লাগাম স্বহস্তে গ্রহণ করেন, কিন্তু ইহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া তিনি সিংহাসন আত্মসাৎ করিবার স্বপ্নে মাতিয়া উঠেন এবং সুলতানের প্রাণ নাশের ষড়যন্ত্র করেন। সৌভাগ্যক্রমে আবুবকর সময়মত এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে উজির ও তাঁহার ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অনেক প্রাসাদ-রক্ষী সৈন্যকে হত্যা করিবাব হুকুম প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে সামানার আমীর জাদিয়ারা তাঁহাদের দলপতি মালিক সুলতানকে হত্যা করিয়া ফেলে। মালিক সুলতান ছিলেন সুলতান আবুবকর তোগলকের অবিচলিত বন্ধু ও সমর্থক। আমীর জাদিয়ারা মালিক সুলতানের খণ্ডিত মস্তক নগরকোটে শাহজাদা মুহম্মদ খানের নিকট প্রেরণ করেন এবং সিংহাসন দাবী করিবার জন্য তাঁহাকে সামানায় আসিবার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। তাঁহাদের কথামত শাহজাদা মুহম্মদ খান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া জলন্দরের পথে সামানায় আগমন করেন এবং সেখানে নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। অতঃপর তিনি সসৈন্যে দিল্লী আগমন করেন। কয়েকবার পিছু হটিবার পর তিনি শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেন এবং সুলতান আবুবকর তাঁহার হস্তে বন্দী হন। এক বৎসর ছয় মাস রাজত্বের পর ৭৯২ হিজরীর ২০ শে জিলহজ্ব (১৩৮৯ খ্রীঃ ২৭শে নভেম্বর) আবুবকর সিংহাসনচ্যুত হন।

নাসির-উদ-দীন মুহম্মদ তোগলক (২)

[সিংহাসনারোহণের পূর্ববর্তী ঘটনাবলী। দুই সুলতানের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। নাসির-উদ-দীন মুহম্মদ কর্তৃক দুইবার দিল্লী অধিকার ও দুইবারই বেদখল। তৃতীয়বার আবুবকরকে বহিষ্কৃত করিতে সক্ষম এবং তাহাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধকরণ। গুজরাটে বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ দমনে ফারহাত্-উল-মুলককে প্রেরণ। ফারহাত্-উল-মুলক্ কর্তৃক নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা। ইসলাম খান উজির নিযুক্ত এবং খান জাহান কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনীত। খান জাহান উজির নিযুক্ত ' মেওয়াটের বাহাদুর নাহিরের অভিযান। শেইখা গোক্কর কর্তৃক লাহোর অধিকার। সুলতানের পীড়া ও মৃত্যু। পুত্র হুমায়ুনের উত্তরাধিকারীত্ব লাভ— কিন্তু ৪৫ দিন রাজত্বের পরই তাঁহার মৃত্যু।]

নাসির-উদ-দীন মুহম্মদ তোগলক পিতার জীবদ্দশায় ৭৮৯ হিজরীতে (১৩৮৭ খ্রীঃ) প্রথম একবার সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আমরা দেখিয়াছি—বাহা-উদ-দীন ও অন্যান্য আমীররা গুজরাটের মোগল সেনা ও গৃহরক্ষী সৈন্যদের সহায়তায় কি প্রকারে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত ও বহিষ্কৃত করিয়া দেয়। তাঁহার নগরকোটে আশ্রয় গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত তাঁহার সম্পর্কে সকল বিবরণ প্রদান করা হইয়াছে। আমীর জাদিয়ারা প্রাক্তন সুলতানের উজির মালিক সুলতানকে (সামানার প্রাক্তন সুবাদার) হত্যা করিলে নাসির-উদ-দীন মুহম্মদ তাহাদের আমন্ত্রণক্রমে নগরকোট হইতে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহার সঙ্গে প্রথমে ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ছিল। সৈন্য সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়া ৭৯২ হিজরীর ৫ই রবি-উল-আউয়াল (খ্রীঃ ১৩৯০) তিনি ৫০,০০০ সৈন্য পরিচালনা করিয়া দিল্লী প্রবেশ করিয়া জাহান নুমা প্রাসাদ অধিকার করেন। শাহজাদা আবুবকর তখন শহরের ফিরোজাবাদ এলাকায় ছিলেন। তিনি সেখান হইতে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ২রা জমাদি-উল-আউয়াল (এপ্রিল, ১৮) ফিরোজাবাদের রাস্তায় উভয় পক্ষে তুমুল সংঘর্ষ আরম্ভ হইল। এই সময় মেওয়াট হইতে বাহাদুর নাহির এক শক্তিশালী বাহিনী লইয়া আসিয়া আবুবকরের সঙ্গে যোগদান করেন। আবুবকর পরদিন ফিরোজাবাদ হইতে বাহির হইয়া পড়েন এবং বহু হত্যা-কাণ্ডের মধ্য দিয়া নাসির-উদ-দীনকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন।

মাত্র ২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ নাসির-উদ-দীন পলায়ন করেন এবং যমুনা পার হইয়া দোয়াব পৌঁছেন। সেখান হইতে তিনি পুত্র হুমায়ুনকে কয়েকজন ওমরাহের সঙ্গে সামানায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে পাঠাইয়া নিজে গঙ্গা তীরে জলেশ্বরে অবস্থান করেন।

এ পর্যন্ত যাহা ঘটিয়াছিল তাহাতে মুহম্মদ লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, ফিরোজের প্রাসাদ-রক্ষী সৈনিকরাই তাহার সর্বাধিক শত্রুতা সাধন করিয়াছে। এই জন্য নাসির-উদ-দীন পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাহাদের যেসব জায়গীর ছিল সেসব এলাকা লুণ্ঠন করিবার হুকুম দেন এবং দর্শন মাত্র তাহাদিগকে হত্যা করিবার আদেশ দেন। ইহার ফলে জমিদাররা অনেক লোক হত্যা করিল—এমনকি যাহাদের অন্যত্র জায়গীর ছিল তাহাদেরও অনেকেই মারা পড়িল। আবুবকরের কুশাসনে অতিষ্ঠ হইয়া কৃষকরাও খাজনা বন্ধ করিয়া দিল এবং তাঁহারা বিপক্ষ দলে যোগদান করিতে লাগিল। ইত্যবসরে হস্তীশালার তত্ত্বাবধায়ক মালিক সরওয়ার, মুলতানের সুবাদার মালিক নাসির-উল-মুল্ক্, বিহারের সুবাদার খোয়াস-উল-মুল্ক্ এবং রায়সার্ভার ও অন্যান্য হিন্দু রাজারা তাহাদের সেনাবাহিনী লইয়া মুহম্মদের সঙ্গে যোগদান করিলেন। ফলে অল্প কয়েক দিনের মধ্যে ৫০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইল। এই সময় তিনি মালিক সরওয়ারকে খান জাহান উপাধি প্রদান করিয়া উজির মনোনীত করেন। মালিক নাসির-উল মুল্ক্ খোরাজ খান উপাধিসহ আমির-উল-ওমরাহের মর্যাদা প্রাপ্ত হইলেন। রায় সার্ভাকে রায় রায়ান উপাধি প্রদান করা হয় (হিজরী ৭৯২ : খ্রীঃ ১৩৮৯)। অতঃপর মুহম্মদ দ্বিতীয়বার দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হন। আবুবকর তাঁহার বাহিনী লইয়া আগাইয়া আসিয়া কুন্দ্‌লী গ্রামে শত্রুবাহিনীকে বাধাদান করেন। শাহজাদা মুহম্মদ দ্বিতীয়বার পরাজয়বরণ করিয়া দোয়াবে (জলেশ্বরে) পালাইয়া যাইতে বাধ্য হন।

এই ঘটনার অল্প কয়েকদিন পরেই শাহজাদা মুহম্মদের পুত্র হুমায়ুন সামানায় সংগৃহীত সৈন্য লইয়া দিল্লীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রাজধানীর উপর হাম্‌লা চালাইয়া অকৃতকার্য হন। অবশেষে পানিপথে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হইয়া সামানায় পালাইয়া যান। এতসব সাফল্য সত্ত্বেও আবুবকর দিল্লীর বাহিরে আসিতে সাহসী হন নাই। তাঁহার সন্দেহ ছিল যে, দিল্লীতে প্রতি পক্ষের

সমর্থকদের একটা দল আছে। অধিক শত্রুভাবাপন্ন কয়েকজনকে শাস্তিদান করিবার পর তিনি দিল্লী ত্যাগ করিয়া জলেশ্বরের পথে ৪০ মাইল দূরে যাইয়া পৌঁছিলেন। জলেশ্বরে তাঁহার চাচা মুহম্মদ পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিতে ব্যস্ত ছিলেন। এই সময় তিনি দিল্লীর কোতোয়াল ও আরও কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে গোপনে চক্রান্ত করিয়া জলেশ্বরে সমস্ত সৈন্য ও মালপত্র ত্যাগ করিয়া মাত্র ৪,০০০ বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া আবুবকরের সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের দিকে রওয়ানা হন। কিন্তু বামদিক দিয়া আবুবকরের পাশ কাটিয়া সৈন্যবাহিনীসহ দ্রুত দিল্লী অভিমুখে ধাবিত হন। দিল্লী পৌঁছিয়া প্রাচীর-রক্ষী সৈন্যদিগকে হটাইয়া এবং বাদায়ুন তোরণে অগ্নি সংযোগ করিয়া শহরে প্রবেশ করেন। তিনি যখন প্রাসাদে আসিয়া পৌঁছিলেন তখন উৎফুল্ল নাগরিকবৃন্দ তাঁহাকে সানন্দে গ্রহণ করিয়া সম্মান প্রদর্শনের জন্য তাঁহার চতুর্দিকে সমবেত হইল। আবুবকর তাঁহার পিছু ছুটিয়া সেই দিনই দিল্লী আসিয়া পৌঁছিলেন এবং তোরণরক্ষী সৈন্যদিগকে হটাইয়া শহরে প্রবেশ করিয়া প্রাসাদ আক্রমণ করিলেন এবং প্রতিপক্ষকে বহিষ্কৃত করিয়া শহর পুনরাধিকার করিলেন। এই অভিযানে অধিকাংশ সৈন্য হারাইয়া শাহজাদা মুহম্মদ পুনরায় জলেশ্বরে পালাইয়া গেলেন।

কিছুদিন অতিবাহিত হইল। কোনরূপ সংঘর্ষ বাঁধিল না। এই সময় প্রাসাদ-রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক মুবাশির হাজিব আবুবকরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া শাহাজাদা মুহম্মদ খানের নিকট পত্র লিখিলেন। তিনি মুহম্মদকে পত্রে জানাইলেন যে, মুহম্মদ দিল্লী অধিকারের জন্য আর একবার চেষ্টা করিলে মুবাশির হাজিব তাঁহাকে প্রাসাদ-রক্ষীবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য লইয়া সাহায্য করিবেন। মুবাশির হাজিব ইসলাম খান নামে পরিচিত ছিলেন। যাহাহউক, প্রতিপক্ষের পুনরায় দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইবার সংবাদ পাইয়া এবং প্রাসাদরক্ষী সৈনিক ও আরও অনেকের বৈরীভাব লক্ষ্য করিয়া আবুবকর সামান্য সংখ্যক অনুচর লইয়া দিল্লী ত্যাগ করিয়া মেওয়াটে বাহাদুর নাহিরের নিকট পালাইয়া গেলেন। শাহজাদা মুহম্মদ রমযান মাসে দিল্লী প্রবেশ করিয়া নাসির-উদ-দীন উপাধিধারণ পূর্বক সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। যাঁহার দৌলতে তিনি ক্ষমতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইলেন, সেই ইসলাম খানকে তিনি প্রধান উজির মনোনীত করিলেন। নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠি করিবার পর তিনি হুকুম দিলেন যে, ফিরোজের

প্রাসাদরক্ষী সৈন্যরা যে-সব হস্তী হস্তগত করিয়াছিল সেগুলি তাহাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া সুলতানের কার্যে নিয়োগ করিতে হইবে। এই ব্যাপারে রক্ষীবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্য রুষ্ট হইয়া দিল্লী ত্যাগ করিয়া আবুবকরের সঙ্গে যাইয়া যোগদান করিল। ইহাদের মধ্যে যাহারা শহরে রহিল পরদিন সুলতান নাসির-উদ্-দীন মুহম্মদ তাহাদিগকেও মৃত্যু ভয় দেখাইয়া শহর ত্যাগ করিবার হুকুম দিলেন এবং আরও বলিলেন, তাহারা যেন আর কখনও শহরে প্রবেশ না করে। ইহাদের অনেকেই এই কঠোর আদেশ সত্ত্বেও দিল্লী ত্যাগ করিতে চাহিল না। তাহারা সুলতানের ভয়ে দিল্লীতেই আত্মগোপন করিয়া রহিল। সুলতান তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য লোক নিযুক্ত করিলেন এবং যাহারা ধরা পড়িল তাহাদের সকলকে হত্যা করা হইল। প্রাসাদরক্ষী সৈন্যদলের অধিকাংশই ছিল বিদেশী। সন্দেহবশে যাহাদিগকে ধরা হইল তাহাদের অনেকেই প্রাণের ভয়ে নিজদিগকে ভারতীয় বলিয়া পরিচয় দিল। সুলতান হুকুম দিলেন যে, যাহারা কতকগুলি শব্দ যেমন 'কুহ্‌রী কুহ্‌রী' 'গুড়া গুড়ি' প্রভৃতি উচ্চারণ করিতে পারিবেন না তাহাদিগকে হত্যা করিতে হইবে। কথিত আছে যে, গৃহরক্ষী-বাহিনীর সঙ্গে কোন সংশ্রব নাই এরূপ অনেক লোকও এই সময় নিহত হইয়াছিল।

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নূতন সুলতান, পুত্র হুমায়ুনকে সাবেক সুলতান আবুবকরের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। শাহজাদা আবুবকর, বাহাদুর নাহিরের সহযোগিতায় শাহ্‌জাদা হুমায়ুনকে তাঁহার কোট্‌লা শিবিরে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু হুমায়ুন ও ইসলাম খান প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া আবুবকরকে সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। নূতন সুলতান পরে মেওয়াট পৌঁছিয়া আবুবকরকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় মিরাট দুর্গে প্রেরণ করা হয়। কয়েক বৎসর পর সেখানেই তাঁহার জীবনাবসান ঘটে।

দিল্লী ফিরিয়া সুলতান জানিতে পারিলেন যে, গুজরাটের শাসনকর্তা ফারহাতুল মুল্‌ক্ বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য ওয়াজির-উল-মুল্‌কের পুত্র জাফর খানের[১] অধীনে এক বিরাট বাহিনী গুজরাটে প্রেরণ করা

১ এই আমীর পরবর্তীকালে গুজরাটে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন এবং সেই সময়েই মালব ও খান্দেশের সুবাদারগণ তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। আকবরের সময়াবধি এই প্রদেশগুলি স্বাধীন ছিল।

হইল। এই অভিযানের বিস্তৃত বিবরণের জন্য পাঠককে এই গ্রন্থের অংশ—'গুজরাটের ইতিহাস' পাঠ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

৭৯৪ হিজরীতে (১৩৯১ খ্রী:) রাঠোর রাজপুতদের নেতা নরসিংহ ভাম ও সিবভোধান এবং বৈশ্য রাজপুতদের নেতা বীরভান দিল্লীর আনুগত্য অস্বীকার করায় উজির ইসলাম খান এক বিরাট বাহিনী লইয়া ইহাদের মধ্যে যে অধিক শক্তিশালী—সেই নরসিংহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। নরসিংহ পরাস্ত হইয়া শান্তি ভিক্ষা করেন এবং বিজেতার সঙ্গে দিল্লী আগমন করেন। অপর দুইজন রাজপুত নেতা যুদ্ধ না করিয়াই বশ্যতা স্বীকার করেন। এই সময় এটোয়ার জমিদাররা বিদ্রোহ করিয়া বিলগ্রাম ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলগুলি যথেচ্ছ লুণ্ঠন করে। নাসির-উদ-দীন স্বয়ং ইহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে শায়েস্তা করেন এবং এটোয়ার দুর্গ ধূলিসাৎ করেন। অতঃপর সুলতান কনৌজের পথে জলেশ্বর পৌঁছিয়া সেখানে এক কেল্লা নির্মাণ করাইয়া উহার নাম দেন মুহম্মদাবাদ।

এই সময় দিল্লী হইতে খবর আসিল যে, উজির ইসলাম খান লাহোর ও মুলতান গমনের উদ্যোগ করিতেছেন। উদ্দেশ্য সেখানে যাইয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করিবেন। সুলতান কালবিলম্ব না করিয়া দিল্লী চলিয়া আসিয়া উজির ইসলাম খানের উপর বিশ্বাসঘাতকতার মতলব আরোপ করিলেন। উজিরের আপন ভ্রাতুষ্পুত্র হিন্দু হাজু[২] তাঁহার বিরুদ্ধে শপথ গ্রহণ করিয়া মিথ্যা সাক্ষ্যদান করে। ফলে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড হয়। উজিরের পতনে খাজা জাহানের হাত ছিল। খাজা-জাহান অতঃপর উজির নিযুক্ত হইলেন। মালিক মুকার-রির-উল-মুলক্—যিনি পরবর্তীকালে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, তিনি মুহাম্মবাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন।

৭৯৫ হিজরীতে (খ্রী: ১৩৯২) সিবভোধান রাঠোর ও বীরভান বৈশ্য বিদ্রোহ করে। মুহাম্মদাবাদ হইতে মুকার-রির-উল-মুলকের উপর তাহাদের বিরুদ্ধে গমন করিবার হুকুম হয়। এই বৎসর সুলতান নিজে মেওয়াট যাইয়া সেখানকার গোলযোগ শান্ত করেন। তারপর মুহাম্মদাবাদ ফিরিবার পরই সুলতান জ্বরাক্রান্ত হইয়া পড়েন। জ্বরের সময় মাঝে মাঝে প্রলাপ করা শুরু করেন। রোগ শয্যায় সংবাদ পাইলেন যে, বাহাদুর নাহির দিল্লীর তোরণ পর্যন্ত সমস্ত দেশে যথেচ্ছ লুটতরাজ করিতেছেন। আরোগ্যলাভ করিবার পূর্বেই রোগশীর্ণ সুলতান

২ হাজু হিন্দু ছিল। উজিরও নিশ্চয়ই হিন্দু হইতে মুসলমান হইয়াছিলেন।

সসৈন্যে মেওয়াট চলিয়া আসিলেন এবং কোটলায় বাহাদুর নাহিরকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাস্ত করিলেন। বাহাদুর নাহির ঝিরকায় পালাইয়া গেলেন। এই জয়লাভের পর ৭৯৬ হিজরীর রবি-উস-সানী মাসে (খ্রীঃ ১৩৯৪ ফেব্রুয়ারী) তিনি মুহম্মদাবাদ ফিরিয়া আসেন। সুলতান ইতিপূর্বে তাঁহার পুত্র হুমায়ুনকে শেইখা গোক্করের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে বলিয়াছিলেন। শেইখা গোক্কর বিদ্রোহ করিয়া লাহোর দখল করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু শাহজাদা দিল্লী ত্যাগ করিবার পূর্বেই পিতার মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন। সুলতান পুনরায় জ্বরে আক্রান্ত হইয়া ১৭ই রবি-উস-সানিতে (হিঃ ৭৯৬ ফেব্রুয়ারী ১৩১৪) মুহাম্মদাবাদে ইন্তেকাল করেন। তিনি প্রায় ছয় বৎসর সাত মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার লাশ দিল্লীতে আনিয়া পিতার সমাধিসৌধেই দাফন করা হয়। নাসির-উদ-দীন তোগলকের পর তাঁহার পুত্র হুমায়ন তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সিকান্দার নাম ধারণ করেন। তিনি সমস্ত আমীর-দিগকে স্ব স্ব পদে বহাল করেন কিন্তু অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইয়া মাত্র ৪৫ দিন রাজত্বের পর পরলোক গমন করেন।

মাহমুদ তোগলক

[উজির খাজা জাহানের জৌনপুর গিয়া নিজেকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা। সুলতানের সুবাদার সারং খান কর্তৃক গোক্করদিগকে পরাস্ত করিয়া লাহোর পুনরুদ্ধার এবং দিপালপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা। তাঁহার ভ্রাতা মালু ইয়েকবাল খান কর্তৃক রাজধানীতে বিদ্রোহ। অধিবাসীদের বিপক্ষে যোগদান। দিল্লীতে তিনটি দল সৃষ্টি এবং প্রত্যেক দল কর্তৃক এক একজন সুলতানকে সমর্থন। তিন বৎসর যাবৎ রাজধানীতে গৃহবিবাদ। সমস্ত প্রদেশগুলির স্বাধীনতা প্রাপ্তি। তৈমুরের ভারত আক্রমণ।]

হুমায়ুনের ইন্তেকালের পর উত্তরাধিকার লইয়া ওমরাহদের মধ্যে তুমুল বিরোধ দেখা দেয়। পরিশেষে তাঁহারা ভূতপূর্ব সুলতান নাসির-উদ-দীনের বালক পুত্র মাহমুদকেই নির্বাচিত করিয়া তখ্‌তে উপবেশন করান। খাজা জাহান উজিরের পদে বহাল রহিলেন। মুকার-রি-রুল মুল্‌ক্‌কে মুকার-রিব খান উপাধি প্রদান করিয়া ভকিল-উস-সুলতানাত নিযুক্ত করা হইল এবং তাঁহাকে আমীর-উল-ওমরাহের মর্যাদা প্রদান করা হইল। সাদত খানকে বারবিক নিযুক্ত করা হইল। সারং খানকে দিপালপুরের সুবাদার নিযুক্ত করা হইল এবং দৌলৎ খানকে প্রধান কর্মসচিব মনোনীত করা হইল।

একদিকে সুলতান নাবালক, অন্যদিকে ওমরাহদের মধ্যে আন্তরিকতা ও ঐক্যের অভাব—এই দুই-এর সমন্বয়ে শাসনকার্যের দুর্বলতা ও বিশৃঙ্খলা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হইতে লাগিল। ফলে সুলতানের চতুর্দিকে অবস্থিত প্রধানদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিদ্রোহের বাসনা দানা বাঁধিতে লাগিল। উজির খাজা জাহান মালিক-উস-সার্ক[১] উপাধি ধারণ পূর্বক জৌনপুরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন এবং বাঙ্গালাদেশের সুলতানের নিকট হইতে কর আদায় করিতে লাগিলেন। সাম্রাজ্যের অপর প্রান্তে দিপালপুরের শাসনকর্তা সারং খান মুলতান প্রদেশ ও সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম বিভাগ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া গোক্করদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন। লাহোরের ২৪ মাইল দূরে আজুধন নামক স্থানে গোক্করদের সঙ্গে তাঁহার সংঘর্ষ হয়। যুদ্ধে গোক্করদের পরাজয় ঘটে এবং শেইখা জম্মুর

১ এ বংশ সার্কী নামে পরিচিত। বাঙ্গালা দেশের সুলতানদের বংশ যেমন পুরবিয়া নামে পরিচিত, সার্ক ও পুরবিয়া—দুইটি শব্দের অর্থই পূর্বদিক।

পার্বত্যাঞ্চলে পালাইয়া যান। এই ঘটনার পর সারং খান তাঁহার অনুজ আদিল খানকে লাহোর রাখিয়া নিজে দিপালপুরে ফিরিয়া আসেন এবং এইখানেই তিনি তাঁহার প্রধান কার্যালয় স্থাপন করেন। এই বৎসর সুলতান, মুকার-রিব খানের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া, সাদত্ খান ও আরও কতিপয় আমীরের সঙ্গে গোয়ালিয় ও বিয়ানার দিকে রওয়ানা হন। তাঁহারা গোয়ালিয়রের নিকট পৌঁছিলে মুবারিক খান, সারং খানের ভ্রাতা মালু ইয়েকবাল খান ও মালিক আলা-উদ-দীন ধারওয়ালা সাদত্ খানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করেন। সাদত্ খান সময়মত এই ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারিয়া মুবারিক খান ও আলা-উদ-দীনকে হত্যা করান। মালু ইয়েকবাল প্রাণ লইয়া দিল্লী পালাইয়া আসেন। এইরূপে সাময়িকভাবে এই ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইহার ফলে যে ঘৃণা ও বিদ্বেষের সৃষ্টি হইল তাহাতে সাদত্ খান দিল্লী ফিরিতে বাধ্য হইলেন। তিনি দিল্লীর নিকটবর্তী হইলে আমীর-উল-ওমরাহ্ মুকার-রিব খান তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি জানিতে পারিলেন যে, মালু ইয়েকবাল খানকে আশ্রয়দানের জন্য সাদত্ খান তাঁহার উপর প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন—তখন তিনি শহরে ফিরিয়া তোরণগুলি বন্ধ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিন মাস ব্যাপী শহর অবরুদ্ধ রহিল। কোনো মীমাংসা হইল না। শেষে সুলতান উপলব্ধি করিলেন যে, সাদত্ খানই এই যুদ্ধের জন্য দায়ী এবং এক মাত্র তাঁহারই স্বার্থে এই যুদ্ধ চালানো হইতেছে। তখন মুকার-রিব খানের সঙ্গে আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া সুলতান ৭৯৭ হিজরীর মহরম মাসে অক্টোবর (খ্রীঃ ১৩৯৪) শহরে প্রবেশ করিলেন। সাদত্ খান তাঁহার দলবলসহ ময়দানেই রহিলেন।

সুলতানকে হাতে পাইয়া মুকার-রিব খান পরদিন তাঁহার সমস্ত ফৌজ লইয়া সাদত্ খানকে আক্রমণ করেন। কিন্তু বিপুল ক্ষতির সহিত পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। ওদিকে বৃষ্টিপাত শুরু হওয়ার সাদত্ খানের পক্ষে ময়দানে অবস্থান করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। তখন তিনি তাঁবু উঠাইয়া ফিরোজাবাদ প্রবেশ করেন। অতঃপর তিনি ফিরোজ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র ফতেহ্ খানের পুত্র নসরত খানকে মেওয়াট হইতে ডাকিয়া আনাইলেন এবং তাহাকে নসরত শাহ্ উপাধি প্রদান করিয়া মাহমুদ তোগলকের প্রতিদ্বন্দী সুলতানরূপে দণ্ডায়মান করাইলেন।

কিন্তু মেওয়াটিদের মধ্যে এক নূতন দল সৃষ্টি হওয়ায় সাদত্ খানের এই পরিকল্পনার ফল ভিন্নরূপ দাঁড়াইল। ভূতপূর্ব ফিরোজ তোগলকের গৃহরক্ষী সৈন্যরা সাদত্ খানের সঙ্গে হাত মিলাইয়াছিলেন। কিন্তু সাদত্ খানের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহারা সাদত্ খানের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রস্তুত হইল। হস্তীশালার রক্ষকরাও ইহাদের দলে যোগদান করিল। শাহজাদা নসরতকে হস্তীপৃষ্ঠে উঠাইয়া ইহারা সাদত্ খানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং তাঁহাকে ফিরোজাবাদ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। সমস্ত অনুচর কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া শেষ পর্যন্ত সাদত্ খান মুকার-রিব খানের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য হন। কিন্তু মুকার-রিব খান তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।

সাম্রাজ্যের দুর্ভাগ্য দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ফিরোজাবাদ ও কয়েকটি প্রদেশের আমীরগণ নসরত্ শাহের দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইলেন। আর যাঁহারা দিল্লী ও অন্যান্য অঞ্চলে ছিল তাঁহারা মাহমুদ তোগলকের পক্ষাবলম্বন করিলেন। রাজ্যে পূর্ণ অরাজকতা বিরাজ করিতে লাগিল। সর্বত্র গৃহযুদ্ধ দেখা দিল। দিল্লীতে এমন এক দৃশ্যের অবতারণা হইল—যাহা পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই বা শুনে নাই। এক রাজধানীতে দুই সুলতান—পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া চলিয়াছে। গুজরাটের সুবাদার জাফর খানের পুত্র তাতার খান ও ফজল উল্লাহ্ বলখী ওরফে কুতলুগ খান ফিরোজাবাদে শাহজাদা নসরতের দলে যোগদান করেন। মুকার রিব খান ও অন্যান্য আমীররা মাহমুদ তোগলকের পক্ষে রহিলেন। বাহাদুর নাহির ও মালু ইয়েকবাল খান এক শক্তিশালী সেনাবাহিনী লইয়া সিরির দুর্গ[২] দখল করিয়া নিরপেক্ষ রহিলেন। উদ্দেশ্য - সুযোগ সুবিধামত যে-কোন দিকে ঝুঁকিয়া পড়িবেন। আশ্চর্য! তিন বৎসর যাবৎ বিবাদ চলিল, কোন ফয়সালা হইল না। অবস্থা একইরূপ রহিল। কোন এক সুলতানের পক্ষ যখন প্রাধান্য লাভ করে তখন এই নিরপেক্ষ দল ভারসাম্য রক্ষা করে। এই প্রকারে ক্রমাগত যুদ্ধ চলিল। কোন কোন দিন যুদ্ধে হাজার হাজার লোক প্রাণ হারাইতে লাগিল। কিন্তু নিত্যনূতন সৈন্যের আগমনে এই রিক্ততা সঙ্গে সঙ্গেই পূরণ হইয়াছে। কোন কোন প্রদেশের সুবাদাররা এই গৃহবিবাদে কোন অংশই গ্রহণ করিলেন না। তাঁহারা আশা করিতে লাগিলেন যে, এই গৃহবিবাদ শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা লাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিবে।

২ সম্ভবতঃ দিল্লীর কেল্লার নাম।

৭৯৮ হিজরীতে (১৩৯৫ খ্রীঃ) দিপালপুরের শাসনকর্তা সারং খানের সঙ্গে সুলতানের শাসনকর্তা খিজির খানের বিরোধ বাঁধে। উভয় পক্ষে কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। সারং খান চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করেন এবং মুলতান তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। পর বৎসর সারং খান রাজধানী অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়া সামানা অধিকার করেন। তাঁহাকে বাঁধাদানের জন্য নসরত্ শাহ্ পানিপথের শাসনকর্তা তাতার খান আলমাস বেগকে প্রেরণ করেন। তাঁহারা ৭৯৯ হিজরী, ১লা মহরম (৪ঠা অক্টোবর ১৩৯৬ খ্রীঃ) সারং খানকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া মুলতানে পালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন।

মুলতানে পৌঁছিয়াই সারং খান শুনিতে পাইলেন যে, তৈমুরের পৌত্র পীর মুহম্মদ জাহাঙ্গীর সিন্ধুনদের উপর নৌ-সেতু নির্মাণ করিয়া সিন্ধুনদ পার হইয়া উচা বেষ্টন করিয়াছেন। সারং খান তৎক্ষণাৎ তাহার সহকারী আমীর মালিক তাজুদ্দীনকে তাঁহার ফৌজের বৃহত্তর অংশ লইয়া উচার শাসনকর্তা মালিক আলীর সাহায্যার্থ প্রেরণ করেন। মির্জা পীর মুহম্মদ তাহাদের গতি-বিধির সংবাদ পাইয়া বিয়াস পর্যন্ত আগাইয়া আসেন এবং মুলতানীরা নদী পার হইবার সময় তাঁহাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া তাহাদিগকে নদীর মধ্যে ঠেলিয়া দেয়। ফলে তলোয়ারের মুখে যাহারা পড়িল, তাহাদের অধিক সংখ্যক নদীগর্ভে বিলীন হইল। প্রায় সমস্ত ফৌজই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল। মাত্র কয়েকজন প্রাণ লইয়া মুলতানে ফিরিয়া গেল। হতাবশিষ্ট পলাতকদের অনুসরণ করিয়া পীর মুহম্মদ মুলতান আসিয়া পৌঁছিল এবং সারং খানকে দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিল। ছয়মাস অবরোধ চলিয়াছিল। শেষ পর্যন্ত রসদ নিঃশেষ হওয়ায় কাবু হইয়া সারং খান আত্মসমর্পণ করেন। মির্জা পীর মুহম্মদ মুলতান অধিকার করেন। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই সারং খান কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া পালাইয়া যান। দিল্লীতে মুকার-রিব খানের সঙ্গে মালু ইয়েকবাল খানের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। তখন মালু ইয়েকবাল খান নসরত্ শাহের দলে যোগদান করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রস্তাব সাগ্রহে গ্রহণ করা হয়। দুই দল একত্রে সিরি মহলে খাজা কুতুব-উদ-দীন বখ্তিয়ার কাকীর মাজারে যাইয়া কোরান শরীফ স্পর্শ করিয়া পরস্পরকে সাহায্য করিবার শপথ গ্রহণ করে। শীঘ্রই মাহমুদ তোগলকের সঙ্গে মুকার-রিব খানেরও বিবাদ আরম্ভ হয় এবং তাঁহার প্রায়

তিন দিন পরে মালু ইয়েকবাল খান ও নসরত্ খানের সম্পর্কেও ফাটল দেখা দেয়। শপথের কথা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া মালু ইয়েকবাল খান নসরত্ শাহকে বন্দী করিবার চক্রান্ত করেন। এই ষড়যন্ত্রের কথা অবগত হইয়া নসরত্ শাহ সিরিমহল ত্যাগ করিবার উদ্যোগ করেন। কিন্তু পলায়নকালে মালু ইয়েকবাল খান বাধাদান করিয়া নসরত্ শাহের অনুচরদের নিকট হইতে হস্তী, কোষাগার ও সব মালপত্র ছিনাইয়া লয়। হৃতভাগা শাহজাদার আর যুদ্ধ করিবার মত ক্ষমতা রহিল না। তিনি পানিপথে তাঁহার উজির তাতার খানের নিকট পালাইয়া গেলেন। অতঃপর মালু ইয়েকবাল হইলেন ফিরোজাবাদের মালিক। তিনি সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া সুলতান মাহমুদ ও তাহার সাহায্যকারী মুকার-রিব খানকে পুরাতন শহর হইতে বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। অবশেষে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় দুই দলের মধ্যে শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু চিরবিশ্বাসঘাতক মালু ইয়েকবাল খান পবিত্র শপথ উপেক্ষা করিয়া মুকার-রিব খানকে তাঁহার গৃহে আক্রমণ করিয়া হত্যা করেন। তিনি মাহমুদ তোগলককেও মুঠির মধ্যে আনয়ন করেন এবং সুলতান উপাধি ব্যতীত আর সবকিছু হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করেন।

অতঃপর মালু ইয়েকবাল খান 'লোক দেখানো সুলতান' মাহমুদকে সঙ্গে লইয়া পানিপথ অভিমুখে রওয়ানা হন। উদ্দেশ্য—নসরত্ শাহ ও তাতার খানকে খতম করা। তাতার খান তাহার হস্তী ও সাজসরঞ্জামাদি পানিপথের দুর্গে রাখিয়া—শত্রুবাহিনীকে পাশ কাটাইয়া ও কোন প্রকার সংঘর্ষ এড়াইয়া প্রাণপণে ছুটিয়া দিল্লী আসেন এবং শহর পরিবেষ্টন করিয়া ফেলেন। শহরে যে সৈন্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহাদের উপর নির্ভর করিয়া মালু ইয়েকবাল দিল্লী না ফিরিয়া পানিপথ দুর্গ অবরোধ করেন এবং তৃতীয় দিবসে প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া উহা অধিকার করেন। অতঃপর তিনি দ্রুত দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। দিল্লীতে তাতার খান সুবিধা করিতে না পারিয়া গুজরাটে তাঁহার পিতা জাফর খানের নিকট পালাইয়া যান। মালু ইয়েকাল খান শহরের কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া শাসনকার্যে কিছুটা শৃঙ্খলা আনয়নের চেষ্টা করেন। এই সময় হতভাগ্য দেশবাসীর দুঃখের পেয়ালা কানায় কানায় পূর্ণ করিবার জন্য তৈমুর বেগ হিন্দুস্তান আক্রমণ করিতে আসিলেন। দিল্লীতে সংবাদ পৌঁছিল যে, তিনি ইতিমধ্যেই সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়াছেন।

তৈমুর (বা তৈমুর লং) কর্তৃক ভারত আক্রমণ

[তৈমুরের সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তুলুম্বা হইয়া মুলতান আগমন। সেখানে তাঁহার সহিত পৌত্র পীর মুহম্মদের যোগদান। তৈমুরের ভাটনগর গমন ও অধিকার। পানিপথ হইয়া দিল্লী আগমন। শহর দর্শনে ক্ষুদ্র এক সৈন্যদল প্রেরণ। তাঁহারা আক্রান্ত এবং সংঘর্ষে তাহাদেরই জয়। তৈমুরের আদেশে একলক্ষ ভারতীয় বন্দীর হত্যাসাধন। দিল্লীর যুদ্ধ। ভারতীয় বাহিনীর শোচনীয় পরাজয়। সুলতান মাহমুদ তোগলকের পলায়ন। দিল্লীর উপর তৈমুর কর্তৃক শাস্তিমূলক কর ধার্য। ভারতীয়গণ কর্তৃক বাধাদান। দিল্লীর অধিবাসীদিগকে নির্বিচারে হত্যা। খিজির খান নামক এক ভারতীয় সেনাপতিকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া তৈমুরের স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান। নসরত শাহের দিল্লী আগমন এবং মালু ইয়েকবাল খানকে বিতাড়িতকরণ। অতঃপর মালু ইয়েকবাল খান কর্তৃক নসরত শাহ বিতাড়িত। দিল্লীর প্রভুত্ব কয়েকটি গ্রামে সীমাবদ্ধ। দিল্লী সাম্রাজ্যের ধ্বংসের উপর সাতটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত। মালু ইয়েকবাল খান তৈমুরের প্রতিনিধি খিজির খানকে আক্রমণ করিয়া পরাস্ত ও নিহত। খিজির খানের দিল্লী প্রবেশ।]

ভারতে গোলযোগ ও গৃহযুদ্ধের সংবাদ পাইয়া আমীর তৈমুর ৮০০ হিজরী (১৩৯৮ খ্রীঃ) ভারতাভিযানে বহির্গত হন এবং পর বৎসর ১২ই মহরম সিন্ধু নদের তীরে আসিয়া উপনীত হন। সিন্ধু অতিক্রম করিয়া তিনি কোল জালালীর উপর আসিয়া পতিত হন। কাবুলের সুলতান জালাল-উদ-দীন বাঙ্গুর ত্যাগ করিয়া এই কোলে (দুর্গে) আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে এই দুর্গ কোল জালালী নামে পরিচিত। ইতিমধ্যে সীমান্তাঞ্চল রক্ষার জন্য দিল্লীর সুলতানের পক্ষ হইতে শাহাব-উদ-দীন মুবারিক খান বিহুত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। তৈমুর তাঁহার বিরুদ্ধে শেখ নুর-উদ-দীনকে প্রেরণ করেন। নুর-উদ-দীন মুবারিক খানের কয়েক মাইলের মধ্যে আসিয়া তাঁহাকে তৈমুরের আনুগত্য মানিয়া লইতে বলেন। মুবারিক খান নদী তীরে এক অতি সুবিধাজনক স্থান বাছিয়া লইয়া উহার চারিদিকে পরিখা খনন করাইলেন এবং আত্মরক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইলেন। নুর-উদ-দীন সেখানে আসিয়া পরিখা কোন প্রকারে ভরাট করাইলেন। রাত্রে অবরুদ্ধ মুবারিকের সৈন্যরা সহসা শত্রু সৈন্যের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া উহাদের বহুলোককে

হত্যা করে। কিন্তু নুর-উদ-দীন তাল সামলাইয়া উঠিয়া আক্রমণকারীদিগকে পিছু হটাইয়া দেয় এবং তাহারা পুনরায় প্রাচীরের মধ্যে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। এই সময় তৈমুর তাঁহার সমগ্র বাহিনী লইয়া সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন ভীতসন্ত্রস্ত মুবারিক খান গোপনে তাঁহার পরিবার পরিজন ও কোষাগার দুইশত নৌকায় উঠাইয়া রাত্রির অন্ধকারে স্রোতের অনুকূলে পলায়ন করেন। তাঁহাকে ধরিবার জন্য নুর-উদ-দীনকে প্রেরণ করা হইল। তিনি দুইদিন যাবৎ তাঁহার অনুসরণ করিয়া শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। ভারতীয় সৈন্যরা তাহাদের সিপাহসালারের পলায়নের পর বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করে।

তৈমুর অতঃপর নদীপথে অগ্রসর হইয়া রাবী ও চেনাবের সঙ্গমস্থলে আসিয়া পৌঁছেন। তুলুম্বা শহর ও তার সুদৃঢ় কেল্লা সেখানেই অবস্থিত ছিল। তিনি নদীর উপর সেতু স্থাপন করিয়া সৈন্য পার করাইয়া শহরের বাহিরে শিবির স্থাপন করেন। তৈমুর শহরের উপর কর ধার্য করেন। শহরের অধিবাসীরা ভয়ে তৈমুরের জারিকৃত অর্থ আদায় করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় তৈমুর জানিতে পারিলেন যে, তাঁহার শিবিরে রসদ প্রায় শেষ। তখন তিনি সৈন্যদিগকে যে প্রকারেই হউক এবং যেখানেই পাওয়া যাউক—জোর করিয়া খাদ্য সংগ্রহ করিবার হুকুম দিলেন। এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া সৈন্যরা খাদ্য তল্লাশীর জন্য শহরে প্রবেশ করিল। কিন্তু রসদ যা পাওয়া গেল তাহাতে তাহারা তৃপ্ত হইতে পারিল না এবং তাহারা বেপরোয়া লুটতরাজ আরম্ভ করিয়া দিল। অধিবাসীরা যখন এই প্রকার নগ্ন জবরদস্তির প্রতিবাদ করিতে গেল তখন তাহাদিগকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হইল। তুলুম্বা দুর্গ অবরোধ করিতে গেলে তাঁহার অগ্রগতি ব্যাহত হয়। এইজন্য সেখানে আর সময় নষ্ট না করিয়া তিনি পরদিন সসৈন্যে শাহনওয়াজ নামক অপর এক শহরে চলিয়া আসেন। এখানে তিনি এত অধিক খাদ্য পাইলেন যে তাহার সমস্ত ফৌজের প্রয়োজন মিটিবার পরও উদ্বৃত্ত রহিল। যাহা বহন করা গেল না তাহা তিনি পোড়াইয়া ফেলিলেন। গোক্কর সর্দারের ভ্রাতা ২,০০০ লোক সমবেত করিয়া শহর রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়া নিহত হয়। তৃতীয় দিবসে তৈমুর শাহ-নওয়াজ ত্যাগ করেন এবং বিয়াস পার হইয়া এক উর্বর সমৃদ্ধশালী এলাকায় প্রবেশ করেন। এইখানে পীর মুহম্মদের কার্যকলাপের কিছু বিবরণ দেওয়া প্রয়োজন।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে, তিনি মুলতান অধিকার করিবার পর বর্ষাকাল শুরু হয় এবং অত্যন্ত অসুবিধায় পতিত হন—তাঁহার বহু অশ্ব ময়দানেই মারা যায়। তখন তিনি মুলতান শহরে যাইয়া আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কিন্তু সে অঞ্চলের অধিবাসীরা তাঁহাকে ভীষণভাবে কষ্ট দিতে থাকে। তাঁহারা শহর বেষ্টন করিয়া সরবরাহ বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে তৃণাভাবে তাঁহার অশ্ব সংখ্যা প্রতিদিন হ্রাস পাইতে থাকে। শাহজাদার অবস্থা যখন এইরূপ তখন তাঁহার পিতামহ তৈমুর ভারত আক্রমণ করেন। তিনি প্রথমেই ৩০,০০০ হাজার বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী পীর মুহম্মদের সাহায্যার্থে প্রেরণ করেন এবং তার অল্পকাল পরেই অবশিষ্ট সৈন্যবাহিনী লইয়া স্বয়ং আসিয়া পৌত্রের সঙ্গে মিলিত হন। পীর মুহম্মদ ভাটনগরের সুবাদারের বিরুদ্ধে পিতামহের নিকট নালিশ করেন যে, মুলতানে তাঁহার দুর্দশার মূলে ছিলেন সেই সুবাদার। ভাটনগরের সুবাদারের উপর প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য তৈমুর ১০,০০০ হাজার উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া ভাটনগরাভিমুখে ছুটিলেন। মোগল বাহিনী আজুধন পৌঁছিলে তৈমুরকে সেখানে শেখ ফরিদ-উদ-দীনের মাজার দেখানো হয়। দরবেশের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ তিনি তথাকার অধিবাসীদের প্রাণনাশে বিরত থাকেন। অধিকাংশ অধিবাসীই প্রাণভয়ে ভাটনগর ও দিল্লী পালাইয়া যায়। আজুধনে নদী পার হইয়া তিনি ভাটনগরের পথ ধরিলেন এবং চালিস্‌কোল আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। এইখান হইতে যাত্রা করিয়া একদিনে পঞ্চাশ কোষ[১] পথ অতিক্রম করিয়া ভাটনগর আসিয়া পৌঁছিলেন। তৈমুরের আগমন-সংবাদ পাইয়া দিপালপুর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক অধিবাসী প্রাণভয়ে শহরে আসিয়া ভিড় করিয়াছিল। তাহাদের প্রায় অর্ধেক সংখ্যক লোককে শহর হইতে বিতাড়িত করা হয়। তখন তাহারা শহরের প্রাচীরের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে। তৈমুরের আগমনের দিন সেখানেই আক্রমণ করিয়া তাহাদের কয়েক সহস্রকে তথায় বধ করা হয়। ভাটনগরের শাসনকর্তা রো-খিলজী[২] দেখিলেন যে, আক্রমণকারীদের সংখ্যা বেশী নয়।

১ এক কোষ এক হইতে চারি মাইলের সমান। ন্যূনতম দূরত্ব ধরিলেও পঞ্চাশ মাইল পথ একদিনে অতিক্রম করা বিস্ময়কর। কশাক ও তাতাররা সকলেই ছিল অশ্বারোহী।

২ সম্ভবতঃ নামটা ভুল লেখা হইয়াছে বা পাণ্ডুলিপিতে অস্পষ্টভাবে লিখিত থাকার জন্য ভুল পাঠ করা হইয়াছে।

সেই জন্য তিনি সাহসে ভর করিয়া তাহার সৈন্যদিগকে শহরের বাহিরে লইয়া আসিয়া যুদ্ধের জন্য কাতারবদ্ধ করিলেন। কিন্তু মোগল আক্রমণের প্রথম ধাক্কাতেই তাঁহারা পিছু হটিয়া শহরের দিকে ছুট দিল। তৈমুর তাহাদের পিছু পিছু ছুটিয়া আসিয়া পলাতকরা তোরণ বন্ধ করিবার পূর্বেই উহা দখল করিয়া লইলেন। তারপর তিনি পলাতক সৈন্যদিগকে শহরের মধ্যে রাস্তায় রাস্তায় তাড়াইয়া লইয়া গেলেন এবং এই প্রকারে কয়েক ঘন্টার মধ্যে কেল্লা ব্যতীত সমস্ত শহরের তিনি মালিক হইলেন। কেল্লা দখল করিবার জন্য তিনি উহার প্রাচীর ধ্বংস করিয়া ফেলিবার আদেশ দিলেন। দুর্গস্থ সৈন্যরা আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পেশ করিল। সুবাদার স্বয়ং তৈমুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে ৩০০ শত আরবীয় অশ্ব ও হিন্দুস্থানের অনেক আশ্চর্য ও সৌখীন বস্তু উপহার দিলেন। প্রতিদানে তৈমুর অবশ্য তাঁহাকে একটি সম্মানসূচক খেলাৎ প্রদান করেন। অতঃপর তৈমুর সুলেমান শাহ্ ও আমীর আল্লাদাদকে তোরণ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন এবং প্রাচীরের নীচে আশ্রয়গ্রহণকারী লোকদিগকে হত্যা করিবার হুকুম দান করিয়া পৌত্র পীর মুহম্মদের প্রতি দুর্ব্যবহারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। এই আদেশের ফলে কয়েক মিনিটের মধ্যে মোগলরা ৫০০ লোককে হত্যা করিল। অবশিষ্টদের যথাসর্বস্ব কাড়িয়া লইয়া তাহাদিগকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। দুর্গবাসী হিন্দু ও মুসলমান সকলেই বুঝিল তাহাদের ভাগ্যেও ইহাই ঘটিবে। তখন সেই ভয়াবহ পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া স্ত্রী ও সন্তানকে স্বহস্তে বধ করিয়া দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিল। তারপর মৃত্যুপণ করিয়া শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। সেকি হৃদয় বিদারক দৃশ্য। হতভাগ্য অধিবাসীরা সকলেই নিহত হইল। কিন্তু কয়েক সহস্র মোগলকেও তাহারা সঙ্গে লইয়া গেল। তাহাদের এই বাহাদুরীতে দুনিয়ার অদ্বিতীয় বদমেজাজী তৈমুরের ক্রোধানল এমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল যে, ভাটনগরের একটি প্রাণীও রক্ষা পাইল না এবং সমস্ত শহর ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

অতঃপর তৈমুর সরস্বতী নগরে গমন করিয়া তথাকার অধিবাসীদিগকেও তলোয়ারের মুখে বিসর্জন দেন এবং নগর সম্পূর্ণ লুণ্ঠন করেন। তারপর ফাতেহাবাদ আসিয়া সেই এলাকা ও নিকটবর্তী শহর—রাজপুর, আরুনী ও তুহানা লুণ্ঠন ও অগ্নি সংযোগ দ্বারা ছারখার করেন। সেখান হইতে তিনি হাকিম ইরাকীকে ৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ পৃথকভাবে সামানাভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি

নিজে দেশ ছারখার করার কার্যে লিপ্ত রহিলেন। সেই অঞ্চলে একদল জাট কয়েক বৎসর যাবৎ লুণ্ঠন কার্য দ্বারা জীবিকার্জন করিতেছিল। তৈমুর তাহাদের সকলকে কাটিয়া ফেলেন। ইতিমধ্যে তাহার মূল সেনাবাহিনীও কতিপয় সর্দারের অধীনে বিভক্ত হইয়া মুলতান ও লাহোর প্রদেশে তলোয়ার ও অগ্নিকাণ্ডের বিভীষিকা সৃষ্টি করিতে রত ছিল। তৈমুর তাহাদের সকলকে সামানার ১০ মাইল দূরে কাইথুনে মিলিত হইবার নির্দেশ দান করিলেন। এইখানে সমস্ত সেনাদল একত্রিত করিয়া তাহাদিগকে প্রয়োজনীয় নির্দেশাদি প্রদান করিবার পর দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা করিয়া দিলেন। তাহারা যখন পানিপথে পৌঁছিল তখন তিনি তাহাদিগকে বর্ম পরিধান করিতে হুকুম দিলেন। পথে যাহাতে অশ্বের তৃণাভাব না ঘটে তজ্জন্য তিনি যমুনা পার হইয়া দোয়াবে প্রবেশ করিলেন। সেখানে লোনী নামক আর একটি দুর্গ অধিকার করেন ও দুর্গবাসী সকল সৈন্যকে হত্যা করেন। মোগল বাহিনী অতঃপর নদী বরাবর অগ্রসর হইয়া দিল্লীর বিপরীত দিকে আসিয়া ছাউনী ফেলিলেন। দিল্লীর অধিবাসীরা যেখানে যমুনা পার হইয়া দোয়াবে প্রবেশ করে, তৈমুর সেখানে প্রহরী মোতায়েন করিলেন। অতঃপর তৈমুর সুলেমান খান ও খান জাহানকে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে শহরের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে তদন্তকার্য চালাইবার জন্য প্রেরণ করেন। আর তৈমুর নিজে মাত্র ৭০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সেই দিনই নদী পার হইয়া দিল্লী শহর দর্শনে গমন করেন। তৈমুরের সঙ্গে সামান্য সংখ্যক সৈন্য দেখিয়া দিল্লীর সুলতান ও তাঁহার উজির মালু ইয়েকবাল খান ৫,০০০ অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং ২৭টি হস্তী লইয়া আগাইয়া আসিলেন। ফলে সংঘর্ষ বাঁধিল। তাহাতে সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও দিল্লীর সৈন্যদের পরাজয় ঘটিল এবং দিল্লী বাহিনীর পরিচালক সাইফ বেগ শত্রুহস্তে বন্দী হইলেন। তৈমুর ঘটনাস্থলেই তাঁহার শিরোচ্ছেদের হুকুম দিলেন। অতঃপর তাঁহার যাহা যাহা লক্ষ্য করিবার ছিল তাহা শেষ করিয়া তিনি সসৈন্যে নদী পার হইয়া শিবিরে ফিরিয়া আসেন। পরদিন ভোরে তিনি আরও পূর্বদিকে শিবির সরাইয়া লইলেন। সিন্ধু পার হইবার পর হইতে এ-পর্যন্ত যেসব লোককে বন্দী করিয়া সঙ্গে আনয়ন করা হইয়াছিল, তাহাদের সংখ্যা লক্ষের উপর উঠিয়াছিল। তৈমুর নদীর পরপারে যখন দিল্লীর সৈন্যগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন তখন এইসব বন্দীদের মধ্যে নাকি উল্লাসের ভাব পরিলক্ষিত হইয়াছিল। এই কথা পরদিন তৈমুরের কর্ণগোচর

করা হয়। অনুসন্ধান করিয়া তিনি জানিলেন যে, ইহাদের অধিকাংশই পৌত্তলিক। অমনি তিনি হুকুম দিলেন যে, ১৫ বৎসরের অধিক যাহাদের বয়স তাহাদের সকলকে হত্যা করিতে হইবে। ফলে তাঁহার সৈনিকরা ঐ দিনই অবলীলাক্রমে এক লক্ষ বন্দীকে হত্যা করিল (হিঃ ৮০১ : খ্রীঃ ১৩৯৮)।

৫ই জমাদি-উল-আউয়াল (খ্রীঃ ১৩৯৮ জানুয়ারী ১৩) তৈমুর নির্বিঘ্নে নদী পার হইয়া দিল্লীর বিশিষ্ট শহরতলী ফিরোজাবাদের ময়দানে শিবির স্থাপন করিয়া তথায় পরিখা খনন করিলেন। তিনি খন্দকে শত্রুর দিকে মুখ করিয়া কতকগুলি মহিষ বাঁধিয়া রাখিয়া মহিষের পশ্চাতে সুবিধাজনক দূরে শক্তিশালী সৈন্যদল মোতায়েন করিলেন। মাসের সপ্তম দিবসে গণকদের অমতে তৈমুর শিবির হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য সন্নিবেশ করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মাহমুদ তোগলক ও মাল্লু ইয়েকবাল বর্মাবৃত দিল্লীর বাহিনী ও ১২০টি হস্তী লইয়া মোগলদিগকে বাধাদানের জন্য আগাইয়া আসিলেন। যুদ্ধ শুরু হইল এবং প্রথম ধাক্কাতেই হস্তীর মাহুতগুলি ধরাশায়ী হইল। তখন ঐ বিশালাকার চালকবিহীন ভারী জন্তুগুলি মুখ ফিরাইয়া পশ্চাদদিকে ছুটিল। ইহাতে দিল্লী বাহিনীতে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল। তৈমুরের দুর্ধর্ষ বিশ্বজয়ী যোদ্ধারা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতীয় বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিল এবং তাহারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাইতে লাগিল—দেশ ও জাতির ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য কেহই সাহস করিয়া দণ্ডায়মান রহিল না। বিজয়ীরা পলায়নপর দিল্লীর সৈন্যদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের কয়েক সহস্রকে ধরাশায়ী করিল এবং উহাদের পিছু পিছু দিল্লীর তোরণদ্বার পর্যন্ত আসিয়া পড়িল। তৈমুরের বাহিনী প্রাচীরের নিকটেই ঘাঁটি স্থাপন করিল। দিল্লীতে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি হইল যে, মোগলদের সঙ্গে আর যুদ্ধের কথা কেহ কল্পনাও করিতে সাহস করিল না। সুলতান মাহমুদ তোগলক ও তাঁহার উজির সেই রাত্রেই দিল্লী ত্যাগ করিলেন—মাহমুদ গুজরাট ও উজির ইরানের পথ ধরিলেন। উহাদের খবর পাইয়া তৈমুর তাহাদের পশ্চাতে সৈন্য লেলাইয়া দিলেন। অনুসরণকারীদের একদল মাল্লু ইয়েকবালের নাগাল পাইল এবং তাঁহার অনুচরদের অনেককেই নিহত করিল। মাল্লু ইয়েকবালের দুই শিশু পুত্র সাইফ-উদ-দীন ও খোদাদাদ বন্দী হইল। ইতিমধ্যে শহরের সমস্ত প্রধান ব্যক্তিরা আনুগত্য স্বীকারের জন্য তৈমুরের শিবিরে আসিয়া ভিড় করিল। অর্থের বিনিময়ে তৈমুর তাঁহাদের প্রাণভিক্ষা দিবার

প্রতিশ্রুতি প্রদান করিলেন। পরবর্তী শুক্রবার তৈমুর নিজেকে হিন্দুস্তানের সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং সমস্ত মস্‌জিদে তাঁহার নামে খোৎবা পাঠ হইল। সেই মাসেরই ১৬ তারিখে দিল্লীর তোরণগুলিতে প্রহরী মোতায়েন করা হইল। তিনি শহরের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও ফৌজদারদিগকে শহরবাসীদের নিকট হইতে আর্থিক অবস্থা ও মর্যাদানুযায়ী খেসারত আদায় করিতে হুকুম দিলেন। এই সময় তৈমুরের নিকট সংবাদ আসিল যে, বরাদ্দকৃত খেসারত দানে অনিচ্ছুক কতিপয় ওমরাহ ও ধনী ব্যবসায়ী লোকজনসহ গৃহে কপাট আটিয়া বসিয়া আছে। কিছুতেই তাহারা তাহাদের অংশ প্রদান করিবে না। তখন ফৌজদারদের পরামর্শে আদায়কারীদের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তৈমুর উহাদের সঙ্গে সৈন্যদল পাঠাইলেন। এই ব্যবস্থার ফলে এক মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইল। শহরে প্রবেশ করিয়া মোগল সৈন্যরা বেপরোয়া লুটতরাজ শুরু করিয়া দিল—দলের সর্দাররা তাহাদিগকে সংযত রাখিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইল। তাহারা তৈমুরকে এই সংবাদ জানাইতেও সাহস করিল না।

যুদ্ধে সাফল্য অর্জনের পর তৈমুর সর্বদাই বিজয়োৎসব পালন করিতেন। এখানেও তিনি শিবিরে উৎসবে মত্ত ছিলেন। শহরে কি কাণ্ড ঘটিতেছে পাঁচদিন পর্যন্ত তার কোন সংবাদ তিনি রাখেন নাই। প্রথম যে সংবাদ পাইলেন তাহা এই যে, শহরে আগুন লাগিয়াছে। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ যে, হিন্দুরা চোখের সম্মুখে ধনসম্পদ লুণ্ঠিত এবং স্ত্রীলোকদিগকে ধর্ষিত হইতে দেখিয়া তাহাদের চিরাচরিত প্রথানুযায়ী দরজা বন্ধ করিয়া স্ত্রী ও সন্তানদিগকে স্বহস্তে হত্যা করিয়া গৃহে অগ্নি সংযোগ করিয়া দেয়—তারপর তাহারা শত্রু সৈন্যদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে। ইহাতে তোরণ ভাঙ্গিয়া সমস্ত মোগলবাহিনী শহরে ঢুকিয়া ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু করিয়া দেয়। মৃতদেহ স্তূপীকৃত হইয়া কয়েকটি রাস্তা চলাচলের অনুপোযোগী হইয়া পড়ে। দিল্লী শহরে বল্গাহীন নরহত্যার যে বিভীষিকার সৃষ্টি হইল, তাহা বর্ণনাপেক্ষা কল্পনা করা সহজ। দিল্লীবাসীদের মরণপণ পরাক্রম শেষ পর্যন্ত তাহাদেরই রক্তে শীতল হইয়া আসিল—তখন অস্ত্র-শস্ত্র ছুড়িয়া ফেলিয়া বলীর ছাগলের মত আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল। কোন কোন স্থানে দেখা গেল যে, একজন সৈনিক একশত লোককে বন্দী করিয়া খেদাইয়া লইয়া যাইতেছে।

শহর লুট করিয়া বিজেতারা বিপুল পরিমাণ ধনরত্ন লাভ করিয়াছিল। কি পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য ও রত্নাদি—বিশেষ করিয়া পদ্মরাগমণি ও হীরক প্রাপ্ত

হইয়াছিল, ঐতিহাসিকগণ তাহার বিস্তৃত বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু উহার পরিমাণ বিশ্বাসের সীমারেখা হইতে এতো দূরবর্তী যে, আমি উহার বর্ণনাদানে বিরত থাকিলাম। নিজাম-উদ-দীন আহমদ অবশ্য তাঁহার ইতিহাসে এই ঘটনার অনুরূপ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, তৈমুর অর্থ আদায়ের জন্য যেসব লোক নিয়োজিত করিয়াছিলেন, তাহারা অর্থ নিষ্কাশন করিবার জন্য লোকদের উপর এমন অকথ্য অত্যাচার শুরু করিয়া দেয় যে, অতিষ্ঠ হইয়া তাহারা একস্থানে কয়েকজন মোগলকে মারিয়া ফেলে। এই সংবাদ তৈমুরের কর্ণগোচর হওয়া মাত্র তিনি তাঁহার সৈন্যদিগকে নরহত্যা ও শহর লুণ্ঠনের হুকুমদান করেন। মোগলদের দ্বারা এই প্রথম দিল্লী শহর লুণ্ঠিত হয়। তারপর তৈমুর শহরে প্রবেশ করিয়া ১২০টি হস্তী, ১২টি গণ্ডার ও আরও কয়েকটি অদ্ভুত জন্তু হস্তগত করেন। এই অদ্ভুত জন্তুগুলি ফিরোজ তোগলক কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছিল। ফিরোজ তোগলক কর্তৃক নির্মিত এক সুরম্য মসজিদ দর্শনে তৈমুর অত্যন্ত মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এই মসজিদের প্রস্তর গাত্রে ফিরোজ তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস খোদাই করিয়া গিয়াছিলেন। অনুরূপ একটি মসজিদ স্বীয় রাজধানীতে নির্মাণের জন্য তিনি সেই স্থপতি ও ওস্তাগরদিগকে সমরকন্দে লইয়া যান। দিল্লীতে ১৫ দিন অপেক্ষা করিবার পর তৈমুর স্বদেশ যাত্রা করেন। তিনি প্রথম ফিরোজাবাদ আগমন করেন। সেখানে মেওয়াটের বাহাদুর নাহির আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তৈমুরকে দুইটি শ্বেতবর্ণ তোতা পাখী উপহারস্বরূপ প্রেরণ করেন। তাঁহাকে সাক্ষাৎ করিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া সৈয়দ শামস্ উদ-দীনকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হয়। মেওয়াটের পাহাড়ে আত্মগোপনকারী খিজির খানও বাহাদুর নাহিরের সঙ্গে আসেন এবং তাহাদিগকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়।

ফিরোজাবাদ ত্যাগ করিয়া তৈমুর পানিপথে চলিয়া আসেন। এখান হইতে তিনি আমীর শাহ মালিককে দিল্লী হইতে ৬০ মাইল দূরবর্তী মিরাটের সুদৃঢ় দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। দুর্গটির দুর্ভেদ্যতা পরীক্ষা করিয়া এবং দুর্গবাসী সৈন্যদের মনোবল লক্ষ্য করিয়া শাহ মালিক দমিয়া গেলেন এবং তৈমুরকে সব লিখিয়া জানাইলেন। দুর্গবাসী সৈন্যরা প্রাচীরের উপর উঠিয়া মোগল ফৌজকে লক্ষ্য করিয়া কি বলিয়াছিল, তাহাও এই সঙ্গে তিনি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। তাহারা নাকি বলিয়াছিল, "মোগল

সেনাপতি তমুস্রি খান এই দুর্গ আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। তৈমুরের ভাগ্যেও তাহাই ঘটিবে।" পত্র পাঠ করিয়া তৈমুর তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হইলেন এবং মিরাট পৌঁছিয়া কালক্ষেপ না করিয়া সুড়ঙ্গ খনন করিতে লোক নিযুক্ত করিয়া দিলেন। ইহারা প্রতিদিন মাটির নীচ দিয়া দুর্গ প্রাকারের দিকে ১৫ গজ সুড়ঙ্গ কাটিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। মওলানা আহম্মদ থানেশ্বরীর পুত্র খাজা ইলিয়াস আজুধন ও মালিক সুফী কবির দৃঢ়তার সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিল। কিন্তু মোগলরা পরিখা ভরাট করিয়া সমস্ত বাধা অপসারণ করিয়া দুর্গ প্রাচীরে আরোহণ করিবার জন্য তাহাতে মই ও বড়শিযুক্ত দড়ি লাগাইল। সুড়ঙ্গ তৈয়ার করিয়া বিস্ফোরক দ্বারা দুর্গ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিবার পূর্বেই তাহারা ঝড়ের বেগে আক্রমণ করিয়া দুর্গে প্রবেশ করিল এবং হত্যাকাণ্ড শুরু করিয়া দিল—একটা প্রাণীও নিস্তার পাইল না। সুড়ঙ্গ, প্রাচীরের নিম্নদেশ পর্যন্ত পৌঁছিলে তৈমুর উহাতে অগ্নি-সংযোগ করিতে হুকুম দিলেন। দুর্গ প্রাচীর ধ্বসিয়া পড়িল।[৩]

এই স্থান ত্যাগ করিয়া ক্রমাগত পথ চলিয়া তৈমুর সেবালিক পর্বতের পাদদেশ পর্যন্ত যাইয়া পৌঁছিলেন এবং সমস্ত পথ তলোয়ার ও অগ্নিদ্বারা চিহ্নিত করিয়া গেলেন। অতঃপর তিনি গঙ্গা অতিক্রম করেন এবং গঙ্গা নদী যে পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে সেই পর্বত পর্যন্ত সমস্ত দেশ পদানত করিয়া গেলেন। সেখান হইতে ফিরিবার পথে নদী পার হইয়া এক পার্বত্য পথ ধরেন। এইখানে এক ভারতীয় জমিদার তাঁহাকে বাধাদান করিয়া পরাভূত হন এবং তাঁহার সর্বস্ব লুণ্ঠিত হয়। পথে কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করিয়া শেষ পর্যন্ত জামুগড় আসিয়া পৌঁছেন। জামুগড়ের রাজা আহতাবস্থায় মোগল হস্তে বন্দী হন এবং ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হন। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, শেইখা গোক্করের

৩ দুর্গ অবরোধ কালে তৈমুর কয়েক স্থলে সুড়ঙ্গ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এশিয়া মাইনরেও তিনি সুড়ঙ্গ দ্বারা দুর্গ প্রাকার ধ্বংস করিয়া ফেলিবার পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়াছিলেন। পূর্ব প্রচলিত নিয়মানুসারেই এই সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করা হইত। কিছু দূর হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রাচীর ভাঙ্গিতে হইবে তাহার নিম্ন পর্যন্ত সুড়ঙ্গ লইয়া যাওয়া হইত। কাষ্ঠ নির্মিত কাঠামো দ্বারা এই সুড়ঙ্গ ঠেকা দিয়া রাখা হইত। প্রাচীরের নীচে গহ্বর করিয়া প্রথম কাঠ দিয়া প্রাচীর ঠেকা দেওয়া হইত। তারপর ঐ কাঠে অগ্নিসংযোগ করিয়া লোক বাহির হইয়া আসিত। কাঠসহ স্তম্ভগুলি পুড়িয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রাচীর ভাঙ্গিয়া পড়িত।

ভ্রাতা জশরত তৈমুর কর্তৃক পরাস্ত হইয়া পালাইয়া প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন। মোগলদিগকে বাধাদানের জন্য শেইখা গোক্কর তাঁহাকে তিরস্কার করিয়াছিলেন। এই কথা শুনিতে পাইয়া তৈমুর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তদবধি শেইখা গোক্কর তৈমুরের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। পরে তৈমুরের অনুপস্থিতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া শেইখা গোক্কর লাহোর অধিকার করিয়াছিলেন এবং তৈমুর জামুগড় আসিবার পরও তিনি তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিতে থাকেন। এই কারণে লাহোর অবরোধের জন্য তৈমুর একদল সৈন্য প্রেরণ করেন (হিঃ ৮০১ : খ্রীঃ ১৩৯৭)। কয়েকদিনের মধ্যে লাহোর পুনরাধিকৃত হইল এবং শেইখা গোক্করকে বাঁধিয়া আনিয়া তৈমুরের সম্মুখে হাজির করা হইল। তৈমুর দর্শন মাত্র তাঁহার শিরোচ্ছেদের হুকুম দিলেন। জম্মুতে অবস্থান কালে তৈমুর খিজির খানকে লাহোর, মুলতান ও দিপালপুরের সুবাদার নিযুক্ত করিয়া কাবুলের পথে সমরকন্দ প্রত্যাবর্তন করেন।

তৈমুরের প্রস্থানের পর দুই মাস দিল্লীতে অরাজকতা বিরাজ করে এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারী তাহার সঙ্গে হাত মিলায়। তারপর নসরত শাহ্ মিরাট হইতে মাত্র ২,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ আসিয়া দিল্লীর মালিক হইয়া বসেন। আদিল খান তাহার সৈন্য ও চারিটি হস্তীসহ তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইলেন। পরে মেওয়াট হইতে শাহাব খান ও মালিক আলমাস তাঁহাদের সৈন্য ও ১০টি হাতী লইয়া আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন। দিল্লী হস্তগত করিবার পর নসরত শাহ শাহাব খানকে সসৈন্যে বিরানে মালু ইয়েকবালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মালু ইয়েকবাল বিরানেই বাস করিতেছিলেন। পথে মালু ইয়েকবালের পক্ষের জমিদাররা তাঁহাকে রাত্রিকালে আক্রমণ করে। শাহাব খান নিহত হন এবং তাঁহার সমস্ত মালপত্র শত্রু হস্তে পতিত হয়। এই সাফল্যের ফলে মালু ইয়েকবালের মর্যাদা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং তাহার দল স্ফীত হইতে থাকে এবং কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি নিজেকে রাজধানীতে হানা দেওয়ার উপযুক্ত মনে করিলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া নসরত শাহ মিরাটে ভাগিয়া গেলেন এবং মালু ইয়েকবাল খান বিধ্বস্ত শহরের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করিলেন। যেসব লোক ইতিপূর্বে শহর ছাড়িয়া পালাইয়া গিয়াছিল তাহারা গৃহে ফিরিতে লাগিল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই দিল্লী পুনরায় জনবহুল শহরের রূপ পরিগ্রহ করিল। নূতন শহর (দিল্লী) নামে পরিচিত এলাকায় লোকসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পাইল।

ইহার অল্পকাল পরেই মাল্লু ইয়েকবাল খান দোয়াব অঞ্চল অধিকার করিয়া লইলেন। এই অঞ্চল ও দিল্লীর আশে-পাশের ক্ষুদ্র এলাকার মধ্যেই দিল্লীর কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ রহিল। প্রদেশের শাসনকর্তারা আর দিল্লীর তোয়াক্কা রাখেন না। বিগত গৃহবিবাদের সময় তাঁহারা স্ব স্ব প্রদেশে তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছেন। মুজাফ্ফর খান গুজরাট, দিলওয়ার খান মালব এবং খান জাহান ওরফে শাহ্ শর্কী কনৌজ, অযোধ্যা, কারা ও জৌনপুর অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। খিজির খান লাহোর, মুলতান ও দিপালপুর; গালিব খান সামানা; শামস্ খান আহুদী বিয়ানা এবং মালিকজাদা ফিরোজের পুত্র মুহম্মদ খান কাল্পি ও মহোবায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ইহারা সকলেই নিজেকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া জাহির করিয়াছিলেন।

৮০৩ হিজরীতে (ডিসেম্বর ১৪০০ খ্রীঃ) জমাদি-উল-আউয়াল মাসে মাল্লু ইয়েকবাল খান একদল সৈন্য লইয়া দিল্লী হইতে বাহির হইয়া বিয়ানার পথে রওয়ানা হন। শাম্স্ খান যুদ্ধে পরাস্ত হয় এবং তাহার সৈন্যরা মাল্লু ইয়েকবালের পক্ষে যোগদান করে। মাল্লু ইয়েকবাল খান অতঃপর কাটিহার গমন করেন এবং নরসিংহ রায়ের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এই সময় তিনি খবর পাইলেন যে, জৌনপুরে খাজা জাহান ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার পোষ্য পুত্র মালিক ওয়াছিল, মুবারক শাহ উপাধি ধারণপূর্বক খাজা জাহানের আসনে উপবেশন করিয়াছেন। প্রয়োজনবোধে মাল্লু ইয়েকবাল খান বিয়ানার সুবাদার শাম্স্ খানের সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া ফেলিলেন এবং বাহাদুর নাহির মেওয়াটির পুত্র মুবারিককেও দলে ভিড়াইলেন। তারপর ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়া তিনি ওয়াছিলের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা গঙ্গাতীরবর্তী পাতিয়ালা গ্রামে পৌঁছিলে সেরিনগরের রাজা (বিলগ্রামের প্রাচীন নাম, তখন উহা একটি রাজ্য ছিল) সেই অঞ্চলের জমিদারের সঙ্গে মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে বাধাদান করেন। কিন্তু বহু হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে তিনি পরাজয় বরণ করিতে বাধ্য হন। এই অভিযানকালে মাল্লু ইয়েকবাল খান সন্দেহবশে শাম্স্ খান ও মুবারিক খানকে খুন করান।

৮০৪ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৪০১) ভূতপূর্ব সুলতান মাহমুদ তোগলক মুজাফ্ফর খানের আচরণে অসন্তুষ্ট হইয়া গুজরাট ত্যাগ করিয়া মালব চলিয়া আসেন। এতদিন তিনি মুজাফ্ফর শাহের রাজধানীতে বাস করিতেছিলেন। ইহার

কিছুকাল পরে মালু ইয়েকবাল খানের আমন্ত্রণে তিনি দিল্লী চলিয়া আসেন। দিল্লী আসিয়া একটা ভাতা গ্রহণ করিয়াই তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন—কারণ তিনি বুঝিয়াছিলেন, ক্ষমতার লোভ করা তাঁহার পক্ষে মারাত্মক হইবে। এই সময় মালিক ওয়াছিলের মৃত্যু সংবাদ দিল্লী আসিয়া পৌঁছিল—তিনি মুবারিক শাহ শর্কী নাম ধারণ করিয়া জৌনপুরের সুলতান হইয়াছিলেন। এই সংবাদ পাইয়া মালু ইয়েকবাল খান সুলতান মাহমুদ তোগলককে সঙ্গে করিয়া কনৌজের দিকে রওয়ানা হইলেন। মুবারিক শাহের ভ্রাতা ইব্রাহিম শাহ শর্কী তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। ইব্রাহীম জৌনপুর বাহিনী লইয়া আগাইয়া আসিলেন।

উভয় বাহিনী পরস্পরের মুখোমুখি শিবির স্থাপন করিল। এই সময় ভাগ্যাহত মাহমুদ তোগলকের প্রাণে এক নূতন আশার সঞ্চার হইল। তিনি ভাবিলেন, মালু ইয়েকবালের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইব্রাহীম শর্কী হয়তো তাঁহাকে দিল্লীর সুলতান রূপে মানিয়া লইতে পারেন এবং তিনি তাঁহার অধিকৃত প্রদেশগুলিতে স্বাধীন হইয়া সন্তুষ্ট থাকিবেন। এই আশা ও ধারণার বশবর্তী হইয়া মাহমুদ তোগলক শিকারে গমনের ছলে সেনাবাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সদলবলে ইব্রাহীম শর্কীর বাহিনীতে যাইয়া যোগদান করেন। ইব্রাহীম শর্কী পরে যখন তাঁহার অতিথির অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন তখন তাঁহার সহিত দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন ও তাঁহাকে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ বন্ধ করিয়া দিলেন এবং স্পষ্টতঃই তাঁহাকে শিবির ত্যাগ করিতে বলিলেন। অনোন্যপায় মাহমুদ নিঃস্ব অবস্থায় কনৌজে ফিরিয়া আসিলেন। মালু ইয়েকবাল তাঁহাকে কনৌজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। ইব্রাহীম শর্কীর পক্ষে যিনি কনৌজ শাসন করিতে-ছিলেন তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। ইব্রাহীম শর্কী এই অপমান বেমালুম হজম করিয়া গেলেন এবং মাহমুদ তোগলককে নির্বিবাদে কনৌজ অধিকার করিতে দিয়া নিজে জৌনপুর ফিরিয়া গেলেন। অপরপক্ষে মালু ইয়েকবাল খানও দিল্লী ফিরিয়া গেলেন।

৮০৫ হিজরীতে (১৪০২ খ্রীঃ) মালু ইয়েকবাল খান গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তৈমুরের ভারতাক্রমণকালে গোয়ালিয়র দুর্গ নরসিংহ রায়ের হস্তে পতিত হইয়াছিল। সম্প্রতি নরসিংহ রায়ের মৃত্যুতে তাঁহার পুত্র ব্রহ্মদেব গোয়ালিয়রের মালিক হইয়াছিলেন। গোয়ালিয়র দুর্গ চিরকাল দুর্ভেদ্য বলিয়া খ্যাত ছিল। তিনি বুঝিলেন, দুর্গ অধিকার করা তাঁহার সাধ্যাতীত। এই জন্য

তিনি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি লুণ্ঠন করিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। কিছুকাল পরে পুনরায় গোয়ালিয়র গমন করেন। ব্রহ্মদেব দুর্গের বাহিরে আসিয়া মালু ইয়েকবালকে আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া পুনরায় দুর্গে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। মালু ইয়েকবাল দুর্গ অবরোধ করিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিফল মনোরথ হইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চল ছারখার করিয়া মনের ঝাল মিটাইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন।

৮০৭ হিজরীতে (১৪০৪ খ্রী:) মালু ইয়েকবাল খান সসৈন্যে এটোয়ায় গমন করেন। সেখানে সেরিনগর, গোয়ালিয়র ও জালোরের রাজারা তাহাদের সম্মিলিত বাহিনী লইয়া তাহাকে বাধাদান করেন। মালু ইয়েকবাল তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তিকে পরাজিত করেন এবং প্রচুর অর্থ প্রদানের শর্তে তাহাদিগকে নিরাপদে ফিরিতে দেন। এই জয়লাভের পর কৃতজ্ঞতা ও ইন্‌সাফের কথা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া মালু ইয়েকবাল কনৌজে অবস্থানরত সুলতান মাহমুদের বিরুদ্ধে ধাবিত হইলেন। মাহমুদ তোরণদ্বার রুদ্ধ করিয়া শহরে রহিলেন। মালু ইয়েকবাল দুর্গ জয় করিতে অসমর্থ হইয়া অবরোধ ত্যাগ করিয়া ৮০৮ হিজরীর মহরম মাসে (জুন ১৪০৫ খ্রী:) সামানায় চলিয়া আসেন। ফিরোজ তোগলকের এক তুর্কী ক্রীতদাসের পুত্র বৈরাম খান বহুদিন যাবৎ সামানা দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। মালু ইয়েকবাল খানের আগমনে তিনি পাহাড়ে পালাইয়া গেলেন। মালু ইয়েকবাল খানও তাহার পশ্চাৎগমন করিতে লাগিলেন। এই সময় বিখ্যাত সৈয়দ জালাল বোখারীর পৌত্র আলম-উদ-দীন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে আপোষ নিষ্পত্তির জন্য মধ্যস্থতা করিতে আগাইয়া আসেন এবং তাঁহার প্রচেষ্টায় তাঁহাদের মধ্যে শত্রুতার অবসান হয়। অতঃপর উভয়পক্ষ তাঁহাদের সৈন্যদল একত্রিত করিয়া খিজির খানের বিরুদ্ধে মুলতানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তুলুম্বায় রায় দাউদ[৪], কামাল খান মাঈ এবং রায় রত্তির পুত্র রায় হাবু প্রমুখ উত্তরাঞ্চলের সর্দাররা তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হন। আজুধনের নিকটবর্তী হইলে খিজির খান মুলতান, পাঞ্জাব ও দিপালপুরের সৈন্য লইয়া মালু ইয়েকবালকে বাধাদান করিলেন। হিজরী ৮০৮-এর জমাদি-উল-আউয়াল (নভেম্বর ১৮, ১৪০৫ খ্রী:) দুই বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। যুদ্ধে মালু ইয়েকবাল খান নিহত হইলেন।

---

৪ কি প্রকারে হিন্দু ও মুসলমান নামের সংমিশ্রণ ঘটিল তাহা আমি উদ্‌ঘাটন করিতে পারি নাই।

দিল্লীর আমীরদের মধ্যে দৌলৎখান লোদী ও ইয়েকতিয়ার খান এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া কনৌজে মাহমুদ তোগলককে সিংহাসন গ্রহণের আমন্ত্রণ জানাইলেন। মাহমুদ তোগলক সামান্য কয়েকজন অনুচরসহ দিল্লী আসিয়া তখ্‌তে উপবেশন করিলেন। তিনি মুলতান পুনরুদ্ধারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করাই স্থির করিলেন এবং দৌলৎ খানকে একদল সৈন্যসহ সামানায় বৈরাম খানের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইতিমধ্যে সুলতান নিজে কনৌজে গমন করিলেন। ইব্রাহীম শাহ্ শর্কীও কনৌজ পুনরুদ্ধারের জন্য আগাইয়া আসিলেন এবং সামান্য সংঘর্ষের পর মাহমুদকে দিল্লী অভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য করেন। পথে মাহমুদক তোগলক নির্বোধের মত নিজের দুর্ব্যবহার দ্বারা সৈন্যদের সহানুভূতি হারাইয়াছিলেন এবং সৈন্যরা তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল। এই সংবাদ শুনিয়া ইব্রাহিম শাহ্ শর্কী গঙ্গা অতিক্রম করিয়া দিল্লীর দিকে ছুটিলেন কিন্তু তিনি যমুনার তীর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, গুজরাটের মুজাফ্‌ফর শাহ্ আলপ্‌ খানকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়াছেন এবং মালব অধিকারের পর জৌনপুরের দিকে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়া নিজের ঘর সামলাইবার জন্য তাঁহাকে জৌনপুর ফিরিতে হইল।

৮১০ হিজরীর রজব মাসে (ডিসেম্বর ১৪০৭ খ্রীঃ) দৌলৎ খান লোদী ও বৈরাম খান সামানীর মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। বৈরাম খান পরাস্ত হইয়া স্বেচ্ছায় দৌলৎ খান লোদীর নিকট আত্মসমর্পণ করেন। কিন্তু অল্পকাল পরেই এই অঞ্চল খিজির খানের করায়ত্ত হয়।

এই বৎসর (হিঃ ৮১০) জিলকদ মাসে (এপ্রিল ১৪০৮ খ্রীঃ) মাহমুদ তোগলক বিরানের শাসনকর্তা মালিক মীর জিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। মালিক মীর জিয়া ইব্রাহীম শাহ্ শর্কীর পক্ষে বিরান শাসন করিতেছিলেন। মালিক মীর বাহিরে আসিয়া সুলতানকে বাধাদান করিলেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া শহরের মধ্যে হটিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। সুলতানী সৈন্যদলও উহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া এক সঙ্গেই শহরে ঢুকিয়া পড়িল। যুদ্ধে মালিক মীর প্রাণ হারাইলেন। সুলতান অতঃপর বিরান ত্যাগ করিয়া সম্বল চলিয়া যান। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া তাতার খান পালাইয়া কনৌজ পৌঁছেন। আসাদ খান লোদীকে সম্বলে রাখিয়া সুলতান দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ৮১১ হিজরীতে (১৪০৮ খ্রীঃ) মাহমুদ তোগলক কোয়াম খানের বিরুদ্ধে গমন করেন। কোয়াম

দিল্লীর সুলতানদের চতুর্থ বংশ

সৈয়দ বংশ

সৈয়দ খিজির খান—সৈয়দ মুবারিক—সৈয়দ মুহাম্মদ - সৈয়দ আলা-উদ-দীন

সৈয়দ খিজির খান

[তাঁহার বংশ পরিচয়। সুলতানাতের দায়িত্ব গ্রহণ, তবে সুলতান উপাধি গ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি। উজির-সভা গঠন। তৈমুরের নামে খোত্‌বা পড়াইবার ও মুদ্রা ছাপাইবার ব্যবস্থাকরণ। দিল্লীর প্রভুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা। দোয়াবের অধিকাংশ স্থান পুনরুদ্ধার। সারহিন্দের শাসনকর্তা নিহত এবং জনৈক মালিক তোগান তুর্কের শাসন ক্ষমতা দখল। মন্ত্রী জিরাক খান কর্তৃক তাঁহাকে বহিষ্কৃত। খিজির খানের বিয়ানার পথে গোয়ালিয়র গমন। মালিক তোগানের সারহিন্দ আক্রমণে আগমন। তাঁহাকে হটাইয়া দেওয়া এবং তাঁহার পলায়ন। পরে ধৃত হইয়া খেসারত দিতে বাধ্য। তোগানকে কালিন্দর অধিকারে রাখিবার অনুমতি প্রদান। খিজির খানের কাটিহারের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ। এক প্রতারক কর্তৃক ইয়েকবাল খানের পরলোকগত ভ্রাতা সারং খানের নাম গ্রহণ করিয়া সৈন্য সংগ্রহ। তাঁহার পরাজয় এবং মালিক তোগানের সঙ্গে যোগদান। মালিক তোগান কর্তৃক তাঁহার দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন। সম্পদের লোভে মালিক তোগান কর্তৃক তাহাকে হত্যা। মালিক তোগান কর্তৃক সারহিন্দ লুণ্ঠিত। মালিক তোগান পরাস্ত ও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত। খিজির খানের অসুস্থতা এবং মৃত্যু। তাঁহার চরিত্র। জনসাধারণের শ্রদ্ধার নিদর্শন।]

তাবকাতে মাহমুদ শাহী ও তারিখ-ই-মুবারিক শাহীর রচয়িতা—উভয়েই খিজিরকে (হিঃ ৮১৭ খ্রীঃ ১৪১৪) রসুলুল্লার বংশধর মনে করিয়া তাঁহাকে সৈয়দ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহার পিতা মালিক সুলেমান একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ফিরোজ তোগলকের রাজত্বকালের অন্যতম খ্যাতনামা আমীর মুলতানের শাসনকর্তা মালিক মর্দান দৌলতের পোষ্যপুত্র ছিলেন। মালিক মর্দান দৌলতের মৃত্যুর পর তাঁহার আপন পুত্র মালিক শেখ পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর মালিক সুলেমান যিনি নিজেকে সৈয়দ বলিয়া পরিচয় দিতেন—তিনি মুলতানের শাসনকর্তা নির্বাচিত হন। তাঁহার পুত্র খিজির খান উত্তরাধিকার সূত্রে এই আসন প্রাপ্ত হন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি

যে, সারং খান কর্তৃক পরাস্ত ও সুবা হইতে বহিষ্কৃত হইবার পর খিজির খান দিল্লী বিজয়ের অব্যবহিত পরেই তৈমুরের সঙ্গে মোলাকাত করেন এবং তাঁহারই অনুগ্রহে তাঁহার পূর্ব সুবায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হন। তৈমুর তাঁহার মূল সুবার সঙ্গে পাঞ্জাব ও দিপালপুর সংযুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে ক্ষমতা লাভ করিয়া পরে তিনি স্বীয় ক্ষমতাবলে সিংহাসন অধিকার করিতে সমর্থ হন।

খিজির খান যে রসূলুল্লার বংশধর সে সম্পর্কে তারিখ-ই-মুবারিক শাহীর লেখক যে দুইটি শক্তিশালী প্রমাণ (তাঁহার মতে) খাড়া করিয়াছেন তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা সমীচীন মনে করি। প্রথম প্রমাণস্বরূপ লেখক বলিয়াছেন, "একবার মালিক মর্দান দৌলৎ খান জালাল বোখারীকে ভোজদান করিয়াছিলেন। সেই ভোজে খিজির খানের পিতা, মালিক সুলেমান অন্যান্য ভৃত্যের মতই কাজকর্ম করিতেছিলেন এবং একটা কলম ও বাটি লইয়া অতিথির সম্মুখে হাজির হইয়াছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া জালাল বোখারী মালিক মর্দানকে বলিয়াছিলেন, আপনি কেন এই সুদর্শন সৈয়দ যুবককে সামান্য কর্মে নিযুক্ত করিয়াছেন? সেই শ্রদ্ধাস্পদ পবিত্রাত্মা দরবেশের মুখ নিঃসৃত এই মন্তব্যের পর সেই যুবক যে সত্যই সৈয়দ সে সম্পর্কে কাহারও মনে সন্দেহ থাকা উচিৎ নয়।" দ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ লেখক বলিয়াছেন, "খিজির খানের চরিত্র, বদান্যতা, সাহস, করুণা, উদারতা, ধর্মজ্ঞান, কৃচ্ছসাধনা, সত্যবাদিতা প্রভৃতি গুণাবলীর আধিক্য লক্ষ্য করিলে তাঁহাকে রসূলের বংশধর ছাড়া আর কিছু মনে হইতেই পারে না।" খিজিরের উচ্চ বংশে জন্ম সম্পর্কে তারিখ-ই-মুবারিক শাহীর লেখকের বক্তব্য আমরা বলিলাম। এইবার খিজির খান সম্পর্কে আমাদের যাহা জানা দরকার তাহা বর্ণনা করা হইতেছে। সিংহাসনাধিকারের পর খিজির খান মালিক তোহ্‌ফা ওরফে তাজ-উল-মুলক্‌কে উজির মনোনীত করেন এবং তাঁহার পিতা মালিক সুলেমানের পোষ্যপুত্র আব্‌দ্‌-উল-রহিমকে উচ্চ মর্যাদা প্রদান করেন। তিনি তাহাকে ফতেহপুর ও মুলতানের শাসনভার অর্পণ করেন এবং তৎসহ মালিক আলা-উল-মুলক্‌ উপাধি প্রদান করেন। কিন্তু যে স্থলে তিনি নিজের কর্মচারীদের মধ্যে উপাধি বণ্টন করিলেন, সে স্থলে নিজে শাহী উপাধি গ্রহণ করিতে নারাজ হইলেন এবং তিনি সকলকে জানাইলেন যে, তৈমুরের পক্ষেই তিনি শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি তৈমুরের নামে মুদ্রা ছাপাইলেন এবং মস্‌জিদে খোত্‌বা পাঠ করিবার হুকুম দিলেন। তৈমুরের ইন্তেকালের পর তাঁহার উত্তরাধিকারী

শাহ্রুখ মির্জার নামে খোত্‌বা পড়ান। তিনি সময় সময় তাঁহার রাজধানী সমরকন্দে রাজস্বও পাঠাইয়াছেন।[১] তাঁহার হুকুমতের প্রথম বৎসরে তিনি মালিক তোহ্‌ফাকে এক সৈন্যবাহিনীসহ কাটিহার প্রেরণ করেন। কাটিহার অধিকৃত হয়। নরসিংহ রায়কে পাহাড়ে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হয়। পরে ক্ষতিপূরণ দান করিলে তাহাকে নিজ দেশে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই সময় বাদায়ুনের শাসনকর্তা মহাবত খানও মালিক তোহ্‌ফার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন। অতঃপর উজির গানপুর, কাম্‌পিলা ও চান্দোয়ায় গমন করিয়া তথাকার কয়েক বৎসরের বকেয়া রাজস্ব আদায় করেন এবং চান্দোয়ারের রাজপুতদের হাত হইতে জলেশ্বর পুনরুদ্ধার করেন। ইহার পর এটোয়া অধিকার করিয়া তিনি দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। ৮১৭ হিজরী জমাদি-উল-আউয়াল মাসে সারহিন্দের শাসনকর্তা মালিক লাধু, বৈরাম খান নিয়োজিত একদল তুর্কী কর্তৃক নিহত হন এবং ঐ তুর্কীরা সারহিন্দ অধিকার করিয়া লয়। খিজির খান তখন জিরাক খান ও মালিক দাউদকে এক সৈন্যবাহিনীসহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। উহাদের আগমনের সংবাদ পাইয়া তুর্কীরা শতদ্রু পার হইয়া পাহাড়ে পালাইয়া যায়। জিরাক খান তাহাদের পিছু ছাড়িলেন না। কিন্তু ঐ পাহাড়গুলি নগরকোট পাহাড়ের অংশ এবং উহা কতকগুলি স্বাধীন জমিদারের দখলে ছিল। এই জমিদাররা তুর্কীদিগকে সাহায্য করিত। এইজন্য জিরাক খান উহাদের বিরুদ্ধে কিছুই করিতে না পারিয়া শেষ পর্যন্ত সৈন্যদল ফিরাইয়া আনিতে বাধ্য হইলেন।

৮১৯ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৪১৬) গুজরাটের সুলতান আহমদ শাহ বাগোর পর্যন্ত আগাইয়া আসেন। খিজির খান তাঁহাকে বাধাদানের জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। গুজরাটের সুলতান মালবের দিকে পশ্চাদাপসরণ করিলেন। খিজির খান জালোর[২] পৌঁছিলে নূতন শহরের শাসনকর্তা ইলিয়াস খান (এই শহরের প্রতিষ্ঠাতা আলা-উদ-দীন খিলজী ইহার নাম দিয়াছিলেন 'বিশ্বের বধূ') তাহার

১ খিজির খান কেন যে শাহী উপাধি ধারণ করেন নাই তাহা বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন নয়। এই ব্যবস্থা দ্বারা তিনি ভূতপূর্ব রাজবংশের সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ঈর্ষার পথ রুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাহাদের আনুগত্য স্বীকারের পথে যে অন্তরায় ছিল তাহাও দূর করিয়াছিলেন।

২ আসল নাম সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। বিভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে বিভিন্ন রকমে লেখা আছে।

সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সেখান হইতে খিজির খান গোয়ালিয়র গমন করেন এবং রাজার নিকট হইতে কর আদায় করেন। অতঃপর তিনি বিয়ানার পথে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হন। শাম্‌স্ খান আহদীর ভ্রাতা করিম-উল-মুল্‌ক তখন উত্তরাধিকারী হিসাবে বিয়ানা শাসন করিতেছিলেন। খিজির খান তাঁহার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন করেন।

৮২০ হিজরী (১৪১৭ খ্রী:) মালিক লাধুকে হত্যাকারী তুর্কীদের সর্দার মালিক তোগান এক বিরাট বাহিনী লইয়া সারহিন্দ বেষ্টন করে। সামানার শাসনকর্তা জিরাক খানকে পুনরায় তাহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করা হইল। তোগান পাহাড়ে পালাইয়া গেল। কিন্তু পাইল্ গ্রামে সে জিরাকের হাতে ধৃত হইয়া প্রচুর ক্ষতি-পূরণদানে বাধ্য হইল। তদুপরি ভবিষ্যৎ সদাচারণের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাহার পুত্রকে জামিন রাখিতে হয় এবং লাধুর খুনীকে শিবির হইতে বাহির করিয়া দিতে হয়। এই ব্যবস্থার পর তোগানকে জলন্দরের জমিদারী রাখিবার অনুমতি প্রদান করিয়া তিনি সামানায় চলিয়া আসেন। মালিক তোগানের পুত্রও তাহার নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থ দরবারে পাঠাইয়া দেন।

৮২১ হিজরী (১৪১৮ খ্রী:) খিজির খান কাটিহারের রাজাকে দমন করিবার জন্য উজিরকে প্রেরণ করেন। তিনি কাটিহার অঞ্চল লুণ্ঠন ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইয়া বাদায়ুন চলিয়া আসেন। এটোয়া নামক স্থানে তিনি নদী পার হইবার কালে ঐ স্থানের উপর করধার্য করিয়া দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। পরে খিজির খান স্বয়ং কাটিহারের বিরুদ্ধে রওয়ানা হন। পথে কোলেতে একদল দুর্ধর্ষ ডাকাতকে পরাস্ত ও পর্যুদস্ত করেন। অতঃপর তিনি গঙ্গা পার হইয়া সম্বল ও কাটিহার অঞ্চলে প্রবেশ করেন এবং লুঠতরাজ ও অগ্নিকাণ্ড দ্বারা দেশ ছারখার করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন। দিল্লীতে কয়েকদিন বিশ্রাম গ্রহণের পর খিজির খান বাদয়ুন অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহার আগমন বার্তা পাইয়া আতঙ্কগ্রস্ত বাদায়ুনের শাসনকর্তা মহাবত খান দুর্গের তোরণ বন্ধ করিয়া দেন। খিজির খান ছয় মাস যাবৎ দুর্গটি অবরোধ করিয়া রহিলেন। এই অবরোধ কালে খিজির খান আবিষ্কার করেন যে, কোয়াম খান, ইয়েকতিয়ার খান এবং ভূতপূর্ব মাহমুদ তোগলকের আরও কয়েকজন বন্ধু তাঁহার প্রাণনাশের চক্রান্ত করিয়াছে। এমতাবস্থায় সেখানে বহু দিন অবস্থান করা নিরাপদ মনে করিলেন না এবং অবরোধ উঠাইয়া দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। দিল্লীতে ২০শে জমাদি-উল-আউয়াল

৮২২ (জুলাই ১৮ ১৪১৯, খ্রীঃ) তিনি ষড়যন্ত্রকারীদিগকে সমবেত করিয়া প্রাসাদ রক্ষী সৈন্যদিগকে তাহাদের উপর লেলাইয়া দিলেন। উহারা সকলকে হত্যা করিল।

প্রায় এই সময়েই সুলতান অবগত হইলেন যে, মচিওয়ারার নিকটে এক প্রতারক নিজেকে সারং খান বলিয়া জাহির করিয়া একদল বিদ্রোহীকে দলে ভিড়াইয়াছে। কিন্তু সকলেই জানিত যে, তৈমুরের আক্রমণের সময় সারং খান মারা গিয়াছেন। খিজির খান এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য সারহিন্দের তদানীন্তন শাসনকর্তা মালিক সুলতান শাহ লোদীকে (উপাধি ইসলাম খান) প্রতারকের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। সে পরাস্ত হইয়া জঙ্গলে পালাইয়া গেল। জলন্দরের সুবাদার মালিক তোগান, সামানার সুবাদার জিরাক খান ও দোয়াবের সুবাদার মালিক খয়ের-উদ-দীনের সেনাদল তাহাকে অনুসরণ করিল। প্রতারকের সৈন্যরা শীঘ্রই তাহাকে গোপনে ত্যাগ করিয়া স্ব স্ব গৃহে চলিয়া গেল। দিল্লীর সেনাদল তাহার সন্ধান না পাইয়া ফিরিয়া আসিল এবং সুবাদাররা স্ব স্ব সুবায় চলিয়া গেলেন। মালিক তোগান পুনরায় বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং পর বৎসর সেই প্রতারক পুনরায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করে। প্রতারকের নিকট প্রচুর ধনরত্ন ছিল। ইহা জানিতে পারিয়া তোগান তাহাকে খুন করান। তোগান অতঃপর সারহিন্দ গমন করিয়া মনসুরপুর ও পাইল অঞ্চলে লুঠতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কার্য চালান। দিল্লীর সেনাবাহিনী তোগানের অনুচরদিগকে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত ও রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন।

৮২৪ হিজরীতে (১৪২১ খ্রীঃ) খিজির খান কোট্‌লার দুর্গ অধিকার ও ধ্বংস করিয়া মেওয়াটের দিকে অগ্রসর হইলেন। এই বৎসর উজির মারা যান এবং সেই পদে তাঁহার পুত্র মালিক সিকান্দর তোহ্‌ফাকে নিযুক্ত করা হয়। কোট্‌লা হইতে খিজির খান গোয়ালিয়র অভিমুখে রওয়ানা হন। সেখানে কর আদায় করিয়া তিনি আটোয়ায় ফিরিয়া আসেন এবং সেখানে সমর রায়ের পুত্রের নিকট হইতে কর আদায় করেন। এই অভিযানকালে খিজির খান অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং সত্বর দিল্লী ফিরিয়া আসেন ৮২৪ হিজরী ১৭ই জমাদি-উল-আউয়াল (১৪২১ খ্রীঃ ২০শে মে) সাত বৎসর কয়েক মাস রাজত্বের পর তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন।

খিজির খান সে যুগের অন্যতম ন্যায়পরায়ণ মহানুভব ও দানশীল নরপতি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে প্রজারা শোকে মুহ্যমান হইয়াছিল। তাঁহার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য দিল্লীর অধিবাসীরা তিনদিন যাবৎ কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরিধান করিয়াছিল[৩]।

ইহার পর আমীর ও ওমরাহগণ একত্রিত হইয়া খিজির খানের পুত্র মুবারিককে[৪] সিংহাসন প্রদান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

---

৩ ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে মুসলমানরা শোকবস্ত্র হিসাবে কৃষ্ণবর্ণ পোশাক পরিধান করিত।

৪ খিজির খানের সুলতান উপাধি গ্রহণ না করা এবং ওমরাহদের মুবারিককে সিংহাসনে বসাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া প্রমাণ করে তখনকার দিনে ওমরাহ-গণ কতটা শক্তিশালী ছিল এবং রাজারা কিরূপ অনিশ্চিত ক্ষমতার অধিকারী ছিল।

সৈয়দ মুবারিক

[সৈয়দ মুবারিকের পিতার আসনে অধিষ্ঠিত। পাঞ্জাবে বিদ্রোহ দমন। উজির সুবাদার নিযুক্ত হন। সরওয়ার-উল-মুল্‌ক্ উজির নির্বাচিত। পাঞ্জাবে নূতন করিয়া বিদ্রোহ। মালবের রাজার দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা এবং গোয়ালিয়র অধিকার। পরে পশ্চাদাপসরণ। মেওয়াটের বিদ্রোহ দমন। সুলতানের বিয়ানা গমন। জৌনপুরের সুলতান কালপীর শাসককে সাহায্য — তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ। দিল্লীর সুলতান কর্তৃক কালপীর শাসককে সাহায্য। বিয়ানা, মেওয়াট ও সারহিন্দের শাসনকর্তাদের দিল্লী সরকারের আনুগত্য অস্বীকার। বিয়ানা ও মেওয়াটকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্যকরণ। সারহিন্দের শাসনকর্তার কাবুলে অবস্থানকারী মোগলদের সাহায্য প্রার্থনা। দিল্লীর সুলতানের সারহিন্দ ত্যাগ করিয়া দিল্লী প্রত্যাগমন। মোগলদিগকে আক্রমণ করিয়া বিতাড়িতকরণ। পাঞ্জাবে পুনরায় বিদ্রোহ এবং সুলতানের সুবাদার বন্দী। সুলতানের স্বয়ং পাঞ্জাব গমন করিয়া উহা পুনরুদ্ধার। সুলতান কর্তৃক নূতন সুবাদার নিযুক্তি। মোগল ও গোক্করদের লাহোর অধিকার। মালিক সিকান্দরকে সিপাহসালার নিযুক্তি। মোগল ও গোক্করদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাঁহার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন। মন্ত্রীর প্রতি সুলতানের ঈর্ষা। উজির সুলতানের ভয়ে তাঁহাকে খুন করান।]

রোগের লক্ষণ দেখিয়া খিজির খান যখন বলিলেন যে, তাঁহার বাঁচিবার কোন আশা নাই তখন তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। তদনুযায়ী পিতার মৃত্যুর তিন দিন পরে মুবারিক সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং মুইজ-উদ-দীন আবুল ফাতাহ্ মুবারিক উপাধি ধারণ করেন। তিনি তাঁহার চাচাতো ভাই মালিক বদরকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করেন এবং মালিক রজবকে দিপালপুর ও পাঞ্জাবের সুবাদার নিযুক্ত করেন।

৮২৪ হিজরীর জমাদি-উল-আউয়াল (মে, ১৪২২ খ্রী:) মাসে মুবারিক সংবাদ পাইলেন যে, শেইখা গোক্করের ভ্রাতা জসরত খান দিল্লীর সিংহাসন লাভের মতলব আঁটিয়াছেন। এই জসরত খান গত বৎসর থাট্টার অভিযান হইতে ফিরিয়া কাশ্মীরের সুলতান আলীশাহকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়াছিলেন। এই সাফল্যে স্ফীত হইয়া তিনি দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে জসরত গোক্কর মালিক তোগানকে তাঁহার সহিত যোগদান

করিবার আমন্ত্রণ জানাইলেন—যে মালিক তোগান ইতিপূর্বে পাহাড়ে পালাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিল। জসরত তোগানকে তাঁহার সেনাবাহিনীর আমীর-উল-ওমরাহ্ বা প্রধান সেনাধ্যক্ষের দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। তাঁহারা প্রথমে পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং লাহোর অধিকার করিলেন। তারপর তাঁহারা জলন্দরে সুবাদার জিরাক খানকে বন্দী করিলেন ও তাঁহার সুবা অধিকার করিলেন। অতঃপর তাহারা সারহিন্দের দুর্গে ইসলাম খানকে অবরুদ্ধ করিলেন। প্রবল বারিপাত উপেক্ষা করিয়া সৈয়দ মুবারিক দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন। কিন্তু সারহিন্দ পৌঁছিয়া তিনি শুনিলেন যে, জসরত গোক্কর অবরোধ উঠাইয়া লোধানায় পালাইয়া গিয়াছেন। জিরাক খান কৌশলে পালাইয়া সারহিন্দে সুলতানের সঙ্গে যোগদান করেন। দিল্লীর ফৌজ অতঃপর লোধানার দিকে অগ্রসর হইল। সেখানে যাইয়া তাহারা দেখিল যে, জসরত নদীর অপর পাড়ে ছাউনী ফেলিয়া অবস্থান করিতেছে। জসরত তথাকার সমস্ত নৌকা হস্তগত করিয়াছিলেন। সুতরাং পানি কমিয়া নদী পারাপারের উপযোগী না হওয়া পর্যন্ত সুলতান কাব্বুলপুরে অবস্থান করিবেন স্থির করিলেন। ১১ই শাওয়াল (৮২৪ হিঃ ১৪২১ খ্রীঃ ৮ই অক্টোবর) মালিক সিকান্দর (উজির) জিরাক খান, মাহমুদ হাসান, মালিক কালু ও অন্যান্য সেনাপতিরা নদী পার হইল। সুলতান নিজে যখন প্রধান বাহিনী লইয়া নদী পার হইলেন তখন জসরত গোক্কর ও তাঁহার সৈন্যরা ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। সুলতানের ফৌজ পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদের বিপুল সংখ্যক সৈন্যকে হত্যা করিল এবং তাহাদের সমস্ত মাল-পত্র হস্তগত করিল।

এই পরাজয়ের পর জসরত চেনাব পার হইয়া পার্বত্যাঞ্চলে বিস্‌ল নামক এক সুদৃঢ় দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। জম্মুর রাজা ভীম রায় সুলতানী ফৌজকে সেই দুর্গে পৌঁছিবার পথনির্দেশ করেন। সুলতানী ফৌজ সেখানে পৌঁছিলে জসরত গোক্কর দুর্গ ত্যাগ করিয়া পুনরায় পলায়ন করিলেন। পলায়ন-কালে পশ্চাদ্ধাবনকারী দিল্লী ফৌজের হস্তে জসরতের বহু লোক নিহত হইল। অতঃপর মহরম মাসে (৮২৫ হিঃ; জানুয়ারী ১৪২২ খ্রীঃ) সুলতান লাহোর দুর্গ ও তথাকার প্রাসাদাদি মেরামত করিবার আদেশ প্রদান করিয়া ও মাহমুদ হাসানকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। রাজধানীতে পৌঁছিয়াই তিনি শুনিতে পাইলেন যে, জসরত তাহার বিক্ষিপ্ত সৈন্যদিগকে

একত্রিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং পাঁচমাস যাবৎ লাহোর দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিয়াছেন। যাহা হউক শেষ পর্যন্ত ব্যর্থমনোরথ হইয়া তিনি অবরোধ উঠাইয়া কালানুর চলিয়া যান এবং জম্মুর রাজা ভীম রায়কে আক্রমণ করেন। ভীম রায় সুলতানী ফৌজকে তাহার পার্বত্য দুর্গের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন—সেই আক্রোশেই জসরত তাঁহাকে আক্রমণ করেন। কিন্তু বিশেষ সুবিধা করিতে না পারিয়া সৈন্যদিগকে সতেজ করিবার ও নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিবার জন্য জসরত বিয়াস নদীর অপর পাড়ে চলিয়া গেলেন। ইত্যবসরে উজির মালিক সিকান্দর লাহোরের সাহায্যার্থে তথায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দিপালপুরের মালিক রজব ও সারহিন্দের সুবাদার ইসলাম খান তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিলেন। এই সম্মিলিত বাহিনী লইয়া উজির জসরতের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং জসরতকে রাভি ও চেনাব পার হইয়া পুনরায় পর্বতে আশ্রয় লইতে বাধ্য করিলেন। দিল্লীর ফৌজ জম্মু সীমান্তে পৌঁছিলে ভীম রায় তাঁহাদের সঙ্গে যোগদান করেন। ভীম রায় দিল্লীর সৈন্যদিগকে পথপ্রদর্শন করিয়া লইয়া যান। এবং তাঁহার সাহায্যে দিল্লীর ফৌজ আত্মগোপনকারী গোক্করের আস্তানা খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহাদিগকে হত্যা করে। অতঃপর উজির লাহোর ফিরিয়া আসেন।

তাহার এই সাফল্যে মুগ্ধ হইয়া সুলতান, উজির মালিক সিকান্দরকে লাহোরের সুবাদারের পদ প্রদান করিলেন এবং মাহমুদ হাসানকে ডাকিয়া পাঠান। ৮২৬ হিজরীতে (১৪২২ খ্রীঃ) সুলতান মালিক সিকান্দরকে উজিরের পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া সরওয়ারুল মুল্‌ককে উক্ত পদ প্রদান করেন। কাটিহারের হিন্দুদিগকে প্রচলিত কর প্রদানে বাধ্য করিবার জন্য সুলতান সরওয়ার-উল-মুল্‌ক্‌কে এক সেনাবাহিনী সহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। এই সময় সুলতান বাদায়ুনের শাসনকর্তা মহাবত খানের সঙ্গে আপোষ করিয়া ফেলেন এবং রাটোর রাজপুতদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাইবার দায়িত্ব তাহার উপর ন্যস্ত করেন। তিনি উহাদের দেশ লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের কয়েকজনকে বন্দী করেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া আটোয়ার রাজা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়েন এবং আকস্মিকভাবে সুলতানের শিবির ত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। সুলতান তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাঁহাকে আটোয়ায় অবরোধ করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁহার সঙ্গে একটা চুক্তি সম্পাদিত হয়।

ভবিষ্যৎ সদ্ব্যবহারের জামিনস্বরূপ রাজা তাঁহার পুত্রকে সুলতানের হস্তে অর্পণ করেন। সুলতান অতঃপর দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এই সময় মাহমুদ হাসানকে সেনাবাহিনীর বখ্‌শীর পদ প্রদান করা হয়—এই পদ তৎকালে আরিজি নামে অভিহিত ছিল। পুনঃপুনঃ ভাগ্যবিপর্যয়ে হতোদ্যম না হইয়া জসরত গোক্কর পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি জম্মুর ভীম রায়কে পরাস্ত ও নিহত করিলেন এবং প্রায় ১২,০০০ গোক্করকে লইয়া এক সেনাবাহিনী গঠন করিয়া পুনরায় দিল্লী সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তিনি লাহোর ও দিপালপুর প্রদেশ লুণ্ঠন ও ছারখার করিয়া বিপুল পরিমাণ ধনসম্পদ লাভ করিলেন। সুবাদার মালিক সিকান্দর তোহ্‌ফা তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। জসরত যুদ্ধে লিপ্ত না হইয়া লুণ্ঠিত দ্রব্যাদিসহ জঙ্গলে গা-ঢাকা দিলেন এবং আর একটি অভিযানের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে জসরত গোক্কর কাবুলে নিযুক্ত শাহ্‌রুখ মির্জার শাসনকর্তা শেখ আলীর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করিলেন এবং তাঁহাকে সিস্তান, ভাকার ও থাট্টা অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করিতে রাজী করাইলেন। জসরত মনে করিলেন মোগলবাহিনী সিন্ধু অঞ্চলে প্রবেশ করিলে স্বাভাবিকভাবেই দিল্লীর মনোযোগ সেই দিকেই আকৃষ্ট হইবে এবং দিল্লীর ফৌজ সেই অঞ্চলে মোগলাক্রমণ প্রতিহত করিতে গেলে জসরত গোক্করের দিল্লী আক্রমণের পথ প্রশস্ত হইবে। আমির শেখ আলী যখন সিন্ধুর এলাকায় প্রবেশ করে ঠিক সেই সময় সুবাদার মালিক আলা-উল-মুল্‌ক ইন্তেকাল করেন। সুলতান তখন মালিক মাহ্‌মুদ হাসানকে সুলতানের সৈন্যসহ তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মালবের অধিপতি সুলতান হুসাং এই সময়েই গোয়ালিয়র অবরোধ করেন। ইহাতে সুলতানকে সমস্ত ফৌজ যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে হইল। সুলতান স্বয়ং মালবের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পথে বিয়ানার শাসনকর্তা আসির-খান-বিন-ওয়াহ্‌দের নিকট হইতে অর্থ আদায় করেন।

মালবের সুলতান হুসাং চাম্বলের সুপরিচিত পারঘাটাগুলি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। সুলতান নদীর অন্য এক অগভীর অংশের সন্ধান পাইয়া সেই স্থানে নদী পার হইয়া হুসাংকে তাঁহার শিবিরে আক্রমণ করিয়া সম্পূর্ণ পরাজিত করিলেন। বহু লোক বন্দী হইল এবং তাহাদের সরঞ্জামাদির কতকাংশ সুলতানের হস্তগত হইল। বন্দীরা সকলেই মুসলমান বলিয়া তাহা-দিগকে মুক্তিদান করা হইল। সুলতান হুসাং দেখিলেন যে, দিল্লীর সুলতানকে

কিছু অর্থ প্রদান করিয়া তাহার সঙ্গে বিবাদ মিটাইয়া ফেলাই যুক্তিসঙ্গত। সুলতান তাঁহাকে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরিয়া যাইতে দিলেন। দিল্লীর সুলতান অতঃপর গোয়ালিয়রের পার্শ্ববর্তী হিন্দু রাজাদের নিকট হইতে কর আদায়ের নিমিত্ত কিছুকাল গোয়ালিয়রের নিকট অবস্থান করেন। তারপর ৮২৭ হিজরী রজব মাসে (জুন, ১৪২৩ খ্রী:) রাজধানীতে ফিরিয়া আসেন।

পর বৎসর সুলতান কাটিহার অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সেখানে নরসিংহ রায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্য গঙ্গার তীর পর্যন্ত আগাইয়া আসেন। নরসিংহ রায় পূর্ববর্তী তিন বৎসরের রাজস্ব বাকী রাখিয়াছিলেন। সেই অপরাধে তাহাকে শিবিরে আটক করা হয় এবং সমস্ত বকেয়া কর চুকাইয়া দেওয়ার পর তাঁহাকে মুক্তিদান করা হয়। সুলতান গঙ্গার পরপারে কতকগুলি অবাধ্য করদ রাজাকে বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়া দিল্লী ফিরিয়া আসেন। দিল্লীতে অল্প কয়েকদিন অবস্থানের পরই তিনি মেওয়াটের দিকে রওয়ানা হইলেন। তিনি কতকগুলি বিদ্রোহীকে মেওয়াট হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদের অঞ্চলে কিছু ধ্বংসাত্মক ও লুণ্ঠন কার্য চালাইবার পর দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় তিনি তাহার সেনাপতিদিগকে তাঁহাদের স্বস্ব সুবায় ফিরিয়া যাইবার অনুমতি দান করেন। তারপর তিনি ইন্দ্রিয় সুখভোগে আত্মনিয়োগ করেন। মেওয়াট বাসীদের উপর সুলতান ইতিপূর্বে যে অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহারা মরিয়া হইয়া পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে লুটতরাজ করিয়া উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষাদানের জন্য সুলতান সৈন্য সংগ্রহ করিয়া উহাদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া বাহাদুর নাহিরের পৌত্র জালু ও কুদ্রু[1] আলোয়ের পাহাড়ে পালাইয়া যাইয়া অসীম সাহসের সঙ্গে গিরিপথগুলি রক্ষা করিতে থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত অশেষ দুর্দশায় পতিত হইয়া তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তাহাদিগকে বন্দী করা হইল।

মেওয়াটিদের উপর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ সত্ত্বেও তাহারা শান্ত হইল না। চারি মাস পরে পুনরায় সুলতানকে তাহাদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হইতে হইল। আক্রমণকারী দিল্লীর ফৌজ সমস্ত দেশ তলোয়ার ও অগ্নি দ্বারা

১ ইহা জালাল ও কুদ্দুরের ডাকনাম। ইহাদের সঙ্গে সচরাচর খান উপাধি সংলগ্ন থাকে।

ছারখার করিল। তারপর সুলতান বিয়ানা পর্যন্ত গমন করেন। বিয়ানার সুবাদার আমীর আলী খান ইতিপূর্বেই ইন্তেকাল করিয়াছেন এবং তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মদ খান তাঁহার আসন অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছেন। সুলতানের আগমনে মুহাম্মদ খান শহরের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুলতান ১৬ দিন যাবৎ বিয়ানা অবরোধ করিয়া রহিলেন। তারপর দুর্গবাসী সৈন্যদের একাংশ আসিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদান করে। তখন আত্মসমর্পণ ছাড়া মুহাম্মদের গত্যন্তর রহিল না। তিনি গলায় দড়ি জড়াইয়া সুলতানের সামনে হাজির হইলেন। সুলতান মক্‌বিল খানকে বিয়ানার শাসনভার অর্পণ করিলেন এবং মুহাম্মদ খান ও তাঁর পরিবারবর্গকে দিল্লী পাঠাইলেন। অতঃপর মালিক খয়ের-উদ-দীন তোহ্‌ফাকে সিক্রির (এখন ফতেপুর সিক্রি নামে পরিচিত) শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া সুলতান গোয়ালিয়র চলিয়া আসেন এবং সেখানে রাজার নিকট কর গ্রহণ করেন। এই সময় মালিক মাহমুদ হাসানকে মুলতান হইতে ডাকিয়া আনাইয়া তাঁহাকে হিশার ফিরোজের শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। সেই সঙ্গে মালিক রজব নাদিরীকে মুলতানের শাসনভার অর্পণ করা হয়।

ইতিমধ্যে বিয়ানার মুহাম্মদ খান সপরিবারে পালাইয়া মেওরাট চলিয়া আসেন এবং এক সৈন্যদল গঠন করিয়া সুলতান নিয়োজিত সুবাদার মক্‌বিল খানের অনুপস্থিতিতে বিয়ানা শহর পুনরাধিকার করেন। মক্‌বিল খান তখন মাহায়ুনে গিয়াছিলেন। মুহাম্মদ খানকে বহিষ্কৃত করিবার জন্য মালিক মুবারিককে নিযুক্ত করা হইল। মুহাম্মদ খান দুর্গে আশ্রয় লইলেন এবং মালিক মুবারিক দেশ দখল করিয়া লইলেন। কয়েকদিন পর দুর্গ রক্ষার দায়িত্ব কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচরের উপর ন্যস্ত করিয়া মুহাম্মদ খান নিজে বাহির হইয়া ইব্রাহীম শর্কীর সঙ্গে যাইয়া যোগদান করিলেন। ইব্রাহীম শর্কী তখন সসৈন্যে কাল্‌পীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কাল্‌পীর শাসক কাদির খান সাহায্য প্রার্থনা করিয়া দ্রুত দিল্লীতে সংবাদ পাঠাইলেন। সুলতান স্বয়ং যুদ্ধে আগমন করিলেন। আত্রাওলী পৌঁছিয়া তিনি মালিক মাহমুদ হাসানকে ১০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যসহ ইব্রাহীম শর্কীর ভ্রাতা মখলিস খানের পথরোধ করিতে প্রেরণ করিলেন। মখলিস খান আটোয়া দখল করিতে আসিতেছিলেন। দিল্লীর ফৌজ তাঁহার

পথরোধ করায় মখলিস খান তাহার ভ্রাতার নিকট ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইল। মালিক মাহমুদ হাসান দিল্লীর ফৌজের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইল। ইব্রাহীম শাহ্ শর্কী ইত্যবশরে কালিনদ্রির (নদীর) তীর ধরিয়া বরাবর অগ্রসর হইয়া বুরহানাবাদ আসিয়া পড়িলেন এবং সেখান হইতে রাবেরী গ্রামে পৌঁছিলেন। ওদিকে সুলতান মুবারিক আত্রাওলী হইয়া মালিকোটায় আসিয়া পৌঁছিলেন। দুই বাহিনী সমান্তরালভাবে অগ্রসর হইয়া শেষপর্যন্ত নদীর তীরে আসিয়া পড়িল। দিল্লীর সুলতান চান্দোয়ার নিকট যমুনা পার হইয়া শত্রুসেনার দশ মাইলের মধ্যে আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন। বাইশদিন ব্যাপী উভয় সেনাবাহিনী তাহাদের পরিখার মধ্যে কালযাপন করিল। এই সময় একবার মাত্র সামান্য সংঘর্ষ হইয়াছিল। ইব্রাহিম শর্কী ৭ই জমাদি-উস-সানী (২১ শে মার্চ) শিবির হইতে বাহিরে আসিয়া দিল্লীর ফৌজকে যুদ্ধে আহ্বান করিলেন। সুলতান নিজে বিপদের সম্মুখে আগাইয়া না যাইয়া উজির সরওয়ার-উল-মুল্‌কের উপর সেনাবাহিনীর পরিচালনা ভার প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য সৈয়দ সেলিম, সাইদ-উস-সাদত ও জামালকে সঙ্গে দিলেন। মধ্যাহ্ন বেলা দুই বাহিনী পূর্ণোদ্যমে পরস্পরকে আক্রমণ করিল এবং এক ভীষণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল। রাত্রির আগমনে উভয় বাহিনী নিরস্ত হইয়া নিজ নিজ শিবিরে ফিরিয়া গেল। পর দিন প্রত্যুষে ইব্রাহীম শর্কী তাঁবু উঠাইয়া জৌনপুর রওয়ানা হইলেন এবং বিজয় গৌরব দাবী করিবার জন্য সুলতান মুবারিক যুদ্ধ ক্ষেত্রেই রহিলেন। এই দিধাহীন বিজয়ে তুষ্ট হইয়া সুলতান চাম্বল অতিক্রম করিয়া গোয়ালিয়র গমন করেন। সেখান হইতে নির্ধারিত রাজস্ব আদায় করিয়া তিনি বিয়ানার দিকে অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধাবসানে মুহাম্মদ খান আহদী পুনরায় এই দুর্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি অসম সাহসিকতার সঙ্গে আত্মরক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহাকে যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করা হইল। মালিক মাহমুদ হাসানকে বিয়ানার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া ৮৩১ হিঃ ১৫ই সাবান (১৪২৭ খ্রীঃ ২৯শে মে) সুলতান মুবারিক দিল্লী প্রত্যাগমন করেন। সেখানে তিনি মালিক কুদ্র মেওয়াটিকে বন্দী করেন—যিনি গত যুদ্ধে ইব্রাহীম শাহ্ শর্কীর সঙ্গে যোগদান করিয়াছিলেন। সুলতান তাঁহাকে বধ করিবার হুকুম দিলেন। অতঃপর মালিক সরওয়ার-উল-মুল্‌ককে মেওয়াট অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করা হইল। শহরের

অধিবাসীরা শহর ত্যাগ করিয়া পাহাড়ে পালাইয়া গেল। মালিক কুক্রর ভ্রাতা জামাল খান মেওয়াটি আহমদ খান ও মালিক ফকর-উদ-দীনের সঙ্গে মিলিয়া আলোর দুর্গে এক সৈন্যবাহিনী গঠন করিলেন এবং এমন সাহসিকতার সঙ্গে দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন যে মালিক সরওয়ার-উল-মুলককে তাহাদের নিকট সামান্য পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করিয়া তুষ্ট হইয়াই দিল্লী ফিরিয়া আসিতে হইল।

জিলকদ মাসে (হিঃ ৮৩১ : খ্রীঃ সেপ্টেম্বর, ১৪২৭) সুলতান সংবাদ পাইলেন যে, জসরত গোক্কর নালানোর অবরোধ করিয়াছেন এবং ইহা ছাড়াও মালিক সিকান্দরকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া তাঁহাকে লাহোর হটিয়া আসিতে বাধ্য করিয়াছেন। তখন সামানার সুবাদার জিরাক খান ও সারহিন্দের সুবাদার ইসলাম খানের উপর হুকুম হইল মালিক সিকান্দরের সাহায্যার্থ গমন করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহাদের আগমনের পূর্বেই মালিক সিকান্দর কালানোরের রাজার সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং জসরত খানকে শুধু পরাজিতই করেন নাই—অধিকন্তু ঐ প্রদেশে প্রাপ্ত সমস্ত লুণ্ঠিত দ্রব্য ফেলিয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছেন।

৮৩২ হিজরী মহরম মাসে (১৪২৮ খ্রীঃ) সুলতান মেওয়াট গমন করেন এবং উহা সম্পূর্ণ পদানত করিয়া অধিবাসীদিগকে কর প্রদানে বাধ্য করেন। এই সময় মুলতানের সুবাদার মালিক রজব নাদিরীর মৃত্যু সংবাদ দিল্লী পৌঁছে। তখন মাহমুদ হাসানকে (যিনি বিয়ানার সমস্যা সুষ্ঠুরূপে সমাধা করিয়াছিলেন) ইমাদ-উল-মুল্‌ক্ উপাধি প্রদান করিয়া মুলতানের সুবাদার মনোনীত করা হইল। পর বৎসর সুলতান পুনরায় গোয়ালিয়র গমন করেন। পথে তিনি রাজা হলকান্তের নিকট রাজস্ব দাবী করেন। হলকান্ত দাবী পূরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পর্বতে পালাইয়া যান। তখন সুলতান তাহার এলাকায় ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইয়া এবং বহু অধিবাসীকে বন্দী ও গোলাম করিয়া দিল্লীতে লইয়া আসিলেন। অতঃপর সুলতান রাবেরীর দিকে সৈন্য চালনা করেন এবং হুসেন খান মেওয়াটির পুত্রের নিকট হইতে উক্ত প্রদেশ কাড়িয়া লইয়া মালিক হাম্‌জাকে প্রদান করেন। সুলতান যখন দিল্লী ফিরিতেছিলেন তখন সৈয়দ সেলিম মারা যান। তখন সুলতান তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে সৈয়দ খান এবং কনিষ্ঠ পুত্রকে সুজা-উল-মুল্‌ক্ উপাধি প্রদান করেন। গত ৩০ বৎসর যাবৎ ক্ষমতাসীন থাকিয়া তাঁহার পিতা যে ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন সুলতান তাহাতে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিলেন না—

সব তাঁহাদের অধিকারেই রহিল। এই ধনের পরিমাণ খোদ সুলতানের ব্যক্তিগত কোষাগারের প্রায় সমান। হিন্দুস্তানের প্রচলিত নিয়মানুসারে সুলতান উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিতেন। কিন্তু এতো অনুগ্রহ প্রদর্শন সত্ত্বেও সুলতান সৈয়দ পুত্রদের আনুগত্য লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহারা ফোলাদ নামক তুর্কী ক্রীতদাসকে গোপনে সারহিন্দে বিদ্রোহ করিতে পাঠাইলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, বিদ্রোহ দমনের জন্য সুলতান নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকেই প্রেরণ করিবেন এবং তখন তাঁহারা বিদ্রোহীদের সঙ্গে সদলবলে যোগদান করিবার সুযোগ লাভ করিবে। কিন্তু এই ষড়যন্ত্র ফাঁস হইয়া যায় এবং সুলতান উভয় ভ্রাতাকেই কারাগারে নিক্ষেপ করেন এবং মালিক ইউসুফ ও রায় হাবুর উপর গোলযোগ দমনের দায়িত্ব প্রদান করা হয় এবং তাহাদিগকে বিদ্রোহ দমনান্তে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের জমিদারী দখল করিবার নির্দেশদান করা হয়।

ফোলাদ দিল্লীর সেনাপতিদের সঙ্গে আপোষের কথাবার্তা চালাইয়া তাহাদিগকে নিঃসন্দিগ্ধ করিবার পর একদিন রাত্রিকালে সহসা দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া অতর্কিতভাবে তাহাদের শিবিরে হানা দেয়। কিন্তু দিল্লীবাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ ছিল। ফলে সে আক্রমণ সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। কিন্তু ফোলাদ ইহাতে বিন্দুমাত্র হতোদ্যম না হইয়া পরদিন রাতে পুনরায় দুর্গ হইতে বহির্গত হইয়া যন্ত্রের সাহায্যে প্রবল অগ্নিবর্ষণসহ শত্রু শিবির আক্রমণ করে। এইবার সুলতানী ফৌজ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া শিবির ছাড়িয়া পলায়ন করে। এই বিপর্যয়ের সংবাদ পাইয়া সুলতান স্বয়ং দিল্লী হইতে রওয়ানা হইলেন। এদিকে প্রতিদিন বিদ্রোহীদের শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মুলতান হইতে ইমাদ-উল-মুল্‌ক ও আরও কয়েকজন সুবাদারকে সারহিন্দ আসিবার নির্দেশ দেওয়া হইল। সাহায্যকারী দলগুলি আসিয়া পৌঁছিলে সুলতান সেনাবাহিনীর বৃহদাংশকেই সারহিন্দের দুর্গ অবরোধ করিতে পাঠাইয়া নিজে সরস্বতী তীরে অবস্থান করিলেন। এই সময় ফোলাদ সুলতানের নিকট এই মর্মে সংবাদ পাঠাইলেন যে, সুলতান যদি ক্ষমা করিবার প্রতিশ্রুতি দান করিয়া ইমাদ-উল-মুল্‌ক্‌কে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন তাহা হইলে তিনি সারহিন্দ দুর্গ সুলতানের হস্তে অর্পণ করিবেন। সুলতান তাঁহার পক্ষ হইতে এই প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ফোলাদ তোরণের বাহিরে ইমাদ-উদ-মুল্‌কের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া সুলতানের মার্জনা সম্বন্ধে নিশ্চিত হইলেন এবং নিজের দিক হইতে প্রতিশ্রুতিদান করিলেন যে, পরদিন দুর্গ সমর্পণ

করিবেন। ইমাদ-উল-মুল্কের অন্যতম পার্শ্বচরের সঙ্গে ফোলাদের পরিচয় ছিল। সে গোপনে ফোলাদকে বলে যে, ইমাদ-উল-মুল্ক একজন আত্মমর্যাদাশীল ব্যক্তি এবং তিনি নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি পালন করিবেন। কিন্তু সুলতান অতটা বিবেচক নাও হইতে পারেন। এই কথা শুনিয়া ফোলাদের মনে সন্দেহের উদ্রেক হইল। দুর্গে প্রচুর অর্থ ও রসদ মজুদ ছিল। সুতরাং তিনি শেষ পর্যন্ত দুর্গ রক্ষা করিবার সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন।

সুলতান দেখিলেন দুর্গ জয় করিতে অনেক সময় লাগিবে এবং অবরোধ চালাইবার জন্য সমস্ত সৈন্য সেখানে আটকাইয়া রাখা অনাবশ্যক। এই ভাবিয়া তিনি ইমাদ-উল-মুল্ককে তাঁহার সুবা মুলতানে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিলেন। ইসলাম খান ফালি খান ও রায় ফিরোজকে কতক-গুলি আমীর জাদীয়ার সঙ্গে অবরোধ চালাইবার জন্য রাখিয়া সুলতান নিজেও দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। ফোলাদ ছয় মাস যাবৎ আত্মরক্ষা করিয়া চলিলেন। তাঁহার দুর্দশা চরমে পৌঁছিল এবং তিনি বুঝিলেন যে, শাহ্রুখ মির্জা কর্তৃক নিযুক্ত কাবুলের সুবাদার শেখ আলীর সাহায্য ব্যতীত এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি হইতে মুক্তি লাভের কোন পথ তাঁহার নাই। এই জন্য সাহায্য ভিক্ষা করিয়া ফোলাদ কাবুলে দূত প্রেরণ করিলেন (হিঃ ৮৩৩, খ্রীঃ ১৪২৯)। সুলতান সীমান্তবর্তী মোগল রাজ্যের সঙ্গে সৌহার্দ স্থাপনের কোন প্রকার চেষ্টা করেন নাই। এই জন্য কাবুলের শাসনকর্তা ফোলাদকে সাহায্য করিবার জন্য রওয়ানা হইলেন। তিনি বিয়াস পার হইয়া গোক্কর-দের সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং যে সমস্ত আমীররা সারহিন্দে অবরোধ পরিচালনা করিতেছিল এবং তাহাদের মধ্যে পাঞ্জাবে যাহাদের জায়গীর ছিল সেইসব জায়গীর যথেচ্ছ লুণ্ঠন ও ছারখার করিলেন। আমীর শেখ আলী সারহিন্দ আসিয়া পৌঁছিলে সুলতানী ফৌজ অবরোধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। ফোলাদ তাঁহার মিত্রকে দুই লক্ষ তঙ্কার সমমূল্য ধনরত্ন এবং অনেক উপহার প্রদান করিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি তাঁহার পরিবারবর্গকে শেখ আলীর আশ্রয়াধীনে কাবুল পাঠাইলেন। অতঃপর তিনি সারহিন্দের দুর্গ আরও মজবুত করিয়া উহাতে প্রচুর রসদ ও অস্ত্র-শস্ত্র মজুত করিয়া আর একটি অবরোধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ফিরিবার পথে শতদ্রু পার হইয়া শেখ আলী পাঞ্জাবে ব্যাপকভাবে লুণ্ঠনকার্য অনুষ্ঠিত

করিলেন। ফোলাদের নিকট হইতে তিনি যাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার শতগুণ ধন তিনি লুণ্ঠন করিয়া লাভ করেন। লাহোর পৌঁছিয়া তিনি মালিক সিকান্দর তোহ্ফার নিকট এক বৎসরের রাজস্বের সমপরিমাণ অর্থ দাবী করিলেন। লাহোর হইতে তাহারা দিপালপুর গমন করিলেন এবং সেখানেও ব্যাপক লুণ্ঠন ও নরহত্যা চালাইলেন। প্রায় ৪০,০০০ হিন্দুকে এই সময় হত্যা করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। উপরন্তু বহু সংখ্যক লোককে গোলামরূপে বাঁধিয়া লইয়া যান। আমীর শেখ আলীকে অতর্কিতভাবে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত ইমাদ-উল-মুল্ক তুলুম্বায় ওঁৎ পাতিয়া রহিয়াছিলেন। কিন্তু আমীর সেই ফাঁদে পা না দিয়া খাতিরপুর চলিয়া যান। ইতিমধ্যে মুলতান রক্ষার জন্য ফিরিয়া আসিবার জন্য সুলতান ইমাদ-উদ-মুল্‌ক্‌কে পত্র লিখিলেন। তাঁহার পশ্চাদাপসরণে শত্রুর সাহস বৃদ্ধি পাইল। তাহারা রাবী বরাবর অগ্রসর হইয়া মুলতান শহরের দুই ক্রোশ দূর পর্যন্ত সমস্ত দেশ ছারখার করিল। তাঁহার অগ্রগতি প্রতিহত করিবার চেষ্টা করিয়া ইমাদ-উল-মুল্‌ক্ আমীর শেখের হস্তে পরাস্ত হইলেন। সেখান হইতে তাঁহারা মুলতানের ছয় মাইল দূরে খায়রাবাদ আসিয়া পৌঁছিলেন এবং পরদিন ৪ঠা রমজান ৮৩৩ (মে ২৯, ১৪৩০ খ্রী:) ঐ স্থানের উপর একটা নিষ্ফল হামলা চালাইলেন। কিন্তু তাহারা অবরোধ ত্যাগ করিল না এবং প্রতিদিন চতুষ্পার্শ্বে ধ্বংসাত্মক কার্য চালাইয়া যাইতে লাগিল—যাহাকে যেখানে দেখা পাইল, সেখানেই হত্যা করিতে লাগিল।

এইসব ঘটনার সংবাদ পাইয়া সুলতান ইমাদ-উল-মুল্‌কের সাহায্যার্থে মুজাফ্‌ফর গুজরাটির পুত্র ফতেহ্ খানকে আরও কয়েকজন খ্যাতনামা সেনাপতির সঙ্গে পাঠাইলেন। ফতেহ্ খান আসিয়া আমীর শেখ আলীকে যুদ্ধে লিপ্ত করিলেন। এক ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হইল। প্রথম দিকে মোগলরা কিছুটা সুবিধা করিয়াছিল। কিন্তু ফতেহ্ খান গুজরাটি যুদ্ধে নিহত হইবার পর সুলতানী ফৌজ প্রতিশোধ গ্রহণের উন্মাদনায় মরণপণ যুদ্ধ করিয়া শত্রুর উপর চূড়ান্ত জয়লাভ করিল। আমীর শেখ আলী সম্পূর্ণ পরাজিত হইলেন এবং লুণ্ঠনলব্ধ সমস্ত ধনসম্পদ হারাইয়া হতাবশিষ্ট কয়েকজন মাত্র অনুচর লইয়া

কাবুলে ফিরিয়া গেলেন। পলায়নকালে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্য শত্রুহস্তে নিহত হইল এবং অনেকেই ঝিলামে ডুবিয়া মরিল। ইমাদ-উল-মুল্‌ক্ শেহ্‌পুর পর্যন্ত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া মুলতান ফিরিয়া আসেন। তাঁহার সাহায্যার্থ সুলতানের আদেশে যেসব সেনাপতি পাঞ্জাব আসিয়াছিল, তাঁহারা সুলতানের আদেশে পুনরায় দিল্লী ফিরিয়া গেলেন। মুলতানে ইমাদ-উল-মুল্‌কের জনপ্রিয়তায় ঈর্ষান্বিত হইয়া এই ঘটনার অল্পকাল পরেই সুলতান তাঁহাকে রাজধানীতে ডাকিয়া পাঠান। তাহার অনুপস্থিতির সুযোগে জসরত গোক্কর ঝিলাম, রাবী ও বিয়াস পার হইয়া আসিয়া জলন্দরের নিকট মালিক তোহ্‌ফাকে আক্রমণ করেন। মালিক তোহ্‌ফা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া শত্রুহস্তে বন্দী হন এবং তাঁহার সমস্ত মাল-পত্র ও ধনরত্ন শত্রুহস্তে পতিত হয়। জসরত গোক্কর অতঃপর লাহোর অবরোধ করেন। জসরত গোক্কর কর্তৃক প্ররোচিত হইয়া আমীর শেখ আলী আর একবার মুলতানে অনুপ্রবেশ এবং আত্মসমর্পণের মাধ্যমে তুলুম্বা দখল করেন। কিন্তু তিনি তাঁহার অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া ঐ স্থান লুণ্ঠন করেন এবং অস্ত্র ধারণ করিতে সক্ষম সকল পুরুষকে হত্যা করেন এবং শহর ভস্মীভূত করেন। অধি-বাসীদের স্ত্রী ও সন্তানদিগকে বাঁধিয়া লইয়া যান।

এইসব ঘটনার সুযোগ গ্রহণ করিয়া ফোলাদ সারহিন্দ দুর্গ হইতে নির্গত হইয়া রায় ফিরোজের রাজ্য আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত ও নিহত করিল। ৮৩৫ হিজরীর ১লা জমাদি-উল-আউয়াল (জানুয়ারী ৩, ১৪৩২ খ্রীঃ) সুলতান এইসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে লাহোর রওয়ানা হইলেন। মালিক সরওয়ার-উল-মুল্‌ক্‌কে দ্বিতীয়বার সুবাদার নিযুক্ত করিয়া সেনাবাহিনীর অগ্রগামী দলের পরিচালনার দায়িত্ব তাঁহার উপর ন্যস্ত করিলেন। উজির সামানায় আসিয়া পড়িলে জসরত গোক্কর লাহোরের অবরোধ উঠাইয়া পাহাড়ে পালাইয়া গেলেন। আমীর শেখ আলীও কাবুলে সরিয়া পড়িলেন এবং ফোলাদ পুনরায় সার-হিন্দের দুর্গে প্রবেশ করিল। সুলতান পুনর্বার উজিরকে লাহোরের সুবাদারের পদ হইতে বঞ্চিত করিয়া নসরত খান গুরগানদাজকে ঐ পদ প্রদান করেন। সুলতান নিজে পানিপথে শিবির স্থাপন করিয়া অপেক্ষা করেন এবং ইমাদ-উল-মুল্‌ক্‌কে একদল সৈন্যসহ গোয়ালিয়রের নিকট কতকগুলি স্থানে বিদ্রোহ দমনের জন্য প্রেরণ করেন। অপরদিকে উজির সরওয়ার-উল-মুল্‌ক্‌কে সারহিন্দ অব-রোধের জন্য রাখিয়া সুলতান দিল্লী ফিরিয়া আসেন। জিলহজ্জ মাসে (আগস্ট)

জসরত গোক্কর পুনরায় লাহোরে আসিয়া নসরত খানের সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিয়া দেয়। এই খবর পাইয়া ৮৩৬ হিজরীতে (১৪৩৩ খ্রীঃ) সুলতান পুনরায় দিল্লী ত্যাগ করিয়া সামানায় চলিয়া আসেন। এইখানে পৌঁছিয়া তিনি তাঁহার মাতা মকদুমা জাহানের মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া সামান্য কয়েকজন অনুচরসহ দিল্লী ফিরিয়া আসেন। জানাজা সমাপনান্তে তিনি পুনরায় দিল্লী হইতে রওয়ানা হইয়া সেনাবাহিনীতে যাইয়া যোগদান করেন। শিবিরে পৌঁছিয়া তিনি আকস্মাৎ মেওয়াট অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। প্রস্থানের পূর্বে মালিক আল্লাদাদ লোদীর উপর লাহোরের শাসনভার অর্পণ করিয়া গেলেন। আল্লাদাদ লোদী জসরতকে বিতাড়িত করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। সুলতানের প্রস্থানের সংবাদ পাইয়া জসরতের সাহস বৃদ্ধি পাইল। তদুপরি তাহার স্বজাতীয় বহু লোকের যোগদানে তাঁহার সৈন্যবলও অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল। গোক্কর নেতা আল্লাদাদকে লাহোর পৌঁছিবার পূর্বেই পরাস্ত করিতে সমর্থ হইল।

এই বিপর্যয় ও আমীর শেখ আলীর সারহিন্দ অভিমুখে আগমনের সংবাদ পাইয়া সুলতান পুনরায় পাঞ্জাবের পথ ধরিলেন। সারহিন্দ অবরোধকারী সেনাদলকে সাহায্য করিবার জন্য ইমাদ-উল-মুল্‌ক্‌কে অগ্রে প্রেরণ করিলেন। ইমাদ-উল-মুল্‌কের আগমনের সংবাদ পাইয়া আমীর শেখ আলী যিনি ইতিপূর্বে ইমাদ-উল মুলকের হাতে পরাস্ত হইয়াছিলেন, সারহিন্দ আসিবার সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া লাহোর অভিমুখে দ্রুতগতিতে সরিয়া পড়িলেন। শেখ আলী অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া লাহোর অধিকার করিয়া বসিল। সুলতান তুলুম্বায় আসিয়া পৌঁছিলে আমীর শেখ আলী ২,০০০ সৈন্য লাহোরে রাখিয়া কাবুলে চলিয়া গেলেন। যাওয়ার পথে সমস্ত দেশ ছারখার করিয়া গেলেন। ভ্রাতুষ্প‌ুত্র মুজাফ্‌ফর খানকে সেউর দুর্গে রাখিয়া গেলেন। মালিক সিকান্দর তোহ্‌ফা প্রচুর পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া জসরত গোক্করের হাত হইতে রেহাই পাইলেন। সুলতান তাঁহাকে হালোর, দিপালপুর ও জলন্দরের শাসনকর্তার পদে পুনর্বহাল করেন। ইহার পর সুলতান লাহোর অবরোধ করেন। লাহোর বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করিল এবং দুর্গবাসী মোগল সৈন্যদিগকে কাবুলে যাইবার অনুমতি প্রদান করা হইল। সুলতান অতঃপর তুলুম্বার নিকট রাবী পার হইয়া সিউর অবরোধ করেন। মুজাফ্‌ফর খান পুরা একমাস ঐ দুর্গ রক্ষা করিল। কিন্তু প্রবল চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। সুলতানকে স্বীয় কন্যা ও প্রচুর

অর্থ ক্ষতিপূরণস্বরূপ প্রদান করিয়া তিনি রেহাই পাইলেন। তারপর সুলতান তাঁহার সেনাবাহিনীর একাংশ দিপালপুর রাখিয়া নিজে একদল বাছাই করা অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া মুলতান গমন করেন। সেখানে তিনি কতিপয় অলি-আল্লার কবর জিয়ারত করেন। সেখান হইতে কয়েকদিনের মধ্যেই শিবিরে প্রত্যাগমন করেন। এই সময় তিনি মালিক তোহ্ফাকে লাহোরের সুবাদারের পদ হইতে অপসারণ করিয়া ইমাদ-উল-মুল্‌ক্‌কে ঐ পদে বহাল করেন। অতঃপর সুলতান দিল্লী ফিরিয়া আসেন। উজির মালিক সরওয়ার-উল-মুল্‌কের প্রতিপত্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া সুলতান কালে খানকে তাহার পাশে উজির পদে নিযুক্ত করেন। কালে খান অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। তিনি শীঘ্রই সুলতানের অনুগ্রহ ও জনসাধারণের সমর্থন লাভে সক্ষম হইলেন।

এই ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হইয়া মালিক সরওয়ার-উল্‌-মুল্‌ক্‌, গাঙ্গুকাটরীর পুত্র সদানন্দ, প্রধান কর্মসচিব কাযী আব্‌দ্‌-উস্‌-সামাদ ও আরও কতিপয় প্রধান ব্যক্তির সঙ্গে সুলতানকে খুন করাইবার ষড়যন্ত্র করিলেন এবং সুযোগের অপেক্ষায় রহিলেন। এই সময় সুলতান যমুনার তীরে এক শহর প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার নাম দিলেন মুবারকবাদ (হিঃ ১৭ রবিউল-আউয়াল : অক্টোবর ১০, ১৪৩৫ খ্রীঃ)। এই কার্য সমাপণ করিবার পর সুলতান চিত্তবিনোদনের জন্য সারহিন্দের জঙ্গলে শিকার করিতে গেলেন। পথে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, সারহিন্দ অধিকৃত হইয়াছে এবং বিদ্রোহী ফোলাদের মস্তকও তাঁহাকে দেখানো হইল। অতঃপর সুলতান নূতন শহরে ফিরিয়া আসিলেন। এইখানে তিনি সংবাদ পাইলেন যে, ইব্রাহীম শাহ্ শর্কী ও মালবের সুলতান হুসাং-এর মধ্যে যুদ্ধ বাঁধিয়াছে এবং উহাদের সেনাবাহিনী কালপীর নিকট অবস্থান করিতেছে। এই সংবাদ শুনিয়া সুলতান মনে করিলেন, ইব্রাহীম শর্কীকে তাঁহার রাজ্যচ্যুত করিবার এই সুবর্ণ সুযোগ। সুলতান কালক্ষেপ না করিয়া সৈন্যবাহিনীকে শহরের বাহিরে সমবেত হইবার হুকুম দিলেন এবং সেখানে তাঁবু খাটাইলেন। সৈন্য-বাহিনীকে সংগঠিত করিতে কয়েকদিন অতিবাহিত হইল। সুলতান এই সময় প্রতিদিন নূতন শহরের নির্মাণকার্য পরিদর্শন করিতে যাইতেন। নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধে তাহার মনে কোন সন্দেহের লেশমাত্র ছিল না। কারণ তিনি জানিতেন ওমরাহদের মধ্যে তাঁহার কোন শত্রু নাই। তিনি কোনদিন তাঁহাদের উপর কোন জুলুম করেন নাই। অসদাচরণ করিলে তিনি তাঁহাদিগকে বদলী করিতেন অথবা

পদচ্যুৎ করিতেন। তার বেশী কোন জুলুম তিনি আমীরদের উপর কোনদিন করিতেন না।

৮৩৯ হিজরী, ৯ই রজব (১৪৩৫ খ্রীঃ ২৮শে জুন) অন্যান্য দিনের মত সামান্য কয়েকজন দেহরক্ষী সৈন্য লইয়া নূতন শহরে নবনির্মিত মস্জিদে নামাজ পড়িতে গিয়াছিলেন। সেই সময় মিরন সদর এবং কাযী আব্দ্-উস-সামাদ বর্ম পরিহিত একদল হিন্দু গুণ্ডা লইয়া মস্জিদে প্রবেশ করে। গাঙ্গুকাট্রীর পুত্র সদানন্দ আর একদল হিন্দুকে লইয়া সেই সময় বাহিরে পাহারায় নিযুক্ত রহিল—যাহাতে বাহিরের কোন লোক মস্জিদে বা মস্জিদের কোন লোক বাহিরে আসিতে না পারে। সুলতান বর্মাবৃত ষড়যন্ত্রকারীদিগকে লক্ষ্য করিলেন কিন্তু উহাদের প্রতি কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ করিলেন না। সিদপাল নামক এক হিন্দু তলোয়ার টানিয়া বাহির করিয়া সুলতানের দিকে ছুটিল এবং তাহার দেখাদেখি আর সকলেও ছুটিল এবং এই সহৃদয় ও সুযোগ্য সুলতানকে নৃশংসভাবে হত্যা করিল। মিরন সদর তৎক্ষণাৎ ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া উজিরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে সব জানাইল। সরওয়ার-উল্-মুল্ক পূর্বাহ্ণেই খিজির খানের অন্যতম পৌত্র মুহাম্মদের সঙ্গে কথা বলিয়া সব স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন। এইবার সেই শাহজাদাকে তখ্তে বসানো হইল।

সৈয়দ মুবারিক ১৩ বৎসর তিন মাস ও ১৬ দিন রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি একজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বলিয়া লোকের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন এবং তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উদারতা ও ন্যায়পরায়ণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি এমন নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিলেন যে জীবনে কোনদিন কাহারো প্রতি রাগান্বিত হইয়া কথা বলেন নাই। তারিখ-ই-মুবারিক শাহী তাঁহার রাজত্বের ঘটনাবলীকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

সৈয়্যদ মুহাম্মদ

[উজির কর্তৃক সুলতানের পুত্রকে সিংহাসনে উপবেশন। সুলতানের হত্যাকারীদের প্রদেশের শাসনকর্তার পদ প্রাপ্তি। কর্মচারীদের মধ্যে অসন্তোষ। সাম্বলে বিদ্রোহ এবং বিদ্রোহ দমনে কালে খানের গমন। বিদ্রোহীর সঙ্গে যোগদান করিয়া তাঁহার রাজধানী অভিমুখে রওয়ানা। উজির নিহত। কালে খান উজির নিযুক্ত। প্রাক্তন সুলতানের খুনীদিগকে শাস্তি প্রদান। মুলতানে বিদ্রোহ। বাহ্‌লুল খান লোদীর লাহোরে স্বাধীনতা ঘোষণা। তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরিত সুলতানী ফৌজ পরাস্ত। রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ। জৌনপুরের সুলতান কর্তৃক দিল্লীর কিছু এলাকা অধিকার। মালবের সুলতান কর্তৃক দিল্লীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ। সুলতানকে সাহায্য করিবার জন্য বাহ্‌লুল খান লোদীকে আহ্বান। মালব বাহিনীর পশ্চাদাপসরণ। সুলতান ও বাহ্‌লুল লোদীর মধ্যে মতানৈক্য। বাহ্‌লুল লোদীর রাজধানী ত্যাগ। তারপর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া ছয়মাস যাবৎ দিল্লী অবরোধ। পীড়াগ্রস্ত হইয়া সুলতানের ইন্তেকাল।]

দুনিয়া নিয়মে চলে। নিয়মের ব্যতিক্রম হইলে বিশ্বের অস্তিত্বই বিলুপ্ত হইবে। মুবারিক যে দিন মরণাঘাত প্রাপ্ত হইলেন সেই দিনই তাঁহার পুত্র শাহজাদা মুহাম্মদ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। কৃতঘ্ন উজির সরওয়ার-উল-মুল্‌ক খান জাহান উপাধি ধারণ করিলেন এবং সুলতানের কোষাগার, শাহী নিশান ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামাদি হস্তগত করিলেন এবং সমস্ত পুরাতন মন্ত্রীদিগকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার আস্থাভাজন লোকদিগকে তাহাদের স্থলে নিযুক্ত করিলেন। সহকারী মন্ত্রী কালে খান ও শিবিরের অন্যান্য আমীরগণ সুলতানের মৃত্যু সংবাদ পাইয়া এক পরামর্শ সভায় মিলিত হইয়া এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, গৃহযুদ্ধের অভিশাপ এড়াইবার জন্য তাহাদিগকে সাময়িকভাবে নূতন সুলতানের আনুগত্য মানিয়া লইতে হইবে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের উপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অনুকূল অবস্থার প্রতীক্ষায় ধৈর্যধারণ করিয়া থাকিতে হইবে। সেই মোতাবেক তাঁহারা শহরে আসিয়া নূতন সুলতানের নিকট আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। উজিরের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য প্রথম যেসব পদ-বিনিয়োগ হইল তাহাতে হিন্দু ষড়যন্ত্রকারীদের ভাগ্যে উচ্চপদ লাভ ঘটিল। সদানন্দ ও সিদ্‌পালের উপর বিয়ানা, আমরোহা, নারনাউল, কোহ্‌রাম ও দোয়াবাঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করা হইল। মিরন

সদরকে মঈন-উল্-মুল্‌ক্ উপাধিতে ভূষিত করিয়া বিস্তৃত এলাকা জায়গীরস্বরূপ প্রদান করা হইল। সৈয়দ সেলিমের পুত্রকে খান আজিম সাইদ খান উপাধিসহ কয়েকটি জিলার শাসনভার প্রদান করা হইল। অপরপক্ষে ভূতপূর্ব সুলতানের আমীরদের উপর জুলুম করা আরম্ভ হইল এবং তাহাদের কয়েকজনকে মিথ্যা অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইল।

রানো নামক উজিরের এক গোলামকে বিয়ানার রাজস্ব আদায়কারী মনোনীত করা হইল (হিঃ রজব ১২, ৮৩৯ : খ্রীঃ জানুয়ারী, ১৪৩৫) সে বিয়ানা দুর্গের দখল লাভ করিতে যাইয়া ইউসুফ খান লোদীর হস্তে নিহত হইল। এই সময় খিজির খানের আমলের পুরাতন আমীরগণ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহাদের জায়গীর কাড়িয়া লইবার পালা আসিয়াছে। তখন বাদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক জুমুন, সাম্বলের শাসনকর্তা মালিক আল্লাদাদ লোদী, মীরআলী গুজরাটি ও আমীর খান তুর্কী মিলিত হইয়া প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। মালিক সরওয়ার-উল-মুল্‌ক তাহার সহকারী মন্ত্রী কালে খানের বাহ্যিক সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে প্রভাবিত হইয়া তাহারই উপর বিদ্রোহ দমনের নিমিত্ত প্রেরিত সেনা-বাহিনীর পরিচালনার ভার ন্যস্ত করেন। কালে খান সদানন্দ ও ইউসুফ খানের উপর প্রাক্তন সুলতানের খুনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন। বিরান গ্রামে পৌঁছিয়া তিনি মালিক আল্লাদাদকে তাঁহার উদ্দেশ্য জ্ঞাপন করিলেন। তদনুযায়ী মালিক আল্লাদাদ দিল্লীর ফৌজকে বাধাদানের চেষ্টা করিলেন না। কালে খানের মতলবের কথা সুলতান জ্ঞাত হইলেন। সুলতান তাঁহার অন্যতম গোলাম মালিক হুসিয়ার খানকে আরও কিছু সৈন্যসহ কালে খানের নিকট পাঠাইলেন। বাহ্যতঃ কালে খানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য তাহাকে পাঠানো হইল। কিন্তু কার্যতঃ কালে খানের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্যই তাহাকে প্রেরণ করা হইয়া-ছিল। কিন্তু হুসিয়ার খান আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বেই মালিক আল্লাদাদ লোদীর সেনাবাহিনীর সঙ্গে কালে খানের সেনাবাহিনী মিলিত হইয়াছিল (হিঃ ৮৩৯ : খ্রীঃ ৩৩৫)। তখন হুসিয়ার খান আর সম্মুখে পা বাড়াইতে সাহস করিল না এবং ইউসুফ খান ও সদানন্দ দিল্লী পালাইয়া গেল। কালে খানসহ বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিদের সম্মিলিত বাহিনী এইবার দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইল এবং রমজান মাসের শেষ দিন (এপ্রিল ১৫) তাঁহারা দিল্লী আসিয়া পৌঁছিল। এই সঙ্কটাবস্থায় উজির শিরি কেল্লায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং সেখানে তিন মাস

যাবৎ অবরুদ্ধাবস্থায় আত্মরক্ষা করিয়া রহিলেন। কালে খানের দলে প্রতিদিন নূতন নূতন লোক আসিয়া যোগদান করিতে লাগিল আর অপরদিকে অবরুদ্ধ উজিরের দুরবস্থা চরমে উঠিল। সুলতান বুঝিলেন যে, উজিরের সংশ্রব ত্যাগ না করিলে তাঁহারও নিস্তার নাই। সুলতান অবরোধকারীদের সঙ্গে পত্রালাপ আরম্ভ করিলেন এবং পালাইয়া যাইবার বা উজিরকে খুন করাইবার সুযোগান্বেষণ করিতে লাগিলেন। উজির এই ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করিলেন এবং সুলতানের দুর-ভিসন্ধির যথাযোগ্য প্রত্যুত্তরদানে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

৮ই মহরম (৮৪০ হিজরী ১৪৩৬ খ্রীঃ ২২শে জুন) সরওয়ার-উল-মুল্‌ক, মিরন সদরের পুত্র ও তাঁহাদের আরও কয়েকজন অনুচর সুলতানকে বধ করিবার উদ্দেশ্যে উন্মুক্ত তলোয়ার হস্তে সুলতানের প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। তাঁহাদের দুরভিসন্ধির সংবাদ পাইয়া সুলতান সশস্ত্র প্রহরী মোতায়েন করিয়াছিলেন। ইঙ্গিত মাত্র তাহারা ষড়যন্ত্রকারীদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িলে তাহারা ভয়ে পলায়ন করিল। দরজার চৌকাঠ পার হইবার সময় সরওয়ার-উল-মুল্‌ক পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহাকে সেখানেই কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করা হইল। অবশিষ্ট আততায়ীর সঙ্গে মিরন সদরের পুত্রও ধৃত হইল এবং তাহাদের সকলকে কতল করা হইল। সেইসঙ্গে এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালিক হুসিয়ার ও মালিক মুবারিককেও প্রকাশ্যে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইল। ক্ষত্রিয়েরা ও উজিরের দলভুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিরা সুলতানের কোপানলে নিশ্চিত ভস্মীভূত হওয়ার কথা চিন্তা করিয়া মরণ কামড় দিবার জন্য প্রস্তুত হইল। সুলতানও তাঁহার নিরাপত্তার জন্য প্রাসাদের রক্ষণব্যবস্থা সুদৃঢ় করিলেন। এইরূপ পরিস্থিতিতে সুলতান অবরোধকারীদের জন্য বাগদাদ তোরণ খুলিয়া দিলেন; আর সঙ্গে সঙ্গে অবরোধকারীরা বন্যার স্রোতের ন্যায় ভিতরে ঢুকিয়া বিদ্রোহীদের উপর ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড শুরু করিয়া দিল। শেষ পর্যন্ত তাহারা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইল। যাহাদিগকে জীবন্ত বন্দী করা হইল তাহাদের হাত পা বাঁধা হইল এবং সাবেক সুলতান সৈয়দ মুবারিকের কবরে লইয়া যাইয়া তাহাদিগকে কোরবানী করা হইল। কালে খান ও অন্যান্য আমীরগণ পর দিন সুলতানের নিকট দ্বিতীয়বার আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। এই সময় কালে খানকে কামাল খান উপাধিসহ উজিরের পদ প্রদান করা হইল এবং মালিক জুমুনকে গাজী খান উপাধি ও একটি জায়গীর প্রদান করা হইল। মালিক আল্লাদাদ লোদী নিজের জন্য কোন খেতাব গ্রহণ করিতে রাজী হইলেন না। কিন্তু তাঁহার

ভ্রাতার জন্য দরিয়া খান উপাধি প্রার্থনা করিলেন। অবশিষ্ট ওমরাহগণকে তাহাদের স্ব স্ব পদে বহাল রাখা হইল। দিল্লীতে শান্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল। সুলতান তখন তাঁহার সভাসদদের পরামর্শে মুলতানাভিমুখে যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। মুবারকবাদের নিকট আসিয়া শিবির স্থাপন করিলেন এবং প্রতিবেশী প্রদেশগুলি হইতে সৈন্য সংগ্রহের হুকুম জারি করিলেন। আমীরদের অনেকেই ভয়ে প্রধান ঘাটিতে আসিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। শেষটায় ইমাদ-উল-মুল্‌ক মুলতান হইতে আসিয়া স্বীয় ক্ষমতা ও প্রভাব দ্বারা সুলতানকে সাহায্য করিতে লাগিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই অন্যান্য প্রদেশের শাসনকর্তারাও শিবিরে আসিয়া হাজির হইলেন। তাঁহাদিগকে খেলাৎ ও অন্যবিধ অনুগ্রহ প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করা হইল।

সুলতান অতঃপর মুলতানের দিকে সেনাবাহিনী রওয়ানা করিয়া দিলেন এবং সৈন্যবাহিনীর পুরোভাগে থাকিয়া কয়েকদিন পথ চলিয়া আজুধন আসিয়া পৌঁছিলেন। সেখানে পীর-আউলিয়াদের কবর জিয়ারত করিয়া রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন।

এই বৎসরই (হিঃ ৮৪০) সুলতান সামানায় গমন করেন এবং সেনাবাহিনীর একাংশ জসরত গোক্করের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। ইহারা জসরত গোক্করের এলাকায় যথেচ্ছ লুটতরাজ করিল। অতঃপর সুলতান দিল্লী ফিরিয়া আসেন। এইবার দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিয়া সুলতান আমোদ-প্রমোদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইলেন এবং শাসনকার্যের প্রতি চরম ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। সুলতানের অবহেলার জন্য শাসনকার্য বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে লাগিল, চতুর্দিকে অসন্তোষ মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল এবং মুলতানে লাঙ্গা নামে অভিহিত আফগানদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দিল। এই সময় বাহ্‌লুল লোদী লাহোর, দিপালপুর এবং পানিপথ পর্যন্ত দক্ষিণ দিকের সমস্ত অঞ্চল দখল করিয়া লইলেন। এই বাহ্‌লুল লোদীই তাঁহার পিতৃব্য ইসলাম খান লোদীর ইন্তেকালের পর সারহিন্দের শাসনকর্তার পদ আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছিলেন। সুলতান বাহ্‌লুল লোদীর বিরুদ্ধে তাঁহার সমগ্র সেনাবাহিনী প্রেরণ করিলেন। বাহ্‌লুলকে পাহাড়ে তাড়াইয়া দেওয়া হইল এবং পলায়নকালে তাঁহার বহু খ্যাতনামা সেনাপতি মারা পড়িল।

শাহী ফৌজ চলিয়া যাওয়ার পর বাহ্‌লুল লোদী পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া—যেসব অঞ্চল বেদখল হইয়াছিল সে-সব পুনর্দখল করিয়া লইলেন। সুলতান উজির হিশাম খানকে তাঁহার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তিনি পরাস্ত হইয়া দিল্লী পালাইয়া আসিলেন। এই সময় বাহলুল লোদী সুলতানকে লিখিলেন যে, হিশাম খানের কারণেই তিনি বিদ্রোহী হইয়াছেন এবং সুলতান যদি হিশাম খানকে মারিয়া ফেলেন, তবে তিনি অস্ত্রসংবরণ করিবেন। দুর্বলচিত্ত সুলতান বাহ্‌লুল লোদীর এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং হিশাম খানকে কতল করিবার হুকুম দিলেন। তিনি কামাল-উল-মুল্‌ককেও তাঁহার ওজারতের পদ হইতে অপসারণ করিয়া সহকারী উজির হামিদ খানকে সেই পদ প্রদান করিলেন এবং তাঁহাকে হিশাম খান উপাধি প্রদান করিলেন। অর্বাচীন সুলতানের এইসব দায়িত্বহীন কার্যকলাপ লক্ষ্য করিয়া প্রাদেশিক সুবাদাররা বুঝিলেন যে, তাঁহার পতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং তাহারা স্ব স্ব এলাকায় স্বাধীন হইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। কৃষক ও জমিদাররা আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের কথা চিন্তা করিয়া রাজস্ব বন্ধ করিয়া দিলেন। তাহারা ভাবিলেন যে, গোলমালের সময় এই টাকাটা তাহাদের কাজে লাগিবে। এই পরিস্থিতি পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলির শাসকদের জন্য সুলতানের এলাকা গ্রাস করিবার পক্ষে বিশেষ অনুকূল বলিয়া বিবেচিত হইল। ইব্রাহীম শর্কী তাঁহার রাজ্যসংলগ্ন কতকগুলি এলাকা দখল করিয়া লইলেন। ওদিকে মালবের সুলতান মাহমুদ খিল্‌জী খোদ দিল্লীতে হানা দিবার জন্য ৮৪৪ হিজরী (১৪৪০ খ্রীঃ) শহরের দুই ক্রোশের মধ্যে আসিয়া পৌঁছিলেন। আতঙ্কগ্রস্ত সৈয়দ মুহাম্মদ বাহ্‌লুল লোদীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়া তাঁহার নিকট পত্র পাঠাইলেন। তদনুযায়ী বাহ্‌লুল লোদী ২০,০০০ সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া রাজধানীতে আসিয়া হাজির হইলেন। সুলতানের বাহিনী যদিও শত্রুর তুলনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল তবুও তিনি নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতে সাহসী হইলেন না। সেনাপতিদের উপর সমস্ত দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া তিনি নিজে প্রাসাদে রহিলেন।

সুলতান মাহমুদ খিল্‌জী যখন জানিতে পারিলেন যে, দিল্লীর সুলতান তাঁহার সেনাবাহিনীর সঙ্গে আসেন নাই, তখন তিনি ভাবিলেন, সুলতান তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসা অপমানজনক মনে করিয়াই নির্লিপ্ত রহিয়াছেন।

এইজন্য ইহার প্রত্যুত্তরে মালবের সুলতান তাঁহার সেনাবাহিনীর পরিচালনার ভার তদীয় পুত্র গিয়াস-উদ-দীন ও কুদ্দুর খানের উপর অর্পণ করেন। দিল্লী ও মালবের বাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধিবার সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লীর বাহিনী পিছু হটিয়া গেল, শুধু বাহ্লুল লোদীর সেনাদলই যুদ্ধক্ষেত্রে রহিল এবং তাহারা দৃঢ়তার সঙ্গে শত্রুর মোকাবিলা করিতে লাগিল। শেষ পর্যন্ত পলাতকরা লজ্জিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়া যুদ্ধে অংশগ্রহণ করিল। দিবাবসানে যুদ্ধ স্থগিত রহিল এবং জয় পরাজয় অনিশ্চিত রহিয়া গেল। কথিত আছে, সেই রাত্রে দুঃস্বপ্ন দেখিয়া মাহমুদ খিলজী অব্যবস্থিতচিত্ত হইয়া পড়েন এবং পরদিন সকালে যখন আহমদ শাহ গুজরাটির মান্দো অভিমুখে অগ্রসর হইবার সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন তখন তিনি সন্ধি স্থাপনের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু লজ্জার কারণে প্রথম এই প্রস্তাব উত্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। ঠিক সেই সময় দুর্বলচিত্ত সৈয়দ মুহাম্মদ উজিরের মতের বিরুদ্ধে দুত মারফত তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীর নিকট প্রস্তাব ও উপহার প্রেরণ করেন।

এই প্রস্তাব পাইয়া উল্লসিত মাহমুদ খিলজী অবিলম্বে সব বিবাদ মিটমাট করিয়া স্বদেশাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সুলতানের প্রতি বাহ্লুল লোদীর ঘৃণা এইবার চরমে পৌঁছিল। তিনি স্থির করিলেন যে, এই অপদার্থের হস্ত হইতে রাজ্য ছিনাইয়া লইতেই হইবে। তিনি নিজের সেনাবাহিনী লইয়া প্রস্থানরত মালব বাহিনীর পশ্চাদ্ধাবন করিলেন এবং তাহাদিগকে আক্রমণ ও পরাজিত করিয়া তাহাদের সমস্ত সাজসরঞ্জামাদি হস্তগত করিলেন। তাঁহার এই অসামান্য কৃতিত্বের জন্য তাঁহার মতলব সম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ সুলতান তাঁহাকে খান জাহান উপাধি প্রদান করিলেন এবং উপরন্তু তাঁহাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

৮৪৫ হিজরীতে (১৪৪১ খ্রীঃ) সুলতান সামানায় যাইয়া বাহ্লুল লোদীকে লাহোর ও দিপালপুরের শাসনকর্তার পদে বহাল করিলেন। অবশ্য এই দুইটি প্রদেশ তিনি নিজের বাহুবলেই আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। জসরত গোক্করকে আক্রমণ করিবার দায়িত্ব সুলতান তাহার স্কন্ধেই ন্যস্ত করিলেন। বলা বাহুল্য, এইসব মোটা অনুগ্রহের ফলে বাহ্লুল লোদীর হস্ত আরও মজবুত হইল। তিনি অসংখ্য আফগানকে সৈন্যদলে ভর্তি করিয়া তাঁহার সেনাবাহিনীর কলেবর অভাবিতরূপে বৃদ্ধি করিলেন এবং সুলতানের নির্দেশানুযায়ী জসরত গোক্করকে আক্রমণ করা দুরের কথা বরং তাঁহাকে দলে টানিয়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে সুলতানের

কয়েকটি এলাকা দখল করিয়া লইলেন। শেষ পর্যন্ত বাহ্‌লুল দিল্লীর দুয়ারে আসিয়া হানা দিলেন এবং কয়েক মাস যাবৎ রাজধানী অবরোধ করিয়া রহিলেন। কিন্তু সেবারের মত তাঁহাকে সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল।

সুলতানের শক্তির দ্রুত অবনতি লক্ষ্য করিয়া বিয়ানার জমিদারগণ মালবের সুলতান মাহমুদ খিল্‌জীর অধীনতা মানিয়া লয়। এদিকে পীড়াগ্রস্ত হইয়া ৮৪৯ হিজরীতে (১৪৩৫ খ্রীঃ) সৈয়দ মুহাম্মদ স্বাভাবিকভাবেই প্রাণত্যাগ করেন এবং পিছনে রাখিয়া যান এক দুর্বল ও চরিত্রহীন নরপতির খ্যাতি। তিনি বার বৎসর কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর পুত্র আলা-উদ-দীন পিতার স্থলাভিষিক্ত হন।

সৈয়দ আলা-উদ-দীন

[সিংহাসনারোহণের পর বিয়ানা অধিকারে রওয়ানা। দিল্লীতে ফিরিয়া আসা। সকলের ঘৃণার পাত্র। ভারতে মুসলমান রাজত্বের চমকপ্রদ বিবরণ ; প্রত্যেক রাজ্যের আঞ্চলিক সীমানার বর্ণনা। সুলতান কর্তৃক বাদায়ুনে রাজধানী স্থানান্তর। উজিরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের চেষ্টা। উজিরের দিল্লী পলায়ন ও বাহ্‌লুল লোদীকে দিল্লী আক্রমণের আমন্ত্রণ। বাহ্‌লুলের দিল্লী আগমন ও সুলতানের নিকট দুরভিসন্ধি গোপন। সুলতান কর্তৃক বাহ্‌লুল লোদী উত্তরাধিকারী নির্বাচিত। আলা-উদ-দীনের সিংহাসন ত্যাগ এবং বাদায়ুনে বাস করিবার অনুমতি লাভ।]

সৈয়দ মুহাম্মদের পুত্র আলা-উদ-দীন পিতার মৃত্যুর পর তখ্‌তে উপবেশন করেন। বাহ্‌লুল লোদী ব্যতীত সমস্ত আমীর-ওমরাহ আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু এই উপেক্ষা প্রদর্শনের জন্য বাহ্‌লুল লোদীর উপর রুষ্ট হইবেন এমন অবস্থা নূতন সুলতানের ছিল না। ৮৫০ হিজরীর প্রথম ভাগে (১৪৪৬ খ্রীঃ) সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নূতন সুলতান বিয়ানা পুনরুদ্ধারের জন্য গমন করেন। কিন্তু পথে সংবাদ পাইলেন যে, ইব্রাহিম শাহ্ শর্কী দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সংবাদটা ছিল একেবারে ভিত্তিহীন। তাহা পরীক্ষা না করিয়াই সুলতান রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। একটা গুজবের উপর বিশ্বাস করিয়া এমন গুরুত্বপূর্ণ অভিযান পরিত্যাগ করার জন্য উজির সাহস করিয়া সুলতানকে মৃদু তিরস্কার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার ফল এই হইল যে, সুলতান উজিরের প্রতি অসন্তুষ্ট হইলেন।

এই ব্যাপারে সুলতানের মর্যাদা বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইল এবং অতি নগণ্য ব্যক্তিরাও দ্বিধাহীন চিত্তে বলিতে লাগিল যে, আলা-উদ-দীন তাঁহার পিতার চেয়েও দুর্বলচিত্ত। পর বৎসর তিনি বাদায়ুনের বিরুদ্ধে যাত্রা করেন এবং সেখানে কিছু-কাল উদ্যান তৈরী, প্রমোদাগার নির্মাণ ও আমোদ-প্রমোদ করিয়া কাটাইলেন। বাদায়ুনের আবহাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে অধিক অনুকূল বিবেচনা করিয়া তিনি সেইখানেই বাস করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। উজির শত চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে সেই সঙ্কল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিলেন না। এই সময় হিন্দুস্তান

অনেক খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। দাক্ষিণাত্য, গুজরাট, মালব জৌনপুর ও বাঙ্গালাদেশ—প্রত্যেক প্রদেশ এক একজন স্বাধীন সুলতানের অধীন ছিল।[১] পাঞ্জাব, দিপালপুর, সারহিন্দ ও পানিপথ পর্যন্ত সমস্ত দক্ষিণাঞ্চল ছিল বাহ্‌লুল লোদীর করায়ত্ত। মেহ্‌রোলী এবং দিল্লীর সাত মাইল দূরে সরাইলাদো পর্যন্ত সমস্ত এলাকা আহমদ খান মেওয়াটির অধিকারে ছিল। দিল্লীর শহরতলী পর্যন্ত প্রসারিত সম্বল রাজ্য ছিল দরিয়া খান লোদীর অধিকাভুক্ত। দোয়াবের কোলে জলেশর ঈসা খান এবং রাবেরী ও তাহার আওতাধীন এলাকা কুতুব খান আফগান দখল করিয়া লইয়াছিল। কাম্পিলা ও পাতিয়ালী অধিকার করিয়াছিল রাজা প্রতাপ সিংহ এবং বিয়ানা অধিকার করিয়াছিল দাউদ খান লোদী। ফলে দিল্লী শহর ও পার্শ্ববর্তী অতিক্ষুদ্র অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল দিল্লীর প্রভুত্ব।

এইবার রাজধানী অধিকার করিবার জন্য বাহ্‌লুল লোদী আর এক দফা চেষ্টা পাইলেন। কিন্তু পূর্বাপেক্ষা বেশী সাফল্য অর্জন করা তাঁহার ভাগ্যে ঘটিল না। এই সঙ্কটাবস্থা কাটিয়া উঠিবার পর হৃত সাম্রাজ্যের কিয়দংশ পুনরুদ্ধারের কথা সুলতান চিন্তা করিতে লাগিলেন। তিনি কুতুব খান, ঈসা খান ও প্রতাপ রায়ের সঙ্গে এই বিষয়ে আলাপ করিলেন। এই সব নেতারা সুলতানকে আরও দুর্বল করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কুমন্ত্রণা দিলেন যে, যেহেতু আমীর-ওমরাহগণ তাঁহার উজির হামিদ খানের উপর বিতৃষ্ণ, সেই জন্য সুলতান যদি হামিদ খানকে পদচ্যুত ও কারারুদ্ধ করেন, তাহা হইলে তিনি সকলের অকুণ্ঠ সমর্থন ও সহযোগিতা প্রাপ্ত হইবেন এবং ইহাতে তাঁহার শাসন ব্যবস্থায় সন্তোষজনক উন্নতি সাধিত হইবে। এইসব বিশ্বাসঘাতক নেতাদের প্রতারণার জালে পড়িয়া সুলতান উজিরকে কারারুদ্ধ ও লাঞ্ছিত করিলেন এবং তখনই বাদায়ুনে রাজধানী স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তুতি করিতে আদেশ দিলেন। সুলতানের অকৃত্রিম বন্ধু যাঁহারা ছিলেন তাঁহারা সুলতানকে স্পষ্টভাবে বুঝাইয়া বলিলেন যে, এমন সঙ্কটাবস্থায় সুলতানের পক্ষে দিল্লী ত্যাগ মারাত্মক রাজনীতি বিরুদ্ধ কর্ম হইবে। কিন্তু সুলতান তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

---

১ এই আঞ্চলিক বিভাগের বিবরণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এগুলি ছাড়াও খান্দেশ, সিন্ধু ও মুলতান প্রদেশ এক একজন স্বাধীন মুসলমান সুলতানের অধীনে ছিল।

এইভাবে ৮৫২ হিজরীতে (১৪৪৮ খ্রী:) হিশাম খানের উপর দিল্লীর শাসনভার অর্পণ করিয়া আলা-উদ দীন বাদায়ুন গমন করেন। তিনি নূতন রাজধানীতে আসিয়া পৌঁছিলে কুতুব খান ও প্রতাপ রায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন যে, উজির হামিদ খান যতদিন জীবিত আছেন ততদিন তাঁহারা দরবারকে তাঁহাদের জন্য নিরাপদ মনে করিতে পারেন না। সুলতান তখন বাধ্য হইয়া উজিরের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিলেন। কিন্তু উজিরের ভ্রাতা সুলতানের দুরভিসন্ধি আঁচ করিয়া কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে কৌশলে উজিরকে মুক্ত করিলেন। হামিদ খান দিল্লী পালাইয়া আসিলেন। দিল্লীতে সুলতানের যাহা কিছু সাজসরঞ্জাম মালপত্র ছিল তাহা সব দখল করিয়া লইয়া সুলতানের হারেমের মহিলাদিগকে শহরের বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন। নির্বোধ অকর্মণ্য আলা-উদ-দীন প্রতিকূল আবহাওয়া, অশুভদিন, ইত্যাকার নানা অছিলায় দিল্লী আগমন বিলম্বিত করিতে লাগিলেন। ইহাতে উজির দিল্লী অধিকারের জন্য বাহলুল লোদীকে আমন্ত্রণ জানাইবার যথেষ্ট সময় পাইলেন। বাহলুল এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণের জন্য অবিলম্বে দিল্লী রওয়ানা হইলেন—এবং সুলতানকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে, উজিরকে শায়েস্তা করিবার জন্যই তিনি দিল্লী আসিতেছেন। দিল্লী পৌঁছিয়া বাহলুল লোদী নিঃশব্দে রাজধানী অধিকার করিয়া লইলেন এবং নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ৮৫৪ হিজরীতে (১৪৫০ খ্রী:) এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। কিন্তু শুধু একটা জিনিস হইতে আলা-উদ-দীনকে বঞ্চিত করিলেন না, তাহা হইল পূর্বের মতই খোতবায় তাহার নাম ব্যবহার করিবার হুকুম দিলেন। পুত্র বায়জিদকে দিল্লী রাখিয়া বাহলুল লোদী দিপালপুর চলিয়া গেলেন—আফগানদিগকে লইয়া সৈন্যবাহিনী গঠন করিবার জন্য। দিপালপুরে নিজের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—আর সুলতানকে লিখিয়া পাঠাইলেন যে, উজিরকে বহিষ্কৃত করিবার জন্যই তিনি দিল্লী অধিকার করিয়াছেন। এই পত্রের উত্তরে সুলতান বাহলুল লোদীকে লিখিলেন, 'যেহেতু সাবেক সুলতান আপনাকে পুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন সেই সুবাদে আপনি আমার ভ্রাতা এবং চিরকাল আমি আপনাকে ভাই বলিয়া শ্রদ্ধা করিব।' সুলতান আলা-উদ-দীন আরও জানাইলেন যে, "তাঁহাকে নির্বিঘ্নে বাদায়ুনে

বাস করিতে দেওয়ার শর্তে তিনি বাহ্‌লুল লোদীকে প্রকাশ্যে সিংহাসন ছাড়িয়া দিতে প্রস্তুত। সেই সময় হইতে খোত্‌বায় সৈয়দ আলা-উদ-দীনের নামোল্লেখ বন্ধ করিয়া দিয়া বাহ্‌লুল লোদী নিজে পূর্ণ শাহীমর্যাদা গ্রহণ করিলেন। আলাউদ-দীন জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বাদায়ুনে নির্বিঘ্নে ও নিরিবিলি বাস করিয়াছিলেন। ৮৮৩ হিজরীতে (১৪৭৮ খ্রী:) তিনি ইন্তেকাল করেন। দিল্লীতে তিনি রাজত্ব করিয়াছিলেন সাত বৎসর এবং বাদায়ুনে অবসর জীবনযাপন করিয়াছিলেন প্রায় আটাইশ বৎসর।

দিল্লীর সুলতানদের পঞ্চমবংশ এবং লোদী বংশীয় আফগানদের প্রথম রাজবংশ

বাহ্লুল লোদী

বায়জিদ বারবিক আলা-উদ-দীন সিকান্দর জামাল ইয়াকুব ফতেহ্ মুসা জালাল

(বায়জিদ) আজিম হুমায়ুন

(সিকান্দর) জালাল ইব্রাহীম ইসমাইল হুসেন মাহমুদ

বাহ্লুল্ লোদী আফগান

[বাহ্লুলের ক্ষমতালাভের গোড়ার কথা। প্রাক্তন সুলতানের মন্ত্রী হামিদ খানকে পুনরায় কার্য গ্রহণ করিবার অনুমতি প্রদান। অবশেষে তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করিয়া বিনা রক্তপাতে সরকারী কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্যকরণ। দিল্লীর সমীপবর্তী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের কর্তাদের বাহ্লুল লোদীকে স্বীকৃতি দানে অসম্মতি জ্ঞাপন। জৌনপুর ব্যতীত সমস্ত রাজ্যের উপর বাহ্লুলের প্রভুত্ব স্থাপন। পর পর তিনটি সুলতানের শাসনকাল ব্যাপী বাহ্লুল লোদী জৌনপুরের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শেষ পর্যন্ত উহা অধিকার করিতে সমর্থ। তাঁহার গোয়ালিয়র গমন এবং সেখানে অসুস্থ হইয়া দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা। মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্তিকরণ। পুত্র নিজাম খানকে উত্তরাধিকারী মনোনীতকরণ। পুত্র বারবিককে জৌনপুর রাজ্য প্রদান এবং পুত্র আলমকে কারা মানিকপুর মঞ্জুরকরণ। ভ্রাতুষ্পুত্র কালা পাহাড়কে ভাইরাক প্রদান এবং হুমায়ুন নামক এক আত্মীয়কে লক্ষ্ণৌ ও কালপী দান। উত্তরাধিকারী পুত্র নিজামের অধীনে রহিল দিল্লী ও অবশিষ্ট রাজ্যগুলি। আটত্রিশ বৎসর রাজত্বের পর তাঁহার মৃত্যু। তাঁহার চরিত্র ও হুকুমতের বিবরণ।]

কথিত আছে যে, পুর্বে আফগান বংশীয় লোকেরা এক বণিক সম্প্রদায়ে পরিণত হইয়াছিল এবং তাহারা পারস্য ও আফগানিস্তানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করিত। ফিরোজ তোগলকের রাজত্বকালে বাহ্লুলের পিতামহ বৈরাম লোদী প্রচুর ধন-

সম্পদ অর্জন করিয়া ভ্রাতার নিকট হইতে পৃথক হইয়া পড়েন এবং মালিক মর্দান দৌলতের অধীনে কর্ম গ্রহণ করিয়া শেষ পর্যন্ত মুলতানের শাসনকর্তার পদ লাভ করেন। মালিক বৈরামের পাঁচ পুত্র ছিল। তাহাদের নাম—মালিক সুলতান, মালিক কালী, মালিক ফিরোজ, মালিক মুহাম্মদ এবং মালিক খাজা। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁহারা সকলে মুলতানেই ছিলেন।

খিজির খান মুলতানের সুবাদার হইয়া মালিক সুলতানকে আফগান বাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। খিজির খানের সঙ্গে মালু ইয়েকবাল খানের যে যুদ্ধ হয়—সেই যুদ্ধে ভাগ্যের জোরে মালিক স্বহস্তে মালু ইয়েকবালকে বধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি খিজির খানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হন এবং খিজির খান তাঁহাকে ইসলাম খান উপাধি প্রদান করিয়া সারহিন্দের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তাঁহার ভ্রাতাগণও তাঁহার সৌভাগ্যের অংশীদার হইয়াছিলেন। ইসলাম খানের ভাইদের অন্যতম ছিলেন বাহ্‌লুলের পিতা মালিক কালী। মালিক কালীর প্রকৃত নাম ছিল বুল্লু। তিনি তাঁহার চাচাতো বোনকে শাদী করিয়াছিলেন। মালিক কালীর স্ত্রী গর্ভাবস্থায় গৃহ পতনে নিষ্পিষ্ট হন। তাঁহার স্বামী সঙ্গে সঙ্গেই স্ত্রীর পেট কাটিয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করেন। এই সন্তানই বাহ্‌লুল। মালিক কালী নিয়াজী আফগানদের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত হইলে বাহ্‌লুল তাঁহার চাচার নিকট সারহিন্দে চলিয়া যান। যোদ্ধা হিসাবে তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন এবং সেই জন্য ইসলাম খান তাঁহাকে কন্যাদান করেন। ইসলাম খানের সেনাবাহিনীর বিশেষত্ব ছিল এই যে, ইহাতে ১২,০০০ আফগান ছিল—যাহাদের অধিকাংশই তাঁহার স্বজাতি। মৃত্যুকালে নিজের প্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র থাকা সত্ত্বেও তিনি বাহ্‌লুলকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান এবং তাঁহাকে সেনাবাহিনীর নেতৃত্বও প্রদান করেন। এই সময় আফগানরা তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। একদল মালিক বাহ্‌লুলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রহিল, আর একদল মালিক ইসলাম খানের ভ্রাতা মালিক ফিরোজের সঙ্গে রহিল। মালিক ফিরোজ দিল্লীর সুলতানের একজন কর্মচারী ছিলেন। অন্য আর এক অংশ মালিক ইসলাম খানের পুত্র কুতুব খানের দলে রহিল। কিন্তু বাহ্‌লুল নিজের বুদ্ধি বলে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে দুর্বল করিয়া ক্রমশঃ নিজের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।

বাহ্‌লুলের শক্তি বৃদ্ধিতে ঈর্ষান্বিত হইয়া মালিক কুতুব খান দিল্লী যাইয়া সুলতান সৈয়দ মুহাম্মদকে জানাইলেন যে, আফগানরা সারহিন্দে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য

স্থাপনের চেষ্টা করিতেছে এবং তাহাদিগকে এখনই বাধাদান না করিলে তাহারা একদিন তাঁহার সিংহাসন বিপন্ন করিবে। এই কথার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সুলতান উজির মালিক সিকান্দর তোহ্ফাকে একদল সৈন্যসহ সারহিন্দের দিকে প্রেরণ করেন। উজিরের প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তিনি আফগান প্রধানদিগকে দরবারে হাজির হইতে বলিবেন এবং তাহাতে সম্মত না হইলে তিনি তাহাদিগকে সারহিন্দ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবেন। আফগানদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণের জন্য জসরত গোক্করকে উস্কাইয়া দেওয়া হইল। শেষ পর্যন্ত আফগানদিগকে পাহাড়ে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পর মালিক ফিরোজ লোদী—পুত্র শাহীন খান ও ভ্রাতুষ্পুত্র বাহ্লুলকে সেনাবাহিনীসহ পশ্চাতে রাখিয়া কয়েকজন মাত্র অনুচর লইয়া মালিক সিকান্দর তোহ্ফা ও জসরত গোক্করের শিবিরে গমন করেন। তাহাকে কসম খাইয়া নিরাপত্তার নিশ্চয়তা প্রদান করা হইয়াছিল। কিন্তু ভ্রাতুষ্পুত্র কুতুব খানের প্ররোচনায় মালিক ফিরোজকে বন্দী করা হইল এবং তাহার অনুচরদিগকে কাটিয়া ফেলা হইল। তারপর বাহ্লুলকে দমন করিবার জন্য তাহার বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল। বাহ্লুল পরিবার পরিজনবর্গসহ জঙ্গলে পালাইয়া রক্ষা পাইল। কিন্তু শাহীন খান ধৃত হইয়া প্রাণ হারাইল এবং তাহার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক নিহত হইল। শাহীন খানকে হত্যা করিবার পর তাহার মস্তক জসরত গোক্করের নিকট লইয়া যাওয়া হয় এবং উহা সনাক্ত করিবার জন্য শাহীনের পিতা মালিক ফিরোজের সম্মুখে স্থাপন করা হইয়াছিল। মালিক ফিরোজ প্রথম ঐ মস্তক যে তাঁহার পুত্রের তাহা অস্বীকার করে। পরে যাহারা মস্তক লইয়া আসিয়াছিল তাহাদের নিকট পুত্রের বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহার অশ্রুর বাঁধ ভাঙ্গিয়া পড়িল এবং তিনি বলিলেন, "হাঁ। এই আমার সন্তান। সে যে আমার জাতির মুখ রক্ষা করিয়াছে—সে সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারিলে আমি কখনই তাহাকে পুত্র বলিয়া স্বীকার করিতাম না। আমার ভ্রাতুষ্পুত্র বাহ্লুল নিশ্চয়ই যুদ্ধক্ষেত্রে ছিল না; থাকিলে সেও যুদ্ধ করিয়া প্রাণ বিসর্জন দিত। সে জীবিত আছে এবং সে আমার সন্তানের প্রতিশোধ একদিন গ্রহণ করিবেই"।[১]

১ আফগানদের প্রতিহিংসার কথা ভারতে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়া রহিয়াছে। কথায় বলে, হস্তী, কোত্রা ও আফগানদের প্রতিহিংসা হইতে কাহারো নিস্তার নাই।

জসরত গোক্কর পাঞ্জাবে ফিরিয়া তাহার কওমের লোকদিগকে সংঘবদ্ধ করিয়া রাজস্ব আদায় করিতে লাগিলেন। লুণ্ঠনলব্ধ ধন তিনি সৈন্যদের মধ্যে মুক্তহস্তে বণ্টন করিয়া দিলেন। ইহার ফলে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়া উঠিলেন এবং তাহার অনুচর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছু দিন পর মালিক ফিরোজ কোন প্রকারে পালাইয়া যাইয়া বাহ্‌লুল লোদীর সঙ্গে মিলিত হইলেন। এদিকে কুতুব তাহার পূর্ব আচরণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া তাঁহার আত্মীয়দের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বাহ্‌লুলের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হইয়া আফগানরা সারহিন্দ আক্রমণ করিয়া উহা অধিকার করিয়া লইলেন। এই ঘটনার সংবাদ পাইয়া সুলতান তাঁহার উজির হিশাম খানকে আফগানদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহ্‌লুল তাঁহাকে যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। জনশ্রুতি আছে যে, বালক বয়সে বাহ্‌লুল একবার শায়দা নামক সামানার এক বিখ্যাত দরবেশকে সম্মান প্রদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি যখন দরবেশের সম্মুখে নতজানু হইয়া সম্মান প্রদর্শনের জন্য বসিয়াছিলেন, তখন দরবেশ উচ্চস্বরে বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "দিল্লী সাম্রাজ্যের জন্য কে ২,০০০ টাকা দিবে"? তখন বাহ্‌লুল বলিয়াছিলেন, "আমার নিকট মাত্র ১,৬০০ টাকা আছে"। এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ সেই টাকা আনাইয়া দরবেশকে উপহার দেন। টাকাটা গ্রহণ করিয়া দরবেশ বাহ্‌লুলের মাথায় হাত রাখিয়া বলিয়াছেন, "সাবাস বেটা! আল্লাহ্‌ যেন তোমাকে সত্য সত্যই দিল্লীর সুলতানাত মঞ্জুর করেন"। এই কথা লইয়া বাহ্‌লুলের সঙ্গীরা তাঁহাকে খুব উপহাস করিয়াছিল। কিন্তু বাহ্‌লুল বলিয়াছিলেন, "দিল্লীর সুলতানাত যদি হাসিল হয়, তবে বলিতে হইবে আমি ইহা খুব সস্তায় কিনিয়াছি। আর সুলতানাত যদি নাই পাই—একজন দরবেশের দোওয়া তো পাইলাম। ইহাই বা কম কি? ইহা দ্বারা আমার কোন ক্ষতি তো আর হইতেছে না।"

উজিরকে পরাস্ত করিয়া ও তাহার নামে দোষারোপ করিয়া বাহ্‌লুল সুলতানের নিকট পত্র লিখিয়াছিলেন (যাহা পূর্বে বলা হইয়াছে) যে, উজিরের দুর্ব্যবহারেই তাঁহাকে বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করিতে বাধ্য করিয়াছে। বাহ্‌লুলের এই কথার উপর নির্ভর করিয়া সুলতান জঘন্যভাবে উজিরকে হত্যা করান এবং বাহ্‌লুলকে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি প্রদানকরেন। এই সাক্ষাতের ফলে তিনি তাঁহার দুরভিসন্ধি রাজধানীতে প্রসারিত করিবার

সুযোগ লাভ করেন। দিল্লীতে তিনি তাঁহার ব্যাপার এমনভাবে গুছাইয়া নিলেন যে, তাঁহাকে বিধিবদ্ধভাবে সারহিন্দের শাসনকর্তার পদে বহাল করা হইল এবং পার্শ্ববর্তী আরও কয়েকটি জিলাকে তাহার সুবার সঙ্গে যোগ করিয়া দেওয়া হইল।

মালবের সুলতান মাহমুদ খিল্‌জী যখন দিল্লী আক্রমণ করিতে আসেন তখন সুলতান বাহ্‌লুল লোদীকে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ জানাইয়াছিলেন। বাহ্‌লুল ২০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সুলতানের সাহায্যার্থ দিল্লী আগমন করেন। এই সৈন্য দ্বারাই তিনি মাহ্মুদ খিলজীর পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং তাঁহার দিল্লী ত্যাগের পর দিনই মাহ্মুদ খিল্‌জীর বাহিনীকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের মালপত্র সব হস্তগত করেন। তাহার এই কৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপ সুলতান তাঁহাকে খান খানান উপাধি প্রদান করেন। ইহার পর সারহিন্দ পৌঁছিয়া বাহ্‌লুল আর কালক্ষেপ না করিয়া তাঁহার সুবার সংলগ্ন সুলতানের রাজ্যান্তর্গত লাহোর, দিপালপুর ও সুনামের উপর হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাতেও তৃপ্ত না হইয়া তিনি খোদ সুলতানের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং দিল্লী অবরোধ করেন। কিন্তু সেবার তাঁহাকে বিফল মনোরথ হইয়া সারহিন্দ ফিরিয়া যাইতে হয়। ইতিমধ্যে সুলতানের আকস্মিকভাবে মৃত্যু ঘটে এবং তাঁহার পুত্র আলা-উদ-দীন সিংহাসনে আরোহণ করেন। তারপর যাহা ঘটিয়াছিল পূর্বেই বলা হইয়াছে। ইহার কয়েক বৎসর পর শাসন ব্যবস্থার ও দিল্লীর শক্তির ক্রমাবনতি লক্ষ্য করিয়া উজির হামিদ খান সারহিন্দ হইতে বাহ্‌লুল লোদীকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তিনি আসিয়া সিংহাসনে উপবেশন করিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন।

সিংহাসনারোহণকালে বাহ্‌লুল লোদীর নয় পুত্র ছিল নাম—বায়জিদ, নিজাম (যিনি পরে সিকান্দর নাম ধারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন), বারবিক, আলম (আলা-উদ-দীন নাম ধারণ পূর্বক তিনিও সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন), জামাল, ইয়াকুব[২] ফতেহ, মুসা এবং জালাল। রাষ্ট্রের খ্যাতনামা আমীরদের

২ দাউদ, মুসা, ইয়াকুব প্রভৃতি হিব্রু নামের বহুল প্রচলন দেখিয়া আফগানদিগকে ইহুদী বংশদ্ভুত বলিয়া মনে হওয়া স্বাভাবিক। পাঠকরা কষ্ট করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাইবেন যে, আফগান ব্যতীত অন্য কোন মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সব নাম খুব কমই দেখা যায়।

মধ্যে অন্ততঃপক্ষে ৩৬ জনের সঙ্গে সুলতানের রক্তের সম্বন্ধ বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। উজির হামিদ খান—যিনি তাঁহার হস্তে রাজ্য তুলিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহার প্রথম দিকে যথেষ্ট প্রভাব ছিল। বাহলুল তাহাকে বিশেষ সমীহ করিয়া চলিতেন। পরে সুলতান তাঁহাকে কৌশলে বন্দী করেন। উজিরের গৃহে একদিন জলসার ব্যবস্থা হয়—যাহাতে সুলতান নিজে উপস্থিত ছিলেন। এই সময় সুলতান তাঁহার আফগান বন্ধুদিগকে সঙ সাজিয়া ইতর জনোচিত অভিনয় করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য—উজিরকে তাহাদের সম্পর্কে অসতর্ক করিয়া তোলা। তাহারা যখন দলবদ্ধ হইয়া প্রবেশ করিল তখন দেখা গেল, তাহাদের কয়েকজনের কোমরে জুতা বাঁধা। কেহ আবার কক্ষের মধ্যেই জুতা রাখিল। হামিদ খান ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিয়াছিল, জুতা চুরি হওয়ার ভয়েই তাহারা জুতা ভিতরে আনিয়াছিল। আসন গ্রহণ করিবার পর একজন কার্পেটে অঙ্কিত ফুল দেখিয়া প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া বলিল যে, এইরূপ একটা কার্পেট পাইলে সে বাড়ী লইয়া কাটিয়া ছেলেদের টুপি বানাইয়া দিত। হামিদ খান উচ্চহাস্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "কার্পেট কাটিয়া টুপি বানাইতে হইবে কেন? আমি তোমাকে ভেলভেট বা জরির কাপড় দিবো।" যখন আতরের থালা ও কৌটা তাহাদের সম্মুখে রাখা হইল তখন তাহাদের কেহ কেহ সর্বোৎকৃষ্ট আতর সর্বাঙ্গে মাখিতে লাগিল। আবার কেহ বা উহা চাটিয়া খাইতে লাগিল। কেহ বা ফুলের মালার ফুলগুলিই খাইয়া ফেলিল। কাড়াকাড়ি করিয়া পানের পাতাগুলি লইয়া গোগ্রাসে গিলিতে লাগিল। একজন আহ্লাদের আতিশয্যে চুনের একটা বড় দলা মুখে দিয়া মুখ পুড়িয়া ফেলিল—তারপর মুখ বিকৃত করিয়া বিড় বিড় করিতে লাগিল। উজিরের ভৃত্য ও অন্যান্য অতিথিরা এইরূপ আচরণ দেখিয়া বিস্ময়াভিভূত হইল। তাহারা ভাবিল—ইহারা বিদেশী বলিয়া দরবারের আদব-কায়দার সঙ্গে পরিচিত নয়। সুলতান ও উজির তো হাসিয়াই খুন।[৩]

---

৩ সম্ভ্রান্ত মুসলমানদের ভোজসভার সুরুচিপূর্ণ পরিবেশের সঙ্গে যাহাদের পরিচয় নাই, তাহারা ফিরিশতা বর্ণিত এই দৃশ্যের অভাবনীয়তা উপলব্ধি করিতে পারিবে না। বেশী দূর নয়—শুধু পেশোয়ার হইতে ভারতে আসিয়া বর্তমান সময়েও আফগানরা যে-সব অদ্ভুত আচরণ করে, তাহা যাহার জানা নাই, সেও ইহা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

উজির ভাবিলেন, তাঁহার গৃহে একটু স্ফূর্তি করিবার জন্যই সুলতান এই ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং এইসব লোককে আমদানী করিয়াছেন। এসব সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড দেখিয়া তাঁহার মনে কোনরূপ সন্দেহের উদ্রেক হয় নাই। পরে সুলতান হামিদ খানের সঙ্গে মোলাকাত করিতে আসিলেন। তার সঙ্গে অনেক দেহরক্ষীও আসিল। কিন্তু যেহেতু প্রাঙ্গণে হামিদ খানের বন্ধু-বান্ধবের সংখ্যা তখনও অনেক বেশী ছিল—সুলতানের পক্ষে আরও লোক ভিতরে আসার প্রয়োজন হইল। বাহিরে প্রহরীরা এত লোককে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করিল। এমতাবস্থায় তাহাদিগকে কি প্রকারে প্রবেশ করিতে হইবে তাহা সুলতান পূর্বেই শিখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহারা প্রহরীদের সঙ্গে উচ্চৈঃ-স্বরে কথা কাটাকাটি করিতে লাগিল এবং তাহাদিগকে সঙ্গে না নেওয়ার জন্য সুলতানকে গালাগালি করিতে লাগিল। তাহারা কসম করিয়া বলিতে লাগিল যে, তাহারা উজিরের বন্ধু, উজিরকে তাহারা শ্রদ্ধা করেন এবং তাহারা তাঁহার সাক্ষাৎ প্রার্থী। গোলমাল শুনিয়া হামিদ খান প্রাঙ্গণের দরওয়াজা খুলিয়া দিতে বলিলেন এবং যত সংখ্যক আফগানদের স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে তত সংখ্যক আফগানকে ভিতরে আসিবার অনুমতিদান করিলেন। এ পর্যন্ত পরিকল্পনা কার্যকরী করিবার পর সুলতান তাঁহার লোকদিগকে শেষাংশ সমাধা করিবার ইঙ্গিত প্রদান করিলেন। অমনি আফগানরা অসি নিষ্কাশিত করিয়া উজিরের ভৃত্যদিগকে নির্বাক ও নিষ্ক্রিয় থাকিতে বলিল। ভৃত্যদিগকে অভয়দান করা হইল যে, তাহাদের কোন ক্ষতি করা হইবে না। এই বলিয়া তিন চারজন উজিরকে ধরিয়া মজবুত করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। উজিরকে আশ্বাস দিয়া সুলতান বলিলেন, "আপনার কোন ভয় নাই। আমার কৃতজ্ঞতা-বোধ আপনার জন্য রক্ষাকবজ। শুধু আপনাকে কর্মে ইস্তাফা দিয়া অবশিষ্ট জীবন অবসর ভোগ করিতে হইবে।" সেই বৎসরই ৮৫৫ হিজরীতে (১৪৫১ খ্রীঃ) জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জিদের উপর রাজধানীর দায়িত্ব অর্পণ করিয়া সুলতান মুলতানাভিমুখে রওয়ানা হইলেন। এই অভিযানের উদ্দেশ্য একাধারে সৈন্য-দিগকে কর্মলিপ্ত রাখা এবং দ্বিতীয়তঃ পশ্চিম প্রদেশগুলির শাসন ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করা। তাঁহার কয়েকজন সেনাপতি অসন্তুষ্ট হইয়া দল ত্যাগ করিয়া মাহমুদ শাহ শর্কীর পক্ষাবলম্বন করেন। বাহ্লুল বাদশাহ্র অনুপস্থিতকালে ৮৫৬

হিজরীর প্রথম ভাগে (খ্রীঃ ১৪৫২) মাহমুদ শাহ্ শর্কী দিল্লী অবরোধ করেন। এই সংবাদ পাইয়া বাহ্লুল লোদী দিপালপুর ইইতে রওয়ানা হইয়া অবিরাম ছুটিয়া দিল্লীর ৩০ মাইল দূরে পেরায় আসিয়া পেঁাছেন। তঁাহাকে বাধাদানের জন্য মাহমুদ শাহ্ শর্কী ফতেহ্ খান হার্ভির পরিচালনাধীনে ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৩০টি হস্তী সম্বলিত এক বাহিনী প্রেরণ করেন। উভয়পক্ষে সংগ্রাম আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধে ইসলাম খানের পুত্র কুতুব খান লোদী ফতেহ্ খান হার্ভির হস্তীর ললাটে একটি তীর বিদ্ধ করিয়া দেয়। তীর বিদ্ধ জন্তুটি তখন ক্ষিপ্ত হইয়া স্বপক্ষের কাতার ভাঙ্গিয়া বিষম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। যুদ্ধক্ষেত্রে কুতুব খানের সঙ্গে দরিয়া খানের সাক্ষাৎ হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যে-সব সেনাপতি পূর্বে দলত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন—দরিয়া খান তাহাদের অন্যতম। কুতুব খানের সহিত দরিয়া খানের সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাহাকে শ্লেষব্যঞ্জক সুরে তিরস্কার করিয়া বলেন, "ধিক, দরিয়া খান। কোথায় গেল তোমার আত্মমর্যাদাবোধ? তুমি আজ তোমার কওমের লোকের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছ। যে দিল্লীতে তোমার পরিবার-পরিজন রহিয়াছে সেই দিল্লী তুমি অবরোধ করিয়াছ। অথচ তোমার কর্তব্য ছিল তোমার কওমের দুশমনের হাত হইতে এই দিল্লীকে প্রাণপণে রক্ষা করা।" দরিয়া খান তাহাকে বলিল, "আমার পশ্চাদ্ধাবন করিও না, তাহা হইলে আমি মারা পড়িব।' এই বলিয়া তিনি পিছু ফিরিয়া বিপক্ষ দলে যোগদানের জন্য ছুটিলেন।" ফতেহ্ খান হার্ভির দলের অন্য আফগানরাও তাঁহাকে অনুসরণ করিল। এইরূপে দল ভঙ্গ হওয়ায় শত্রুপক্ষ ছত্রভঙ্গ হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। ফতেহ্ খান বন্দী হইল। এই ফতেহ্ খান করন রায়ের ভ্রাতা পৃথ্বী রায়কে স্বহস্তে বধ করিয়াছিলেন। করন রায় সেই আক্রোশে ফতেহ্ খানের মস্তক কাটিয়া বাহ্লুল লোদীর নিকট প্রেরণ করে। এই পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া মাহমুদ শাহ্ শর্কী দিল্লী অবরোধ উঠাইয়া ঊর্ধ্বশ্বাসে জৌনপুর অভিমুখে পলায়ন করেন।

বাহ্লুল লোদী ক্ষমতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর রাজ্য জয়ের দিকে মনোযোগ দিলেন। প্রথমে তিনি মেওয়াট গমন করেন এবং আহমদ খান মেওয়াটি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়া সাতটি পরগণা ছাড়িয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ

করদরাজ্য হিসাবে ভোগ করিবার অনুমতি গ্রহণ করেন। মেওয়াট হইতে তিনি বিরান গমন করেন। সেখানে সম্বলের সুবাদার দরিয়া খান লোদী তাঁহাকে সাতটি সুদর্শন হস্তী উপহার দেন এবং তাহার প্রভুত্ব স্বীকার করিয়া লন। অতঃপর বাহ্লুল লোদী বিরানের কাজ শেষ হইলে কোল গমন করেন। সেখানে ইসা খানকে ঐ জিলার শাসনকর্তার পদে বহাল করিয়া বুরহানাবাদের পথ ধরেন। মুবারিক খান লোহানীকে বুরহানাবাদের শাসনভার অর্পণ করা হয় এবং প্রতাব রায়কে মইনপুরী ভুঁইগামের দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বাহ্লুল লোদী অতঃপর রাবেরী পৌঁছিলে হুসেন আফগানীর পুত্র কুতুব খান দুর্গের তোরণ বন্ধ করিয়া সুলতানকে প্রবেশ করিতে দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে তিনি আত্মসমর্পণ করায় তাঁহাকে ক্ষমতায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। বাহ্লুল সেখান হইতে আটোয়া গমন করেন এবং তথাকার শাসনকর্তাকেও স্বপদে বহাল করেন। এই সময় জুনা খান নামক এক আমীর বিরক্ত হইয়া রাজধানী ত্যাগ করিয়া মাহমুদ শাহ শর্কীর দলে যাইয়া যোগদান করেন। মাহমুদ শাহ তাঁহাকে শামসাবাদের শাসনকর্তার পদ প্রদান করেন। তাঁহারই প্ররোচনায় মাহমুদ শাহ্ শর্কী দিল্লী জয়ের জন্য আর একবার চেষ্টা করিতে স্বীকৃত হইয়া আটোয়া পর্যন্ত চলিয়া আসেন। দিল্লীর ফৌজ সেখানে ছাউনী ফেলিয়া অবস্থান করিতেছিল। প্রথম দিন উভয় সুলতান পর্যবেক্ষক দল প্রেরণ করিয়া বিপক্ষের অবস্থান ও অবস্থা নিরূপণ করেন। এই সময় কোনরূপ সংঘর্ষ হয় নাই। পরদিন তাহাদের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়, উহা হইল—সৈয়দ মুবারিকের রাজত্বকালে যে সব প্রদেশ দিল্লীর অধীনে ছিল তাহা বাহ্লুল লোদীর এবং ইব্রাহীম শাহ্ শর্কীর অধীনে যেসব প্রদেশ ছিল সেসব মাহমুদ শাহ্ শর্কীর অধিকারভুক্ত থাকিবে। আরও স্থির হইল যে, ফতেহ্ খান হাভির সঙ্গে যুদ্ধে যেসব হস্তী বাহ্লুলের হস্তগত হইয়াছিল সেসব তিনি মাহমুদ শাহ্ শর্কীকে প্রত্যার্পণ করিবেন এবং বিনিময়ে মাহমুদ শাহ্ শর্কী জুনা খানকে তাঁহার চাকুরী ও শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারিত করিবেন। এই চুক্তি সম্পাদন করিবার পর উভয় বাহিনী পশ্চাদাপসরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দেয়।

এই চুক্তি সম্পাদনের পর মাহমুদ শাহ্ শর্কী জৌনপুর প্রত্যাগমন করেন এবং বাহ্লুল শাম্সাবাদ দখল করিবার জন্য অগ্রসর হন। এই সংবাদ পাইয়া মাহমুদ ক্রুদ্ধ হইয়া শাম্সাবাদ ফিরিয়া আসেন। সেখানে কুতুব খান লোদী ও দরিয়া খান লোদীর নেতৃত্বে দিল্লীর দুইটি বাহিনী রাত্রিকালে শর্কী শিবিরে

অতর্কিতে হামলা করে। এই নৈশযুদ্ধে কুতুব খানের অশ্বপদ একটা তাঁবুর খুঁটির উপর পড়িয়া পিছ্‌লাইয়া যায়। ইহাতে কুতুব খান অশ্ব হইতে পতিত হইয়া বন্দী হন।[৪] কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল নির্বিঘ্নে শিবিরে ফিরিয়া যায়। পরদিন প্রভাতে বাহ্‌লুল লোদী যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তিনি শুনিতে পাইলেন যে, সেই রাত্রেই মাহমুদ শাহ্‌ শর্কী প্রাণত্যাগ করিয়াছেন এবং উজিররা তাঁহার পুত্র মুহাম্মদ শাহ্‌কে তখ্‌তে বসাইয়াছেন। তরুণ শর্কী সুলতানের মাতা বিবি রাজীর মধ্যস্থতায় সন্ধি সম্পাদিত হইল। মুহাম্মদ শাহ্‌ শর্কীও জৌনপুর ফিরিয়া গেলেন এবং বাহ্‌লুল দিল্লীর পথ ধরিলেন।

রাজধানী পৌঁছিবার পূর্বেই তিনি কুতুব খানের ভগ্নী শামস্‌ খাতুনের নিকট হইতে এক পত্র পাইলেন। পত্রে তিনি তাঁহার ভ্রাতাকে মুহম্মদ খানের শিবির হইতে উদ্ধার করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়াছেন। সন্ধির শর্ত ভঙ্গ করিয়া বাহ্‌লুল পুনরায় জৌনপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। সাসনীর নিকট মুহাম্মদ শাহ্‌ শর্কীর সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। এইখানে মুহাম্মদ শাহ্‌ শর্কীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা হুসেন শাহ্‌ শর্কী ভ্রাতার ভয়ে তাঁহার অনুচরসহ বিচ্ছিন্ন হইয়া কনৌজাভিমুখে পলায়ন করেন এবং তাঁহার অপর ভ্রাতা জালাল খান শর্কীও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন। বাহ্‌লুল এই ঘটনার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন। তিনি হুসেন খানকে পাকড়াও করিবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহারা হুসেন খানকে ধরিতে অসমর্থ হয়। তবে তাহারা জালাল খানকে বন্দী করিতে সমর্থ হয়। বাহ্‌লুল লোদী স্থির করিলেন যে, জৌনপুরের সুলতান কুতুব খানকে ফিরিইয়া না দিলে তিনিও জালাল খানকে ফিরাইয়া দিবেন না। ইতিমধ্যে শর্কীর আমীররা মুহাম্মদ শাহ্‌র বিরুদ্ধে এক চক্রান্ত করিয়া তাঁহাকে মারিয়া ফেলিলেন এবং কনৌজ হইতে হুসেন শাহ্‌ শর্কীকে ডাকিয়া আনিয়া তাঁহাকে সিংহাসন প্রদান করিলেন। কুতুব খান ও জালাল খানের মুক্তির শর্তে বাহ্‌লুল খান চারি বৎসরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন করেন। বাহ্‌লুল লোদী অতঃপর শাম্‌সাবাদ চলিয়া আসেন। সেখানে প্রতাপ রায়ের পুত্র নরসিংহ রায় তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন করিতে আসিলেন। মনে হয় নরসিংহ রায় পূর্বে কোন যুদ্ধে দরিয়া খান লোদীর নিকট হইতে একটা নিশান ও একজোড়া নাকাড়া হস্তগত

৪ প্রসঙ্গতঃ মনে হয়, এই ব্যক্তি সেই ব্যক্তি নন যিনি রাবেরীর প্রশাসক ছিলেন। অন্য কেউ হবেন।

করিয়াছিলেন। তারই প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে দরিয়া খান লোদী হুসেন খানের পুত্র কুতুব খানের নিষেধ উপেক্ষা করিয়া নরসিংহ রায়কে খুন করায়। দরবারে দরিয়া খানের অপ্রতিহত ক্ষমতাদর্শনে ভীত হইয়া মুবারিক খান হুসেন শাহ্ শর্কীর নিকট পালাইয়া গেলেন। বাহ্লুল লোদী দিল্লী ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরেই মুলতানের বিদ্রোহ দমন ও পাঞ্জাবে গোলযোগ নিবারণের জন্য তাঁহাকে তথায় রওয়ানা হইতে হয়। কিছুদুর যাইবার পর তিনি সংবাদ পাইলেন যে, তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে হুসেন শাহ্ শর্কী দিল্লী অবরোধ করিবার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইয়াছেন। অগত্যা তাঁহাকে দিল্লী ফিরিতে হইল এবং কুতুব খান ও জাহান খানের উপর দিল্লীর দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া বাহ্লুল শত্রুর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন। চান্দোয়ার গ্রামে দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইল। সেখানে উভয় পক্ষ সাত দিন ব্যাপী দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত থাকিল। কিন্তু কোনরূপ মীমাংসা হইল না। শেষ পর্যন্ত তিন বৎসরের জন্য একটা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই মেয়াদ অতিবাহিত হইবার পর হুসেন শাহ আটোয়া অবরোধ ও অধিকার করেন এবং আহমদ খান মেওয়াটি ও কোলের ইসা খানকে তাঁহার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট করেন। বিয়ানার শাসনকর্তা আহমদ খান জুলানীও তাঁহার দলে আসিলেন এবং তিনি এতদূর অগ্রসর হইলেন যে, তাঁহার এলাকায় শর্কী সুলতানের নামাঙ্কিত মুদ্রা প্রচলন এবং খোতবায় শর্কী সুলতানদের নামোচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিলেন। শর্কী অধিপতি এইবার ১,০০,০০০ অশ্বারোহী ও ১,০০০ হস্তী লইয়া আটোয়া হইতে দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হইলেন। হুসেন শাহ্ শর্কীর ফৌজের বিপুল সংখ্যাধিক্যে ভীত না হইয়া বাহ্লুল লোদী বীরবিক্রমে শত্রুকে বাধাদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। দুই বাহিনী ভাট্‌ওয়ারায় পরস্পরের দৃষ্টিসীমার মধ্যে শিবির স্থাপন করিয়া কিছুকাল অবস্থান করিল। এই সময় কয়েকটি খণ্ড যুদ্ধ হয়। তাহাতে কোন পক্ষই বিশেষ সুবিধা অর্জন করিতে সমর্থ হয় নাই। শেষ পর্যন্ত পুনরায় আর একটি ফাঁপা অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই শান্তি চুক্তি বেশীদিন স্থায়ী হইল না। কয়েকদিন পরেই হুসেন শাহ্ শর্কী পুনরায় দিল্লীর পথে পা বাড়াইলেন। কিন্তু শক্কর গ্রামে বাধা প্রাপ্ত হইয়া তিনি পশ্চাদাপসরণ করিতে বাধ্য হন। এই অভিযানে তাহার এক কানাকড়িও লাভ হইল না।

এই সময় আটোয়ায় হুসেন শাহ্ শর্কীর মাতা বিবি রাজীর ইন্তেকাল করেন। এই সময় হুসেন শাহ্কে সমবেদনা জ্ঞাপনের জন্য গোয়ালিয়রের রাজা ও রাবেরীর হুসেন খান আফগানের পুত্র কুতুব খান আটোয়া আগমন করেন। এই সাক্ষাৎকালে বাহ্লুল লোদীর প্রতি হুসেন শাহ্ শর্কীর বদ্ধমূল বৈরীভাব লক্ষ্য করিয়া সুযোগমত একবার মন্তব্য করেন যে, বাহ্লুল লোদী দিল্লীর এক অধীনস্ত শাসনকর্তা মাত্র ছিলেন। তাঁহার পক্ষে বেশীদিন শাহী বংশোদ্ভূত শর্কী সুলতানের মোকাবিলা করা সম্ভবপর হইবে না। শেষ পর্যন্ত তিনি এই বলিয়া তাঁহার বক্তব্য শেষ করেন যে, আমি যদি আপনাকে দিল্লী অধিকার করিয়া দিতে না পারি তাহা হইলে আপনি আর কোন দিন আমার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিবেন না। হুসেন শাহ্ শর্কীর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াই কুতুব খান দিল্লী চলিয়া আসেন। সেখানে আসিয়াই তিনি বিবৃতি দিলেন যে, তিনি অতি কষ্টে হুসেন শাহ্ শর্কীর হাত হইতে মুক্ত হইয়া আসিয়াছেন এবং তিনি আরও বলেন যে, হুসেন শাহ্ পুনরায় দিল্লী আক্রমণের তোড়জোড় করিতেছেন। এই সময় দিল্লীর প্রাক্তন সুলতান সৈয়দ আলা-উদ-দীন যিনি স্বেচ্ছায় সিংহাসন ত্যাগ করিয়াছিলেন—তিনি বাদায়ুনে ইন্তেকাল করেন। হুসেন শাহ্ শর্কী তখন বাদায়ুন আসিয়া জানাজায় শরীক হন এবং জানাজা সমাপনান্তে সৈয়দ আলা-উদ-দীনের পুত্রের নিকট হইতে বাদায়ুন কাড়িয়া লন। সেখান হইতে সম্বল গমন করিয়া সেখানকার শাসনকর্তা মুবারিক খানকে বন্দী করেন। ৮৮৩ হিজরীতে (১৪৭৮ খ্রীঃ) দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইয়া 'কাচ্চা ঘাটে' যমুনা অতিক্রম করেন। বাহ্লুল লোদী তখন সারহিন্দ ছিলেন। সেখন হইতে এই আক্রমণের সংবাদ পাইয়া তিনি দ্রুতগতিতে দিল্লী চলিয়া আসেন। উভয় পক্ষে কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। তাহাতে মোটামুটি হুসেন শাহ্ শর্কীই সুবিধা অর্জন করেন। যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত কুতুব খানের মধ্যস্থতায় আর একটি শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী বাহ্লুল লোদী গঙ্গার পূর্ববর্তী সমস্ত এলাকার উপর হুসেন শাহ্ শর্কীর অধিকার এবং হুসেন শাহ্ শর্কী গঙ্গার পশ্চিমস্থ সমস্ত এলাকার উপর বাহ্লুল লোদীর অধিকার স্বীকার করেন। এই চুক্তি সম্পাদনের পর হুসেন শাহ্ শর্কী জৌনপুর অভিমুখে রওয়ানা হন। কিন্তু বাহ্লুল সন্ধির শর্ত উপেক্ষা করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করেন এবং পথেই তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া তাঁহার বিপুল সংখ্যক

সৈন্য হত্যা করেন। এই যুদ্ধে শর্কী পক্ষের ৪০ জন বিখ্যাত সেনাপতি বন্দী হয় এবং তাহাদের অনেক সাজসরঞ্জাম ও কোষাগারের কিয়দংশ শত্রুহস্তে পতিত হয়। এই সাফল্যের পরে বাহ্‌লুল লোদী হুসেন শাহ্ শর্কীর অধিকৃত কয়েকটি অঞ্চল যথা—কাম্‌পিলা, পাতিয়ালা, শাম্‌সাবাদ, সুকিত, মুরহেরা, কোল ও জলেশ্বর অধিকার করিয়া লন এবং ঐসব এলাকায় জন্য শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

হুসেন শাহ্ শর্কী রামপিনজুনে আসিয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য রুখিয়া দাঁড়াইলেন। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষই জয়লাভ করিয়াছে বলিয়া দাবী করিতে লাগিল। যাহা হউক পুনরায় শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তি অনুসারে দোপামো গ্রামকে উভয় রাজ্যের সীমারেখা নির্ধারিত করা হইল। অতঃপর হুসেন শাহ্ রাবেরী এবং বাহ্‌লুল দিল্লী চলিয়া গেলেন।

হুসেন শাহ বাহ্‌লুলের বিশ্বাসঘাতকতা হজম করিতে পারিলেন না। অচিরেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। সার্সার গ্রামে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ হইল। এই যুদ্ধে হুসেন শাহ্ শর্কীর পরাজয় ঘটিল। তাঁহার সমস্ত কোষাগার ও সাজসরঞ্জাম শত্রুহস্তে পতিত হইল। এই জয়লাভে বাহ্‌লুলের খ্যাতি অনেকগুণ বৃদ্ধি পাইল। হুসেন শাহ্ শর্কী রাবেরী অভিমুখে পলায়ন করিলেন। কিন্তু বাহ্‌লুল তাঁহার পিছু ছাড়িলেন না। দ্বিতীয় সংঘর্ষে তিনি হুসেন শাহ্‌কে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করিলেন। হুসেন কোন প্রকারে প্রাণ লইয়া গোয়ালিয়র পালাইয়া গেলেন। গোয়ালিয়রের রাজা তাঁহাকে কয়েক লক্ষ টাকা, হস্তী, অশ্ব, উষ্ট্র ও একটি উৎকৃষ্ট তাঁবু দিয়া সাহায্য করিলেন এবং তাঁহার সঙ্গে কাল্‌পী পর্যন্ত গমন করিলেন। ইতিমধ্যে বাহ্‌লুল লোদী আটোয়া গমন করেন। উহা তখন হুসেন শাহ্ শর্কীর ভ্রাতা ইব্রাহিমের দখলে ছিল। আটোয়া বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিল। দিল্লীর অন্যতম সেনাপতি ইব্রাহিম খান লোহানীকে আটোয়ায় রাখিয়া সুলতান কাল্‌পী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি হুসেন শর্কীকে শিবিরে অবস্থানরত দেখিতে পাইলেন। মাঝে নদী থাকায় দুই বাহিনীর মধ্যে কয়েক মাস কোন সংঘর্ষ বাঁধিল না। শেষে কাটিহারের রায় ত্রিলোক চাঁদ বাহ্‌লুলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে পারোপযোগী নদীর এক অগভীর অংশ দেখাইয়া দেয়। সেইখানে সসৈন্যে নদী পার হইয়া বাহ্‌লুল হুসেন শাহ্ শর্কীকে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে জৌনপুরের দিকে পলায়ন করিতে বাধ্য

করিলেন। কনৌজে কালি নদীর তীরে হুসেন শাহ্ পুনরায় শত্রুকে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু তখন পলায়ন করা তাঁহার অভ্যাস হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সুতরাং এখানেও তিনি রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করেন। তাঁহার শাহী নিশান, সাজসরঞ্জাম ও হারেমের প্রধান মহিলা বিবি খোন্জা শত্রুহস্তে পতিত হইল। তিনি ছিলেন প্রাক্তন সুলতান সৈয়দ আলা-উদ-দীনের কন্যা। বাহ্লুল লোদী তাঁহাকে বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করেন। এই জয়ের পর বাহ্লুল দিল্লী ফিরিয়া আসেন।

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বাহ্লুল পুনরায় জৌনপুর অভিমুখে রওয়ানা হইলেন এবং এইবার ঐ দেশ সম্পূর্ণ জয় করিয়া মুবারিক খান লোহানীর উপর উহার শাসনভার অর্পণ করেন। কুতুব খান লোদীকে খান জাহান ও অন্যান্য কতিপয় সেনাপতির সঙ্গে বিশ্বলী রাখিয়া আসিলেন। অতঃপর সুলতান বাদায়ুন গমন করেন। সেখানে পৌঁছিয়া তিনি কুতুব খানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্ত হন। খান জাহান, মুবারিক খান ও আরও কতিপয় আমীর বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করিতেন। কুতুব খানের মৃত্যু সংবাদ প্রাপ্তির পর হইতেই তাহারা ঐক্যবদ্ধভাবে স্বাধীনতালাভের উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের দুরভিসন্ধি সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল হইবার পর বাহ্লুল জৌনপুর গমন করিলেন। হুসেন শাহ্ শর্কী হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহাকে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া তাঁহার অন্যতম পুত্র বারবিককে সিংহাসনে বসাইয়া তিনি কাল্পী চলিয়া আসেন। কাল্পী অধিকার করিয়া তিনি উহা তাহার পৌত্র আজিম হুমায়ুনকে প্রদান করেন। আজিম হুমায়ুন ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বায়জিদ খানের পুত্র। অতঃপর সুলতান ঢোলপুর গমন করেন এবং সেখানকার রাজার নিকট হইতে কর আদায় করিয়া তিনি সেখান হইতে রতনপুর গমন করেন। এই স্থানটি রনথম্বরের অন্তর্গত ছিল। সেখানে ব্যাপক ধ্বংসাত্মককার্যাবলী অনুষ্ঠিত করিয়া তিনি দিল্লী ফিরিয়া আসেন।

এইবার বৃদ্ধ বাহ্লুল লোদী উপলব্ধি করিলেন যে, তাঁহার বয়স অনেক হইয়াছে এবং দৈহিক দুর্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এইজন্য তিনি পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্য বন্টন করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। বারবিক খানকে জৌনপুর, আলম খানকে কারা ও মানিকপুর এবং কালাপাহাড় নামে পরিচিত তাঁহার এক ভ্রাতুষ্পুত্র শেখজাদা মুহাম্মদ ফার্মালীকে ভাইরাক এবং

আজিম হুমায়ুনকে লক্ষ্ণৌ ও কাল্পী প্রদান করেন। এই আজিম হুমায়ুনের পিতা বায়জিদ খান তাঁহার এক ভৃত্যের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। তাহার অন্যতম আত্মীয় ও প্রধান সেনাপতি খান জাহানকে বাদায়ুন প্রদান করা হইল। পুত্র শাহজাদা নিজাম পাইলেন দিল্লী ও দোয়াবের অন্তর্গত কয়েকটি এলাকা। এই নিজাম খানই পরে সিকান্দর নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বাহ্‌লুল তাঁহাকে উত্তরাধিকারী ঘোষণা করেন।

ইহার অল্পকাল পরে সুলতান গোয়ালিয়র গমন করিয়া রাজার নিকট হইতে ৮০ লক্ষ টাকা কর আদায় করেন। অতঃপর আটোয়া গমন করিয়া সংগত সিংহকে সেখান হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন। তারপর তিনি দিল্লী অভিমুখে রওয়ানা হন। পথে তিনি অসুস্থ হইয়া পড়েন। এই সময় অধিকাংশ ওমরাহই উত্তরাধিকার সম্পর্কে সুলতানের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। তাহাদের মতে পরলোকগত জ্যেষ্ঠপুত্রের পুত্র আজিম হুমায়ুনই ন্যায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী। ইহা শুনিয়া রাণী তাঁহার পুত্র নিজামকে পত্র দ্বারা সতর্ক করিয়া দেন যে, তিনি যেন পিতাকে অভ্যর্থনার জন্য আগাইয়া না আসেন। কারণ, ওমরাহগণ তাঁহাকে বন্দী করিতে পারেন। সেই সময়ই সুলতান আমীরদের পরামর্শে নিজামকে দ্রুত শিবিরে আসিবার তাগিদ দিয়া এক পত্র লিখিয়াছিলেন। পত্রে তিনি পুত্রকে দেখিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। পিতার অসুস্থতার সংবাদ পাইয়া নিজাম দিল্লী ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছিলেন। মাতা ও পিতার তরফ হইতে পরস্পরবিরোধী পত্রাদেশ পাইয়া তিনি মহা গোলমালে পড়িলেন। কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি হুসেন শাহ্ শর্কী উজির কুতলুগ খানের (যিনি দিল্লীতে বন্দী ছিলেন) উপদেশ চাহিলেন। কুতলুগ খান তাঁহাকে দিল্লী ত্যাগ করিয়া মন্থর গতিতে পিতার শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইতে উপদেশ দিলেন। ইতিমধ্যে সুলতানের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং সুকিত জিলার বাদাউলীতে ৮৯৪ হিজরীতে (১৪৮৮ খ্রীঃ) ৩৮ বৎসর ৮ মাস সাতদিন রাজত্বের পর তিনি ইন্তেকাল করেন।

বাহ্‌লুল লোদী একজন ধার্মিক ও শান্ত প্রকৃতির সুলতান হিসাবে সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি জ্ঞাতসারে কখনও কাহারও প্রতি অবিচার

করেন নাই। তিনি আমীর ওমরাহগণকে প্রজা না ভাবিয়া সঙ্গী ভাবিতেন এবং তাহাদের সঙ্গে তদ্রূপ আচরণ করিতেন। সিংহাসনের মালিক হইবার পর তিনি বন্ধুদের মধ্যে সরকারী কোষাগারের অর্থ বণ্টন করিয়া দেন এবং তাঁহাকে সিংহাসনে উপবেশন করিবার জন্য রাজী করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "দুনিয়া জানিয়াছে আমি সুলতানাত লাভ করিয়াছি। ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট। শাহী শানশওকত প্রদর্শন নাই বা করিলাম।" খানা-পিনা সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত সাদাসিদা ছিলেন এবং তিনি কদাচিৎ গৃহে আহার করিতেন। নিজে বিশেষ বিদ্বান না হইলেও তিনি বিদ্বান লোকদের সাহচর্য পছন্দ করিতেন এবং যোগ্যতানুসারে তিনি তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিতেন। মোগল সেনাদের শৌর্যের উপর তাঁহার বিশেষ আস্থা ছিল। সেই কারণে তাঁহার আত্মীয় ও সভাসদরাও মোগলদিগকে এমনভাবে উৎসাহ দান করিতেন যে, তাহার রাজত্ব কালে ২০,০০০ হাজারের মত মোগল সরকারী চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল। তিনি একজন সাহসী ও জ্ঞানবান সুলতান ছিলেন এবং মুসলমানী আইনের সঙ্গে তাহার বিশেষ পরিচয় ছিল। শাসনকার্যে শৃঙ্খলা আনয়নের জন্য যে-কোন উত্তম ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন। তিনি অতিশয় বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন; সরকারী কার্যে তাড়াহুড়া বা অধীরতা তিনি কখনও পছন্দ করিতেন না। এই নীতি তিনি কতটা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছেন—তাঁহার সমস্ত জীবনের কার্যকলাপ তার সাক্ষ্য বহন করে।

সিকান্দর লোদী আফগান

[আফগান আমীরগণ কর্তৃক নিজাম খানকে সিকান্দর নাম দিয়া সিংহাসনে উপবেশন। ঈসা খান কর্তৃক প্রথমে তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লইতে অস্বীকৃতি এবং পরে স্বীকার। তাঁহার বিদ্রোহ এবং নিহত। বারবিক খান কর্তৃক আনুগত্য স্বীকার করিতে অসম্মতিজ্ঞাপন। তাঁহার পরাজয়। তাঁহাকে জৌনপুরের শাসন-কর্তার পদে পুনর্বহাল। তাঁহার কুশাসন বৃত্তান্ত এবং শেষ পর্যন্ত অপসারণ। হুসেন শাহ্ শর্কী কর্তৃক জৌনপুর পুনরুদ্ধারের ব্যর্থ প্রয়াস। সিকান্দর কর্তৃক বাঙ্গালাদেশ পর্যন্ত হুসেন শাহ্ শর্কীর পশ্চাদ্ধাবন। তাঁহার পুন্না ও বান্দা আক্রমণ। সুলতানের ঢোলপুর ও গোয়ালিয়র গমন। উভয় অঞ্চলের রাজাদের আনুগত্য লাভ। সুলতান কর্তৃক পরে ঢোলপুর অধিকার। আগ্রায় ভূমিকম্প। মালবের সুলতানের পুত্রের ইহাতে উৎসাহিত হইয়া চান্দেরী দাবী। তাঁহার চান্দেরীর অধিকার প্রাপ্তি। তাঁহার রনথম্বর অধিকারের চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্য-বসিত। গোয়ালিয়র অধিকারের জন্য তাঁহার আগ্রায় সেনাবাহিনী সম্মিলিত-করণ। সুলতানের অসুস্থতা এবং মৃত্যু। তাঁহার চরিত্র ও ধর্মানুরাগ।]

বাহ্‌লুল লোদীর মৃত্যুর পর আমীর-ওমরাহগণ উত্তরাধিকার নির্বাচনের জন্য এক পরামর্শ সভা আহ্বান করেন। ওমরাহদের মধ্যে কেহ কেহ সাবেক সুলতানের পৌত্র আজিম হুমায়ুনকে সুলতান করিবার পক্ষপাতি ছিলেন—আবার কেহ কেহ জীবিত জ্যেষ্ঠ পুত্র বারবিকের সমর্থক ছিলেন। তাঁহারা যখন এই বিষয়ে বিতর্করত ছিলেন সেই সময় পর্দার অন্তরাল হইতে সিকান্দর খানের মাতা (যাঁহার নাম জৈনা বেগম এবং তিনি একজন স্বর্ণকারের কন্যা ছিলেন এবং রূপের জোরে যিনি সুলতানের জীবনসঙ্গিনী হইতে পারিয়াছিলেন) পুত্রের পক্ষে পরিষদের নিকট ওকালতি করেন। ইহা শুনিয়া বাহ্‌লুলের ভ্রাতুষ্পুত্র ঈসা খান বিদ্রূপ করিয়া বলেন "স্বর্ণকারের পুত্র কখনও কি রাজ্যের লাগাম ধারণ করিতে পারে? লোকে কথায় বলে যে, বানর কখনও দক্ষ কারিগর হইতে পারে না।" উপস্থিত আমীরদের মধ্যে হইতে খান খানান লোহানী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠেন, "সুলতানের দেহ এখনও কবরের মধ্যে যাইয়া ঠাণ্ডা হয় নাই। এখনই তাঁহার কোন সন্তানের প্রতি কটাক্ষ করা আমাদের পক্ষে শোভনীয় নয়।" ঈসা খান তাঁহাকে এই বলিয়া রসনা সংবরণ করিতে বলেন যে, তিনি

একজন ভৃত্য বৈ আর কিছুই নন, তাঁহার পক্ষে পারিবারিক ব্যাপারে নাক গলানো উচিৎ নয়। খান খানান তখন গাত্রোত্থান করিয়া নিজেকে সিকান্দর লোদীর ভৃত্য বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সিকান্দার লোদীর শত্রুদের বিপক্ষে দাঁড়াইয়া তাঁহার দাবী প্রতিষ্ঠা করিবার সঙ্কল্প প্রকাশ করেন। এই বলিয়া তিনি সভা ত্যাগ করেন। তাঁহার দলের আর সকলে তাঁহার পিছু পিছু বাহির হইয়া আসেন। তিনি মৃত সুলতানের দেহ জালালী শহরে লইয়া আসেন। সেখানে সিকান্দর লোদীর সহিত সাক্ষাৎ হয় এবং সেইখানেই তাঁহাকে পিতার সিংহাসনে উপবেশন করানো হয়। নূতন সুলতান পিতার লাশ দিল্লী পাঠাইয়া দিয়া তৎক্ষণাৎ ইসা খানের বিরুদ্ধে রওয়ানা হন এবং ইসা খানকে পরাস্ত করিয়া পরে ক্ষমা করেন। অতঃপর তিনি দিল্লী আসিয়া পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণপূর্বক আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে সুবিধা ও অনুগ্রহ বন্টন করিয়া দেন।

অভিষেককালে সিকান্দর লোদীর ছয় পুত্র যথা—ইব্রাহীম, জালাল, ইসমাইল, হুসেন, মাহমুদ ও হুমায়ুন তথায় উপস্থিত ছিলেন। ইহা ছাড়াও ৪৪ জন বিশিষ্ট আমীর সেখানে উপস্থিত ছিলেন যাহাদের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ

১। খান জাহান লোদী। ২। খান খানান ফার্মালীর পৌত্র আহমদ খান। ৩। শেখ জাদা ফার্মালী। ৪। খান খানান লোহানী। ৫। আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানী। ৬। দরিয়া খান লোদী। ৭। কাল্পীর নায়েব[১] জালাল খান লোদী। ৮। শের খান লোদী। ৯। মুবারিক খান মৌজী। ১০। খলিল খান লোদী। ১১। আটোয়ার নায়েব আহমদ খান লোদী। ১২। ইব্রাহীম খান শিরওযানী। ১৩। মাহমুদ শাহ লোদী। ১৪। বাবু খান শিরওয়ানী। ১৫। সাহারানের নায়েব হুসেন খান ফার্মালী। ১৬। সোলেমান খান ফার্মালী। ১৭। সৈয়দ খান লোদী। ১৮। ইসমাইল খান লোহানী। ১৯। তাতার খান ফার্মালী।

---

১ তোগলক বংশের রাজত্বকালে প্রথম নায়েব বা সহকারী সুবাদারের পদ সৃষ্টি করা হয়। এই শব্দই পরে মার্জিত হইয়া বহু বচনের রূপ পরিগ্রহ করে। অর্থাৎ নায়েব পরে নওয়াবে পরিবর্তিত হয়। ইউরোপের রাজারা যেমন নিজেকে আমি না বলিয়া আমরা বলিয়া উল্লেখ করে তেমনি হিন্দুস্তানেও বড় লোকদের বেলায় এক বচনের স্থলে বহু বচন ব্যবহার করিবার প্রচলন ছিল। আমাদের নিকট এই শব্দই নায়েব বলিয়া পরিচিত।

২০। শেখ খান লোদী। ২১। শেখজাদা মুহাম্মদ ফার্মালী (কালাপাহাড় নামে পরিচিত) ২২। শেখ জামাল ফার্মালী। ২৩। শেখ ওছমান ফার্মালী। ২৪। শেখ আহমদ ফার্মালী। ২৫। আহমদ খান লোদী। ২৬। হুসেন খান লোদী। ২৭। কবির খান লোদী। ২৮। নাসির খান লোহানী। ২৯। গাজী খান লোদী। ৩০। তিজারার সুবাদার তাতার খান। ৩১। খাজা নশর উল্লাহ। ৩২। মুবারিক খান। ৩৩। বারীর নায়েব ইয়েকবাল খান। ৩৪। কোয়াম-উল-মুল্‌কের পুত্র আসগর। ৩৫। শের খান লোহানী। ৩৬। ইমাদ-উল-মুল্‌ক কুম্ব। ৩৭। আলম খান লোদী। ৩৮। করিম খান লোদী। ৩৯। ভিখুন খান লোদী। ৪০। জহির খান লোদী। ৪১। উমর খান শিরওয়ানী। ৪২। জব্বার খান শিরওয়ানী। ৪৩। আলম খান জুলওয়ানী। ৪৪। সফদার খান জুলওয়ানী।

ইহা ছাড়াও শয়ন কক্ষের তত্ত্বাবধায়ক মিয়া জুদ্দুন কুম্বো, মুজদ্-উদ-দীন, শেখ ইব্রাহীম, শেখ ওছমান, শেখ ওমর, শেখ সিদ্দিক, কাবুলের কাযী আবদুল ওয়াহাব ও মিয়াভুরি তথায় উপস্থিত ছিলেন।

সিংহাসনারোহণের অনতিকাল পরে সিকান্দর লোদী রাবেরী অভিমুখে যাত্রা করেন এবং সেখান হইতে চান্দোয়ার দুর্গে গমন করেন। সুলতানের ভ্রাতা শাহ্‌জাদা আলম খান সেখানে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুলতানের আগমন সংবাদ পাইয়া আলম খান শহর ত্যাগ করিয়া পাতিয়ালায় ঈসা খান লোদীর নিকট পালাইয়া যান। রাবেরী জিলা খান খানান ফার্মালীকে প্রদান করিয়া সিকান্দর আটোয়ায় গমন করেন। এইখানে তাঁহার ভ্রাতা আলম খান সিকান্দর লোদীর আনুগত্য স্বীকার করেন এবং নিজেকে সুলতানের দয়ার উপর ছাড়িয়া দেন। সুলতান তাঁহাকে ক্ষমা করেন। তবে তিনি ইহার অল্পকাল পরেই ক্ষতস্থানে পচন ক্রিয়ার ফলে মারা যান।

অতঃপর সিকান্দর লোদী তাঁহার ভ্রাতা বারবিকের নিকট কয়েকজন প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। বারবিক জৌনপুরে সুলতান উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। সিকান্দর প্রতিনিধি মারফত বারবিককে বশ্যতা স্বীকার করিতে এবং খোত্‌বায় সিকান্দরের নাম ব্যবহার করিতে আদেশ করেন। বারবিক[২] এই প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় সিকান্দর লোদী তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হন।

২ মনে রাখিতে হইবে যে বারবিক ছিলেন সিকান্দরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

বারবিক ভ্রাতার মোকাবিলা করিবার জন্য আগাইয়া আসেন। যুদ্ধের প্রারম্ভেই বারবিকের সেনাপতি কালাপাহাড় বন্দী হন। তাঁহাকে দর্শন মাত্র সিকান্দর লোদী অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাঁহাকে আলীঙ্গনাবদ্ধ করিয়া বলেন, "আপনি আমার পিতৃতুল্য। আমি আপনাকে পিতার ন্যায় শ্রদ্ধা করি। আশা করি, আপনিও আমাকে পুত্রবৎ স্নেহ করিবেন"।—এই অপ্রত্যাশিত সমাদরে অভিভূত হইয়া কালাপাহাড় উত্তর দেন, প্রতিদানে প্রাণ ব্যতীত আর কিছুই আমার দিবার নাই। আশা করি আপনি আমাকে আপনার কার্যে নিযুক্ত করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগদান করিবেন। ইহা শুনিয়া সুলতান তাঁহাকে নিজের অশ্ব প্রদান করেন। কালাপাহাড় তখনই অশ্বে আরোহণ পূর্বক এক দল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া বিপক্ষ দলে হানা দিতে গমন করেন —যে দলের পক্ষে তিনি যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। সিকান্দর লোদীর বিজয় লাভ অনেকটা এই কারণেই সহজসাধ্য হইয়াছিল (হিঃ ৮৯৪ খ্রীঃ ১৪৮৮)। বারবিকের সৈন্যরা যখন কালাপাহাড়কে তাহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে আসিতে দেখিল তখন তাহারা মনে করিল কালা পাহাড়ের অধীনস্ত সৈন্যদলও তাঁর সঙ্গে গিয়াছে। তখন পরাজয় নিশ্চিত মনে করিয়া বারবিকের সৈন্যরা পলায়ন করিতে লাগিল। শাহ্‌জাদা বারবিক এই যুদ্ধে অসাধারণ শৌর্যের পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু সৈন্যদল কর্তৃক পরিত্যক্ত হওয়ায় তিনি বাদায়ুনে পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার পুত্র মুবারিক খান অবশ্য শত্রুহস্তে বন্দী হন। কিন্তু অনতিকাল পরেই বারবিক আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে সাদরে ওমরাহগণের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। ইহার পর সিকান্দর জৌনপুর গমন করিয়া দেখিতে পান যে, নির্বাসিত শর্কী সুলতান হুসেন শাহ্ শর্কী তখনও বিহারে শক্তিশালী রহিয়াছেন। সেইজন্য তিনি বারবিককে জৌনপুর রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রাখাই যুক্তিসঙ্গত মনে করিলেন—যাহাতে হুসেন শাহ্ শর্কী দিল্লীর বিরুদ্ধে মাথা উঠাইতে গেলে প্রথমে জৌনপুরেই বাধাপ্রাপ্ত হন। সেই সঙ্গে তিনি বারবিকের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য তাঁহার নিকট কয়েক জন বিশ্বস্ত বন্ধু রাখিয়া আসিলেন—যাহাদের বন্ধুত্বের মূল্যস্বরূপ তিনি তাহা-দিগকে জায়গীর প্রদান করিয়াছিলেন। সিকান্দর লোদী ইহার পর কাল্‌পী গমন করেন এবং আজিম হুমায়ুনের নিকট হইতে শাসনকর্তার পদ কাড়িয়া লইয়া

মুহাম্মদ খান লোদীকে প্রদান করেন। সেখান হইতে তিনি ভুয়াই* গমন করেন। সেখানকার শাসনকর্তা তাতার খান আনুগত্য স্বীকার করেন এবং তাঁহাকে নিজ পদে বহাল রাখা হয়। সেখানকার কাজ শেষ করিয়া সুলতান গোয়ালিয়র যাত্রা করেন। সেখানে রাজা মানসিংহের নিকট তিনি সেনাপতি খাজা মুহাম্মদ কার্মালীকে একটা খেলাৎসহ প্রেরণ করেন। প্রত্যুত্তরে রাজা মানসিংহ তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উপহারসহ বিয়ানার সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। বিয়ানার শাসনকর্তা সুলতান শরিফও সুলতানকে সম্মান প্রদর্শন করেন। সুলতান তাঁহাকে তাঁহার জিলা হইতে সরাইয়া জলেশ্বর, চান্দোয়া, মাহেরা ও সুকিতের শাসনকর্তা মনোনীত করেন। সুলতান শরিফের সঙ্গে ওমর খান শিরওয়ানী বিয়ানা দুর্গে গমন করেন। এই ওমর খান শিরওয়ানীর হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিবার নির্দেশ ছিল। কিন্তু দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াই সুলতান শরিফ দুর্গের দ্বার রুদ্ধ করিয়া আত্মরক্ষার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সুলতান অবশ্য এই ঘটনার উপর কোন প্রকার গুরুত্ব আরোপ না করিয়াই আগ্রা চলিয়া আসেন। আগ্রায় হয়বত খান জুলওয়ানীও দুর্গের দ্বার বন্ধ করিয়া দেন। এই হয়বত খান শরিফ খানের অধীনেই সেই দুর্গ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিলেন। এই হটকারিতায় সুলতান এতোটা ক্রুদ্ধ হইলেন যে, আগ্রা অবরোধের জন্য সৈন্য-বাহিনীর একাংশ সেখানে রাখিয়া সুলতান নিজে বিয়ানায় ফিরিয়া আসিলেন এবং দুর্গ অবরোধ করিলেন। সুলতান শরিফ শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। ৮৯৭ হিজরীতে (১৪৯১ খ্রীঃ) তাঁহার সুবা খান খানান ফার্মালীকে প্রদান করা হইল এবং শরিফকে তখনকার মত গোয়ালিয়র দুর্গে প্রেরণ করা হইল। প্রায় একই সময়ে আগ্রা দুর্গেরও পতন ঘটে। সুতরাং সিকান্দর নিশ্চিন্তে দিল্লী ফিরিয়া আসেন।

দিল্লীতে কয়েকদিন অবস্থানের পরেই তিনি জৌনপুরে জমিদার বিদ্রোহের সংবাদ পাইলেন। শুনিলেন, তাঁহারা অশ্ব ও পদাতিক মিলিয়া এক লক্ষ্য সৈন্যের এক বিরাট বাহিনী গঠন করিয়া কারার শাসনকর্তা মুবারিক খান লোহানীর ভ্রাতা শের খানকে হত্যা করিয়াছে। আরও শুনিলেন যে, খোদ মুবারিক খানকে কারা হইতে বিতাড়িত করা হইয়াছে এবং তিনি গঙ্গা পার হইবার সময় কাত্‌রার রাজা সাহাদেব কর্তৃক বন্দী হইয়াছেন। শাহজাদা বারবিকও বাইরাকে পালাইয়া

৩ চাম্বল ও যমুনার সঙ্গম স্থলে এই নামের এক বৃহৎ শহর আছে।

যাইয়া কালাপাহাড়ের সাহায্য প্রার্থনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সুতরাং দিল্লীতে মাত্র ২৪ দিন বিশ্রাম গ্রহণের পরই সুলতানকে পুনরায় জৌনপুরের দিকে ছুটিতে হইল। তিনি ডালমো পৌঁছিলে শাহজাদা বারবিক তাঁহার সঙ্গে মিলিত হন। ওদিকে সুলতানের আগমন সংবাদ পাইয়া রাজা সাহাদেবও মুবারিক খান লোহানীকে ছাড়িয়া দেন। সুলতান জমিদারদের ঘাঁটি কাটগড় গমন করেন। জমিদাররা যুদ্ধে পরাস্ত হইল এবং তাহাদের বহু ধন-সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হইল। সুলতান জৌনপুর পৌঁছিয়া শাহজাদা বারবিককে সেখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নিজে এক মাস সেই এলাকার নিকটে অবস্থান করেন। এই সময় তিনি সংবাদ পাইলেন যে, জমিদারদের দৌরাত্ম পুনরায় বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং তাহারা বারবিককে জৌনপুরে অবরুদ্ধ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া সুলতান সিকান্দর—কালাপাহাড়, হুমায়ুন খান শিরওয়ানী, অযোধ্যার খান খানান লোহানী এবং কারা হইতে মুবারিক খানকে একত্রিত হইয়া জমিদারদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতে আদেশ করিলেন। তাঁহাদের প্রতি আরও নির্দেশ রহিল যে, তাঁহারা শাহজাদা বারবিককে সুলতানের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। শাহজাদা বারবিককে পরে রাজবন্দীরূপে হয়বত খান ও ওমর খান শিরওয়ানীর তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। এই ঘটনার পর সুলতান চুনাড় গমন করেন। চুনাড় তখন হুসেন শাহ্ শর্কীর অধিকারভুক্ত ছিল। সুলতান তথায় পৌঁছিবা মাত্র দুর্গবাসী সৈন্যরা বাহিরে আসিয়া সুলতানকে আক্রমণ করে। কিন্তু তাহাদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর সুলতান ঐ দুর্গটি পর্যবেক্ষণ করাইলেন। শেষে জয়লাভ সম্বন্ধে নিশ্চিত হইতে না পারিয়া সুলতান পাটনার এলাকাভুক্ত কুটুম্বা[৪] নামক স্থানে চলিয়া আসেন। কুটুম্বার রাজা বল বাহাদুর রায় সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার প্রভুত্ব মানিয়া লন। সুলতান সেখান হইতে বল বাহাদুরের সঙ্গে আরিলিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিশ্বাসভঙ্গের সন্দেহে রাজা এক রাত্রে শিবির হইতে পালাইয়া পাটনায় চলিয়া আসেন। সুলতান পরদিন রাজার অনুচরদিগকে তাহাকে ব্যক্তিগত মাল-পত্রাদিসহ শিবির ত্যাগ করিবার অনুমতি প্রদান করেন। সুলতান তাঁহার নিজের সৈন্যদিগকে আরিলির পথে যে সকল অঞ্চল পতিত হয়, সব লুণ্ঠন করিয়া চলিবার হুকুম দান করেন। কারায় গঙ্গা

৪ সঠিক নির্ণয় করা কঠিন।

পার হইয়া সুলতান ডাল্‌মো আসিয়া পড়েন এবং সেখানে তথাকার ভূতপূর্ব সুবাদার শের খানের বিধবা পত্নীকে শাদী করেন। ডাল্‌মো হইতে সুলতান অতঃপর শাম্‌সাবাদ গমন করেন। সেখানে ছয় মাস কাল বিশ্রাম গ্রহণের পর তিনি সম্বল চলিয়া যান। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি দেওনারী নগর লুণ্ঠন করেন। কারণ, সেখানে একদল দস্যুর আড্ডা ছিল। শাম্‌সাবাদে বর্ষাকাল কাটাইয়া সুলতান ৯০০ হিজরীতে (১৪৯৪ খ্রীঃ) পুনরায় পাটনার পথে যাত্রা করেন। পাটনায় বল বাহাদুর রায়ের পুত্র নরসিংহ রায় সুলতানকে হুণ্ডিয়া ঘাটে বাধা প্রদান করেন। কিন্তু সুবিধা করিতে না পারিয়া পাটনা শহরের প্রাচীরের অন্তরালে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করেন। সুলতানের আগমন সংবাদ পাইয়াই বল বাহাদুর সারগুজা অভিমুখে পলায়ন করিতে যাইয়া পথেই প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনার পর সুলতান সাজ দেওয়ার অভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকেন। কিন্তু শিবিরে রসদের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় তিনি জৌনপুর প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হন। এই যাত্রায় পথের দুর্গমতা ও তৃণাভাবে তাঁহার অধিকাংশ অশ্বই মারা যায়। বল বাহাদুর তনয় নরসিং রায় ও অন্যান্য জমিদাররা এই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিবার জন্য বিহার প্রদেশের তদানীন্তন শাসক শাহ্ শর্কীর নিকট পত্র দেন। তাঁহাকে জানানো হইয়াছিল যে, অশ্বারোহী বাহিনী দারুণ দুরবস্থার সম্মুখীন হইয়াছে। প্রতিশোধ গ্রহণের এমন সুবর্ণ সুযোগ আর পাওয়া যাইবে না। তাহাদের নির্দেশানুযায়ী হুসেন শাহ্ শর্কী তাঁহার ফৌজ রওয়ানা করিয়া দিলেন। তাঁহার মতলব বুঝিতে পারিয়া সুলতান সিকান্দর লোদী গঙ্গা পার হইয়া তাঁহার মোকাবিলা করিতে অগ্রসর হইলেন। বেনারস হইতে ১৮ ক্রোশ দূরে দুই বাহিনীর সাক্ষাৎ হইলে তথায় এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম আরম্ভ হয়। হুসেন শাহ্ শর্কী পরাজয় বরণ করিয়া পাটনায় পালাইয়া যান। সুলতান এক লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া কয়েকদিন যাবৎ পলাতকদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। কিন্তু নবম দিনে যখন শুনিতে পাইলেন যে, পলাতকরা বিহারে প্রবেশ করিয়াছে। তখন তিনি থামিয়া পড়েন। সমগ্র সেনাবাহিনীকে সঙ্ঘবদ্ধ করিয়া তিনি বিহারের পথে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। মালিক কুণ্ডর উপর বিহার রক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করিয়া হুসেন শাহ্ লক্ষণাবতী জিলার অন্তর্গত কুলগ্রামে পালাইয়া যান। বাঙ্গালার সুলতান আলা-উদ-দীন শাহ্ পুরবি মহাসমাদরে পলাতকদিগকে তাঁহা

রাজধানীতে গ্রহণ করেন। এইখানেই তিনি অজ্ঞাতভাবে জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি অতিবাহিত করেন এবং তাঁহার সঙ্গেই জৌনপুরের শাহী বংশের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সিকান্দর আলী দেওনাগ্নী ফিরিয়া তাহার ফৌজের একাংশ মালিক কুওর বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। মালিক কুও অবশ্য তাহার দেশকে দিল্লীর ফৌজের জন্য উন্মুক্ত রাখিয়া প্রাণ লইয়া পালাইয়া যান। দিল্লীর সুলতান অতঃপর হয়বত খানকে একদল সৈন্যসহ বিহারে রাখিয়া তিরহুত গমন করেন। তিরহুতের রাজা বাৎসরিক কর প্রদানে স্বীকৃত হইলে মুবারিক খান লোহানীর উপর কর গ্রহণের নির্দেশ দান করিয়া সুলতান দরবেশপুর গমন করেন। সেখানে তিনি শরিফ মুনওয়ারীর মাজার জিয়ারত করেন। সেই দরগায় যে-সকল ফকির বাস করিতেন তিনি তাহাদের মধ্যে উপহার বিতরণ করেন। এই সময় খান খানান ফার্মালীর পুত্র খান জাহান ইন্তেকাল করেন এবং তাহার পুত্র আহমদ খানকে আজিম হুমায়ুন উপাধি প্রদান করা হয়। এইবার সুলতান বাঙ্গালা অভিমুখে সৈন্য পরিচালনা করেন এবং তিনি কুৎলুগপুর পৌঁছিলে আলা-উদ-দীন শাহ্ পুরবী তাঁহার পুত্র দানিয়েলকে বাধাদানের জন্য প্রেরণ করেন। দানিয়েলকে মোকাবিলা করিবার জন্য দিল্লীর সুলতানের পক্ষ হইতে মাহমুদ খান লোদী ও মুবারিক খান মৌজিকে প্রেরণ করা হইল। বাড়া নামক গ্রামে দুই বাহিনী পরস্পরের কাছাকাছি শিবির সন্নিবেশ করিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর যুদ্ধ হয় না। এক অনাক্রমণ শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে উভয়পক্ষ পরস্পরের প্রতি বৈরীভাব পরিহার করিবে এবং একে অন্যের শত্রুকে আশ্রয়দান হইতে বিরত থাকিবে। সুলতানী ফৌজ দিল্লী প্রত্যাবর্তন করিবার পথে পাটনায় মুবারিক খান মৌজি ইন্তেকাল করেন এবং দরবেশপুরে মুবারিক খান লোহানীও সহসা মারা যান। তিরহুতের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হইল খান জাহানের পুত্র আজিম হুমায়ুনের উপর এবং বিহারের শাসনভার অর্পণ করা হইল পরলোকগত মুবারিক খান লোহানীর পুত্র দরিয়া খানের উপর। এই সময় দেশে ভীষণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। যাহা হউক, খাদ্যশস্য স্থানান্তরে লইয়া যাওয়ার উপর কর রহিত করায় এই দুর্ভিক্ষ প্রশমিত হয়। এই সুলতানের রাজত্বকালে এই কর আর পুনঃ প্রচলিত হয় নাই। ইতিমধ্যে সিকান্দর লোদী জমিদারদের অধিকারভুক্ত সাহারান জিলা দখল করিয়া কয়েকজন

সেনাপতিকে জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন। অতঃপর সুলতান জৌনপুর চলিয়া আসিয়া সেখানে ছয়মাস অবস্থান করেন।

কিছুকাল পূর্বে সুলতান পুন্নার রাজা শালি বাহনের কন্যাকে শাদী করিবার প্রস্তাব দিয়াছিলেন। কিন্তু রাজা সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। সেই আক্রোশে সুলতান সসৈন্যে পুন্না গমন করেন এবং বান্দা পর্যন্ত সমস্ত দেশ লুণ্ঠন করেন (৯০৪ হিঃ ১৪৯৮ খ্রীঃ)। অতঃপর জৌনপুর ফিরিয়া আসিয়া তথায় কিছুকাল অবস্থান করেন। এই সময় মুবারিক খান লোদীর জৌনপুর শাসনকালের হিসাব-নিকাশ পরীক্ষা করিয়া সেখানে বিপুল ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়। সুলতান হুকুম দিলেন, তাঁহার নিকট হইতে অবশিষ্ট অর্থ আদায় করিতে হইবে। এই ব্যাপারে অনেক আফগান আমীর সুলতানের প্রতি অসন্তুষ্ট হইল এবং আত্মসাৎকারীর স্বপক্ষে একটা দলই গঠিত হইল। একদিন সুলতান পরিষদবর্গের সঙ্গে চৌগান খেলিতেছিলেন। এই সময় আকস্মিকভাবে হয়বত খান শেরওয়ানীর যষ্টি দরিয়া খান লোদীর পুত্র সোলিমান খানের মাথায় আঘাত করে এবং তিনি গুরুতরভাবে আহত হন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সোলিমান খানের ভ্রাতা খিজির খান অশ্ব ছুটাইয়া আসিয়া হয়বত খানের মাথায় আঘাত করে। নিমেষ মধ্যে দুই দলে ভীষণ মারামারি লাগিয়া যায় এবং মাঠে মহা হৈচৈ ও গোলমালের সৃষ্টি হয়। মাহমুদ খান লোদী ও খান খানান লোদী মাঝখানে আসিয়া হয়বত খানকে কোন প্রকারে শান্ত করিয়া তাহাদের সঙ্গে গৃহে ফিরিয়া যাইতে রাজী করান। এই ঘটনার পিছনে কোন ষড়যন্ত্র আছে আশঙ্কা করিয়া সুলতান অবিলম্বে প্রাসাদে যাইয়া প্রবেশ করেন। ইতিমধ্যে আর কিছু না ঘটায় কয়েকদিন পর সুলতান পুনরায় আর একদল লইয়া চৌগান খেলার জন্য রওয়ানা হন। পথে হয়বত খানের এক আত্মীয় শাম্‌স খান, সোলিমান খানের ভ্রাতা খিজির খানকে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে খেলার যষ্টি লইয়া আক্রমণ করে এবং তাঁহাকে গুঁতা মারিয়া অশ্ব হইতে ফেলিয়া দেয়। সুলতান শাম্‌স খানকে তিরস্কার করিয়া প্রাসাদে ফিরিয়া আসেন। এইবার তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, নিশ্চয়ই একটা ষড়যন্ত্র দানা বাঁধিয়া উঠিতেছে। তিনি প্রাসাদে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করিলেন এব প্রহরীদিগকে সতর্ক থাকিবার নির্দেশদান করিলেন। সুলতানের সন্দেহ অ ছিল না। কেননা সেই সময়ই হয়বত খান শিরওয়ানী এবং আরও

আমীর সুলতানের ভ্রাতা শাহ্‌জাদা ফতেহ্ খানের নিকট সুলতানকে খতম করিবার প্রস্তাব করেন। তাঁহারা ফতেহ্ খানকে বলেন যে, সুলতানকে কেহই পছন্দ করে না এবং সকলেই ফতেহ্ খানকে সিংহাসনে বসাইবার পক্ষপাতী। শাহ্‌জাদা এই প্রস্তাব বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য কিছু সময় চাহিয়া শেখ তাহের কাবুলী ও নিজের মাতার সঙ্গে পরামর্শ করেন। তাঁহারা উভয়েই ফতেহ্ খানকে এই ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করিতে দৃঢ়ভাবে নিষেধ করেন। অন্য কোন প্রকারে এই ষড়যন্ত্র কার্যকরী হইতে পারে, সেই আশঙ্কায় তাঁহারা শাহ্‌জাদাকে অবিলম্বে এই প্রস্তাবের কথা সুলতানের নিকট প্রকাশ করিবার সুপারিশ করেন। ইহার ফল এই হইল যে, ষড়যন্ত্রকারীদিগকে বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণ করা হইল এবং প্রত্যেককে কাটিয়া ফেলা হইল।

৯০৫ হিজরীতে (১৪৯৯ খ্রীঃ) সুলতান সম্বল গমন করিয়া সেখানে চারি বৎসরকাল অবস্থান করেন। এই সময় তিনি আমোদ-প্রমোদ ও শাসনকার্য পরিদর্শন করিয়া ব্যয় করেন। এইখানে অবস্থানকালে দিল্লীর শাসনকর্তা আসগর খানের বিরুদ্ধে আফগান আমীরদের এক গুরুতর অভিযোগের কথা শুনিয়া সুলতান, মাচিওয়ারার শাসনকর্তা খুবাস খানকে দিল্লী গমন করিয়া আসগর খানকে বন্দী করিয়া তাঁহার নিকটে পাঠাইবার হুকুম দেন। আসগর খান এই দুরভিসন্ধির কথা পূর্বাহ্ণে অবগত হইয়া স্বয়ং সুলতানের নিকট আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া করুণা ভিক্ষা করিলেন। কিন্তু তিনি অভিযোগ খণ্ডন করিতে না পারায় তাঁহাকে আটক রাখিবার হুকুম দেওয়া হয়।

এই সময় লক্ষ্ণৌর নিকটবর্তী কাতীন নিবাসী এক ব্রাহ্মণ ধর্ম সম্বন্ধে এক মত প্রকাশ করিয়া বিপদগ্রস্ত হন। ব্রাহ্মণটির নাম ছিল বোধন। কয়েকজন মুসলমান কর্তৃক ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "আন্তরিকতার সঙ্গে পালন করিলে হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মই খোদার নিকট সমানভাবে গ্রহণযোগ্য হইবে।" ব্রাহ্মণ তাঁহার উক্তির স্বপক্ষে জোরালো যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। ফলে এই কথা লইয়া জনসাধারণের মধ্যে আলোচনা চলিতে থাকে। ব্রাহ্মণ ও লক্ষ্ণৌর কাযীর উপর দরবারে হাজির হইবার হুকুম হয়। লক্ষ্ণৌর কাযী পিয়ালা ও শেখ বদর এই মতের বিরোধিতা করেন। ব্রাহ্মণের [illegible] লইয়া শহরে বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হয়। সুবাদার আজিম হুমায়ুন এই উভয় পক্ষকে সুলতানের নিকট পাঠানো সমীচীন মনে করেন। ধর্ম বিষয়ে

তর্কবিতর্ক সুলতান বিশেষ উপভোগ করিতেন। তিনি সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আলেম-দিগকে সম্বলে হাজির হইয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে ধর্মবিষয়ে তর্কে প্রবৃত্ত হইতে হুকুম দেন। নিম্নোলিখিত আলেমগণকে ব্রাহ্মণের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে নিয়োগ করা হইয়াছিল।

(১) মিয়া কাদের বিন শেখরাজু
(২) মিয়া আবদুল ইলিয়াস (তুলুম্বার)
(৩) মিয়া আল্লাদাদ (তুলুম্বার)
(৪) সৈয়দ মুহম্মদ বিন সৈয়দ খান (দিল্লীর)
(৫) মোল্লা কুতুব-উদ-দীন (সারহিন্দ)
(৬) মোল্লা আল্লাদাদ সালেহ (সারহিন্দ)
(৭) সৈয়দ আমান
(৮) সৈয়দ বুরহান (কনৌজ) ও
(৯) সৈয়দ আহম্মান (কনৌজ)।

ইহা ছাড়াও দরবারের স্থায়ী কয়েকজন আলেমও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা হইলেন:

(১) সৈয়দ সদর-উদ-দীন (কনৌজের)
(২) মিয়া আবদ্-উর-রহমান (সিক্রীর)
(৩) মিয়া আজিজ উল্লাহ্ (সম্বলের)

অনেক বিতর্কের পর আলেমরা এক সঙ্গে এই মত প্রকাশ করিলেন যে, ব্রাহ্মণের কথার অর্থ এই দাঁড়ায় যে—হিন্দুর পূজা ও মুসলমানের এবাদত আল্লাহ্র নিকট সমভাবে গ্রহণযোগ্য। এই আপত্তিকর মত প্রকাশের জন্য তাঁহাকে তওবা করিয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে। আর তাহাতে সম্মত না হইলে তাহাকে কতল করিতে হইবে। সেই হিন্দু ধর্মান্তর গ্রহণাপেক্ষা মৃত্যুকেই শ্রেয় জ্ঞান করিলেন। ফলে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড ভোগ করিতে হইল। উপস্থিত মুসলমান ধর্মীয় নেতাদিগকে উপহার প্রদান করিয়া বিদায় করা হইল। তাঁহারা স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলেন। সুবাস খান—যাঁহার কথা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে, যখন দিল্লী প্রবেশ করেন তখনই দরবারে হাজির হইবার জন্য এক সুলতানী ফরমান প্রাপ্ত হন। লাহোর হইতে সৈয়দ খান লোদীকেও ডাকিয়া পাঠানো হইয়াছিল। বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণের সন্দেহে সৈয়দ খান লোদী

তাতার খান ফার্মালী ও মুহাম্মদ শাহ্ লোদীকে একসঙ্গে গুজরাটে নির্বাসিত করা হইল।

এই বৎসরই (৯০৭ হিঃ : ১৫০১ খ্রীঃ) গোয়ালিয়রের মানসিংহ রায় নিহাল নামক তাহার অন্যতম খোজাকে বহু মূল্যবান উপহারসহ সুলতানের নিকট দূতস্বরূপ প্রেরণ করেন। এই ব্যক্তি দরবারে বেআদবী করায় তাহার উপর তৎক্ষণাৎ দরবার ত্যাগের হুকুম হয়। তাহাকে কোন কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় না। এই সময় সুলতানের নিকট বিয়ানার শাসনকর্তা খান খানান ফার্মালীর মৃত্যুসংবাদ পৌঁছে। বিয়ানার শাসনভার প্রথম তাঁহার পুত্রদের উপর ন্যস্ত হয়। কিন্তু তাহাদের সময় শাসনকার্যে বিশৃঙ্খলা পরিলক্ষিত হওয়ায় খুসাব খানকে বিয়ানার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। প্রাক্তন সুবাদার খান খানানের পুত্র আহমদ ও সোলিমানকে শাম্‌সাবাদ, জলেশ্বর, কাম্পিলা ও শাহাবাদের জমিদারি প্রদান করা হয়। এই সময়েই আগ্রা জয়ের জন্য সদর খানের অধীনে একদল সৈন্য প্রেরণ করা হয়। কারণ আগ্রা বিয়ানার অধীনে ছিল এবং সেখানে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছিল। ঢোলপুর অবরোধকল্পেও একদল সৈন্য প্রেরণ করা হইল। ঢোলপুর রাজা বিয়ানক রায়ের অধিকারভুক্ত ছিল এবং বিয়ানক রায় সমর প্রস্তুতি আরম্ভ করিয়াছিল। সেনাপতি খাজা বাবুনকে এই কার্যে নিযুক্ত করা হয়। কিন্তু তিনি যুদ্ধে নিহত হন। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেই বৎসরই ৬ই জমাদি-উল—আউয়াল শুক্রবার (৯০৭ হিঃ : ১৭ই ডিসেম্বর, ১৫০১ খ্রীঃ) সুলতান নিজে ঢোলপুর অভিমুখে রওয়ানা হন। তাঁহার আগমন সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বিনায়ক রায় একজন প্রতিনিধি রাখিয়া গোয়ালিয়র অভিমুখে পলায়ন করেন। দুর্গবাসী সৈন্যরাও পরবর্তী রাত্রিতে দুর্গ খালি করিয়া পালাইয়া যায়। সুলতান বিনা রক্তপাতে দুর্গের অধিকার লাভ করেন। সুলতান একমাস সেখানে অবস্থান করিয়াছিলেন। এই সময় পার্শ্ববর্তী এলাকা ব্যাপক লুণ্ঠন ও অগ্নিকাণ্ড দ্বারা ছারখার করিবার পর তিনি গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন। গোয়ালিয়রের রাজা সন্ধি ভিক্ষা করেন এবং সাঈদ খান শিরওয়ানী, বাবুখান শিরওয়ানী ও রায় গনেশকে সুলতানের হস্তে সমর্পণ করেন। এইসব নেতারা বিভিন্ন সময়ে দরবার হইতে পালাইয়া গোয়ালিয়রের রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে সুলতানের অনুগ্রহ লাভের জন্য রাজা তাঁহার পুত্র বিক্রমাজিৎকে মূল্যবান উপঢৌকনসহ

সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। ঢোলপুর ফিরিয়া আসিয়া সিকান্দর লোদী রাজা বিয়ানক রায়কে স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন এবং তারপর আগ্রা গমন করেন। এই সময় তিনি আগ্রাকে রাজধানী করিবার সংকল্প গ্রহণ করেন। আগ্রায় বর্ষাকাল অতিবাহিত করিবার পর ৯১০ হিজরীতে (১৫০৪ খ্রীঃ) সুলতান মুন্দ্রিল অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান মুন্দ্রিল অধিকার করিবার পর সেখানকার মন্দিরগুলি ভাঙ্গিয়া তাহার স্থলে মসজিদ নির্মাণ করান। সেখান হইতে ঢোলপুর ফিরিয়া আসিয়া রাজা বিয়ানক রায়ের নিকট হইতে দুর্গ কাড়িয়া লন এবং শেখ কামর-উদ-দীনের উপর ইহার শাসনভার অর্পণ করেন। সেখান হইতে আগ্রা ফিরিয়া আসিয়া সুলতান তাঁহার সেনাপতিদিগকে নিজ নিজ জমিদারিতে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করেন।

পর বৎসর (৩রা সফর রবিবার দিন হিঃ ৯১১ : জুলাই ৫, ১৫০৫ খ্রীঃ) আগ্রায় এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্প হয়। ইহাতে পাহাড়গুলির ভিত্তি পর্যন্ত নড়িয়া উঠিয়াছিল। সুউচ্চ অট্টালিকাগুলি মাটিতে গড়াগড়ি যায় এবং কয়েক সহস্র অধিবাসী ধ্বংস-স্তূপের নীচে সমাধিস্থ হয়। পূর্বে বা পরে এমন ভয়াবহ ভূমিকম্প আর হিন্দুস্তানে হয় নাই। এই বৎসরই সুলতান গোয়ালিয়র অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ঢোলপুরে কয়েকমাস অবস্থান করেন। তারপর সেখানে পরিবার-পরিজন ও ভারী সাজসরঞ্জাম রাখিয়া একদল অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া তিনি পার্বত্যাঞ্চলে কয়েকটি হিন্দু রাজার নিকট হইতে অর্থসংগ্রহের জন্য গমন করেন। এইসব হিন্দু রাজার নিকট হইতে তিনি প্রচুর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিলেন। এই সময় বানজারাসদের[৫] সঙ্গে অবাধ আদান-প্রদান বিছিন্ন হওয়ায় সহসা শিবিরের সরবরাহ বন্ধ হয়। এই বণিকদিগকে তাহাদের মালসহ প্রহরাধীনে শিবিরে লইয়া আসিবার জন্য সুলতান আজিম হুমায়ুন, আহমদ খান ও মুজাহিদ খানকে তাহাদের সৈন্যসহ এই কার্যে নিযুক্ত করেন। গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী এলাকার অধিবাসীদের উপদ্রবের জন্য এই কার্য সম্পাদন করিতে তাহাদিগকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

---

৫ মুসলমান ইতিহাসে এই অতি উপকারী সম্প্রদায়ের উল্লেখ এই প্রথম। বানজারাসরা ছিল এক প্রাচীন বণিক সম্প্রদায়। ইহারা তাবুতে বাস করিত। তাহাদের নিজস্ব আইনকানুন ছিল এবং তাঁহারা কখনই শহরের লোকের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিত না। ইহারা অত্যন্ত সাহসী সৎ ও কর্মঠ ছিল এবং তাহাদের স্ত্রীলোকদের সতীত্ব সর্বজনবিদিত ছিল।

ইহার অনতিকাল পরে দিল্লীর ফৌজ গোয়ালিয়রের অধীনস্থ চিন্নুর শহরের নিকট দিয়া গমনকালে অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়। দাউদ খান ও আহমদ খানের (খান জাহানের পুত্র ও খান খানান ফার্মালীর পৌত্র) বীরত্বে তাহারা রক্ষা পায়। শেষ পর্যন্ত হিন্দুদিগকে হটাইয়া দেওয়া হয় এবং কিছু সংখ্যক রাজপুতকে তলোয়ারের মুখে বিসর্জন করা হয়।

আগ্রা ফিরিয়া আসবার পর ৯১২ হিজরীতে (খ্রীঃ ১৫০৬) সুলতান গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারের সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া হনুমন্ত গড় দুর্গের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গটির পতন ঘটে এবং দুর্গবাসী রাজপুত সৈন্যদিগকে তলোয়ারের মুখে উৎসর্গ করা হয়। সেখানকার মন্দিরগুলি ধ্বংস করিয়া তথায় মসজিদ নির্মাণের হুকুম দেওয়া হয়। মুজাহিদ খানের পুত্র ভিকুন খানকে প্রথম এই দুর্গের কর্তৃত্বভার প্রদান করা হয়। কিন্তু সুলতান যখন পরে শুনিতে পাইলেন যে, মুজাহিদ খান হনুমন্ত গড়ের রাজার নিকট এই শর্তে ঘুষ গ্রহণ করিয়াছিলেন যে, তিনি সুলতানের দৃষ্টি হনুমন্ত গড় হইতে অন্য দিকে ফিরাইবেন, তখন তিনি মুজাহিদ খানকে ঢোলপুরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তারপর সুলতান আগ্রায় ফিরিয়া আসেন। পথে সেনাবাহিনী এক জলশূন্য স্থানে থামিয়া পড়ে। জলাভাবে সৈন্যদের দুর্দশা চরমে উঠে। ভারবাহী পশু ছাড়াও ৮০০ শতের মত মানুষ সাহায্য পৌঁছিবার পূর্বেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল। সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত শিবিরে ১৫ টাকায় এক পেয়ালা পানি বিক্রয় হইয়াছে।

পর বৎসর (৯১৩ হিঃ : ১৫০৬ খ্রীঃ) সুলতান মালবের অন্তর্গত নারোর নামক এক সুদৃঢ় দুর্গ জয় করিবার জন্য রওয়ানা হন। এই দুর্গটি হিন্দুদের অধিকারে ছিল। কাল্‌পীর শাসনকর্তা শাহজাদা জালাল খানকে* অগ্রে গমন করিয়া সেই দুর্গ অবরোধ করিতে হুকুম দেওয়া হয় এবং হিন্দুরা বাধাদান করিলে সুলতানকে সে খবর পাঠাইবার নির্দেশ দান করা হয়। সুলতান নারোরের সম্মুখে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য জালাল খান তাঁহার সেনাবাহিনী কাতারবন্দী করিয়া দণ্ডায়মান করান। কিন্তু ইহা দেখিয়া সুলতানের মনে সন্দেহের উদ্রেক হয় এবং তিনি জালাল খানকে ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর

---

৬ এই নামের দুইজন শাহজাদা ছিলেন। এখন যাহার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তিনি সুলতানের ভ্রাতা—যিনি তাঁহার স্থলে পরে কাল্‌পীর শাসনকর্তা হন, তিনি সুলতানের পুত্র।

হন। আটক্রোশ পরিধি বিশিষ্ট নারোর দুর্গকে বেষ্টন করা হইল। আট মাস ব্যাপী অবরোধ চলিল কিন্তু সুলতান সাফল্য অর্জন করিতে পারিলেন না। এই সময় সুলতান জানিতে পারিলেন যে, দুর্গবাসী শত্রুদের সঙ্গে তাঁহার ফৌজের আমীরদের গোপন কথাবার্তা চলিতেছে। সন্দেহবশে শাহজাদা জালাল খান লোদী ও শের খান লোহানীকে হনুমন্ত গড় দুর্গে কয়েদ করিয়া রাখিলেন। শীঘ্রই পানি ও খাদ্যের অভাবে দুর্গবাসী সৈন্যরা বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। সুলতান কয়েকমাস যাবৎ নারোরের মন্দির ধ্বংস ও মসজিদ নির্মাণ কার্যে ব্যাপৃত থাকেন। তিনি সেখানে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া সেখানে বহু পীর ও আলেমকে স্থান করিয়া দেন। এই সময়েই মালবের অধিপতি সুলতান নাসির-উদ-দীনের পুত্র শাহাব-উদ-দীন পিতার প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া সুলতানের সঙ্গে আলোচনা করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—সিপ্রিতে এই সাক্ষাৎ হয়। তাঁহাকে চান্দেরী ছাড়িয়া দেওয়ার শর্তে সুলতান সিকান্দর তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি দান করেন।

৯১৭ হিজরীর (১৫০৮ খ্রীঃ) সাবান মাসে সুলতান নারোর ত্যাগ করেন। কিন্তু সিন্দুনদ বরাবর কিছুদূর অগ্রসর হইবার পর তিনি স্থির করেন যে, নারোরের চতুর্দিকে আর একটি প্রাকার নির্মাণ করিতে হইবে। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই কাজ আরম্ভ করিবার হুকুম দেন। সুলতান অতঃপর জেহার শহরে গমন করিয়া সেখানে পুরা একমাস কাল অবস্থান করেন। এইখানে কুতুব খান লোদীর স্ত্রী নিয়ামত খাতুন (যিনি শাহজাদা জালাল খানের দুগ্ধমাতাও ছিলেন) সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। সুলতান শাহজাদাকে কাল্‌পী জিলা জায়গীরস্বরূপ প্রদান করেন। অতঃপর সুলতান রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করেন। ইলকান্তে পৌঁছিয়া সেই অঞ্চলের কতকগুলি বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সৈন্যবাহিনীর একাংশ নিয়োজিত করেন। বিদ্রোহীদের ঘর-বাড়ী ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয় এবং তাহাদিগকে ভয় প্রদর্শনের জন্য স্থানে স্থানে সিপাহীদের থানা স্থাপন করেন। এই সময় এক অদ্ভুত সংবাদ পাওয়া যায় যে, লক্ষ্ণৌর সুবাদার মুবারিক খান লোদীর পুত্র আহমদ খান হিন্দু ধর্ম-মত[৭] গ্রহণ করিয়াছে। ইহা শুনিয়া

৭ ইহা বিশ্বাস করা শক্ত যে, কোন ব্যক্তি ইসলাম ধর্মের সরল ও স্বচ্ছ মতে অভ্যস্থ হইবার পর পৌত্তলিক হইতে পারে। বিধর্মীকে হিন্দুধর্মে দীক্ষি

সুলতান তাঁহার ভ্রাতা মুহাম্মদকে হুকুম দিলেন—তাঁহাকে বন্দী অবস্থায় দরবারে প্রেরণ করিতে। তাঁহার দ্বিতীয় ভ্রাতা সৈয়দ খানকে শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিলেন। এই বৎসরই মালবের অধিপতি সুলতান নাসির-উদ-দীনের পৌত্র মুহাম্মদ খান পিতামহের ক্রোধানল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য দিল্লীর দরবারে আসিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সুলতান তাঁহাকে তাঁহার চান্দেরীর জায়গীরে শান্তিতে বাস করিবার অনুমতি প্রদান করেন এবং মালবের সুলতানের কোপানল হইতে তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কাল্‌পীর শাহজাদা জালাল খানকে নির্দেশ দান করেন। এই সময় সুলতান ঢোলপুর গমন করিয়া (হিঃ ৯১৫, খ্রীঃ ১৫০৯) স্থানে স্থানে পান্থশালা নির্মাণের আদেশ দেন। এই বৎসরেই মুহাম্মদ খান নাগোরী আলী খান ও আবুবকরকে পরাস্ত করেন। কারণ, উহারা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিল। তাহারা আশ্রয়ের জন্য সিকান্দর লোদীর নিকট পালাইয়া গেল। সুলতানের ক্রোধের ভয়ে, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য অনেক উপহারাদি প্রেরণ করেন। অধিকন্তু দিল্লী সম্রাটের নামে নাগোরে খোত্‌বা পাঠের ব্যবস্থা করেন। এইরূপ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বীকারে সুলতান অত্যন্ত খুশী হইয়া তাহাকে মূল্যবান খেলাৎ প্রেরণ করেন ও তাঁহাকে ক্ষমতায় বহাল রাখেন। ঢোলপুর অবস্থানকালে সুলতান খান জাহান ফার্মালীর পুত্র সোলিমান খানকে হনুমন্ত গড়ের হুসেন খানের সাহায্যার্থ রওয়ানা হইবার হুকুম দেন। সোলিমান খান অযথা গড়িমসি করিতে থাকে এবং অজুহাত-স্বরূপ বলেন যে, সুলতানের নিকট অবস্থান করিতেই তিনি ভালবাসেন। সুলতান ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত করেন এবং পরদিন প্রভাতে দিবালোকে প্রকাশ্যে তাঁহাকে শিবির ত্যাগ করিতে বলেন। ভবিষ্যতের ভরণ-পোষণের জন্য অবশ্য তাঁহাকে বিরানের রাজস্ব গ্রহণের অধিকার প্রদান করা হয়।

এই সময় মালব সুলতানের অধীনস্থ চান্দেরীর সুবাদার বাহ্‌জুত খান তাঁহার প্রভু সুলতান মুহাম্মদের নির্বুদ্ধিতায় বিরক্ত হইয়া নিজেকে দিল্লী সরকারের

করিবার কোন নিয়মও নাই। হিন্দু ধর্মের নৈতিক দিক লক্ষ্য করিয়া—হিন্দুরা যে দোজখবাসী হইবে এ বিশ্বাস তিনি মন হইতে দূর করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের উপর জুলুম করা বন্ধ করিয়াছিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রতি এবং হিন্দুদের প্রতি এই উদার মত ও মানবিক ব্যবহার করাই সিকান্দর লোদীর মনে ইসলাম ধর্ম ত্যাগের সামিল বলিয়া গণ্য হইয়াছিল।

অধীনে আনয়নের প্রস্তাব করেন। সিকান্দর লোদী সেই প্রস্তাবানুযায়ী বাহ্জুত খানকে তাঁহার রাজদ্রোহিতায় সাহায্য করিবার জন্য ইমাদ-উল-মুলক্কে পাঠাইয়া দেন। ইহার অল্পকাল পরেই চান্দেরীকে নিজ রাজ্যভুক্ত ঘোষণা করিয়া সুলতান সিকান্দর এক ফরমান জারি করেন। চান্দেরীর সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে কিছু রদ-বদল করিবার প্রয়োজনে তিনি সৈয়দ খান লোদী, শেখ জালাল ফার্মালী, রায় উগুর সেন কাচওয়াহা, খিজির খান ও খাজা আহম্মদকে চান্দেরী প্রেরণ করেন। ইহারা সাফল্যের সঙ্গে চান্দেরীকে দিল্লী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিলেন। মালবের শাহজাদা মুহাম্মদকে বাহ্যিকভাবে চান্দেরীর শাসনকর্তা বলিয়া জাহির করা হইল; কিন্তু কার্যতঃ তাহার সমস্ত ক্ষমতা কাড়িয়া লইয়া তাঁহাকে শহরে অন্তরীণ রাখা হইল। ওদিকে চান্দেরীর সুবাদার বাহ্জুত খানের কর্তৃত্ব দিল্লীর কর্মচারীরা আত্মসাৎ করিয়া লওয়ায় তিনি চান্দেরী ত্যাগ করিয়া রাজধানীতে চলিয়া আসিলেন।

এই সময় সাহারানের নায়েব হুসেন খান ফার্মালীর মতিগতি সন্দেহজনক প্রতীয়মান হওয়ায়, সুলতান হাজী সারংকে কিছু সৈন্যসহ সাহারান প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রতি নির্দেশ ছিল যে, তিনি কৌশলে নায়েবের সৈন্যদিগকে হাত করিয়া নায়েবকে বন্দী করিবেন। হুসেন খানের নিকট সুলতানের মতলব গোপন ছিল না। তিনি কোনপ্রকারে পালাইয়া যাইয়া বাঙ্গালার আলা-উদ-দীন শাহ্ পুরবীর আশ্রয় গ্রহণ করেন।

৯২২ হিজরীতে (১৫১৬ খ্রীঃ) সুইসাপুরের সুবাদার আলী খান নাগোরী রনথম্বরের সুবাদার মালবের শাহজাদা দৌলত খানের সঙ্গে এক গোপন চুক্তি সম্পাদন করেন। শাহজাদা সিকান্দার লোদীর হাতে রনথম্বর দুর্গের অধিকার ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন, এই শর্তে যে সুলতানকে নিজে আসিয়া দুর্গের দখল লইতে হইবে। এই সংবাদে উল্লসিত হইয়া সুলতান সিকান্দার তৎক্ষণাৎ বিয়ানার দিকে রওয়ানা হইয়া পড়েন। রনথম্বরের সুবাদার দৌলৎ খান সেখানে সুলতানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন এবং তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারের প্রধান উদ্যোক্তা আলী খান নাগোরী ইহাতে বাধ সাধেন। এই কার্য হাসিল করিয়া সুলতানের নিকট হইতে কিছু সুবিধা লাভ করিবার আশা তিনি পোষণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সে আশা পুরণের

কোন লক্ষণ না দেখিয়া তিনি এই ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করেন এবং তাঁহারই প্ররোচনায় রনথম্বরের সুবাদার তাঁহার মনোভাব পরিবর্তন করেন এবং দুর্গ হস্তান্তর করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। সুলতান সব জানিতে পারিয়া আলী খান নাগোরীকে অপদস্থ করেন। সুইসাপুরের সুবাদারী তাঁহার হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া তাহার ভ্রাতা আবুবকরকে প্রদান করেন। রনথম্বরের অধিকার লাভ সুলতানের ভাগ্যে ঘটিল না। তিনি আগ্রা চলিয়া আসিলেন।

৯২৩ হিজরীতে (১৫১৭ খ্রীঃ) গোয়ালিয়র অধিকারে কৃতসঙ্কল্প হইয়া সুলতান দূরবর্তী এলাকার আমীরদিগকে সসৈন্যে আগ্রায় তলব করেন। গোয়ালিয়র আক্রমণের উদ্যোগ চলিতেছিল—এই সময় মুখগহ্বরে ক্ষত হইয়া ৭ই জিলকদ রবিবার ৯২৩ হিজরীতে (১৪ই ডিঃ ১৫১৭ খ্রীঃ) সুলতান ইন্তেকাল করেন।

নিজাম-উদ-দীন আহমদ বলেন, তাঁহার রাজত্বের ইতিহাস যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা এই সুলতানের সবিস্তার বর্ণনা দ্বারাই তাহাদের ইতিহাসের অনেকাংশ পূর্ণ করিয়াছেন। নিজাম-উদ-দীন বলেন, তিনি তাহাদের বিবরণ অনেকটা সংক্ষিপ্ত করিয়া সিকান্দর চরিত্রের কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করিয়াছেন। সমসাময়িক লেখকরা সকলে তাহার দৈহিক বর্ণনা দিয়াছেন। তাহার দেহ যেমন ছিল সৌন্দর্য ও লাবণ্যে মহিমান্বিত তেমনি তাঁহার অন্তর ছিল বিদ্যা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ। তাঁহার রাজত্বকালে জীবনের প্রয়োজনীয় প্রত্যেক জিনিস সস্তা ও পর্যাপ্ত ছিল এবং রাজ্যে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিত। জনসাধারণের অভিযোগ প্রকাশ্যে ও স্বকর্ণে শ্রবণের জন্য তিনি প্রতিদিন কিছু সময় ব্যয় করিতেন। কখনই ইহার ব্যতিক্রম হইত না। অনেক সময় তাঁহাকে সমস্ত দিন কার্যে ডুবিয়া থাকিতে দেখা যাইত। ফলে আহার ও বিশ্রামের নির্ধারিত সময় অতিক্রান্ত হইয়া যাইত। তিনি নিয়মিত দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ আদায় করিতেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি কঠোরভাবে ন্যায়নীতি অনুসরণ করিয়া চলিতেন এবং কখনও ব্যক্তিগত অনুভূতি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইতেন না। ঈশ্বর ভীতি ও বদান্যতার জন্য তিনি সমভাবে বিখ্যাত ছিলেন। রাজত্বের প্রথমভাগে তিনি যখন তাঁহার ভ্রাতা বারবিকের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেছিলেন তখন এক 'কালান্দর' তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিয়াছিল, "আপনার জয় হউক।" ইহা শুনিয়া সুলতান বলিয়াছিলেন, "আপনি এইরূপ দোওয়া করুন যে, যাহার দ্বারা জনগণের অধিক কল্যাণ সাধিত হইবে, তাহারই যেন

জয় হয়।" সাম্রাজ্যে বসবাসকারী পীর-আউলিয়াদের মধ্যে অসংখ্য ব্যক্তি সরকারী ভাতা পাইতেন এবং বৎসরে দুই কিস্তিতে এই ভাতা এবং তৎসঙ্গে এক প্রস্ত পোশাক প্রদান করা হইত। সুলতান শহর বা শিবির—যখন যেখানেই বাস করিতেন তখন প্রতি শুক্রবারে তিনি দীনদু:খীদের মধ্যে অর্থ ও খাদ্য বিতরণ করিতেন। সর্বপ্রকার দান খয়রাতকে তিনি উৎসাহ দান করিতেন এবং আমীরগণ কোন মহৎকাজ করিলে তিনি তাহাদের ভূয়সী প্রশংসা করিতেন। বলা বাহুল্য, সরকারী কর্মচারীদিগকে সৎকার্যে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্যই তিনি এরূপ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "আপনারা সৎকার্যের ভিত্তি স্থাপন করিলে আপনাদিগকে কখনই অনুতপ্ত হইতে হইবে না"। ইসলাম ধর্মের প্রতি প্রবল অনুরাগ বশতঃ তিনি হিন্দুদের সমস্ত মন্দির ধ্বংস করিবার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। মথুরা নগরীর স্নান-ঘাটের সিঁড়ির পার্শ্বেই তিনি মস্‌জিদ ও বাজার নির্মাণ করাইয়া হিন্দুদের সেই ঘাটে তীর্থস্নান বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। তীর্থস্থানে আসিয়া হিন্দুরা দাড়ি ও মাথা মুণ্ডন করিত। সুলতান নাপিতদের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করিয়াছিলেন যে, তাহারা কাহারো দাড়ি ও মাথা মুণ্ডন করিতে পারিবে না। সালার মাসুদের স্মৃতিকে স্মরণ করিবার জন্য যে বর্শামিছিল বাহির করা হইত, তিনি তাহাও নিষিদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। মুসলমান স্ত্রীলোকদের দরগাহ্ প্রভৃতি স্থানে যাইয়া শির্ণিদানের রেওয়াজ তিনি বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে এক পীরের সঙ্গে তাঁহার তর্ক হইয়াছিল। মুসলমান পীর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "প্রজাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা সুলতানের পক্ষে অত্যন্ত গর্হিত কাজ এবং যুগ যুগ ধরিয়া লোক যেখানে স্নান করিয়া আসিতেছে সেখানে স্নান করার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা অত্যন্ত অন্যায়"। শাহ্‌জাদা এই কথা শুনিয়া তলোয়ার টানিয়া বাহির করিয়া বলিয়াছিলেন, "হতভাগা! তুমি তবে হিন্দু ধর্মকে সত্য বলিয়া মনে কর!" পীর বলিলেন, "কখনই নয়। তবে আমি শরিয়তের উপর ভিত্তি করিয়াই বলিতেছি—প্রজাদের উপর কোন প্রকারেই জুলুম করা সুলতানদের উচিৎ নয়।" এই উত্তর শুনিয়া তিনি শান্ত হইয়াছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্বত্র যেখানে যত মসজিদ ছিল, সে সবগুলির সংস্কার সাধন ও পুনর্গঠন করেন। তিনি অতিশয় বিদ্যোৎসাহী নরপতি ছিলেন, তাঁহার সেনাপতিগণ সকলেই শিক্ষিত ছিলেন। এমনকি হিন্দুরাও যাহারা ইতিপূর্বে ফারসী ভা'

শিক্ষা করেন নাই—তাঁহার রাজত্বকালে তাহারা মুসলমানদের সাহিত্য ও অন্যান্য বিদ্যা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করে। সামরিক বিভাগেও তিনি কতকগুলি নূতন নিয়ম প্রবর্তন করেন। পদোন্নয়নকালে তিনি প্রত্যেক সামরিক অফিসারের চরিত্রগত ও শিক্ষাগত যোগ্যতার উপর জোর দিতেন। ঘোড়ার সাহায্যে ডাক প্রেরণের সুবিধার জন্য রাজ্যের সর্বস্থানে মোকাম তৈরী করেন। গতিশীল সেনাবাহিনী এই ঘোড়ার ডাকের মারফত প্রতিদিনের সংবাদ রাজধানীতে প্রেরণ করিত। কোন নূতন ফরমান জারী করা প্রয়োজন হইলে লোক মারফত রাজ্যের প্রত্যেক মস্‌জিদে সেই ফরমান প্রেরণ করা হইত এবং জুম্মার নামাজের সময় ঐ ফরমান জনগণকে পাঠ করিয়া শোনান হইত। সেনাবাহিনী, দরবার ও সমস্ত শহরের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করিয়া প্রতিদিন সুলতানকে শ্রবণ করানো হইত। এজন্য কতকগুলি বিশেষ কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। এইসব সংবাদের ভিত্তিতে প্রয়োজনবোধে তিনি তাঁহার হুকুম সংশোধন করিতেন। প্রচুর সময়-ব্যয় ও কষ্টস্বীকার করিয়া তিনি প্রায়ই আইনের জটিল বিষয়ে অনুসন্ধান কার্য চালাইতেন এবং নিজে আইনগত সমস্যার সমাধান করিতেন। তাঁহার দ্রুত অনুধাবন শক্তি ও নির্ভুল বিচারবুদ্ধি সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। একটা গল্প এই: "সেনাবাহিনীতে কোন দুই ভাই স্বেচ্ছা-সৈনিক হিসাবে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। গোয়ালিয়র দুর্গ অবরোধকালে তাহারা যে-সব লুণ্ঠিত দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে ভিন্ন আকারের দুইটি বৃহদাকার 'রুবী' বা পদ্মরাগ মণি ছিল। এক ভাই চাকুরী ছাড়িয়া দিল্লীতে পরিবারের নিকট ফিরিয়া আসিবে স্থির করিল। অন্য ভাই—যে সেনাবাহিনীতেই রহিল, সে ঐ মণিটি সহ তাহার লুটের মাল দিল্লীতে তাহার স্ত্রীকে পৌঁছাইবার জন্য তাহার গৃহে প্রত্যাগমনকারী ভাইকে দিল। যুদ্ধ শেষে দিল্লী ফিরিয়া সেই সিপাহী তাহার স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, সে পদ্মরাগ মণিটি পায় নাই। কিন্তু তাহার ভাই বলিল, সে রুবী তাহার ভাই-এর স্ত্রীকে দিয়াছে এবং তাহার ভ্রাতৃবধূ মিথ্যা কথা বলিতেছে। দুই দল কাযী মিয়া ভুরার নিকট হাজির হইল। কাযী—যে লোকটি চাকুরী ছাড়িয়া অগ্রে আসিয়াছিল তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, সে রুবী ফেরৎ দিবার সময় কেহ দেখিয়াছে কিনা। সে কয়েকজন লোকের কথা বলিল—তাহারা নাকি জানে যে তাহার ভ্রাতার স্ত্রী ঐ রুবী পাইয়াছে।

সাক্ষীদের মধ্যে কয়েকজন কুখ্যাত ব্রাহ্মণ ছিল। ইহারা ঐ স্ত্রীলোকের

বিরুদ্ধে শিখানো মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করে। কাযী তখন স্ত্রীলোককে গৃহে ফিরিয়া স্বামীকে রুবী প্রদান করিবার রায় দান করেন। ফলে এই হতভাগী স্ত্রীলোককে গৃহে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। অতিষ্ঠ হইয়া শেষ পর্যন্ত সে খোদ সুলতানের নিকট বিচার প্রার্থী হইয়াছিল। সুলতান মনোযোগ সহকারে সমস্ত গল্প আনুপূর্বিক শুনিয়া সাক্ষীদিগকে হাজির হইতে বলেন। তাহারা সকলেই বলে যে, তাহারা রত্নটি সিপাহীর স্ত্রীকে দিতে দেখিয়াছে এবং উহার আকার আয়তন সকলের স্পষ্ট মনে আছে। সুলতান প্রত্যেক সাক্ষীর হাতে তখন কিছু মোম দিয়া প্রত্যেককে সেই রত্নের একটা প্রতিকৃতি তৈরী করিয়া আনিতে বলেন। তাহাদিগকে পৃথক পৃথক কক্ষে রাখা হইল। ভ্রাতৃদ্বয়ের প্রস্তুত প্রতিকৃতি একই প্রকার হইল। কিন্তু সাক্ষীদের প্রস্তুত প্রতিকৃতি ভিন্ন ভিন্ন আকৃতির হইল — কোন দুইটি এক প্রকারের হইল না। ইহাতে সুলতান বুঝিয়াছিলেন, তাহারা কেহই সেই রত্ন চোখে দেখে নাই। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডিত করিবার পর তাহারা সত্য কথা বলে এবং স্ত্রীলোকের নির্দোষিতা প্রমাণিত হয়।" সিকান্দর লোদী নিজে কবি ছিলেন এবং সাহিত্যিককের অত্যন্ত সমাদর করিতেন। তাঁহার সময়ে গদ্য ও পদ্যে বহু গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে 'ফারহাঙ্গে সিকান্দরী' অন্যতম। এই গ্রন্থের লেখকের মতে সুলতান সিকান্দর লোদী আটাইশ বৎসর পাঁচমাস রাজত্ব করিয়াছিলেন।

ইব্রাহিম লোদী আফগান

[কওমের লোকের প্রতি প্রত্যক্ষ ঔদাসিন্য প্রদর্শন করিয়া ইব্রাহিম তাহাদের বিরাগভাজন হন। সুলতানের ভ্রাতা জালালের (কাল্পীর সুবাদার) জৌনপুর গমন করিয়া রাজোপাধি ধারণ। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার গোয়ালিয়র পলায়ন। গোয়ালিয়র অবরুদ্ধ এবং গোয়ালিয়রের রাজার প্রাণত্যাগ। অতঃপর জালালের প্রথম মালবে পলায়ন এবং পরে সেখান হইতে গণ্ডোয়ারায় গমন। গণ্ডোয়ারায় জালাল ধৃত এবং তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান। গোয়ালিয়র অধিকৃত। কয়েক স্থানে আফগান দলপতিদের বিদ্রোহ। সুলতানের নিষ্ঠুরতা। দরিয়া খান লোহানীর পুত্র কর্তৃক গঙ্গার পূর্ববর্তী সমস্ত এলাকা অধিকৃত এবং মুহাম্মদ শাহ উপাধি ধারণ। লাহোরের সুবাদার দৌলত খান লোদী বিদ্রোহী হইয়া কাবুল হইতে বাবরকে ভারতাক্রমণের আহ্বান। বাবর ও সুলতানের ভ্রাতা আলা-উদ-দীনের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত। বাবরের স্বয়ং ভারতাক্রমণে আগমন। ইব্রাহিম তাঁহাকে বাধাদান করিয়া পরাজিত ও নিহত। আফগান শাহীবংশের অবসান।]

আগ্রায় সিকান্দর লোদীর ইন্তেকালের পর উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজত্বের শুরুতেই তিনি তাঁহার পিতা ও পিতামহ কর্তৃক অনুসৃত স্বজনপ্রীতির নীতি পরিহার করেন। তিনি তাঁহার স্বজাতীয় ও বাহিরের কর্মচারীদের মধ্যে কোন প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ করিতে অস্বীকার করেন। তিনি প্রকাশ্যে বলিতেন যে, সুলতানের কোন গোত্র বা আত্মীয় নাই। সকলেই তাঁহার নিকট সমান—সকলেই রাষ্ট্রের প্রজা বা ভৃত্য। যে-সকল আফগান আমীরকে পূর্বে দরবারে উপবেশন করিতে দেওয়া হইত, এখন তাঁহাদিগকে বুকে হাত রাখিয়া সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য করা হইল। এইসব কারণে তাঁহার সিংহাসনারোহণের অনতিকাল পরেই লোদী সরদাররা তাঁহার বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তাহারা স্থির করেন যে, দিল্লী ও দিল্লীর অধীনস্থ কয়েকটি প্রদেশ ইব্রাহিমকে ছাড়িয়া দিয়া রাজ্যের অবশিষ্ট অংশের কর্তৃত্ব তাহার ভ্রাতা শাহজাদা জালাল খানকে প্রদান করা হইবে এবং তিনি জৌনপুরে বসিয়া স্বাধীন সুলতান রূপে রাজত্ব করিবেন। এই চক্রান্ত অনুযায়ী শাহজাদা জালাল[১] কাল্পী হইতে আসিয়া বিক্ষুব্ধ

১ এই শাহজাদা তাঁহার পিতা কর্তৃক কাল্পীর সুবাদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

আমীরদের সাহায্যে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি তাঁহার চাচাতো ভাই ফতেহ্ খানকে উজির মনোনীত করেন। উজিরের প্রচেষ্টায় পূর্ব প্রদেশগুলির সকল আমীরগণ জালালের পক্ষাবলম্বন করেন। এই সময় ইব্রাহীমকে মোবারকবাদ জানাইবার জন্য খান জাহান লোদী রাবেরী হইতে আগ্রাভিমুখে রওয়ানা হন। বিক্ষুব্ধ আমীরদের সঙ্গে পথে তাঁহার সাক্ষাৎ হয় এবং তিনি তাহাদিগকে রাজ্যে বিভেদ ও অনৈক্য সৃষ্টির জন্য তীব্রভাষায় দোষারোপ করেন এবং তাহাদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দেন যে, ইহার পরিণাম লোদী বংশের জন্য মারাত্মক হইবে। আমীরদের তখন হুঁস হয় এবং তাঁহারা তাঁহাদের ভুল বুঝিতে পারেন। শাহ্জাদা জালাল তখনও ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। শাহজাদা জালালের হাত হইতে নবলব্ধ ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার জন্য তাঁহারা বদ্ধপরিকর হইলেন। তদনুযায়ী শাহজাদাকে জৌনপুর পৌঁছিবার পূর্বেই ধরিয়া আনিবার জন্য পত্রসহ হয়বত খানকে পাঠানো হইল। এই ব্যাপারে হয়বত খান কিছু বাড়াবাড়ি করায় শাহজাদার মনে সন্দেহের সঞ্চার হয় এবং তিনি না আসিবার জন্য অজুহাত সৃষ্টি করেন। শাহজাদার দলভুক্ত আমীরগণ অবশ্য তাহা বুঝিতে না পারিয়া শেখ মুহাম্মদ ফার্মালী এবং আরও কয়েকজনকে শাহজাদার পরিবর্তে পাঠাইলেন। শাহ্জাদা জৌনপুর চলিয়া যান। শাহজাদা জালালকে ফিরাইয়া আনিবার সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইতে দেখিয়া ইব্রাহীম লোদী তাঁহার ভ্রাতার সঙ্গে যোগদানকারী প্রত্যেক আমীরকে রাজদ্রোহী ঘোষণা করিয়া এক ফরমান জারী করেন। সেই সঙ্গে তিনি সমস্ত প্রধান আমীরদের নিকট উপহার ও লোক পাঠাইলেন। ইহার ফলে তাঁহারা ক্রমাগত সিংহাসনের নূতন দাবীদার জালালের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া সুলতানের দিকে আসিতে লাগিলেন। শাহজাদার দলের দ্রুত অবনতি ঘটিতে থাকায় তিনি মনে করিলেন যে, কোন দুঃসাহসিক কার্য ব্যতীত তাঁহার অধঃপতন রোধ করা সম্ভব নয়। সেই মোতাবেক তিনি কাল্পী ফিরিয়া আসিয়া পরিবার-পরিজনকে দুর্গে নিরাপদে রাখিয়া সমস্ত সৈন্যদল একত্রিত করিয়া নিজেকে সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন এবং জালাল-উদ-দীন উপাধি ধারণ করেন। আজিম হুমায়ুনকে তাঁহার সঙ্গে যোগদান করিবার জন্য আমন্ত্রণ জানাইয়া তাঁহার নিকট এক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে প্রেরণ করেন। আজিম হুমায়ুন তখন কালিঞ্জর অবরোধের উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি জালালের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। কিন্তু আজিম হুমায়ুন জালালকে প্রথম জৌনপ

প্রতিষ্ঠিত হইবার পরামর্শ দেন। তদনুযায়ী শাহজাদা জালাল অযোধ্যার শাসনকর্তা মুবারিক খান লোদীর পুত্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হন এবং তাঁহাকে লক্ষ্ণৌ পালাইয়া যাইতে বাধ্য করেন।

এইসব সংবাদ পাইয়া সুলতান ইব্রাহিম উপদ্রুত এলাকার দিকে সৈন্যবাহিনী রওয়ানা করিয়া দিলেন এবং অন্য ভাইদিগকে হানসীর দুর্গে আটক করিলেন। অবশিষ্ট জীবন তাঁহারা সেখানেই কাটাইয়াছিলেন। ৯২৩ হিজরী ২৪শে জিলহজ্জ বৃহস্পতিবার (১৫১৮ খ্রীঃ ৬ই ফেব্রুয়ারী) এই ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল। অযোধ্যাভিমুখে গমনকালে সুলতান সংবাদ পাইলেন যে, আজিম হুমায়ুন লোদী* শাহজাদা জালালের সংশ্রব ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে যোগদানের জন্য রওয়ানা হইয়াছেন। ইহা শুনিয়া সুলতান তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে প্রহরাধীনে শিবিরে আনিবার জন্য কয়েকজন আমীরকে পাঠাইলেন। আজিম হুমায়ুনকে শিবিরে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করা হয়। আরও কয়েকজন আমীর সুলতানের সঙ্গে আসিয়া যোগদান করেন। অতঃপর সুলতান আজিম হুমায়ুন লোদীর পরিচালনাধীনে তাঁহার সেনাবাহিনীর বৃহত্তর অংশ শাহজাদা জালালের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। কিন্তু সুলতানী ফৌজ তাঁহার নিকট আসিবার পূর্বেই তিনি কালপী দুর্গে সামান্য কিছু সংখ্যক সৈন্য রাখিয়া ৩০,০০০ উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্যের এক বাহিনী লইয়া দ্রুতগতিতে আগ্রায় চলিয়া আসেন। আজিম হুমায়ুন লোদী কালপী অবরোধ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিলেন। জালাল আগ্রায় পৌঁছিলেন। আগ্রা তখন তাঁহার হাতের মুঠায়। তিনি ইচ্ছা করিলেই উহা অধিকার করিয়া কোষাগার হস্তগত করিতে পারেন। কিন্তু আগ্রার শাসনকর্তা আদম খান শহর ও দেশকে রক্ষার জন্য শাহজাদা জালালের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করিয়া দেন। তিনি এতদুর অগ্রসর হন যে, সুলতানের পক্ষ হইয়া তিনি জালালকে স্বাধীনভাবে কালপী ভোগ করিবার এবং আরও অনেক অনুগ্রহ প্রদানের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেন—যাহা তাঁহার সম্পূর্ণ অধিকার বহির্ভূত ছিল। আদম খান সুলতানকে সব জানাইলেন। কিন্তু সুলতান ইতিমধ্যে কালপী অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অজ্ঞাতসারে আদম খান জালালের সঙ্গে যে-সব চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন, সুলতান তাহার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপ না

* আজিম হুমায়ুন লোদী ও আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানী ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি।

করিয়া শাহজাদা জালাল খানের বিরুদ্ধে রওয়ানা হইলেন। ওদিকে সৈন্যগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া জালাল খান বাধ্য হইয়া গোয়ালিয়র পালাইয়া যাইয়া রাজার আশ্রয় প্রার্থনা করেন। আগ্রায় আসিয়া সুলতান শাসনব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত করিবার কার্যে মনোযোগ দেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর শাসনকার্যে ভীষণ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইয়াছিল। করিম দাদ তুর্ক ও দৌলৎ খান নামক দুই আমীরকে দিল্লীর শাসনভার গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল। মালবের শাহজাদা মুহাম্মদ খানের সঙ্গে অবস্থানের জন্য শেখজাদা মুহাম্মদ ফার্মালীকে চান্দেরী প্রেরণ করা হয়।

এই সময় সুলতান কোন কারণ না দর্শাইয়া তাঁহার পিতার আমলের উজির মিয়া ভুরীকে বন্দী করেন এবং একই সময়ে তাঁহার পুত্রকে বিশেষ মর্যাদাদান করেন। শাহজাদা জালাল গোয়ালিয়রে আশ্রয় লাভ করায় সুলতান গোয়ালিয়র আক্রমণ করা প্রয়োজন মনে করিলেন। সেইজন্য ৩০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য ও ৩০০ হস্তী লইয়া আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানীকে কারা হইতে রওয়ানা হইতে বলা হইল। আরও সাতজন আমীরকে সসৈন্যে তাঁহার সঙ্গে যোগদানের জন্য প্রেরণ করা হইল। এই সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া শাহজাদা জালাল মালবের সুলতান মাহমুদ খিল্‌জীর দরবারে পালাইয়া গেলেন। গোয়ালিয়র পৌঁছিয়া দিল্লীর ফৌজ দুর্গ অবরোধ করিল। অল্প কয়েকদিন পরেই অসম সাহসী ও কর্মবীর রাজ মানসিংহ প্রাণত্যাগ করেন এবং তাঁহার পুত্র বিক্রমজিৎ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন। কয়েকমাস অবরোধের পর ইব্রাহীম লোদীর বাহিনী পাহাড়ের পাদদেশে একটা বহিঃঘাটি অধিকার করিতে সমর্থ হয় (হিঃ ৯২৪; খ্রীঃ ১৫১৮)। এই স্থানে বাদিলগড় দুর্গ অবস্থিত ছিল এবং এইখানে একটা পিতল-নির্মিত বৃষমূর্তি আক্রমণকারীদের হস্তগত হয়। বহু শতাব্দী পূর্ব হইতে হিন্দুরা এই বৃষমূর্তির পূজা করিয়া আসিতেছিল। মূর্তিটি আগ্রায় পাঠানো হয় এবং সেখানে বাগ্‌দাদ তোরণে ইহাকে চিৎ করিয়া রাখা হয়।

মালবের সুলতান শাহজাদা জালালকে বিশেষ আগ্রহ সহকারে গ্রহণ না করায় তিনি সেখান হইতে গুরাকোটার রাজার নিকট গমনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। পথে একদল গণ্ড[৩] হানা দিয়া তাঁহাকে ধরিয়া বন্দী অবস্থায়

৩ গোণ্ডওয়ারা নামক প্রদেশের অধিবাসীদের গণ্ড বলা হইত।

সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। সুলতান ইব্রাহিম লোদী বাহ্যতঃ তাঁহাকে আটক রাখিবার জন্য হান্সী দুর্গে প্রেরণ করেন এবং পথে তাঁহাকে খুন করিবার ব্যবস্থা করেন। ক্ষমতার কি দুর্জয় মোহ। ইহার জন্য মানুষ নিজের ভাইয়ের রক্তপাত করিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। শুধু ভ্রাতার রক্তপাত করিয়াই ইব্রাহিম লোদী ক্ষান্ত হন নাই। সেই সঙ্গে কয়েকজন সেনাপতির রক্তেও তাঁহার হস্ত রঞ্জিত করেন। আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানী যখন গোয়া-লিয়র অধিকারে কৃতকার্য হইতে যাইতেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে সুলতান তাঁহাকে তলব করিয়া আনিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্র ফতেহ্ খানকে বন্দী করেন। অন্য পুত্র ইসলাম খানকে কারার শাসনকর্তার পদ হইতে অপসারণ করেন। ইসলাম খান পিতা ও ভ্রাতার দুর্ভাগ্যের কথা শুনিয়া এবং নিজের অবসম্ভাবী পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। যে আহমদ খানকে শাসনভার গ্রহণ করিতে পাঠানো হইয়াছিল তিনি তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দেন। সুলতান এই সময় গোয়ালিয়র অধিকারের সংবাদ প্রাপ্ত হন। এই দুর্গ প্রায় একশত বৎসর যাবৎ হিন্দুদের অধিকারে ছিল। এই বার সুলতান কারার বিদ্রোহের প্রতি মনোযোগ দিবার প্রচুর অবকাশ পাইলেন। গোয়া-লিয়র বিজয়ের পর আজিম হুমায়ুন ও সাইদ খানকে তাঁহাদের জায়গীরে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করা হইল। ইহারা গোয়ালিয়র ত্যাগ করিবার পর ইসলাম খানের সঙ্গে যোগদান করিয়া তাঁহার শক্তি বৃদ্ধি করেন। তাঁহার নিকটে যে ফৌজ ছিল তাহাদের উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারিয়া সুলতান দূরবর্তী প্রদেশের সৈন্যদিগকে শিবিরে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং আজিম হুমায়ুন লোদীর ভ্রাতা আহমদ খানকে অতিরিক্ত মর্যাদা দান করিয়া ইসলাম খানের বিরুদ্ধে প্রেরিত সেনাবাহিনীর নেতৃত্ব প্রদান করেন। আহমদ খান কনৌজের নিকট পৌছিলে আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানীর অনুগত ইয়েকবাল খান তাঁহাকে আক্রমণ করেন। ইয়েকবাল খান গোপন স্থান হইতে সহসা নিষ্ক্রান্ত হইয়া ৫,০০০ অশ্বারোহী সৈন্য লইয়া সুলতানী ফৌজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে এবং কিছু সংখ্যক সুলতানী ফৌজকে নিহত করিয়া সাফল্যের সঙ্গে সরিয়া পড়ে। এই পরাজয়ের সংবাদ পাইয়া সুলতান আহমদ খানের

[illegible] অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে লিখিয়া জানাইয়াছিলেন [illegible]দ্রোহীদিগকে অচিরে নির্মূল করিতে না পারিলে ভবিষ্যতে তিনি কোন

অনুগ্রহ প্রত্যাশা করিতে পারিবেন না। এই সময় আহমদ খানের শক্তি বৃদ্ধির জন্য আরও একদল সৈন্য পাঠানো হইল। বিদ্রোহীদের দলে ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৫০০ হস্তী এবং বিপুল সংখ্যক পদাতিক সৈন্য ছিল। এই বিশাল বাহিনী লইয়া বিদ্রোহীরা আহমদ খানের অধীনস্থ সুলতানী ফৌজকে বাধাদান করিতে অগ্রসর হইল। দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া নির্লিপ্ত রহিল। কারণ শেখ রাজু বোখারী নামক সে যুগের এক বিখ্যাত পীর আপোষ নিষ্পত্তির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানীকে মুক্ত করিয়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা তাহাদের সেনাবাহিনী ভাঙ্গিয়া দিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিল। কিন্তু সুলতান এই শর্তে রাজী হইলেন না। তিনি বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান লোহানী, গাজীপুরের রাজস্ব সংগ্রহকারী নাসির খান লোহানী এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা শেখজাদা মুহাম্মদ ফার্মালীকে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইবার নির্দেশ দান করিলেন। বিদ্রোহীরা আমোদ-প্রমোদে মাতিয়া রহিল আর সেই অবসরে সমস্ত সুলতানী ফৌজ সম্মিলিত হইল। অতঃপর বিদ্রোহীদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ রহিল—পলায়ন করা অথবা এই অসমান যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। তাহারা দ্বিতীয় পথই বাছিয়া লইল এবং সেই মোতাবেক সৈন্য-বাহিনী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিল। মরিয়া হইয়া তাহারা যুদ্ধ করিতে লাগিল এবং সুলতানী ফৌজকে প্রায় তাহারা পরাস্ত করিতে যাইতেছিল সেই সময় সহসা ইসলাম খান নিহত ও সাইদ খান বন্দী হওয়ায় যুদ্ধের মোড় ঘুড়িয়া গেল। এই অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনায় বিদ্রোহীরা হতোদ্যম হইয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিতে লাগিল এবং তাহাদের সমস্ত মালপত্র সুলতানী ফৌজের হাতে পড়িল। সিকান্দর লোদীর আমলের আমীরদের প্রতি ইব্রাহিম লোদীর ঘৃণা ও বিদ্বেষ এইবার নগ্নভাবে প্রকাশ পাইল। তাঁহাদের অনেককেই মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হইল। আজিম হুমায়ুন শিরওয়ানী, মিয়া ভুরী এবং আরও যাঁহারা আটক ছিলেন তাঁহাদিগকে গোপনে হত্যা করা হইল। আমীরগণ সকলেই তাহাদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিলেন। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান লোদী, খান জাহান লোদী, হুসেন খান ফার্মালী এবং আরও অনেক আমীর প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন। আমীরদের বিরূপ মনোভাবের সংবাদ পাইয়া সুলতান তাঁহাদের বিনাশসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। হুসেন খান ফার্মালীকে হত্যা করিবার জন্য চান্দেরীর কয়েকজন ফকিরকে নিযুক্ত করিলেন। ইহারা তাঁহা'

বিছানায় খুন করিল। ইব্রাহিম লোদীর এইসব নৃশংস কার্যের ফলে তাঁহার শত্রু সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাইল। বিহারের শাসনকর্তা দরিয়া খান লোদী এই সময় মারা গেলে তাহার পুত্র বাহাদুর খান মুহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করিয়া নিজকে স্বাধীন সুলতান বলিয়া ঘোষণা করেন। সেদিকের সমস্ত বিক্ষুব্ধ আমীরগণ তাঁহার সঙ্গে যোগদান করেন এবং শীঘ্রই তাঁহার পতাকাতলে একলক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য সমবেত হইল। এই বিশাল বাহিনীর সাহায্যে তিনি দিল্লীর ফৌজকে পুনঃ পুনঃ পরাজিত করিয়া সম্বল পর্যন্ত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লন। লাহোরের সৈন্যবাহিনী লইয়া গাজী খান লোদী এই সময় সুলতানের সাহায্যে আগাইয়া আসেন। কিন্তু সুলতানের নৃশংসতার কথা শুনিয়া বিশ্বাসঘাতকতার ভয়ে তিনিও লাহোরে তাঁহার পিতা দৌলৎ খান লোদীর নিকট ফিরিয়া যান। দৌলৎ খান লোদী তাঁহার পরিবারের নিরাপত্তার জন্য অনোন্যপায় হইয়া সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়া মোগল বাদশাহ্ বাবরকে হিন্দুস্তান আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ জানাইলেন। বাবর তখন কাবুলে রাজত্ব করিতেছিলেন। বাবরের ভারতাক্রমণের পূর্বে শাহজাদা আলা-উদ-দীন ভারতে চলিয়া আসেন। তিনি এতদিন তাঁহার ভ্রাতা ইব্রাহিম লোদীর ভয়ে পালাইয়া যাইয়া কাবুলে বাস করিতেছিলেন। দৌলৎ খান লোদী নিজের অভিসন্ধি ঢাকিবার জন্য শাহজাদাকে সমর্থন করিবার ভাণ করেন এবং শাহজাদার নামে নিজের জন্য দিল্লীর দক্ষিণে অবস্থিত সমস্ত দেশ অধিকার করিয়া লন। বহু খ্যাতনামা আমীর সসৈন্যে শাহজাদার সঙ্গে যোগদান করায় তিনি শীঘ্রই ৪০,০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের মালিক হন। এই বাহিনী লইয়া তিনি দিল্লী অবরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হন। ইব্রাহিম লোদীও বাধাদানের জন্য অগ্রসর হইলেন। কিন্তু শাহজাদার সেনাবাহিনী হইতে ছয়ক্রোশ দূরে অবস্থানকালে তাঁহার শিবিরে নৈশ আক্রমণ হইল এবং সারারাত্র বিশৃঙ্খলভাবে যুদ্ধ চলিল। প্রভাতে ইব্রাহিম লোদী দেখিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ সেনাপতি তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া শাহজাদা আলা-উদ-দীনের পক্ষে যোগদান করিয়াছেন। তবে তিনি দেখিতে পাইলেন যে, আলা-উদ-দীনের সৈন্যরা বিক্ষিপ্ত হইয়া লুটপাট করিতে ব্যস্ত রহিয়াছে। সুলতান তাহাদের এই অসতর্ক অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করিলেন। তিনি তখন তাঁহার হস্তীবাহিনীকে একত্রিত করিয়া পুনরাক্রমণ করিয়া বসিলেন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দী তার বহু লোককে হত্যা করিয়া তাহাকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে বিতাড়িত করিয়া